শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স • কলিকাতা

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এম. এ (ইংরাজী ও বাংলা), বি.টি., ডি. এস্. ই.

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২
দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল, ১৯৫৫
তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

মূল্য : ৮-৮৭

প্রবর্তক পাবলিশার্স ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি এ, কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থের ১—১৮ ফর্মা ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস ৯।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, এবং অবশিষ্টাংশ প্রবর্তক প্রিণ্টিং এণ্ড হাফটোন প্রাইভেট লিঃ, ৫২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

মা, তোমার হাতে 'শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব' তুলে দিয়ে জগন্মাতার নিকট এই প্রার্থনাই করছি, বাংলার ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' করে তুলতে বইখানি সহায়ক হয়ে যেন তোমার শিক্ষা-ব্রতী সন্তানের পুস্তক-রচনার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। ইতি—**'মণি'**

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তের চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে যখন বিভিন্ন পত্রিকায় শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্যগুলিকে সুখবোধ্য ভাষায় উপস্থাপিত করা। ঐ সময়ে অনেকগুলি প্রবন্ধই প্রবর্ত্তক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রবর্ত্তকের গুণগ্রাহী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী মহাশয় ঐ সমস্ত প্রবন্ধগুলিকে পুস্তকাকারে গ্রথিত করিবার জন্য আমাকে উপদেশ দেন। তাঁর উপদেশ আমার কাছে নির্দ্দেশ ও অনুপ্রেরণার কাজ করিল। আমি কয়েকটি প্রবন্ধ একত্র করিয়া শীঘ্রই তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিলাম। পরে শ্রীচৌধুরী মহাশয় রচনাগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া ও কিছু কিছু সম্পাদনা করিয়া একখানি মনোরম সংস্করণ প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সাতটি নূতন পরিচ্ছেদ সংযোজিত করি এবং বর্ত্তমান তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য আরও চারিটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত করিয়া দিয়াছি। কয়েকটি প্রাচীন পরিচ্ছেদ সমৃদ্ধতর ভাবে পুনর্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থটি এখন প্রাচীন নামে নূতন গ্রন্থই হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে বিষয়-সমৃদ্ধির জন্য "পরীক্ষা পাঠ্য" গ্রন্থ হিসাবে বইটির সার্থকতা বৃদ্ধি পাইলেও, 'সাধারণ-পাঠ্য' পুস্তক হিসাবেও ইহার উপযোগিতা হ্রাস পায় নাই। কারণ, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন যথাসম্ভব সরস ও সুখবোধ্য করিতেই চেষ্টা করিয়াছি। আমি জানি, শিক্ষার প্রয়োজন সার্ব্বজনীন, তাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিদ্যার প্রয়োজনও সার্ব্বজনীন; সেইজন্য সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় মনোবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বগুলি পরিবেশন করিয়াছি; মাঝে মাঝে সাহিত্যের রস মিশাইয়া কর্কশকে কান্ত করিয়া উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিজ্ঞানের গ্রন্থ হিসাবে তাহা ত্রুটি হইয়াছে কি না জানিনা, তবে একটা জটিল বিজ্ঞানের সাধারণীকরণের জন্যই এই কাজ করিয়াছি। এখন যাহাদের উদ্দেশ্যে এই রচনা, তাঁহাদের কিছুটা উপকার হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মৎ লিখিত এই ধরণের অন্য গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর সহিত বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তুর কোথাও কিছু মিল থাকিলে, বুঝিতে হইবে এখন হইতে উহা এই গ্রন্থেরই সামগ্রী। ইতি—

শ্রীরামপুর ১২-৯-৬০ **শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

ইতিকথা

'শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব' গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির সৌভাগ্যবঞ্চিত হয়েও, পাঠকমহলের এই সমাদর বইখানির শুধু যোগ্যতারই নিরিখ নয়, পরন্তু সুধী পাঠকগণের বিচার নৈপুণ্যের সাক্ষ্যও বহন করে। প্রকাশক হিসাবে গ্রন্থের প্রশস্তি হয়তো শোভন হবে না, তথাপি এ কথা না বললেও সত্যের অপলাপ করা হবে যে, ১৯৫২ সালে যখন গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সম্পূর্ণ বাংলা পরিভাষায় শিক্ষা সম্পর্কিত মনস্তত্ত্বের উপর এমন বিষদ আলোচনামূলক গ্রন্থ সম্ভবতঃ আর দ্বিতীয় ছিল না। সে-সময়ে বাংলার প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে এ কথাটা ("মনস্তত্ত্ব বিষয়ক এমন চমৎকার বই বাংলা ভাষায় আছে কি না সন্দেহ"—যুগান্তর। "এ ধরণের বই সে বাংলায় লেখা হইতেছে, ইহা আমাদের সৌভাগ্য"—শনিবারের চিঠি) অকুণ্ঠেই স্বীকৃত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের নিদর্শন না হলেও, গ্রন্থখানি জটিল মনস্তত্ত্বের রাজ্যে দিগ্দর্শক তথা গ্রন্থকার পথিকৃৎ হিসেবে স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গভীরতা, ব্যাপকতা, প্রসাদগুণের পরিচয়ও গ্রন্থের জটিল মনোবিদ্যা বিষয়ক উপস্থাপন প্রমাণ করে। সম্ভবতঃ ভারতের আর কোনও প্রান্তিক ভাষার পক্ষেই এরূপ টেক্‌নিক্যাল বিষয়ের এই প্রাথমিক কৃতিত্ব দেখানো সম্ভবপর ছিল না। গ্রন্থখানির প্রকাশমান তৃতীয় সংস্করণে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত বিভাগই পরিক্রমা করা হয়েছে। ফলে, বর্তমান 'শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব' বইখানিকে বাংলা ভাষায় প্রায় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও বলা চলে।

'যুগান্তর' পত্রিকার ভাষায় শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব "বইখানির সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু হইতেছে অনাড়ম্বর অথচ অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় সহজভাবে বুঝাইয়া দিবার কৌশল।" বইখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'আনন্দবাজার' পত্রিকাও লেখকের প্রকাশভঙ্গী ও ভাষার প্রশংসাপূর্বক মন্তব্য করেছিলেন, বিষয়বস্তুর "আলোচনায় আগাগোড়া একটা আন্তরিকতার ভাব ও মৌলিক-

তার ছাপ সুস্পষ্ট।" গ্রন্থখানিতে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের টেক্‌নিক্যাল বক্তব্যকেও বলবার সাবলীলতা উপন্যাসের মতোই যে আকর্ষণীয় করে তুলেছে সে সম্বন্ধে অনেক সাধারণ পাঠককেও পুস্তকখানি পাঠান্তে মন্তব্য করতে শুনেছি। মৌলিকতার দাবী অবশ্য গ্রন্থকার করেন না, করতেও পারেন না। দীর্ঘ পরাধীন ভারতে অনুকরণ ছাড়া শিক্ষা-মনোবিদ্যার মৌলিক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ-সুবিধা কোনদিনই ছিল না, এমন কি স্বাধীনতার পরে এখনও অবধি তার সূচনা পর্যন্ত হয়নি। শিক্ষা সাহিত্যের ক্রমপুষ্টিও বেশী দিনের নয়। তথাপি বর্তমান পুস্তকখানি পাঠে যে কোন সুধী পাঠকই ধারণা করতে পারবেন যে, গ্রন্থকার পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মনোবিদ্‌দের ইংরেজী গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি সাজিয়ে পুস্তক পৃষ্ঠাকে কণ্টকিত করেন নি, পরন্তু এদেশের ঐতিহ্য, সমাজ-মানস, প্রবণতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ও-দেশের উক্তি, সিদ্ধান্ত-সমাহারকে স্বাধীনভাবে বিচার ক'রে নিজস্ব উপসংহার করেছেন। এমন কি নির্বিচারে ইংরেজী গ্রন্থের হুবহু বাংলা অনুবাদও গ্রন্থকার বর্তমান গ্রন্থে পরিবেশন করেননি। বিষয়বস্তুর স্বাধীন বিচারপূর্বক তিনি তার মর্ম স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এমনভাবে বাংলা ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন যা নূতনত্বেরই দাবী করতে পারে। কচিৎ কোথাও ইংরেজি-জানা পাঠকের সুবিধার জন্য বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি উদ্ধৃতি তুলে দিয়াছেন মাত্র। এ দিক দিয়ে দেখলে বর্তমান গ্রন্থখানির বাংলা ভাষায় শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের মৌলিক ও আকর গ্রন্থ হিসাবে পরিণতি লাভের পুরোপুরি সম্ভাবনা বিদ্যমান।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ইহাই প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ক বহু গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থখানি তাঁকে বাংলা শিক্ষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয় করে রাখবে। গ্রন্থকার পণ্ডিত, বিদ্বান, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি। বহু বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিধি দেখে বার বার বিস্মিত হয়েছি। অমায়িক, আত্মপ্রচারবিমুখ এবং অত্যন্ত লাজুক ও স্পর্শকাতার (sensitive) প্রকৃতির মানুষ তিনি। আজিকার বিজ্ঞাপনের যুগে যে-সব কলা-কৌশল বা অপকৌশল অবলম্বন করলে স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়, সে পথে চলবার

মানস-প্রকৃতিও তাঁর নয়। ফলে যতটুকু প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতির যোগ্য তিনি তাও তিনি পাননি। সুপারিশ-সার্টিফিকেট সংগ্রহ আর ঢাকঢোল পিটিয়ে অযোগ্যকে যোগ্য প্রতীয়মান করার নৈপুণ্য না-থাকাই ইহার হেতু।

প্রায় যুগ-পূর্বের কথা। প্রবর্তক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে লেখক মনীন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সে-সময়ে প্রবর্তকে তাঁর কয়েকটি শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রচনাগুলি তাৎকালীন বি-টি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্কটিশ চার্চ কলেজের বি-টি ছাত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা মৌলিক (বর্তমানে বেলঘরিয়া প্রবর্তক নিদ্যপীঠের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী) মনীন্দ্র বাবুর এই ধরণের রচনাগুলির সংগ্রহ পাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। মনীন্দ্র বাবুও সানন্দে স্বীকৃত হন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংগ্রহের ফাইলটি তাঁকে পাঠিয়ে দেন। প্রায় আট মাস এই ফাইলটি শ্রীমতী মৌলিকের কাছেই থাকে। জন সাতেক সহছাত্রী এই লেখার সাহায্য গ্রহণ করেন। বি-টি পরীক্ষান্তে দেখা গেল, এঁরা সবাই পরীক্ষায় শুধু উত্তীর্ণ হননি, বাংলা ভাষায় লিখে মনস্তত্ত্বের 'পেপারে' বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ইহা ১৯৫০ সালের কথা। তখনও মনস্তত্ত্বের উপর বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ছিল না বললেই চলে। শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য শ্রীমতী কৃষ্ণা এই বিচ্ছিন্ন লেখাগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য বারবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। মনীন্দ্র বাবুর গায়ে-পড়ে আগে-চলার স্বভাব নয়। তাঁর ইতস্ততঃ ছিল। আর্থিক অসংগতির কথা উঠলে শ্রীমতী মৌলিক অলংকার বন্ধক দিয়েও যথাসাধ্য সাহায্যের ভরসা দিলেন। অবশ্য তার আর প্রয়োজন হয়নি। তবে তাঁরই আগ্রাতিশয্যে এবং গ্রন্থকার-প্রকাশকের সম্মিলিত সহযোগে শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব বইখানির প্রথম সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে। আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়, পুস্তকখানি সমাদৃত হয়েছে। তাই বিলম্বিত হলেও, প্রথম আর দ্বিতীয় সংস্করণে নীরব থেকে তৃতীয় সংস্করণের প্রারম্ভে এই ইতিকথাটুকু লিপিবদ্ধ করবার ভরসা করলাম। ইতি—

কলিকাতা
২৭-ভাদ্র '৬৭

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
সম্পাদক : প্রবর্তক।

সূচীপত্র

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব

ভ্রম-সংশোধন: ‘বুদ্ধির মাপকাঠি’ শীর্ষক পরিচ্ছেদের ৩৮৮ পৃষ্ঠার উপর হইতে ১১ লাইন ‘very dull’ স্থলে ‘Moron’ হইবে। ‘অনুবন্ধ’ শব্দের ইংরাজী কোথা কোথাও ভুলক্রমে Co-relation হইয়া থাকিলে উহা Correlation পড়িতে হইবে।

প্রবেশক

শিক্ষা-বিজ্ঞান একটি জটিল শাস্ত্র। "বুনন ধানের" মত খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কতকগুলি জ্ঞানের বীজ ছড়াইয়া দিলেই শিশুর ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না। এই জন্যই প্রয়োজন হইতেছে, যাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে, সেই শিক্ষাটি গ্রহণ করিবার মত শক্তি ছাত্রের আছে কিনা তাহা ঠিক করা, যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা উপযুক্ত কিনা তাহাও ঠিক করা। তাহা ছাড়া কোন্ বয়সে কি শিখান হইবে, শিক্ষার সময়, বিশ্রাম, ছাত্রদের মনোযোগের ক্ষমতা, এ সমস্তই জানিতে হইবে। মানুষ হয়ত কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি (instincts)* লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এইগুলির উৎকর্ষণ (sublimation) করা, তাহাদিগকে কাজে লাগাইয়া চরিত্র-গঠনের পথে পরিচালিত করা, অনুকরণ, সহানুভূতি, অভিভাবন (suggestion) প্রভৃতির সাহায্যে গণমনের যথাযথ ব্যবহার করিয়া শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিয়া তোলা—এই জাতীয় অনেক জিনিসই ছাত্রদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়। এই জন্য শিশু-বিজ্ঞানের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে।

মনস্তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিবর্তন :

এই মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রটি নিতান্ত অর্বাচীন বিষয় নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা যে, এ্যারিষ্টটল (Aristotle—যিনি খৃষ্ট-পূর্ব ৩২২ অব্দে দেহত্যাগ করেন তিনিই) হইতেছেন এই শাস্ত্রের প্রথম পথিকৃৎ। তাঁহার "De anima" (On the soul) নামক নিবন্ধই নাকি মনস্তত্ত্ব বিদ্যার সূত্রপাত করিয়াছে।

* বর্তমান মনোবিদ্গণ কিন্তু কোনও প্রকার সহজাত প্রবৃত্তিকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মানুষের জীবনের চলতি পথে অর্জিত অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

তবে এই শাস্ত্রটি সুপ্রাচীন হইলেও ইহার নামটি অর্থাৎ "সাইকলজি" কথাটি অর্বাচীন। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রুডল্‌ফ গিকেল (Rudolf Goeckel) নামে একজন পণ্ডিত "Psychologia" নামে একটি পুস্তক প্রচার করেন। এই কথাটির অর্থ ছিল Science of the soul অর্থাৎ **আত্মাতত্ত্ব**। তখনকার পণ্ডিতদের বিশ্বাস ছিল যে, আত্মাই হইতেছে প্রাণীর জীবনের চরম তত্ত্ব; সুতরাং মানুষের কাজকর্ম, ভাবনা-চিন্তার মূল উৎস হইতেছে আত্মা।

ব্যুৎপত্তির বিচারে মনস্তত্ত্বের অর্থ **আত্মাতত্ত্ব** হইলেও, আত্মা কথাটির সহিত একটা অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের ব্যঞ্জনা মিশাইয়া আছে বলিয়া আত্মার আলোচনাটি জড়-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। কাজেই বর্তমান যুগে "সাইকলজি" জিনিসটিকে আত্মাকে ছাড়িয়া মনের তত্ত্ব বা **মনস্তত্ত্বে** নামিয়া আসিতে হইল।

কিন্তু প্রশ্নের এইখানেই সমাধান হইল না। কারণ মনটা আবার কি জিনিস? তাহার স্বরূপ কি? দেহ-নিরপেক্ষ মনের অস্তিত্ব আছে কি? কোথায় তাহার বাসা?

এ বিচারও সহজ নয়। কাজেই আত্মার তত্ত্ব ছাড়িয়া এবং পরে মনের কথাও ছাড়িয়া সাইকলজি **চৈতন্য-তত্ত্বে** নামিয়া আসিল। মনটা আর কিছুই নহে, চৈতন্যস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতের বিভিন্ন তরঙ্গলীলা মাত্র।

কিন্তু বিতণ্ডা কি এইখানেই শেষ হইল? আমরা যাহাকে চৈতন্য বলি, তাহার বাহিরেও মনের একটা লীলা আছে। চৈতন্যের অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত নির্জ্ঞান-মন আমাদের অনেক কাজকর্মকেই নিয়ন্ত্রিত করে। আবার নির্জ্ঞান মনেরও যেখানে অস্তিত্ব নাই, এমন অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের নিশ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলির (ductless gland) রসনিঃসরণ আমাদের কাজকর্মকে প্রভাবান্বিত করে। তাহা হইলে, সাইকলজি শুধু চৈতন্য-তত্ত্বও হইতে পারে না।

কাজেই সাইকলজিকে শেষ পর্যন্ত "চেষ্টিতবাদ" বা **আচরণতত্ত্বে** (behaviorism) নামিয়া আসিতে হইল। আত্মা থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে বৈজ্ঞানিকের যায় আসে না, মনের তত্ত্ব না হয় অজ্ঞাতই রহিল, কিন্তু মানুষ যে বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন আবেদনে বিভিন্ন প্রকার

প্রতিক্রিয়া দেখাইবে, বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা বা আচরণ করিবে, ইহা নিশ্চিত। সুতরাং উপস্থিত আচরণতত্ত্ব লইয়াই সাইকলজি কারবার করুক, আচরণের বাহিরে কি সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে, তাহা লইয়া উপস্থিত মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—ইহাই হইল বর্তমান মনস্তাত্ত্বিকদের অধিকাংশের মনোভাব। সাইকলজির এই বিবর্তনটিকে উডওয়ার্থ (Woodworth) চমৎকার কাব্য-ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সাইকলজি প্রথমে তাহার আত্মাকে হারাইয়াছিল, তাহার পর মনকে হারাইল এবং পরিশেষে চৈতন্যকেও হারাইল, তবে এখনও ইহার মধ্যে একটা আচরণের ধারা আছে *।"

মনস্তত্ত্বের এই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই শাস্ত্রটি দর্শন শাস্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্লেটো এবং আরিষ্টটলএর সময় এই শাস্ত্রটি পূর্ণভাবেই দর্শনের অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষের দিক হইতেই ইহা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে গড়িয়া উঠিল। ফলে ইহার আলোচনার রূপটিও বদ্‌লাইয়া গেল।

মনস্তত্ত্ব জিনিসটা যতদিন দর্শনের অভিভাবকত্বে ছিল, ততদিন ইহাকে শুধু দার্শনিক চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির আলোচ্য শাস্ত্র হিসাবেই ভাবা হইত। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দিয়া অনেক জিনিসই, বিশেষতঃ আচরণ সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝিতে পারা যায় না। অন্তর্দৃষ্টির জন্য প্রয়োজন অবসর এবং সমাহিত মনোভাব। কর্মচেষ্টা বা 'আচরণের' সংঘাত ও আবর্তনের মধ্যে এই মনোভাব রাখা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। ক্রোধের বা ভয়ের সময় মানুষের মন কি ভাবে কাজ করে, তাহা ক্রুদ্ধ বা ভীত অবস্থায় ভাবা যায় না। ক্রুদ্ধ মানুষ যদি ক্রোধের সময় থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধের কথা ভাবিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তখন তাহার ক্রোধও খানিকটা উপিয়া যায়।

---

* First psychology lost its soul, then it lost its mind. Then it lost consciousness! it still has behaviour of its kind"—Woodworth Psychology. A study of mental life p. 2.

অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিক চিন্তার আর একটি দোষ আছে। ইহার সিদ্ধান্তগুলি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের দ্বারা এতখানি প্রভাবান্বিত হয় যে, তাহা দ্বারা বিজ্ঞানের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (objective) সার্বজনীন ও প্রমাণযোগ্য সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এইজন্যই বর্তমান মনোবিদ্‌গণ মন সম্বন্ধে দার্শনিক গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া শুধু আচরণকেই তাঁহাদের গবেষণার লক্ষ্য বস্তু স্থির করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু মানুষের শরীর ও মনোগত আচরণের নানা দিক আছে। সংবেদন (sensation), প্রত্যক্ষীকরণ (perception), প্রতিবেদন (response), স্মরণ, মনন, অনুকরণ, অভিভাবন (suggestion), অভিনিবেশ, কামনা, প্রেষণা, (motivation), ধারণা প্রভৃতি মানুষের আচরণের অন্ত নাই। মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে কেহ মনে করেন সংবেদনের মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের মনের সমস্ত রহস্য, কেহবা হয়ত মনে করেন মনের রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহার কামনার ইতিহাসের মধ্যে, কেহ আবার মনে করেন তাহা পাওয়া যাইবে প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যে অথবা শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা চলাফেলার মধ্যে। এইভাবে তাঁহারা নিজের নিজের ধারণা অনুসারে পরীক্ষা চালাইয়া যাইতেছেন ও নানাবিধ তথ্যের সন্ধান করিতেছেন। এইভাবে সৃষ্টি হইয়াছে নানা প্রকার মনস্তাত্ত্বিক সম্প্রদায়—(school) ; এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান, যথা—

ক্রিয়াবাদী সম্প্রদায় (Functional school)
অবয়ববাদী সম্প্রদায় (Structural school)
অনুষঙ্গবাদী সম্প্রদায় (Associationist school)
আচরণবাদী সম্প্রদায় (Behaviorist school)
জেস্‌টাল্ট সম্প্রদায় (Gestalt school)
মনোবিকলনবাদী সম্প্রদায় (Psycho-analysis school)
জীবনপ্রয়াসবাদী সম্প্রদায় (Hormic school)
ব্যক্তিত্ববাদী সম্প্রদায় (Personalistic school)

মানুষের ক্রিয়া-কলাপের আলোচনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ক্রিয়াবাদী সম্প্রদায়, সংবেদনকে (sensation) কেন্দ্র করিয়া structural সম্প্রদায়, প্রত্যক্ষীকরণ (perception)-কে কেন্দ্র করিয়া জেসটাল্ট (Gestalt) সম্প্রদায়, স্মৃতি শিক্ষা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া অনুষঙ্গবাদী সম্প্রদায়, আদিম যৌন কামনাকে কেন্দ্র করিয়া "মনোবিকলনবাদী" সম্প্রদায়, জীবনপ্রয়াসের প্রেরণায় জগতের সহিত "উদ্দেশ্যমূলক কারবারকে" কেন্দ্র করিয়া জীবন প্রসারবাদী (Hormic) সম্প্রদায়, চেষ্টা বা আচরণকে কেন্দ্র করিয়া "আচরণবাদী সম্প্রদায়" এবং সমগ্র মানুষের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে "ব্যক্তিত্ববাদী সম্প্রদায়।" এই সমস্ত সম্প্রদায় (school)-গুলির প্রণালীগত বিভিন্নতাও যথেষ্ট। কেহবা খণ্ড খণ্ড অনুভূতি বা আচরণ হইতে সমগ্র মনের সন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহবা সমগ্রের "প্যাটার্ণ" হইতে খণ্ডের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেহ ভাবিয়াছেন মানুষ বা প্রাণীরা প্রাগ্‌জন্মগত কর্মপটুতা বা সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কেহ বলেন প্রাণীরা জন্মান্তর-প্রসারী কোনও বৈশিষ্ট্যই লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, তাহারা জীবনের চলতি পথে নানা জাতীয় উদ্দীপক (stimulus) এবং তাহার প্রতিক্রিয়া, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়াই যাহা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করে।

এই সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহাদের গবেষণা দ্বারা মানুষের মনের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিচিত্র তথ্যের সন্ধান করিয়াছেন সেইগুলিকেই ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাইয়া আবার মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হইয়াছে। মনোবিদ্যার তথ্যগুলিকে কলকারখানার শ্রমিকদের উপর প্রয়োগ করিয়া কিভাবে ভাল উৎপাদন হইবে ইত্যাদি বিচার করিতে যাইয়া সৃষ্টি হইল ইনডাষ্ট্রিয়াল সাইকলজি (Industrial Psychology), অস্বভাবী মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া তৈয়ারী হইল "অস্বভাবী মনোবিদ্যা" (Abnormal Psychology), শিক্ষার ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া তৈয়ারী হইল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিদ্যা (Educational Psychology), ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার ব্যাপারে উদ্ভূত হইল ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোবিদ্যা (Individual Psychology) ইত্যাদি। ইহা ছাড়া শিশু মনোবিদ্যা (child psychology), প্রাণি মনোবিদ্যা

(animal psychology), সমাজকেন্দ্রিক মনোবিদ্যা (social psychology) প্রভৃতি শাখা-প্রশাখার অন্ত নাই।

শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রয়োজন :

পরিপূর্ণাঙ্গ শিক্ষাশ্রয়ী-মনোবিদ্যা (Educational psychology) জিনিসটি একটা নূতন শাস্ত্র হইলেও, শিক্ষার ব্যাপারে মনস্তত্ত্বের সম্পর্কের কথাটা মানুষ বহু প্রাচীনকাল হইতেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। রোমক পণ্ডিত কুইনটিলিয়ান (Quintilian : মৃত্যু ৯৫ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার ছাত্রদের বক্তৃতা-বিজ্ঞান শিখাইবার পূর্বে তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিয়া লইতেন। ইহাকেই বর্তমান মনস্তাত্ত্বিকদের বুদ্ধি পরীক্ষার (intelligence test) সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। এই মনস্তাত্ত্বিক মনোভাব লইয়াই টমাস ফুলার (Thomas Fuller) বলিয়াছেন, "একজন ভাল শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের সেইভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যেভাবে ছাত্রদের উচিত পাঠ্য-পুস্তককে বুঝিবার চেষ্টা করার।"

অবশ্য শিক্ষা-বিজ্ঞানের সহিত মানস-বিজ্ঞানের সম্পর্কটা সোজাসুজি ভাবে যাঁহারা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সুইস্ স্কুল-শিক্ষক পেষ্টালজি (Pestalozzi) প্রথম। সার জন এ্যাডামস্ (Sir John Adams) যখন বলিয়াছিলেন, "শিক্ষা ক্রিয়াটির দুইটি কর্ম আছে, একটি হইতেছে ছাত্র এবং আর একটি হইতেছে শিক্ষার বিষয়"—তখনও তিনি পরোক্ষভাবে এই মানস-বিজ্ঞানের প্রয়োজনের কথাই বলিয়াছিলেন।

তবে শিক্ষাতত্ত্বে মানস-বিজ্ঞানের প্রয়োজনের কথাটা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে অনেকদিন সময় লাগিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও অনেকের ধারণা ছিল, ভাল শিক্ষক হইতে হইলে যে তাহাকে ভাল মনস্তাত্ত্বিকও হইতে হইবে ইহা খানিকটা আদিখ্যেতার কথা। অধ্যাপক জেমস্ বলিয়াছেন "মনস্তত্ত্বের অত্যন্ত মৌলিক কথাগুলিই (fundamental conception) শিক্ষার প্রয়োজনে লাগে"। ষ্টাউট (Stout) বলেন, "মানস-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা হিসাবে যে তত্ত্বটি আমাদের দিয়াছে, তাহা হইতেছে শিক্ষা ব্যাপারে যাহা

কিছু নূতন তথ্য দেওয়া হইবে, তাহাকে পুরাতন জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই করিতে হইবে।"

তাহা হইলে কি শিক্ষাতত্ত্বের সহিত মনোবিজ্ঞানের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই? তত্ত্ব যখন গুহা-নিহিত থাকে, যখন মহাজনদের মতবাদ আমাদের পথ-নির্দেশ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে দুই দিকেই মহাপুরুষগণের অভিমত রহিয়াছে। তাহা হইলে আমরা কোন্ মতটিকে গ্রহণ করিব?

সাধারণ মনস্তত্ত্ব, যাহা পরিণত-বয়স্কদের মনের ক্রিয়া-কলাপ লইয়া আলোচনা করে, তাহার সহিত শিক্ষা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুব বেশী নাই। কারণ স্কুল পাঠশালায় যাহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই শিশু ও বালকদিগের সহিত পরিণত বয়স্কদের সম্পর্ক খুব বেশী নয়। একটি বেঙাচিকে যেমন ছোট বেঙ্ বলিয়া মনে করা চলে না, অথবা একটি গুটিপোকাকে যেমন ছোট প্রজাপতি বলিয়া মনে করা চলে না, তেমনই একটি শিশুকেও ছোট মানুষ বলিয়া মনে করা চলে না। পরিণত বয়সের মানুষ হইতে শিশু একেবারে অন্য স্তরের জীব। কাজেই সাধারণ মনস্তত্ত্ব আর শিশু-মনস্তত্ত্ব এক জাতীয় বিষয় হইতে পারে না—শিক্ষা-বিজ্ঞানে মনস্তত্ত্বের প্রয়োজন খুব বেশী না থাকিলেও, শিশু-মনস্তত্ত্বের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। তাহা ছাড়া গণমন প্রভৃতির প্রভাবও শিক্ষাতত্ত্বে প্রযুজ্য।

ইহা ছাড়া আরও কথা আছে। কিভাবে পড়াইলে পড়ান সার্থক হইবে, কিভাবে চেষ্টা করিলে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হইবে, অপচয় নিবারিত হইবে, আগ্রহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইবে, সমাজ-সংঘাত নিবারিত হইবে, চরিত্র সুগঠিত হইবে, নীতিজ্ঞান বিকশিত হইবে, আদিম পশু-প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ হইবে, মনের জট্ (complex) সরলায়িত হইবে, অপরাধপ্রবণতা উন্মূলিত হইবে—এইরূপ সহস্র প্রশ্নের সমাধান শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিদ্যা (Educational psychology) দিতে পারে।

তবে এই ব্যাপারে শিক্ষাতত্ত্ব বা দর্শনের সহিত শিক্ষাশ্রয়ী-মনোবিদ্যার একটা পার্থক্য আছে। দর্শন বিচার করে কি পড়াইতে হইবে এবং কেন পড়াইতে হইবে, কিন্তু শিক্ষাশ্রয়ী-মনোবিদ্যা বিচার করিবে কিভাবে তাহা

পড়াইতে হইবে, কখনইবা পড়াইতে হইবে। অর্থাৎ দর্শন শিক্ষা ব্যাপারে যে আদর্শটি স্থির করিবে, শিক্ষা বিষয়ক মনস্তত্ত্ব সেই আদর্শটিকে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিবে। ধরা যাউক দর্শন বিচার করিয়া স্থির করিল যে একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে, পাঠ্যসূচীর মধ্যে বীজগণিত, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, কুসংস্কার দমিত করিতে হইবে, চরিত্র গঠিত করিতে হইবে ইত্যাদি। এইবার শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্ত্বের কাজ হইবে কিভাবে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে, কোন্ বয়সেই বা তাহা আরম্ভ করিতে হইবে, কোন্ বয়সেই বা বীজগণিত শিক্ষণীয় হইবে, কিভাবে পড়িলে বিদেশী শব্দসম্পদ মুখস্থ হইবে ও মুখস্থ থাকিবে, কিভাবে কাজ করিলে কুসংস্কার দমিত হইবে, চরিত্র সুগঠিত হইবে, এই সমস্ত স্থির করা।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন সমাজ-প্রয়োজনে শিক্ষার আদর্শ পরিবর্তিত হইতেছে এবং হইবেও। শিক্ষা-বিষয়ক মনস্তত্ত্ব তখন অগ্রসর হইয়া বলিয়া দিবে—এই আদর্শটি সম্ভাব্য হইয়াছে কিনা, ইহা "অসম্ভব ভালো"র ব্যর্থ গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া "যথাসাধ্য ভালো"র ব্যবহারিক পথের সন্ধান দিবে।

শিক্ষার আদর্শ সমাজ-প্রয়োজনে, যুগ-পরিবর্তনে যেভাবে পরিবর্তিত হয় হউক, পণ্ডিতেরা তাহা ঠিক করুন, মনস্তত্ত্বের তাহাতে অধিকার নাই, কিন্তু যে আদর্শই তাঁহারা গ্রহণ করুন না কেন, তাহাকে সফল করিতে হইলে মনস্তত্ত্বের প্রয়োজন। সে বলিয়া দিবে এই পথে চলিলে ভুল-ভ্রান্তির ব্যর্থ পরিশ্রমের সম্ভাবনা অল্প, আর এই পথে চলিলে সহজে কার্যসিদ্ধি হইবে ইত্যাদি।

শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষা-মনোবিদ্যার মোটামুটি প্রয়োজন হইবে :

(১) ছাত্রের মনের মূলধন ও সম্ভাবনাকে বুঝিবার জন্য।

(২) শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব ছাত্রের ব্যক্তিত্বের উপর কিভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিবে তাহা বুঝিবার জন্য।

(৩) সামাজিক জীব হিসাবে বালকগণের মান-অভিমান ও মনের ঘাত-প্রতিঘাতের জটিলতা সম্বন্ধে শিক্ষকদের সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য।

(৪) যাহাতে অপচয় নিবারিত হয়, শৃঙ্খলা স্বাভাবিক হয় এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ সরলায়িত হয় এইরূপ একটা পাঠ্যসূচী নির্ধারণের জন্য।

(৫) গণমনের সাহায্যে ছাত্রের মনের বিকাশ কিভাবে হইবে, তাহা বুঝিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য।

(৬) জীবন-পরিক্রমায় মানুষ কিভাবে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পথে যাত্রা করে, তাহা বুঝিয়া শৈশব, বাল্য, কৈশোরের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়া অপরাধ-প্রবণতা হইতে তাহাদের রক্ষা করা ও মানুষ হইতে সাহায্য করার জন্য।

(৭) মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনোবৈকল্যের কারণ বুঝিয়া তাহার সহিত সহানুভূতি-স্নিগ্ধ এবং রোগ-প্রতিকারমূলক ব্যবহার করিবার জন্য।

(৮) শিক্ষার পথ ও পাথেয়র সন্ধান করিয়া শিক্ষার সঞ্চারণ, শিক্ষার পথে সাধনা ও বিশ্রামের বিন্যাস, শিক্ষার স্থায়িত্বের ব্যবস্থা, শিক্ষার পথে বাধা ও সহায়তার উপায় নির্ধারণ, ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা প্রভৃতির জন্য।

(৯) বুদ্ধির মাপকাঠির সন্ধান করিয়া ছাত্রদের যথাযথ শ্রেণী বিভাগ করা, প্রতিভাশালী ও জড়বুদ্ধি ছাত্রদের জন্য ভিন্ন প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করা প্রভৃতির জন্য।

(১০) শিক্ষা-ব্যবস্থার সার্থকথা সম্বন্ধে একটা নির্ভুল, বস্তুনিষ্ঠ, নৈর্ব্যক্তিক (objective) পরীক্ষা-মান স্থির করিবার জন্য।

ইহা ছাড়া শিক্ষাতত্ত্বে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন আরও অনেক ব্যাপারেই হইতে পারে। সন্ধানী শিক্ষক তাহাকে কাজে লাগাইয়া শিক্ষা-প্রণালীকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন।

মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান কিভাবে আহরণীয় (মনোবিদ্যার পদ্ধতি):

শিক্ষাতত্ত্বে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন যে কি তাহা না হয় বুঝিতে পার যাইল ; এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান আমরা আহরণ করিব কি প্রকারে ? আর্থাৎ মনোবিদ্যার পদ্ধতি কি ?

মনোবিদ্যার পদ্ধতি (Methods) ঃ

আমরা জানি অন্য সমস্ত শাস্ত্রের মতই মনস্তত্ত্বেরও কাজ হইতেছে সত্যের সন্ধান করা। এই সন্ধান করার পদ্ধতি কি? সত্যসন্ধানের পদ্ধতি সব বিজ্ঞানেই প্রায় একই প্রকার। তাহা হইতেছে "পর্যবেক্ষণ" (Observation) ও "পরীক্ষা" (Experiment)। মনোবিদ্যার এই দুটি পদ্ধতি ত আছেই, তবে এই দুইটি ছাড়া আরও একটি পদ্ধতি আছে, তাহা হইতেছে "অন্তর্দৃষ্টি" (Introspection)। ইহা ছাড়া "প্রশ্নমালা-পদ্ধতি" (Questionnaire method), "রোগ পরীক্ষামূলক পদ্ধতি" (Clinical method), "চেকলিষ্ট পদ্ধতি" প্রভৃতিও মনোবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়।

প্রথমে পর্যবেক্ষণের কথাটাই আলোচনা করা যাক্।

(ক) পর্যবেক্ষণ

Titchner বলিয়াছেন, "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জিনিসটা একটিমাত্র শব্দ দিয়াই বর্ণনা করা যাইতে পারে, সেটি হইতেছে "পর্যবেক্ষণ"। বিজ্ঞানের একমাত্র পথ ও পদ্ধতি হইতেছে নিজ নিজ বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ করা। আমরা দেখিয়াছি মনোবিদ্যা শুধু মানুষের মনের গহনের গোপন চিন্তাধারার কথাই আলোচনা করে না, মনের প্রেরণায় মানুষ যেসব কাজকর্ম করে, তাহার বিচারও মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু। এই সমস্ত কাজকর্ম বিমূর্ত জিনিস নহে, কাজেই এগুলিকে দেখা যায় এবং এগুলিকে লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করা চলে। আমাদের সমস্ত মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিই আমাদের কাজকর্মে অথবা চোখমুখের আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্টায়ুট (Stout) দেখাইয়াছেন, "আমরা যদি দেখি একটা লোক একটা বিশেষ ভঙ্গীতে জলে পাথর ছুঁড়িতেছে তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে লোকটা 'ducks and drakes' খেলিতেছে, যদি দেখি কোনও রকম বাধ্য-বাধকতা না থাকা সত্ত্বেও একটা লোক নিয়মিতভাবে একটা বক্তৃতা শুনিয়া যাইতেছে তাহা হইলে বুঝিব ঐ লোকটার ঐ বিষয়ে আগ্রহ আছে।" কাজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, জীবজন্তুর বাহিরের ক্রিয়া-কলাপগুলি নিছক

শারীরিক ব্যাপারই নহে, তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতর দিয়া মনের খবরও পাওয়া যায়। একজন লোক অন্য একজন পথচারী ভদ্রলোককে নাহক অপমান করিল। ভদ্রলোকটি সেই ব্যাপারটা লইয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিলেন না। কিন্তু যদি দেখিতে পাওয়া যায় ভদ্রলোকটির নাসারন্ধ্র ফুলিয়া উঠিয়াছে, কপালের শিরা প্রকাশিত হইয়াছে, মুখটি আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, কণ্ঠস্বরটি প্রকম্পিত হইয়াছে, তাহা হইলে আর বুঝিতে বাকী থাকিবে না যে ভদ্রলোকটি রাগিয়া গিয়াছেন। মানুষ যতই শান্তদান্ত-সংযত হউক না কেন, যতই গম্ভীরবেদী হউক না কেন, তাহার আচরণ দেখিয়া ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে তাহার মনের কলকব্জাগুলি কিভাবে চলিতেছে। মুখের মুখর বাক্যের চেয়ে অনেক সময় চোখ-মুখের নির্বাক ছবি বেশী স্পষ্টভাবে মনের কথা প্রকাশ করে। এইজন্যই হিন্দী কবি বিহারীলাল তাঁহার বিখ্যাত "সাতসই" গ্রন্থে শ্রীরাধার চোখের ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ঝুঠে জানি ন সংগ্রহে মন মুহ নিকলতে বৈন।
য়্যাতি তে মানো কিয়ে বাঁতো কে বিঠি নৈন॥

[ঝুঠে—উচ্ছিষ্ট, মিথ্যা ; মুহ–মুখ হইতে ; বৈন—বচন ; য়্যাতি তে—এইজন্য ; মানো কিয়ে—মানা করিয়াছে ; বাঁতো—বাক্যসকল ; নৈন—নয়ন]

অর্থাৎ "মুখে কওয়া বাণী উচ্ছিষ্ট; সে মিথ্যাও হতে পারে।
তাই বুঝি ধাতা সে বাণী থুইলা তাহার নয়ন ঠারে॥
চ'খ ইশারায় নিতি হায় কহে যা কৃষ্ণ-প্রিয়া
তরল মধুর নীরব সে বাণী হরিছে হরির হিয়া॥" (ভাবানুবাদ)

কাজেই দেখা যাইতেছে ঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিলে জীবজন্তুর বাহ্য আচরণ বা আকার-ইঙ্গিত হইতেই তাহার মনের খবর পাওয়া যায়।

তবে এই ব্যাপারে একটা অসুবিধা আছে। আমরা প্রায়ই ব্যক্তিগত প্রীতি-বিদ্বেষের বশে অপরের আচরণের ভুল বিচার করিয়া বসি। ফলে, অপরের আচরণগুলিকে প্রাক্-কল্পিত বিচারের রঙিন চশমা দিয়া দেখি। ফলে, আমাদের পর্যবেক্ষণ-জনিত ব্যাপারটা প্রায়ই হয়ত অপব্যাখ্যার সৃষ্টি

করে। বৈজ্ঞানিককে এই অপব্যাখ্যার সিদ্ধান্ত হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। তাহাকে বস্তুনিষ্ঠ (Ocjective) দৃষ্টি দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং সংস্কারমুক্ত নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধি দিয়া বিচার করিতে হইবে। তবেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

(খ) অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তর্দর্শন (Introspection)

মনোবিদ্যার সত্য সন্ধানের জন্য আর একটি পদ্ধতি হইতেছে অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তর্দর্শন। অন্তর্দৃষ্টি কথাটার অর্থ হইতেছে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পর্যবেক্ষণ। "জেস্টাল্ট" (Gestalt). সম্প্রদায়ের মনোবিদ্‌গণ আর এক জাতীয় অন্তর্দৃষ্টির কথা বলেন। সে অন্তর্দৃষ্টির কথা উপস্থিত আমাদের আলোচ্য নহে। উপস্থিত আমরা যে অন্তর্দৃষ্টির কথা বলিতেছি, তাহা হইতেছে আমাদের নিজেদের মনের ভিতর চোখ দিয়া আমরা যা অভিজ্ঞতা পাইতেছি, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা। অন্যান্য বিজ্ঞানে অন্তর্দৃষ্টির কোনও স্থান নাই। কিন্তু মনোবিদ্যায় ইহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে এবং সংবেদন (Sensation) প্রভৃতির ব্যাপারে ইহাই হইতেছে একমাত্র পদ্ধতি।

আর এক জাতীয় অন্তর্দৃষ্টি আছে। সেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়া আমরা আমাদের অতীতের বাহাদুরি লইয়া আত্মপ্রসাদে মাতোয়ারা থাকি, অথবা অতীতের বিফলতা লইয়া অনুশোচনায় কুঞ্চিত হইয়া পড়ি। কখন কখনওবা যুক্ত্যাভ্যাস (Rationalization) দিয়া নিজেদের কাজকর্মের সমর্থনের চেষ্টা করি। এই জাতীয় অন্তর্দৃষ্টিও মনোবিদ্যার সত্য আহরণের পদ্ধতি হইতে পারে না। মনোবিদ্যার পরিভাষায় যাহাকে "অনুবেদন" (After image) বলে, যাহার ফলে একটা জিনিস দেখার কাজ শেষ হইবার পরও চোখে প্রতিচ্ছবি রাখিয়া যায়, শোনা কথা শ্রবণ করিবার কাজ শেষ হইলেও কানে তাহার রেশটুকু রাখিয়া যায়, সেই অনুবেদন বা "পশ্চাৎ অনুভূতি"-টাই মনোবিদ্যার অন্তর্দৃষ্টির মূল কথা। এই অনুবেদন বা "অনুবোধ"-মূলক আত্ম-সমীক্ষণ দ্বারা আমরা মনের খবর বুঝিতে পারি। এইমাত্র আমরা যে অভিজ্ঞতাটা অর্জন করিলাম, স্মৃতির আলো দিয়া সেটিকে আবার অনুভব

করার কৌশলটাই হইতেছে অন্তর্দর্শনের (Introspection) বৈশিষ্ট্য। Titchner বলিয়াছেন, "There is practically no difference between introspection and inspection."

তবে পর্যবেক্ষণের মাল-মশলার সহিত অন্তর্দর্শনের মাল-মশলার একটা পার্থক্য আছে। অন্তর্দর্শনের ব্যাপার হইতেছে নিছক ব্যক্তিগত (Subjective) অভিজ্ঞতার ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং সেই অনুভূতিটাও হইতেছে "অনুবোধ"-(বা পশ্চাৎ-বোধ)-মূলক, আর পর্যবেক্ষণের মাল-মশলা হইতেছে বস্তুগত (Objective) জিনিস তাহা জনসাধারণের চোখেও ধরা দেয়।

মনোবিদ্যায় এই বস্তুগত (Objective) এবং ব্যক্তিগত (Subjective) সমীক্ষার পদ্ধতির দুইটিকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ এমন বহু জিনিসই আছে, যেগুলি নিছক বস্তুগত দৃষ্টি দিয়া বুঝিতে পারা যায় না। গেট্স্ (Gates) দেখিয়াছেন—'আমি এখন লিখিয়া যাইতেছি, অন্য লোকে দেখিতেছে আমার হাত নড়িতেছে, কলম চলিতেছে এবং কথার পর কথা গাঁথা হইতেছে। কিন্তু আমার আঙ্গুলগুলি যে আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছে, মধ্যাহ্নভোজের পূর্বেই যে পরিচ্ছেদটুকু সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমার মধ্যে একটা ত্বরার ভাব রহিয়াছে, পাশে টেলিফোনের আহ্বানে যে আমি বিরক্তি বোধ করিতেছি এবং যে জায়গায় টেলিফোনটি রহিয়াছে, সেই জায়গাটির একটা অস্পষ্ট ছবি আমার মনে ফুটিয়া উঠিতেছে, এইসব খবর বাহিরের লোক তাহাদের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়া বুঝিতে পারিবে না, আমার দেহের আলোকচিত্রে তাহা ধরা পড়িবে না, গ্রাফ দিয়া তাহা বর্ণনা করা চলিবে না, রাসায়নিক পরীক্ষায় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। এগুলি শুধু আমি নিজেই বুঝিতে পারিব।' কাজেই বর্তমানের বস্তুনিষ্ঠ মনোবিদের দল, যাঁহারা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ছাড়া কোনও জিনিসকেই আমল দিতে চাহেন না এবং যাঁহারা মনোবিদ্যা শাস্ত্রটিকে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতির মতই নিছক বিজ্ঞান হিসাবে গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে অন্তর্দর্শনের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

তবে অন্তর্দর্শনের একটা অসুবিধা আছে। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভূত বোধটি একান্তভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়াই তাহার বর্ণনাটির সত্যতা পাঁচ-জনকে দিয়া যাচাই করাইয়া লওয়া যায় না। অনুভূতি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এবং অনুভূতিটাকে বর্ণনা করিবার ক্ষমতা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকার। ফলে, একই ঘটনাকে রাম যেভাবে বর্ণনা করিবে, শ্যাম সেভাবে করিবে না। ইহার কারণ হইতেছে অনুবেদন (After image) জিনিসটা বিভিন্ন লোকের বিভিন্নভাবে হয়। ধরা যাইতে পারে পাঁচজন লোককে একটা বিগত "জলসা"র বর্ণনা দিতে বলা হইল। তখন দেখা যাইবে পাঁচজনে একই জিনিসটি দেখা সত্ত্বেও, বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে তাহার বর্ণনা করিবে। কেহ বর্ণনা করিবে সুরের কারিকুরি, কেহ বর্ণনা করিবে তান-লয়ের কৌশল, কাহারও বর্ণনায় বড় হইয়া উঠিবে গায়কদের হাত নাড়া, তবলচিদের মাথা নাড়া, কাহারও বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিবে গায়ক ও শ্রোতাদের সাজ-পোশাকের কথা। ইহার কারণটি স্পষ্ট। অনুভূতি জিনিসটা কাহারও কাছে "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে", কাহারও কাছে চোখের ভিতর দিয়া অথবা স্পর্শের ভিতর দিয়া "মরমে পশে"। সেইজন্যই একই জিনিসকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন-ভাবে অনুভব করে আর সেইজন্যই একই জিনিসকে বর্ণনা করিবার সময় বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে। এইজন্যই জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের দিক দিয়া অন্তর্দর্শনের একটা ব্যর্থতা আছে।

অন্যান্য বিষয়েও অন্তর্দর্শনের ব্যর্থতা ধরা পড়ে। অন্তর্দর্শনের দ্বারা শুধু স্মৃতির আলোকেই আমরা আমাদের নিজেদের অতীত আচরণের পরিচয় জানিতে পারি। ইহার দ্বারা অপরের কথা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। একজন সুধী পণ্ডিত অন্তর্দৃষ্টি দিয়া জড়-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির মনের কথা বুঝিতে পারেন না, অথবা শিশু বা বর্বর মানুষের মনের কথাও বুঝিতে পারেন না।

শুধু তাহাই নহে, বাস্তব অভিজ্ঞতার সময়, মনের আবেগ-উদ্বেগের আলোড়নের সময় আমাদের মনের যে অবস্থা হয়, অন্তদৃষ্টির শান্ত সমীক্ষণের সময় তাহার অনেকখানি উপিয়া চলিয়া যায়, অনুভূতির গাঢ়ত্ব ফিকা হইয়া

যায়। এইজন্যই অন্তদৃ ষ্টির "অনুবোধমূলক" সমীক্ষণের মধ্যে মনের সত্যটা ঠিকভাবে প্রকাশিত হয় না, তাই প্রয়োজন হয় "পরীক্ষা-পদ্ধতির"।

(গ) পরীক্ষা-পদ্ধতি (The Experimental Method)

পর্যবেক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে যেটুকু ব্যর্থতা আছে, পরীক্ষা বা অভিক্রিয়া পদ্ধতির দ্বারা তাহা সংশোধিত হয়। পরীক্ষা (Experiment) জিনিসটাকে কখন কখনও "প্রকৃতির প্রতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা" (Question put to nature) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতি সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলে না, কাজেই তাহাকে ঠিকভাবে জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক সত্য উত্তরই পাওয়া যায়। আমরা জানি প্রকৃতির বিশেষত্বই হইতেছে সমতা (Uniformity)। এই সমতার (Uniformity of nature) জন্যই একই প্রকার কারণে একই প্রকার কার্যের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির মধ্যে বিরক্তি নাই, আলস্য নাই, কাজে ফাঁকি নাই, তাহার সমস্ত ঘটনাই কার্য-কারণের অমোঘ শাসনে বাঁধা আছে। কাজেই যে ঘটনা-পরিবেশে একটা কাজ হইয়াছে, সেই ঘটনা-পরিবেশ আবার সৃষ্টি করিতে পারিলে আবার সেই কাজটি হইবেই, যতবারই ঐ ঘটনা-পরিবেশের সৃষ্টি করা হইবে, ততবারই অব্যর্থ-অভ্রান্ত-অমোঘভাবেই তাহা হইবেই। কাজেই স্বাভাবিকভাবে পর্যবেক্ষণে যদি কিছু বাদ পড়িয়া যায়, প্রয়োগশালায় বার বার পরীক্ষা করিলে তাহা নজরে পড়িবে, ফলে আমাদের সিদ্ধান্তটা অভ্রান্ত হইবে।

পরীক্ষার মূল তত্ত্বটা হইতেছে "নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণ" (Observation under controlled conditions)। প্রকৃতির রাজ্যে যাহা ঘটে, সেই ঘটনার কার্য-কারণের সম্পর্কটা অনুভূতির জটিলতা ও বস্তুপুঞ্জের বিপুলতার মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। কিন্তু প্রয়োগশালার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে-যন্ত্রপাতির অভ্রান্ত নির্দেশে তাহা অনেক সহজসাধ্য হয়। মর্গান (Morgan) দেখাইয়াছেন, পরীক্ষা-পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে তাহার সিদ্ধির জন্য কতকগুলি পর্যায় অনুসরণ করিতে হয়। প্রথমতঃ, প্রয়োজন হয় একটা জিজ্ঞাসু মনের, কারণ উদাসীন নিস্পৃহ লোকের

কাছে কোনও উত্তেজকই সাড়া জাগায় না, ফলে তাহার মনে সত্য সন্ধানের প্রেরণা জাগে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হয় ঘটনাগুলির শ্রেণী-বিভাগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টার। পরে এই ভূয়োদর্শন ও সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা দ্বারা জাগিয়া উঠে একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বা "প্রকল্প" (Hypothesis)। এইবার আসে পরীক্ষার পালা। আমাদের মনে সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা ঠিক কিনা তাহার বিচার হয় পরীক্ষার দ্বারা।

(ঘ) প্রশ্নমালা পদ্ধতি—(Questionnaire method)

মানুষের ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন বিষয়ে তার অনুরাগ-বিরাগ, তার জীবনের ইতিহাস, বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রভৃতি জানিবার জন্য তাহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করা হয় এবং ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বলা হয়। এই সমস্ত উত্তরের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য (data) পাওয়া যায়। এইভাবে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির নাম "প্রশ্নমালা পদ্ধতি"। এক হিসাবে ইহাও "পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির" অন্তর্গত। এই পদ্ধতি দ্বারা বর্তমানে বহু গবেষণাই পরিচালিত হইতেছে। তবে ইহার সার্থকতা নির্ভর করে উত্তরদাতার সত্যনিষ্ঠার উপর। উত্তরদাতা ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথা বলিলে প্রকৃত তথ্যাদি পাওয়া যায় না।

(ঙ) ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি (Clinical method)

যে স্থানে মানুষের ব্যাধির কারণ প্রভৃতি নির্ণয় করা হয় এবং সেই সব ব্যাধির প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাকে "ক্লিনিক" বা "রোগি-পরীক্ষাগার" বলা হয়। এই পরীক্ষাগারে মানুষের অস্বভাবী (abnormal) আচরণ, শরীর মনের নানা জাতীয় বিকৃতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রভৃতি পরীক্ষা করা ও তাহার চিকিৎসা করা হয়। এই জাতীয় পরীক্ষায় মনোবিদ্ ও চিকিৎসক এক যোগে কাজ করেন। কখন কখনও যিনি চিকিৎসক, তিনিই মনোবিদ্ হিসাবে কাজ করেন। ইহাদের পরীক্ষা-পদ্ধতির নাম "ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি"। এই পদ্ধতি দ্বারা মনোবিদ্যার বহু তত্ত্বই আহৃত হইয়াছে। ফ্রয়েড্, য়ুঙ্গ, এ্যাড্লার প্রভৃতি মনোবিদ্গণ আদিতে চিকিৎসক হিসাবেই কাজ করিয়াছেন এবং

চিকিৎসা ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই তৈয়ারি হইয়াছে "মনোবিকলন-বাদী মনোবিদ্যা," "ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোবিদ্যা" প্রভৃতি।

মনোবিদ্যা যে আজ একটা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে আছে চিকিৎসক ও শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের গবেষণা। ইংলণ্ডের বেল (Bell : ১৮১১), জার্মানির মুলার (Muller : ১৮২৬), ওয়েবার(Weber), ফেক্‌নার (Fechner) প্রভৃতি ল্যাবোরেটারিতে মানুষের স্নায়ুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সংবেদনের কার্য প্রভৃতি সম্বন্ধে চমকপ্রদ তথ্যের আবিষ্কার করেন। ইহার পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানির Wundt প্রথম মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাগার (Psychological laboratory) প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সমস্ত গবেষণা-গারের উদ্দেশ্যই হইতেছে মনোবিদ্যা হইতে দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টিমূলক আলোচনাকে (speculation) বাদ দিয়া তাহাকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ (Objective) জড় বিজ্ঞানের পর্যায়ে লইয়া আসা।

কিন্তু মনস্তত্ত্বকে যতই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ব্যবহারিক জড়বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা যাক না কেন, তাহার আচরণকে যতই সূক্ষ্ম এবং ব্যাপকভাবে গবেষণা করা যাক না কেন, আমাদের সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যা শুধু প্রতক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝান যায় না! সেইজন্যই যাহাকে আমরা অত্যন্ত ভাল ভাবে জানি—যে আমাদের পরম প্রিয়, সেও আমাদের বলিতে পারে—

"মম জীবনের তটিনীর রেখা তোমার কুটির হ'তে
যতটুকু দেখো, আমি কি গো তাই হে প্রিয় তোমার মতে?
সৃষ্টি-প্রভাতের ঝরণা বহিয়া,
কত অতীতের তুষার গলিয়া,
কত দেশ বহি চলিয়া চলিয়া, মিলেছি তোমার পথে;
কত জগতের তীর্থের রেণু লেগেছে আমার রথে।"

প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা আমাদের পূর্ণ পরিচয়ের একটা সামান্য অংশমাত্র প্রকাশ করে, আমাদের সবটুকু সন্ধান তাহাতে মিলে না এবং তাহা দিয়া আমাদের সব আচরণের ব্যাখ্যাও করা যায় না। সেইজন্য ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণ আমাদের অনেক জটিল আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অচেতন মনের কথা বলিয়াছেন, Mc,

Dougall প্রভৃতি Mental Structure-এর কথা আনিয়াছেন, Stout প্রভৃতি Disposition-এর উল্লেখ করিয়াছেন, Samuel Butler প্রভৃতি unconscious memory এবং Nunn প্রভৃতি সংরক্ষণ-প্রয়াসের (Mneme) প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

সে কথা যাক্, ধরিয়া লওয়া যাউক দুই একটি জটিল আচরণের ক্ষেত্র ছাড়া আমরা অধিকাংশ আচরণকে জড়বিজ্ঞানের মত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ গবেষণার বিষয়বস্তু করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি। কিন্তু এই সমস্ত গবেষণার সিদ্ধান্তগুলি কি সত্যই রসায়ন বা পদার্থ-বিদ্যার মত শুধু ল্যাবোরেটারির ব্যাপার হইবে? না, কারণ সেই সিদ্ধান্তগুলিতে সিদ্ধান্তকারীর ব্যক্তিগত (subjective) রঙের খানিকটা কষ লাগিয়া যাইবে, ল্যাবোরেটারির তথ্যের ব্যাখ্যা বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে করিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মনস্তত্ত্বকে ইচ্ছা করিলেও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (objective) জড়বিজ্ঞানের মত আলোচনা করা পুরাপুরি ভাবে সম্ভব নহে। যে অন্তর্দৃষ্টি বা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আমরা কিছুতেই আমল দিতে চাহি নাই, তাহাও খানিকটা আসিয়া পড়ে।

তাহা হইলে আগ্রহশীল শিক্ষকেরা কি করিবেন? তাঁহাদের উচিত, প্রায়োগিক (emperical) মনস্তাত্ত্বিকগণের যে সমস্ত প্রচলিত প্রণালী আছে অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, রোগ-পরীক্ষামূলক প্রণালী (clinical method) এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহমূলক প্রণালী (যথা প্রশ্নগুচ্ছ, ইন্টারভিউ, জীবনেতিহাস, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মন্তব্য, চেক্ লিষ্ট (check list), বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের পরীক্ষা প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করা, বিভিন্ন শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিকদের মতবাদ ভালভাবে পড়াশুনা করা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শৈশব-কৈশোরের কথা চিন্তা করা এবং তার সঙ্গে দেশবিদেশের পণ্ডিতদের গবেষণার ফলগুলি বিচার করিয়া দেখা। এইভাবেই শিক্ষকদের চলিতে হইবে এবং পরে তাঁহারা নিজেরাই দেখিতে পাইবেন যে, ক্রমশঃ "চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে।"

মৌলিক প্রকল্প
[Fundamental Hypothesis]

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই কতকগুলি মৌলিক প্রকল্প (Fundamental hypothesis) থাকে। এই প্রকল্পগুলিকে মানিয়া লইয়া সেইগুলির উপর দিয়াই সে তাহার যুক্তিকে পরিচালিত করে এবং বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আমাদের মানস-বিজ্ঞানের আলোচনার প্রারম্ভে আমাদিগকেও কতকগুলি মৌলিক প্রকল্পকে মানিয়া লইতে হইবে।

মনোবিদ্যা কি কি প্রকল্পকে লইয়া কাজ আরম্ভ করিবে?—এই প্রশ্নের উত্তরটি সহজ নহে।

কারণ মানুষের মন বা আচরণ এমনই একটা বিচিত্র জটিল অনির্দিষ্ট ব্যাপার যে, ইহাকে লইয়া প্রয়োগশালায় চরম পরীক্ষার পরও আমরা ইহার সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। তাই ইহার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মনোবিদ্‌কেও বলিতে হয়।

"নাহি জানি সমগ্র বারতা
সকল ঘটনা তার, ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে,
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই ভয় জাগে মনে"

সেইজন্যই মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কেহ কেহ প্রাক্‌জন্মগত প্রবৃত্তি (instinct) প্রভৃতিকে স্বীকার করিয়াছেন, কেহ আবার জন্মোত্তর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুকেই স্বীকার করেন নাই, কেহ মানুষের বহু আচরণের ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া মানুষের সজ্ঞান মনের নিম্নে অবস্থিত নিৰ্জ্ঞান মনের অবদমিত কামনার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আবার কেহবা আর একটু অগ্রসর হইয়া জাতকের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোনও সম্পর্ক নাই, এইরূপ গোষ্ঠীগত নিৰ্জ্ঞান স্মৃতি (racial mneme), architype প্রভৃতিকে মানিয়া লইয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে, মনোবিদ্যাকে কেহ হয়ত শরীর-বিদ্যার অঙ্গ মাত্র বলিয়া মনে করেন, কেহ হয়ত রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা দিয়া মনের বিচিত্র লীলা

বুঝিতে চেষ্টা করেন, কেহবা সমাজতত্ত্ব দিয়া, কেহবা জীবতত্ত্ব দিয়া ইহার ব্যাখ্যা করেন।

মানুষের কর্ম-প্রেরণার (motivation) মূল উৎস সম্বন্ধেও বিভিন্ন মনোবিদ্‌গণের মতের যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। কেহ মনে করেন, মানুষের সমস্ত কর্মপ্রেরণার মূলে আছে তাহার আদিম যৌন-কামনা, কেহ মনে করেন মানুষের ক্রিয়া-কলাপের মূল উৎস হইতেছে "ক্ষমতা-লিপ্সা" (will-to-power), আবার কেহ মনে করেন পরিবর্তনশীল পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জগতের সহিত "উদ্দেশ্যমূলক কারবার" হইতেছে মানুষের সমস্ত আচরণের মূল কথা।

কাজেই দেখা যাইতেছে, মনোবিদ্‌গণের সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা অনুসারে তাঁহাদের মৌলিক প্রকল্পের বিভিন্নতা থাকিবেই।

আলোচ্য গ্রন্থে আমরা কোনও একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মতবাদ লইয়া মাতামাতি করিব না। আমাদের বিশ্বাস প্রাচীনত্বের গোঁড়ামিও যেমন আমাদের সত্যদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, তেমনই নূতনত্বের ফ্যাশন্‌-বিলাসও আমাদের চোখে দম্ভের ঠুলি পরাইয়া অনেক সত্যকে দেখিবার সুযোগই দেয় না। সেইজন্য সমন্বয় ও মুক্তদৃষ্টির মধ্যেই আছে সত্যিকারের সত্যানুসন্ধান। এই সমন্বয়ের ভঙ্গীতেই আমরা এই শাস্ত্রটি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আমেরিকা ও রাশিয়ার আচরণবাদ বা চেষ্টিতবাদ, জার্মানীর গেস্‌টাল্ট মতবাদ, অষ্ট্রিয়ার মনোবিকলনবাদ, গ্রীসের আত্মাবাদ, প্রাচীন অনুষঙ্গবাদ, অবয়ববাদ প্রভৃতি মতবাদের মধ্যে যে একটা একদেশদর্শিতা আছে, তাহা পরিহার করিয়া আমরা ইংলণ্ডীয় মনোবিদ্‌ নান্‌ (Sir Percy Nunn), ম্যাক্‌ ডুগাল (Mc. Dougall) প্রভৃতির প্রদর্শিত পথেই খানিকটা যাত্রা করিব। ইহা দাস-মনোবৃত্তির পরোক্ষ প্রভাব হিসাবে নহে। ইংলণ্ডের রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মতই ইংলণ্ডের মনোবিদ্যার মধ্যেও প্রাচীন ও নবীনের একটা সমন্বয়ের ভাব আছে। এই সমন্বয়টি আমাদের ভাল লাগে বলিয়াই এই পক্ষপাতিত্ব।

যাঁহারা মানুষকে একটি জটিল যন্ত্র মাত্র বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বলেন মানুষের সব কাজই রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। কথাটা অবশ্য অনেকখানি সত্য। আমাদের দেহের চরম উপাদানগুলি ভৌতিক পদার্থ মাত্র ; তাহা বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে যাহা তৈয়ারী করা যায় সেই কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি হইতে অন্য কিছুই নয়। আমাদের শরীরে জলীয় পদার্থ অন্য জলীয় পদার্থেরই অনুরূপ। জড়-জগতে অক্সিজেন যে কাজ করে, আমাদের নিশ্বাসে গৃহীত অক্সিজেনও সেই কাজই করে। উভয় ক্ষেত্রেই কাজ হইতেছে যৌগিক পদার্থের অণুগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাপ উৎপাদন করা। খাদ্যদ্রব্য হইতে আমরা যে উত্তাপ আহরণ করি, তাহা আমাদের দেহযন্ত্রকে পরিচালিত করে। রেল ইঞ্জিন বা মোটর ইঞ্জিনও ঐ একই ভাবে উত্তাপ হইতে কর্মশক্তি লাভ করে। তাহা হইলে মানুষকে একটি জটিল যন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু ভাবিবার প্রয়োজন কি ? যদি কেহ বলেন, "প্রয়োজন আছে বৈকি ; যন্ত্রের তো প্রাণ নাই, কিন্তু মানুষ প্রভৃতির প্রাণ আছে এবং এই প্রাণ পদার্থটিই প্রাণীকে যন্ত্র হইতে পৃথক করিয়াছে।" ইহার উত্তরে জড়বাদা পণ্ডিত বলিবেন, "এই প্রাণ পদার্থটি ত জড় পদার্থ নিরপেক্ষ একটা সূক্ষ্ম শক্তি মাত্র নহে, জড় পদার্থের দ্বারাই ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কৃত্রিম প্রজনন, কৃত্রিম উপায়ে প্রাণীদের দৈহিক হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ইহাই প্রমাণ করে যে, উপযুক্ত বিদ্যা থাকিলে প্রাণকেও রাসায়নিক ঔষধপত্রের মত বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে সৃষ্টি করা যাইত।" এই প্রাণের রহস্যই যদি জড়বিজ্ঞান দিয়া উদ্ঘাটিত হইল, তখন মন-স্তত্ত্বের আলোচনায় আত্মা, প্রাণের সুখ-দুঃখ বোধ, এই সব সূক্ষ্ম-তত্ত্বের প্রসঙ্গ আনিবার প্রয়োজন নাই ; জীব-জগতের সমস্ত আচরণই উত্তেজক এবং তাহার প্রতিক্রিয়া (Stimulus & Response), শরীর-রসায়ন-পদার্থতাত্ত্বিক কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির সাহায্যেই বুঝান যাইতে পারে। একটি হার-মোনিয়ামে 'সা' পর্দা টিপিলে তাহাতে যেমন 'সা' ধ্বনি উত্থিত হইবে, আর "গা" পর্দা টিপিলে তাহাতে যেমন 'গা' ধ্বনি উঠিবে, তেমনি প্রাণীদিগের বিশিষ্ট অনুভূতির গ্রাহক-যন্ত্রে বিভিন্ন সঙ্কেত (stimulus) থাকিলে তাহা

হইতে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া (response) আসিবে। একটি কুকুরের মুখের কাছে মাংসখণ্ড ধরা হইল, তাহাতে তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাহার মুখ দিয়া লাল ক্ষরণ হইল; তাহার গায়ে কেহ ঢিল মারিল, অমনি সে চিৎকার করিয়া উঠিল, ইহাও ঐ হারমোনিয়ামের বিভিন্ন পর্দ্দার প্রতিক্রিয়ারই অনুরূপ। শুধু তাই নয়, মানুষের যত কিছু ক্রিয়াকলাপ—আইন্‌ষ্টাইনের 'রিলেটিভিটি' আবিষ্কার হইতে সেক্সপীয়ারের 'হ্যাম্‌লেট্' বা রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' 'বলাকা' সৃষ্টি পর্য্যন্ত—ঐ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই জটিল অভিব্যক্তি মাত্র। জড়বাদা পণ্ডিতেরা বলেন, জড়বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি দিন আসিবে, যখন আমরা একটা বিশিষ্ট অশ্ব-শক্তির মেশিন দেখিয়া যেমন তাহার কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি, তেমনিই একটি মানুষকে দেখিয়াও তাহার সম্বন্ধে সব কিছুই বলিয়া দিতে পারিব—শুধু তাহার শারীর সম্ভাবনা নহে, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ-বিরাগ, সিদ্ধি-সাধনা সব কিছুই।

প্রত্যেক বিজ্ঞানই তাহার আলোচনার প্রারম্ভে কতকগুলি মৌলিক প্রকল্পকে (Fundamental hypotheses) মানিয়া লইয়া তাহারই উপর তাহার যুক্তির ইমারত তৈয়ারী করে। আমাদের মানস-বিজ্ঞান কি তাহা হইলে এই প্রকল্পকেই ভিত্তি করিয়া তাহার যুক্তির পথে অগ্রসর হইবে যে, রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যাই মানস-বিজ্ঞানের আদি ও মুল তত্ত্ব এবং ইহার বাহিরে অন্য কিছু কল্পনা করিবার প্রয়োজন মানস-বিজ্ঞানের নাই?

আমাদের মনে হয় তাহা নহে। প্রাণী যে যন্ত্রমাত্রই নহে, তাহা প্রকৃতির রাজ্যের নিম্নতম প্রাণীর প্রতিক্রিয়া হইতেই বুঝা যায়।

একটি কিঞ্চুলিকার (কেঁচো) কথা লইয়াই দেখা যাক। সে তাহার গর্ত হইতে বাহির হইয়া চলিতেছে। তাহার মুখের কাছে একটি কাঠি ধরা হইল, সে তখন সোজা পথটি ছাড়িয়া ডান দিকে চলিতে লাগিল, আবার তাকে বাধা দেওয়া হইল, এবার সে বাঁদিকে চলিতে লাগিল, আবার বাধা দেওয়া হইল, এবার সে খানিকটা চুপ করিয়া থাকিল এবং পরে পিছু হটিতে লাগিল, আবার তাহাকে বাধা দেওয়া হইল, তখন সে তাহার প্রতিক্রিয়ার ধারা

একেবারেই বদ্‌লাইয়া মুখটিকে একটু উচুতে তুলিয়া বাধাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, এই সামান্য কেঁচোটিও একটি জটিল যন্ত্র হইতে অনেক পৃথক। হারমোনিয়ামে যতবার 'সা' পর্দা টেপা হইবে, তাহা হইতে ততবারই 'সা' ধ্বনিই বাহির হইবে, তাহার প্রতিক্রিয়ার কোন পরিবর্তন হইবে না। একটি কুকুরকে ঢিল মারিলে প্রথম বারে সে হয়ত 'কেঁউ' করিয়া ডাকিয়া উঠিবে। দ্বিতীয় বার মারিলে সে হয়ত লেজ গুটাইয়া পলাইয়া যাইবে, আবার প্রতিপক্ষকে হীনবল বুঝিতে পারিলে সে হয়ত গর্জন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিবে। যন্ত্র সম্বন্ধে অনুরূপ প্রতিক্রিয়ায় এইরূপ জটিলতা বা বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

এই কেঁচো হইতে কুকুর এবং কুকুর হইতে মানুষ, ইহাদের প্রতিক্রিয়া একই জাতীয়; তাহাদের মধ্যে পার্থক্যটা প্রকৃতিগত ততটা নহে, যতটা হইতেছে মাত্রাগত। প্রত্যেকেই তাহার অনুভূতির যন্ত্র (জ্ঞানেন্দ্রিয়) এবং কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগতের সঙ্গে একটা উদ্দেশ্যমূলভাবে কারবার করে। কেঁচোর ক্ষেত্রে এই অনুভূতির যন্ত্র হিসাবে তাহার মূলধন ছিল শুধু স্পর্শানুভূতির যন্ত্র—শুধু কাছের জিনিস অঙ্গ দিয়া স্পর্শ করিয়া তবে সে কিছু অনুভব করিতে পারে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দূরানুভূতির যন্ত্র তাহদের নাই বলিয়া তাহারা দূরের জিনিস দেখিতে পায় না, দূরের শব্দ শুনিতে পায় না, দূরের জিনিসের ঘ্রাণও বুঝিতে পারে না। প্রাণী যতই উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকে, তাহার অনুভূতির প্রসার ততই বিস্তৃত ও ব্যাপক হইতে থাকিবে। কেঁচোটি দূরের কোন জিনিসই অনুভব করিতে পারে না, কুকুরটি কিন্তু দূর হইতে শিকারের বস্তুর আঘ্রাণ পাইয়া তাহার অনুসরণ করে, দূর হইতে শত্রুকে দেখিয়া বা তাহার শব্দ শুনিয়া পলায়ন করে। মানুষের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত। পঞ্চেন্দ্রিয়ের আবেদন ছাড়াও ধর্ম, আদর্শ, প্রেম, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতির আবেদনেও তাহার সহিত জগতের কারবারের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে মানুষের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রতিক্রিয়া যাহার যে স্তরেরই হউক না কেন সর্বত্রই তাহার ধারা

এক রকম, তাহা নিছক যান্ত্রিক আচরণ মাত্র নহে, তাহা বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে কারবার করিবার জন্য একটা প্রেরণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, খানিকটা উদ্দেশ্যমূলক ভাব তাহার মধ্যে আছে। তবে এই উদ্দেশ্যমূলক ভাবটি কেঁচো প্রভৃতির ক্ষেত্রে আত্ম-সচেতন ভাবে হয় না, আর মানুষের ক্ষেত্রে তাহা সচেতন ভাবেই হয়।

এইখানেই যন্ত্রের সহিত প্রাণীর আচরণের পার্থক্য ; যন্ত্র কর্তার ইচ্ছায় কাজ করে, আর প্রাণী নিজের অন্তর্নিহিত প্রেরণার বশে জগতের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কাজ চালাইতে পারে। এই প্রেরণা বা উদ্দেশ্য হয়ত সব সময়েই পরিস্ফুট নয় এই মাত্র। পরিস্ফুটই হউক বা অপরিস্ফুটই হউক, এই জীবন-প্রেরণা কোনও যন্ত্রের মধ্যে নাই। এই ব্যাপারটির ম্যাগডুগাল্, নান্ (Sir Percy Nunn) প্রভৃতি **"জীবনপ্রয়াস"** (Horme*) নাম দিয়াছেন।

এই জীবন-প্রয়াস নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে অন্ধভাবেই কাজ করে। পরে প্রাণী যতই উচ্চস্তরে উঠিতে থাকে ততই এই অন্ধ জীবন-প্রয়াস ক্রমশঃ ইচ্ছামূলক কার্য বা **সজ্ঞান কর্মপ্রয়াসে** (conation) পরিণত হয়। এই জীবন-প্রয়াস জীবনের প্রয়োজনেই নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে এমন সমস্ত কাজ করায়, যাহা উচ্চ স্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঠিক সজ্ঞান কর্মপ্রয়াসেরই অনুরূপ। অনেকের বিশ্বাস প্রাণীজগতের মধ্যে ক্রমোন্নতি ও বিবর্তনের পথে ক্ষুদ্র "এ্যামিবা" হইতে মানুষ পর্য্যন্ত যে নব নব জীব তৈয়ারী হইয়াছে তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের নব নব যন্ত্রগুলিও ঐ জীবন-প্রয়াসের প্রেরণাতেই হইয়াছে। স্যামুয়েল বাট্লার (Samuel Butler) এই তত্ত্বটিকে একটু অদ্ভুতভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের যখন কোন কিছু ধরিবার প্রয়োজন হয় তখন আমরা শাঁড়াসী বা চিমটা

---

* Hormic শব্দটি আসিয়াছে গ্রীক শব্দ "horme" হইতে। তাহার অর্থ হইতেছে "জৈব প্রেরণা" (animal impulse)। রোমানগণ এই শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে instinct (প্রবৃত্তি) শব্দটি ব্যবহার করেন।

ব্যবহার করি ; বাট্‌লার বলেন, আদি কাঁকড়াও এক জোড়া শাঁড়াসী জাতীয় জিনিসের প্রয়োজন বোধ করিয়া অন্ধ জীবন-প্রয়াসের প্রেরণায় তাহার শরীরের মধ্যে দাঁড়া তৈয়ারী করিয়াছিল। তাহার পর সেই কাঁকড়ার বংশধরগণ একটা "নির্জ্জান-স্মৃতির" প্রেরণায় ঐ দাঁড়ার প্রয়োজন অনুভব করিয়া দাঁড়াটিকে তাহাদের শরীরের কর্ম-যন্ত্র হিসাবে রাখিয়া দিল এবং সেই হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত কাঁকড়ারই দাঁড়া গজাইয়া থাকে। নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে যে গোষ্ঠীগত "নির্জ্জান স্মৃতি" এইভাবে তাহাদের পূর্বপুরুষদের ভাল ভাল কাজগুলি সংরক্ষিত করিয়া রাখে তাহাই আবার উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে সজ্ঞান-স্মৃতিরূপে কাজ করিয়া অতীতের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করিয়া রাখে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর এই স্মৃতির নির্জ্জান ও সজ্ঞান লীলাকে একটা ব্যাপক নামের দ্বারা অভিহিত করা যাইতে পারে। নান্ সাহেব (Percy Nunn) প্রভৃতি ইহারই নাম দিয়াছেন "Mneme" বা **সংরক্ষণ-প্রয়াস** *।

এই "জীবন-প্রয়াস" ও "সংরক্ষণ-প্রয়াস", ইহাই হইতেছে প্রাণীদের আচরণের মূলধন। ইহা সজ্ঞান ভাবেই কাজ করুক অথবা নির্জ্জান ভাবেই করুক সেই কাজের মধ্যে একটা "প্রেরণার" ভাব আছে, জগতের বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে কারবার চালাইবার জন্য একটা উদ্দেশ্যমূলক প্রতিক্রিয়ার ভাব আছে। এখন কথা হইতেছে, এই যে উদ্দেশ্য-প্রবণতা ইহাকেই ত সাধারণ লোকে মনের কাজ বলে। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাই বলুন না কেন, সাধারণ লোকের বুঝিবার সুবিধার জন্য 'মন' বলিয়া বস্তুটিকে স্বীকার করিয়া লইতে ক্ষতি কি? কাজের সুবিধার জন্য মনস্তত্ত্বের আলোচনায় উপস্থিত 'মন'-কে যদি মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আর একটু পরিষ্কার ধারণা থাকা ভাল। মন বলিতে আমরা কি বুঝি? ম্যাগডুগাল (Mc. Dougall) বলিয়াছেন, "We may define mind

* সেমন্ (Semon) এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। প্রাণি-জগতের মধ্যে যে মৌলিক স্মৃতি (basic memory) আছে, যাহা সজ্ঞানেই হউক অথবা নির্জ্জানেই হউক, সমস্ত অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং গোষ্ঠীর প্রয়োজনে তাহাকে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত করে, তাহাই হইতেছে "Mneme"

as an organised system of mental or purposive forces.” কিন্তু এই সংজ্ঞাটি কালো জিনিসকে অন্ধকার বলিয়া বুঝাইবার মত হইল।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস, মন হইতেছে চৈতন্য-পদার্থ, ইহা জড় পদার্থের বিপরীত এবং জড়দেহকে এই মনই নিয়ন্ত্রিত করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, মন যদি চিন্ময় পদার্থ হইল এবং দেহ যদি মৃন্ময় পদার্থ হইল, তাহা হইলে এই দুইটির সংযোগ হয় কি করিয়া ?

কেহ কেহ বলেন, জড় এবং চৈতন্য এই দুইটি পৃথক সত্ত্বা ; ইহারা পৃথক ও সমান্তরালভাবে কাজ করে (doctrine of psychological parallelism) বা **সহচারবাদ** ; ইহা হয়ত সবাক সিনেমা-চিত্রের মত একটা ব্যাপার— যাহার মধ্যে দুইটি পৃথক কাজ একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন, জড় ও চৈতন্যের মধ্যে একটিমাত্র সত্ত্বা আছে। তবে জড় চৈতন্যকে সৃষ্টি করিয়াছে অথবা চৈতন্য জড়কে সৃষ্টি করিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। আবার কেহ ভাবেন, চরম সত্ত্বা জড়ের মধ্যেও নাই, চৈতন্যের মধ্যেও নাই—তাহা জড় ও চৈতন্যের অতিরিক্ত একটি অস্তিত্ব।

Descartes মানুষকে একটি যন্ত্র এবং একটি আত্মার মিলন বলিয়া ভাবিতেন। Epictetus-এর ধারণা, মৃতদেহের উপর ভূতে ভর করিয়া যে ভাবে কাজ করিয়া যায়, মানুষের কাজকর্মও ঐরূপ একটা দেহাতিরিক্ত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সম্বন্ধে আচরণবাদী ওয়াটসন্ Watson প্রভৃতির মতবাদটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ওয়াটসন্ (Watson) প্রভৃতি আচরণবাদী পণ্ডিতগণ বলেন, চৈতন্যের সন্ধানের জন্য জড়বস্তুর বাহিরে অন্য কিছুর খোঁজে যাইবার প্রয়োজন নাই। এ্যালবার্ট বি (Albert B) নামক একটি ছোট শিশুর উপর ভয়ের প্রতিক্রিয়া দিয়া তিনি ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। শিশুটি একটি সাদা ইঁদুরকে খুব পছন্দ করিত এবং তাহার সহিত খেলা করিতে চাহিত। কিন্তু কোনও বিকট শব্দ শুনিলে শিশুটি ভয় পাইত। ওয়াটসন্ (Watson) সাহেব ছেলেটিকে লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিলেন। তিনি ইঁদুরটিকে যতবার ছেলেটির সমুখে উপস্থাপিত

করেন, ততবারই একটা বিকট শব্দ করেন। ফলে, ভীতিজনক শব্দ আর ঐ ইঁদুরটি ছেলেটির কাছে এক সঙ্গে জড়িত হইয়া গেল এবং পরে শব্দের সম্পর্ক বাদ দিয়াও, ঐ ইঁদুরটি একক ভাবেই ঐ ছেলেটির কাছে ভয়ের বস্তু হইয়া উঠিল। পরিণামে তাহার আদরের ইঁদুরটিই যে তাহার কাছে ভয়ের বস্তু হইয়া উঠিল তাহা নহে, যে কোনও রোমশ দ্রব্য, যথা খরগোশ, লোমযুক্ত শীতের পোষাক প্রভৃতিও তাহাকে ভীত করিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথমে শব্দের প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়, পরে শব্দ+ইঁদুরের প্রতিক্রিয়াও হইল ভয় এবং আরও পরে একক ইঁদুরের কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া (conditional reaction) হইল ভয়। অতএব দেখা যাইতেছে, 'ভয় পাওয়া বলিয়া যে মানস ক্রিয়াটি আছে, তাহা কোনও সূক্ষ্ম চৈতন্যশক্তির লীলায় সংঘটিত হয় না, এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি শুধু দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দিয়াই বুঝান যায়। সেইজন্য আচরণবাদীরা বলেন, আমাদের চিন্তা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির জন্য কোনও সূক্ষ্মতত্ত্বের অবতারণার প্রয়োজন নাই। আমাদের স্নায়ু প্রভৃতি শারীর ক্রিয়া দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা যদি বলি, একজন দক্ষ সেতারী তাঁহার আঙ্গুল দিয়া চিন্তা করে, বা একজন ভাল টেনিস্ খেলোয়াড় তাহার হাত দিয়া চিন্তা করে, তাহা হইলে খুব বেশী ভুল বলা হয় না। যাহাকে আমরা সূক্ষ্ম চিন্তা বলিয়া অভিহিত করি, তাহাও চিন্তার স্থূল প্রতিরূপ দিয়া মনে মনে সাজাইয়া বিচার করি। যেমন, যখন আমরা দুই আর দুইএ যোগ করিয়া চার এই সিদ্ধান্ত করি, তখন দুই দুইটি স্থূল জিনিসকে পাশাপাশি রাখিয়া মানসনেত্রে চারিটি স্থূল জিনিস দেখিয়া লইয়া প্রথম যোগ দিতে শিক্ষা করিয়াছি। কাজেই দেখা যাইতেছে, সূক্ষ্ম চিন্তার মূলে আছে স্থূল জিনিসের অনুভূতির আবেদন।

বার্‌ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) বলেন, চৈতন্য বস্তুকে এইভাবে আচরণের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিলে মানুষের দম্ভে বড়ই আঘাত লাগে, জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে "তাহা হইলে মানুষের চৈতন্য প্রভৃতি সূক্ষ্ম জিনিষগুলি কি দৈহিক আচরণেরই পরিণতি ?"

হয়ত তাহাই ; তবু মনে হয়, চৈতন্য, অনুভূতি, চিন্তা, সিদ্ধান্ত, মনোযোগ

প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের যে সমস্ত প্রাচীন নামগুলি উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া যে অর্থ-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের আপাততঃ অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমাদের জীবন-নাট্যের অভিনয়কে ভালভাবে বুঝিতে হইলে এই প্রাচীন নামগুলির অন্ততঃ রূপক হিসাবেও প্রয়োজন কম হইবে না।

নান্, রস্ (Nunn, Ross) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পুরাপুরিভাবে "আচরণবাদ"কে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, আবার ভারতীয়দের মত আত্মা, জন্মান্তর প্রভৃতিও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন, জড় ও চৈতন্য অথবা দেহ ও মন ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বিচার করিতে যাইয়া নিছক "দেহবাদ" বা "মানসবাদ" ইহাদের কোনটিকেই গ্রহণ না করিয়া, "দেহ-মানস-বাদ' গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, আমরা "দেহ-নিরপেক্ষ মন" বা "মন-নিরপেক্ষ দেহ" ইহাদের কোনটিকেই পৃথকভাবে দেখিতে পাই না। এই দেহ-নিরপেক্ষ মন বা মন-নিরপেক্ষ দেহ হয়ত নিছক কল্পনার বস্তু (hypostatizatious) হইতে পারে এবং দেহের সহিত মনের সম্পর্ক কি, তাহা হয়ত দার্শনিকের গবেষণা-বিলাসের বস্তু হইতে পারে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আমাদের নাই। তবে কাজের সুবিধার জন্য দেহ-যন্ত্রের কথাও পৃথকভাবে আলোচনা করিতে হইবে এবং মনের তত্ত্ব এবং মনের বিভিন্ন লীলাগুলিও আলোচনা করিতে হইবে। দেহ-যন্ত্রের কথা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে, উপস্থিত মনের তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

রস্ (Ross) বলিয়াছেন, মনস্তত্ত্বের বিচারে মনের তত্ত্বটিকে একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। যে সকল আচরণবাদী মনকে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে, তাঁহাদের বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট, তাহা শরীরতত্ত্বের (physiology) শাখা হিসাবে আমাদের কাজের ব্যাখ্যা দিয়াছে। রস্ বলেন, আচরণবাদ কিছুতেই মনের লীলার কথা এড়াইয়া চলিতে পারে না। কারণ, আচরণের সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে হইলেও প্রাণ, মন, কর্মপ্রয়াস, উদ্দেশ্যমূলক প্রেরণা প্রভৃতির কথা আসিয়া পড়ে।

মনের কথা আলোচনা করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের কথা আলোচনা করিতে হয়: (১) বর্তমানের অভিজ্ঞতা এবং (২) পূর্বসঞ্চিত স্মৃতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি।

কোনও জিনিস অনুভব করা, কোন কিছু ইচ্ছা করা, চোখে দেখা, কানে শোনা, মনে ভাবা ইত্যাদি বিষয়গুলি অভিজ্ঞতার পর্যায়ে পড়ে। এই অভিজ্ঞতার জন্য একটি অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু এবং একটি অভিজ্ঞতার কর্তৃ-পুরুষ, এই দুইটির প্রয়োজন হয়।

অভজ্ঞতা—(১) জ্ঞানমূলক (cognition), (২) সংবেদনমূলক (affection) এবং (৩) কর্ম-প্রচেষ্টা-মূলক (conation)—এই তিন প্রকারের হইতে পরে।

জগতের সঙ্গে কারবার করিবার সময় আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় তাহার মধ্যে এই জ্ঞান, সংবেদন এবং কর্মপ্রচেষ্টা এক সঙ্গে মিশিয়া থাকে।

এই অভিজ্ঞতা কখনই স্থিতিশীল নহে, ইহা মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতে থাকে। ঠিক এক জাতীয় অভিজ্ঞতা আমরা পর পর দুইবার পাইতে পারি না। এইজন্য অনেকে অভিজ্ঞতাকে স্রোতের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। অভিজ্ঞতার দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে, এক হিসাবে এই তুলনা সার্থক হইলেও মনের সম্বন্ধে ভাবিতে হইলে আমরা একটা চির-চঞ্চল স্রোতের চেয়ে একটা স্থায়ী সত্ত্বারই কল্পনা করিতে চাই। মনের একটা অতীত ইতিহাস, একটা জ্ঞানের সঞ্চয় আছে, তাহা যেন বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতাকে নূতন ব্যঞ্জনা দান করে। অতীতের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা আহরণ এবং তাহার পর অতীত এবং বর্তমান মিলাইয়া ভাবী কর্মতন্ত্রকে পরিচালনার ইঙ্গিত, এই সমস্তই যেন মন বলিয়া পদার্থটির পরিচালনায় হইয়া থাকে।

এই যে অতীতের অভিজ্ঞতা, তাহার ব্যাপকতা শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই বিস্তৃত নহে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া সমগ্র জাতিগত জীবনের অতীত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় যেন আমাদের ব্যক্তিগত মনকে একটি বিশিষ্ট গঠন দান করে! এই জন্যই যে 'মন' দিয়া আমরা জীবনের কারবার আরম্ভ করি, তাহাকে কেহ কেহ মানসিক গঠন বা **মানসিক কাঠামো** (mental

structure) বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন (Mc. Dougall : Outline of Psychology)।

এই কাঠামো কথাটি কিন্তু আমাদের যেন বিভ্রান্ত না করে। মনের কাঠামো এমনই একটা ব্যাপার যাহা বর্তিষ্ণু (static) নহে,—তাহা চলিষ্ণু (dynamic)। ইহার মধ্যে একটা স্থায়ী সত্ত্বা আছে বটে, কিন্তু সেই স্থায়িত্বের ভিতরেই এমন একটা শক্তি আছে যাহা দ্বারা সে বর্তমান পরিবেশ বুঝিয়া নিজের গঠনের সংস্কার করিতে পারে, গঠনভঙ্গীর পরিবর্তনও করিতে পারে। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ কাঠামো বা structure বলি, তাহার এই ক্ষমতাটি নাই।

এইজন্য অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিকগণ এই মানসিক বৈশিষ্ট্যটিকে মানসিক কাঠামো না বলিয়া **"স্ব-ভাব"** (Disposition) নাম দিয়াছেন। স্টাউট্ (Stout) বলিয়াছেন, "Our actual experience at any moment is determined by conditions which are not themselves actual experience, but the abidiug after-affects left behind by Prior experience." অর্থাৎ 'আমাদের বর্তমানে যাহা অভিজ্ঞতা, তাহার ব্যঞ্জনা শুধু অভিজ্ঞতাটি দিয়াই আমরা লাভ করি না, অতীত অভিজ্ঞতার যে রেশটুকু আমাদের মধ্যে থাকিয়া যায়, তাহা দিয়াই আমরা বর্তমানকে বুঝি।'

অতীতের যে অভিজ্ঞতা আমাদের মানসিক কাঠামো তৈয়ারী করে, তাহা সব সময়েই আমাদের মনের সজ্ঞান স্তরেই ঘটে না, আমাদের অজ্ঞাতসারেও তাহার গঠন নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। কাজেই মনস্তত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই অবচেতন মনের কথাও কিছু কিছু আলোচ্য।

অবচেতন মন সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন জার্মান দার্শনিক হার্টম্যান (Hartman)। যে মতবাদ চৈতন্যকেই মনস্তত্ত্বের চরম তত্ত্ব বলিয়া মনে করিত তাহার প্রতিবাদ করিয়াই অচৈতন্যকে মানুষের মূল তত্ত্ব বলিয়া তিনি প্রচার করেন এবং ইহাকে তিনি দুষ্ট প্রেতাত্মার মত একটা অতিভৌতিক শক্তি বলিয়া মনে করিতেন।

হার্টম্যানের মতবাদ এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ফ্রয়েডীয় অবচেতন-তত্ত্বই অনেকের মনে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফ্রয়েডের মতে, অবচেতন মনটি যেন চেতন মনের নিম্নস্তরে অবস্থিত একটি কক্ষের ব্যাপার—যেখানে আমাদের অতৃপ্ত এবং অবদমিত কামনা-বাসনাগুলি জট পাকাইয়া গোপনে বাসা বাঁধে এবং সেখান হইতে অধিকতর শক্তি লইয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ফ্রয়েডীয় মতবাদটি অবশ্য সকলে স্বীকার করেন না, অথচ অবচেতন মনের আলোচনা তাঁহারা একেবারে বাদ দিতেও চাহেন না। তাই তাঁহারা অবচেতন মনের অন্য জাতীয় একটা ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ ড্রেভার (Dr. Drever) বলিয়াছেন, "অবচেতন কথাটি যদি বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বের কাজে ব্যবহার করিতেই হয়, তাহা হইলে আমাদের সচেতন অভিজ্ঞতার সেই সমস্ত মানসিক প্রভাবগুলিকেই বুঝিব যাহাদের সম্বন্ধে আমরা কখনই সচেতন হইতে পারি না। সুতরাং মানসিক অবস্থার দুইটি দিক আছে : (১) সচেতন প্রণালী এবং (২) সচেতনপ্রণালীর অচেতন প্রেরণা ; কিংবা সংক্ষেপে "সচেতন প্রণালী ও অচেতন প্রণালী"।

ড্রেভারের (Drever) উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে, মনের দুইটি দিক আছে : (১) সচেতন অভিজ্ঞতা এবং (২) মনের একটা সক্রিয় কাঠামো (mentral structure) বা গঠনভঙ্গী অথবা অচেতন প্রেরণা যাহা সচেতন অভিজ্ঞতাকে নূতন ব্যঞ্জনা দান করে।

আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে জ্ঞানমূলক, সংবেদনমূলক এবং কর্ম প্রেরণামূলক তিনটি দিক আছে, তাহা বুঝিবার জন্য এই অবচেতন মনস্তত্ত্ব কোনও নূতন আলোকপাত করিতে পারে কি ?

আমরা কিছু পূর্বে কিঞ্চুলিকার প্রতিক্রিয়ার কথা বলিয়াছি। সম্মুখে যাইতে যাইতে সে যখন বাধা পাইয়াছিল, তখন সে তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ একবার বামদিকে, একবার বা ডানদিকে ফিরিয়াছিল। আমরা পূর্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই প্রতিক্রিয়ার নিছক যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ঠিক হয় না, কিন্তু তা বলিয়া কেঁচোটির আচরণের মধ্যে মানবীয় বুদ্ধি-সিদ্ধান্তপ্রসূত

কর্মপ্রচেষ্টার শক্তির আরোপ করাও অত্যন্ত আদিখ্যেতার কথা হইবে। তাহা হইলে কেঁচোটির প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা কি ?

কেঁচোটি যখন প্রথম বাধা পাইল তখন সে বুঝিল বাইরে একটা কিছু ঘটিয়াছে এবং নিজের সঙ্গে তাহার সহিত একটা বোঝা পড়ার জন্য সে ভিতর হইতে একটা কিছু করিল। এই বাহিরের আবেদন এবং এই ভিতর হইতে প্রেরণার প্রতিক্রিয়া—ইহা যে দুইটি পৃথক ব্যাপার তাহা কেঁচোটি বুঝিতে পারে না। এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বাহিরের জগৎ ও ভিতরের জগৎ এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে—যদিও জ্ঞানমূলক (cognitive) আবেদন আসিয়াছে বহির্জগৎ হইতে এবং কর্মপ্রয়াস (conation)-মূলক প্রেরণা আসিয়াছে তাহার নিজের ভিতর হইতে। কেঁচোটির এই অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা অস্পষ্ট জ্ঞানমূলক এবং সামান্য একটা কর্মপ্রয়াসের প্রতিক্রিয়া ছিল; কিন্তু অভিজ্ঞতার আর একটি দিক অর্থাৎ সংবেদনটি (affection) সুস্পষ্ট ছিল না। ভাল লাগা, মন্দ লাগা, ভয়ে অভিভূত হওয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া এগুলির কিছুই তাহার মধ্যে ছিল না। তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া হইল কিরূপে? ডঃ ড্রেভার বলেন, একটা "feeling of worthwhileness" অর্থাৎ "এইটি করিলে ঠিক হইবে"—এই জাতীয় একটা অস্পষ্ট চেতনাই তাহার প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

একটি ফোটা ফুল দেখিয়া প্রজাপতিটি যখন তাহার দিকে উড়িয়া আসে তখনও এই জাতীয় একটা অনুভূতি অর্থাৎ "ফুলটির উপর বসিলে বেশ হয়" এই প্রকার একটা প্রেরণা তাহাকে ফুলের নিকট যাইবার জন্য প্রযুক্ত করে। ফুল সম্বন্ধে সংবেদনের তীব্র আনন্দও তাহার নাই, মননের গভীর সিদ্ধান্তও তাহার নাই এবং কর্মপ্রয়াসের কার্যাবলীও খানিকটা যান্ত্রিক ব্যাপারের মত। কিন্তু ঐ ফুলটি দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন: "ফুলও আমাদের কাছে প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে, সংসারের সোনার লঙ্কার রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি। রাক্ষস কেবলি বলছে 'আমি তোমার পতি, আমাকে ভজনা কর।' কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে 'আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন'।"

ফুল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আমরা সংবেদনের মধুরতম ব্যঞ্জনা, মননের গভীরতম দার্শনিকতা ও কর্মপ্রয়াসের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির সন্ধান পাইলাম।

শিশু বৃক্ষের একক অঙ্কুর হইতে বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত বনস্পতির পার্থক্য যেমন মাত্রা ও পরিণতিগত. প্রজাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার পার্থক্যও সেইরূপ। নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই তথাকথিত নির্জ্ঞান অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতার মধ্যে জ্ঞানমূলক (cognitive) অনুভূতি নাই, সংবেদমূলক (affective) অনুভূতি নাই এবং কর্মপ্রেরণামূলক (conation) প্রতিক্রিয়াও খানিকটা অন্ধভাবে পরিচালিত হয় এবং এই জ্ঞান, সংবেদন ও কর্মপ্রয়াস সবগুলিই একমাত্র প্রাণ-প্রেরণার অন্ধ আবেগে এক হইয়া কাজ করিতেছে। অঙ্কুর সেখানে একটি মাত্র কাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে শাখা-প্রশাখা কিছুই নাই। বৃক্ষ-শিশুটি যতই বড় হইতে থাকে, কাণ্ডটি ততই শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইতে থাকে। প্রাণীজগতেও তেমনি প্রাণী যতই উচ্চস্তরে উঠিতে থাকে ততই সে নির্জ্ঞান অভিজ্ঞতা, সজ্ঞান সংবেদন, কর্মপ্রয়াস ও মননশক্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিতে থাকে।

শারীর-মানস যন্ত্র

ললিতবাবু একজন বিখ্যাত গায়ক। সঙ্গীতকে তিনি জীবনের পরম ধন বলিয়া মনে করেন। গান গাহিতে-গাহিতে তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যান, যে ব্যক্তি গান জানে না তাহাকে তিনি মানুষ বলিয়াই মনে করেন না, তাহার একমাত্র পুত্রটি গান শিখিল না বলিয়া তাহাকে তিনি দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না এবং মনে মনে ভাবেন এই অযোগ্য পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার জীবনের সর্ব-সঞ্চয় একটি কৃতী ছাত্রকে উইল করিয়া দান করিয়া যাইবেন। ললিতবাবুর এই যে গান সম্বন্ধে ভালবাসা, এই যে স্বরের কড়ি, কোমল, ঔড়ব, খাড়ব, গমক, মীড়, মূর্ছনা, তান, লয় প্রভৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা, এগুলি কিভাবে তাঁহার মধ্যে সঞ্চিত হইল? প্রথমতঃ তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, একদিন শৈশবে হয়ত তাঁহার কানে কাহারও গান খুব ভাল লাগিয়াছিল। তিনি তাহা মন দিয়া শুনিয়াছিলেন। তাহার পর হয়ত তিনি গানটি গাহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, হয়ত প্রথম চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহাকে গানে আরও প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। এইভাবে কর্ম-প্রচেষ্টা ও অনুভূতির ভিতর দিয়া গানের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় নিবিড়তর হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ গান সম্বন্ধে তাঁহার একটি সংস্কার বা রসবোধ (sentiment) তৈয়ারী হইয়াছিল, পরে এই রসবোধ তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়াছিল। তাঁহার এই যে পরিণতি, এই যে গান সম্বন্ধে জ্ঞান, আদর্শবাদ প্রভৃতি ইহা যতই জটিল, যতই সূক্ষ্ম ব্যাপার বলিয়া মনে হউক না কেন, স্থূল শারীর অনুভূতি, স্থূল শারীর কর্মপ্রচেষ্টা এবং কর্মপ্রচেষ্টাজনিত সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানের ও প্রীতির সঞ্চার,—এই সমস্তের ভিতর দিয়াই উহার আরম্ভ হইয়াছে।

বস্তুতঃ জ্ঞানের সঙ্গে কর্মপ্রচেষ্টার একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। জ্ঞান কেবলমাত্র একটা কর্মনিরপেক্ষ সূক্ষ্ম শক্তির ফলমাত্র নহে। প্রত্যেক কর্ম-প্রচেষ্টাই একটি জ্ঞানের সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেক জ্ঞানই কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সঞ্চিত হয়। একটি ছবি দেখিয়া ছবি সম্বন্ধে যখন আমরা জ্ঞান আহরণ করি তখন সূক্ষ্ম মনোযন্ত্রের সাহায্যেই তাহা করি না, দেহ-যন্ত্রের অবদান তাহাতে

সামান্য নহে। ছবিটিকে দেখিবার জন্য দেহের উপযুক্ত সংস্থান করিয়া আমরাই চক্ষুকে যথাযথভাবে নিবদ্ধ করি, আলোক, দূরত্ব প্রভৃতির হিসাব করিয়া চক্ষুর "ক্যামেরা"টিকে যথাযথভাবে বিন্যাস করি, দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে একটা খবর স্নায়ু-তন্ত্রের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে প্রেরণ করি এবং মস্তিষ্ক হইতে দৃষ্ট বস্তুটি সম্বন্ধে একটা প্রেরণা অনুভব করি, তবেই ছবিটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়। জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রেই এইরূপ একটা কর্মেন্দ্রিয়ের অবদান আছে। যাহাকে সূক্ষ্ম চিন্তা করা বলা হয়, তাহার মধ্যেও এই স্থূল কর্ম বা স্থূল অনুভূতিগ্রাহ্য জড় পদার্থের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। জ্যামিতির সিদ্ধান্তগুলিকে সূক্ষ্ম চিন্তার কাজ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু নান্ (Nunn) সাহেব দেখাইয়াছেন, জ্যামিতির সিদ্ধান্তের জন্য যখন একটি ত্রিভুজকে অন্য একটি ত্রিভুজের উপর স্থাপন করা হয়, তখনও আমরা নিছক সূক্ষ্ম চিন্তার দ্বারা সে কাজটি করি না, মনে মনে ত্রিভুজের মত একটা স্থূল জিনিস লইয়া আর একটি স্থূল জিনিসের উপর স্থাপন করি; সুতরাং এক হিসাবে আমরা কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই মনোযন্ত্রের কাজ করি। এই জন্যই ব্রাড্‌লে (Bradley) বলিয়াছেন, "যুক্তি জিনিসটা হইতেছে স্থূল জিনিসের মানস প্রতিরূপগুলি লইয়া মনে মনে একটা পরীক্ষা করা মাত্র (To perform an ideal experiment)।" এখানে ideal কথাটির অর্থ 'আদর্শ' নহে, idea সংক্রান্ত অথবা 'মানসিক'।

চিন্তার সহিত কর্মপ্রচেষ্টার যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা অত্যন্ত জটিল। চিন্তার ক্ষেত্রে ঠিক স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু কর্ম-প্রচেষ্টার অবদান তাহার মধ্যেও আছে। কাজেই "কাজের ভিতর দিয়া শিখ (Learn by doing)"—এই উপদেশটির শিক্ষাতত্ত্বে বিশেষ একটা মূল্য আছে। এইজন্যই গণিত, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থ-তত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষার সময় ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলি (practical experiment) নিছক যুক্তিমূলক ব্যাখ্যার চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয়। ইতিহাস প্রভৃতি তত্ত্বমূলক বিষয়গুলি পড়াইবার সময় রসায়ন; পদার্থ-তত্ত্ব প্রভৃতির মত হস্তসম্পাদ্য পরীক্ষাগুলি হয়ত করান যায় না; তাহা হইলেও ইতিহাসের ঘটনাকে অভিনয় করাইয়া অথবা ইতিহাসের তত্ত্বগুলি বর্তমানের রাজনীতিক সমস্যার

সমাধানে প্রয়োগ করিয়া, ইতিহাসের বিষয়কেও কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা শিখাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অতীতের মনস্তাত্ত্বিকগণ মনে করিতেন যে, জগতের সহিত পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়াই আমাদের জ্ঞানের কাজ আরম্ভ হয়। বর্তমান মানসবিজ্ঞান বলে, শুধু পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি নহে, আমাদের অঙ্গসংস্থানবোধ, পেশীর বিক্ষেপ, কর্মপ্রচেষ্টা, সংবেদন (ভাল লাগা, মন্দ লাগা প্রভৃতি)—এগুলিও আমাদের জ্ঞানকে সাহায্য করে। কর্মপ্রচেষ্টার সহিত জ্ঞানবুদ্ধির যে একটা সমানুপাত সম্পর্ক আছে, তাহা একটী বিপরীতমুখী প্রমাণের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। যে সব ছেলেরা বুদ্ধিতে 'মাট' অথবা জড়বুদ্ধি, তাহারা জটিল গতিবিশিষ্ট অঙ্গপরিচালনা করিতে পারে না। লাঠিখেলা বা মুগুর ঘুরাইবার জটিল কৌশল দেখান, জিম্‌নাষ্টিকের জটিল অঙ্গভঙ্গী বা ব্যালেন্সের খেলা দেখান, সুন্দর পোজে দেহকে বিন্যস্ত করা, সুন্দরভাবে নৃত্য করা, ছবি আঁকা, সেতার, বীণা, এস্‌রাজ প্রভৃতি বাজান—এসব কাজ তাহারা ভালভাবে করিতে পারে না। এই জন্য মনে হয় একটি ভাল মানস-যন্ত্র একটি ভাল দেহযন্ত্রের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তবে হেলেন কেলার (Hellen Keller)-এর মত একজন মূক-বধির এবং অন্ধ বালিকা অসম্পূর্ণ দেহযন্ত্র লইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াও উত্তরকালে যে জ্ঞানী পণ্ডিত ও লেখিকা হইতে পারিয়াছিলেন, ইহা নিয়মের ব্যর্থতা প্রমাণ করে না, ব্যতিক্রমই প্রমাণ করে। এমন ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে।

এই দেহ-যন্ত্রের দক্ষতাবৃদ্ধির দ্বারা মানস যন্ত্রের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্যই মণ্টেসরি (Montessori) স্কুলে ফিতা বাঁধা, বোতামের গর্তে সূতা পরান, রংএর সহিত রং মিলাইয়া উল্ সাজান, খেলাঘরের কলকজা ফিট্ করা, ঢাকনিবদ্ধ কৌটা নাড়িয়া তাহার ভিতরে কি আছে তাহা বলিবার চেষ্টা করা প্রভৃতি করান হয়। মণ্টেসরি (Montessori) বলেন, এইভাবে অনুভূতি তথা শরীরগত দক্ষতার পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

এই অনুভূতি এবং কর্ম-প্রচেষ্টাগত প্রতিক্রিয়া "সংবেদ-চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া" (Sensory motor reactions)। ইহারই উপর মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি,

আদর্শ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সব কিছু নির্ভর করে। যে গায়কটির উদাহরণ দিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়াছি, সেই ললিতবাবুও তাঁহার গায়কত্বের সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন নিছক অনুভূতি এবং অনুভূতির কর্মপ্রচেষ্টাগত প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া।

তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে জগতের অসংখ্য আবেদন দেহযন্ত্র দিয়া কিভাবে অনুভূতিতে ধরা পড়ে এবং সেই অনুভূতি কিভাবে আমাদের মধ্যে কর্মগত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এ সমস্ত আলোচনাও মানসবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। উপস্থিত আমরা এই শারীর-মানস যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব।

ধরা যাইতে পারে, এই রচনাটি যখন লেখা হইতেছে তখন আমার ডান হাতের উপর একটা মশা হুল ফুটাইল, অমনি আমার বাম হাতটি তাহার উপর আপতিত হইয়া তাহাকে সংহার করিল। ঘটনাটি যত সরল বলিয়া মনে হইতেছে, ব্যাপারটা তত সরল নহে। মশাটি যখন কামড়াইয়াছিল, তখন আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই; তাহা হইলে বাম হাত দিয়া তাহাকে মারিলাম কি করিয়া? ব্যাপারটা হইল এইরূপ: মশাটি হুল ফুটাইল। সে যে আমার দেহের কোনও অংশে আক্রমণ করিয়াছে, সেই খবরটি কতকগুলি জ্ঞানবহা অন্তর্মুখী স্নায়ুর বা সংবেদন স্নায়ুর (sensory nerve) দ্বারা দেহের হেড্ অফিসে প্রেরিত হইল। এই হেড অফিসের অফিসার হিসেবে কোনও অধিরাজ মন বা আত্মাকে যদিও অনেকে স্বীকার করেন না, তাহা হইলেও বুঝিবার সুবিধার জন্য একটা রূপকের সাহায্যে বলা যাইতে পারে যে, মশার কামড়ের এই খবরটি যখন হেড অফিসে পৌঁছাইল, তখন অফিসারটি অতীত অভিজ্ঞতার ফাইল ঘাঁটিয়া বুঝিতে পারিল যে, এটা একটা মশামাত্র। তখন সে কর্মবহা বহির্মুখী স্নায়ুর (motor nerve) সাহায্যে বাম হাতের পেশীর নিকট অর্ডার পাঠাইল মশাটিকে মারিবার জন্য। বাম হাতটি সেই নির্দেশ অনুসারে উঠিল এবং মশার পৃষ্ঠে পতিত হইল। এই এতগুলি জটিল প্রক্রিয়া ঘটিতে হয়ত আধ সেকেণ্ডও সময় লাগে নাই। কারণ স্নায়ুর মধ্য দিয়া এই সংবাদ এক সেকেণ্ডে ২০০ ফুট বেগে যাতায়াত করে।

এই ঘটনাটি হইতে দেখা যাইতেছে, আমাদের কর্মযন্ত্রের তিনটি বিশেষ বিভাগ আছে। একটি দ্বারা আমরা অনুভূতি গ্রহণ করি (Affectors) ; আর একটির দ্বারা এই অনুভূতির খবরটি মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দিই ও মস্তিষ্ক হইতে উপযুক্ত নির্দেশগুলি পেশীর নিকট লইয়া আসি (connectors) এবং তৃতীয়টির দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করিয়া আমরা কাজ করি (effectors) ।

কর্ম্মযন্ত্রের বিভাগ তথা অনুভূতির যন্ত্রগুলি সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাইতেছে।

অনুভূতির যন্ত্র (Affectors, End organs) :

"দৃশ্য-গন্ধ-গানে" ভরা জগতের আবেদন অসংখ্য। এই সমস্ত আবেদনই যে আমাদের দেহ-যন্ত্রে ধরা পড়ে তাহা নহে। সূর্যকিরণে লক্ষ লক্ষ রঙ খেলা করিতেছে, তাহাদের মধ্যে সাতটিকে আমরা চক্ষু দিয়া ধরিতে পারি, প্রতি সেকেণ্ডে ১২-১৬ হইতে ২৫,০০০-৩০,০০০ কম্পনবিশিষ্ট শব্দকেই আমরা কর্ণ দিয়া ধরিতে পারি এবং ৩২ হইতে ৪০৯৬ কম্পন বিশিষ্ট শব্দকেই সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করিতে পারি, কিন্তু এই মাত্রার চেয়ে নিম্নতর বা উচ্চতর গ্রামের অসংখ্য শব্দগুলি আমরা কর্ণ দিয়াও শুনিতে পারি না এবং কণ্ঠ দিয়াও উচ্চারণ করিতে পারি না। এইভাবে জিহ্বা দ্বারা আমরা রাসায়নিক কয়েকটি বস্তুর মাত্র স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি। ঘ্রাণ যন্ত্রটি অবশ্য খুবই সূক্ষ্ম, আশী লক্ষ ভাগ বায়ুতে এক ভাগ মাত্র মৃগনাভি-রেণু থাকিলেও মানুষ তাহার গন্ধ বুঝিতে পারে ; কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর ঘ্রাণশক্তি আরও তীব্র। একটি আম কাটিলে বা একটি কাঁঠালের কোয়া বাহির করা হইলে সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মাছি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। তাহা হইলেও প্রাণীগণ সমস্ত বায়বীয় গন্ধদ্রব্যের সমস্ত মাত্রাই অনুভব করিতে পারে না। মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেহ হয়ত পোড়া ভাতের গন্ধটি ঠিক বুঝিতে পারে, কিন্তু বেল, মল্লিকার গন্ধ বুঝিতে পারে না, সামান্য সিগারেটের গন্ধে কাতর হইয়া উঠে, কিন্তু ঘী-এর গন্ধ পায় না ; কাজেই আমাদের ঘ্রাণের শক্তিও সীমাবদ্ধ। এইরূপ ত্বকের শক্তিও খুবই

সীমাবদ্ধ, শীতাতপ এবং স্পর্শের খানিকটা অংশমাত্রই আমরা বুঝিতে পারি। যাহা হউক, এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ লইয়া আমাদের যে জগতের সঙ্গে পরিচয়, তাহা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের (End organs) সাহায্যেই হইয়া থাকে। এই পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়া শরীরের সুস্থতা বোধ (organic sense), দেহসংস্থানবোধ (posture and balance sense), গতিবোধ (kinaesthetic sense) প্রভৃতি আরও অনেক ইন্দ্রিয়ই আমাদের আছে। বস্তুতঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা বহুদিন হইতে শুনা থাকিলেও, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা অনুভূতির যন্ত্র হিসাবে পাঁচের অনেক বেশী সংখ্যক ইন্দ্রিয়েরই সন্ধান পাইয়াছেন। তবে তাহাদের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ই প্রধান।

আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিরই বাইরের অংশটি এমন কতকগুলি কোষ (epithelial cell) দ্বারা গঠিত যেগুলি এক একটা বিশিষ্ট রকমের উত্তেজনাতেই সাড়া দেয়। যে উত্তেজনা কর্ণ অনুভব করিতে পারে, চক্ষুর নিকট তাহা অর্থহীন, আবার চক্ষু দিয়া যাহা বুঝিতে পারি, ত্বকের দ্বারা তাহা পারি না। এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই সাড়া দেওয়ার কাজটি কিভাবে ঘটিয়া থাকে?

যখন বহির্জগতে একটি বিশিষ্ট আবেদনের সহিত একটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, তখন ঐ ইন্দ্রিয়ের Epithelial কোষগুলির মধ্যে একটি শারীর-রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, এই পরিবর্ত্তনের ফলে একটা রাসায়ন-বৈদ্যুতিক বা তজ্জাতীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হইয়া বহু শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত স্নায়ুশাখার সাহায্যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতে (মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক) আনীত হয়। সেখানে তখন এই তরঙ্গগুলি যাইয়া আবার আর একজাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাহার ফলে কর্মবহা স্নায়ু (motor nerve) দিয়া একটি নির্দেশ পেশী (বা গ্রন্থি)-তে উপস্থিত হয় এবং সেই নির্দেশ অনুসারে পেশী নড়াচড়া করে, অথবা গ্রন্থি রস নিঃসরণ করে।

স্নায়ুতন্ত্র (Connecters, Nervous system) :

বহির্জগতের আবেদন যখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনও একটিতে উপস্থিত হয়,

তখন স্নায়ুমণ্ডলীই সেই আবেদনটি মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয়, আবার মস্তিষ্ক হইতে সেই আবেদনের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া-নির্দেশও মস্তিষ্ক হইতে বহন করিয়া আনে। এই স্নায়ুতন্ত্রের পরিণতিই মানুষকে নিম্নতর প্রাণী হইতে পৃথক করিয়াছে। জীবজগতের নিম্নতম সৃষ্টি একটি "এ্যামিবা"—একটিমাত্র জীবকোষ লইয়া গঠিত। ইহার শরীরের প্রত্যেকটি অংশই সমান প্রয়োজনীয় ; কারণ প্রত্যেকটি অংশ দিয়া ইহারা নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে, জীবনের সব কিছু কার্যই করিতে পারে। শুধু তাই নয়, ইহার শরীরের যে কোনও অংশ কাটিয়া মূল দেহ হইতে পৃথক করিয়া দিলে তাহা বাঁচিয়া থাকে, বৃদ্ধি পায় এবং সন্তানসন্ততিও সৃষ্টি করে।

প্রাণী যতই উন্নততর হইতে থাকে, তাহার শরীর ততই অধিক সংখ্যক জীবকোষের দ্বারা গঠিত হইতে থাকে। এই কোষগুলি এ্যামিবার কোষের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ জিনিস হয় না। একটি মানুষের একটি আঙ্গুল কাটিয়া দিলে সেই কাটা আঙ্গুলটি হইতে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈয়ারী হয় না। উচ্চতর প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অনন্য-নিরপেক্ষ নয় বলিয়াই তাহাদের পরস্পরের পূর্ণতা বিধানের জন্য, পরস্পরের সাহায্যের জন্য, পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটী ব্যবস্থার প্রয়োজন। স্নায়ুতন্ত্র এই ব্যবস্থা করে। প্রাণী যতই উচ্চস্তরে উঠিতে থাকে, তাহার স্নায়ুতন্ত্র ততই জটিল হইতে থাকে। ক্রমশঃ স্নায়ুরর্জ্জুকে (বা সুষুম্না কাণ্ডকে) ধারণ ও রক্ষা করিবার জন্য ফাঁপা হাড়ের মেরুদণ্ডের বিকাশ হইতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুর রাজধানী হিসাবে মস্তিষ্কেরও বিকাশ হইতে থাকে এবং দেহযন্ত্রের সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলি মস্তিষ্ক-সাপেক্ষ হইয়া পড়িতে থাকে। কাজেই মানুষের স্নায়ুর সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে মস্তিষ্কের আলোচনা আসিয়া পড়ে।

মস্তিষ্ক চারিভাগে বিভক্ত, যথা (১) প্রধান মস্তিষ্ক বা গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum), (২) মধ্যমস্তিষ্ক বা লঘু মস্তিষ্ক (cerebellum), (৩) অধঃমস্তিষ্ক বা সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla Oblongata) এবং (৪) সেতুমস্তিষ্ক (Pons-varolii)।

প্রধান মস্তিষ্ক (Cerebrum) : ভ্রূযুগলের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া ঘাড়ের চুল যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার দুই ইঞ্চি উপর পর্যন্ত স্থান জুড়িয়া মাথার খুলির প্রায় ⅞ অংশ অধিকার করিয়া আছে। ইহা বাম ও দক্ষিণ দুই অর্ধ গোলাকার অংশে (hemisphere) বিভক্ত। এই দুইটি বিভাগের মধ্যে একটা ফাটলের মত আছে। এই প্রত্যেক গোলার্ধের মধ্যে আবার তিনটি করিয়া অংশ (lobe) আছে। সুতরাং প্রধান মস্তিষ্ক ছয় ভাগে বিভক্ত। ইহার উর্ধ্বতম অংশে ⅛ হইতে ⅛ ইঞ্চি পুরু ধূসর বর্ণের এবং তাহার ভিতরে শ্বেত বর্ণের স্নায়ু স্তর আছে। ধূসর বর্ণের অংশটি উচ্চতর চিন্তাকে পরিচালিত করে।



(১) প্রধান মস্তিষ্ক (২) মধ্য মস্তিষ্ক
(৩) অধঃমস্তিষ্ক (মেডুলা)
(৪) মেরুরজ্জু

প্রধান মস্তিষ্ক মানুষের বুদ্ধি-চৈতন্য, আবেগ (emotion)-ইচ্ছাশক্তি, দেহের ঐচ্ছিক পেশীর পরিচালনা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। আঘাত, পতন, অস্থায়ী অস্ত্রোপচার, বৈদ্যুতিক শক্ প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ নষ্ট হইলে আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা বাক্‌শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শক্তিও বিনষ্ট হয়। এই জাতীয় প্রমাণ হইতে এখন প্রায় নিঃসংশয় রূপেই জানা গিয়াছে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আমাদের বিভিন্ন কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে বামদিকের মস্তিষ্কের চেষ্টাধিষ্ঠান (motor area) রোগগ্রস্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হইলে আমরা দক্ষিণ দিকের হাত-পা নাড়িতে পারি না, মস্তিষ্কের দক্ষিণ দিকের চক্ষু-নিয়ন্ত্রণকারী অংশটি নষ্ট হইলে আমরা বাম চক্ষু দ্বারা কিছুই দেখিতে পাই না, ইত্যাদি।

মধ্য মস্তিষ্ক (Cerebellum) : প্রধান মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগের নিম্নে অর্থাৎ ঘাড়ের ঠিক উপরে মধ্য মস্তিষ্ক অবস্থিত ; আকারে ইহা মাঝারী কমলা লেবুর মত। ইহাও দুই গোলার্ধে বিভক্ত ; ইহার উপরেও ধূসর ও শ্বেত

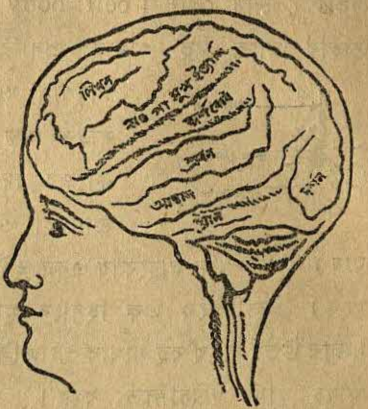
বর্ণের স্নায়ু-চাপ বিদ্যমান আছে। মধ্য মস্তিষ্ক শরীরের পেশীতন্ত্রের কার্যের সমতা রক্ষা করা, শরীরের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখা, চলাফেরা করা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। এই মস্তিষ্ক অসুস্থ হইলে মানুষ চোখ বুজিয়া দাঁড়াইতে যাইলে পড়িয়া যাইবে বা কোনও কিছু করিতে হইলে তাহার হস্ত-পদাদি কাঁপিতে থাকিবে।

অধঃ মস্তিষ্ক (Medulla Oblongata) : অধঃ মস্তিষ্ক বস্তুতঃ মেরু-মজ্জার উর্ধ্বভাগ মাত্র। মস্তিকের ঠিক নিম্নে ইহা অবস্থিত এবং ধীরে ধীরে মেরুমজ্জায় পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে। অধঃ-মস্তিষ্ক প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা এবং উর্ধ্বদিকে পৌণে এক ইঞ্চি মোটা। নীচের দিকে ইহা ক্রমশঃ মেরুমজ্জায় মিশিয়াছে। অধঃ মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তবহা নাড়ীর পেশী ও গিলিবার পেশীর উপর কাজ করিয়া থাকে। ইহার উর্ধ্বদেশ নষ্ট হইলে মানুষের বোধ-শক্তি লোপ পায়, ফলে হয়ত সে বাঁচিয়া থাকিবে, নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবে, কিন্তু বেদনা বোধ করিতে পারিবে না। প্রধান মস্তিকের সহিত ইহার যোগ নষ্ট হইলে মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক নড়িয়া বেড়াইতে পারে না। ইহার নিম্নদেশ নষ্ট হইলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কার্য্য বন্ধ হইবে। মস্তিকের এই অংশ পরিপাক ক্রিয়া ও ঘর্ম সৃষ্টির সহায়তা করে।

পনস্ বা সেতু-মস্তিষ্ক (Pons) : অধঃ মস্তিকের ঠিক উপরেই স্নায়ু-সূত্রগুলি প্রস্থে বিস্তৃত হইয়া মস্তিকের দুই অংশকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই অংশটির নাম পনস্ বা সেতু-মস্তিষ্ক। আমাদের দক্ষিণ দিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির কাজ যে বামদিকের মস্তিকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহার একটা কারণ এইখানে পাওয়া গেল। আমাদের স্নায়ুগুলি মেরুদণ্ড বহিয়া আসিয়া এই "পনস্" বা সেতু-মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া পরস্পর কাটাকাটি করিয়া বিপরীতমুখী গতি লইয়া যাত্রা করিয়াছে।

মেরু-মজ্জা প্রণালী : অধঃ মস্তিষ্ক সরু হইয়া মেরু-মজ্জা (বা সুষুম্না কাণ্ড) রূপে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বিংশ মেরুদণ্ড পর্যন্ত বা প্রথম লাম্বার ভাটিব্রা পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুতরাং ইহাকে মস্তিকের অব্যাহত অংশ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অথবা বিপরীত বিচারে জীব-

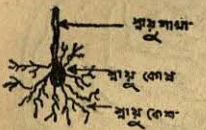
তত্ত্বের ক্রমবিকাশের দিক দিয়া মস্তিষ্ককেই মেরুমজ্জার পূর্ণ পরিণতি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মেরু-মজ্জা দৈর্ঘ্যে ১৮ ইঞ্চি এবং কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত স্থূল। মেরুমজ্জা হইতে ৩১ জোড়া স্নায়ুগুচ্ছ মেরু-দণ্ডের বাম ও দক্ষিণ দিক দিয়া বহির্গত হইয়াছে। এইগুলিকে স্পাইনাল নার্ভ বলা হয়। প্রত্যেক স্পাইনাল নার্ভের দুইটি শিকড় আছে—একটি শিকড় মেরুমজ্জার সম্মুখ অংশ হইতে এবং অপরটি পশ্চাৎ অংশ হইতে নির্গত হইয়া আবার পরস্পর মিলিত হইয়াছে। তখন তাহাদের স্নায়ুগুচ্ছ (Nerve trunk) বলা হয়। মেরুদণ্ড ছাড়িয়া এই স্নায়ুগুচ্ছগুলি বহুধা বিভক্ত হইয়া শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া ইন্দ্রিয়ের মুখ, পেশী-তন্তু, ত্বক প্রভৃতি শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া মস্তিষ্কের সহিত দেহের দূরতম অংশের সংযোগ স্থাপন ও একত্ব বিধান করিয়াছে। শরীরের মধ্যে কেবল নখ, চুল, উপাস্থি এবং উপ-ত্বকে স্নায়ুসূত্র নাই। এইজন্যই চুল বা নখ কাটিলে যন্ত্রণা বোধ হয় না।



কাজের দিক দিয়া স্নায়ুগুলি জ্ঞান-বহা বা অন্তর্মুখা (Afferent), কর্মবহা ও বহির্মুখী (Efferent) এবং মিশ্র—এই তিন জাতীয় হয়। জ্ঞানবহা স্নায়ু বহির্জগতেন আবেদনের খবর মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয়, কর্মবহা স্নায়ু মস্তিষ্কের নির্দেশ কর্মেন্দ্রিয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদের দিয়া কাজ করাইয়া লয় এবং মিশ্র স্নায়ুগুলি উভয় কার্যই করে।

স্নায়ুকোষ (Nenron) : মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের সূক্ষ্মতম অংশ হইতেছে স্নায়ুকোষ (neuron)। শরীরের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ কোটী স্নায়ুকোষ আছে। মস্তিষ্কের মধ্যে যত স্নায়ুকোষ আছে, তাহাদিগকে খালি চোখে দেখিবার মত বড় করিয়া তুলিলে তাহাদের জন্য যে আয়তনের প্রয়োজন হইত,

হইত, তাহা পৃথিবীর বৃহত্তম গম্বুজের চেয়েও বড় হইত। প্রত্যেক স্নায়ুকোষে একটি কেন্দ্রীয় কোষ (cell body), একটী স্নায়ুকোষ (axon) এবং তাহার প্রান্তে বহু শাখায় প্রসারিত স্নায়ুকেশ (dendron) আছে।



স্নায়ুশাখা ও স্নায়ুকোষের সাহায্যে একটি স্নায়ুর সহিত অন্য একটি স্নায়ুর সংযোগ সাধিত হয়। কাজের দিক দিয়া স্নায়ুকোষগুলিকে কর্ম্মবহা, জ্ঞানবহা ও সংযোগকারী এইভাবে ভাগ করা যায়। কতকগুলি স্নায়ুকোষ একত্র হইলে তাহাকে গ্যাঙ্গ্লিয়া (Ganglia) বলে। ইহাদিগকে এক হিসাবে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বলা যাইতে পারে। মেরু-মজ্জার উভয় পার্শ্বে বহু সংখ্যক গ্যাঙ্গ্লিয়া আছে। এইগুলি "সিম্প্যাথেটিক" স্নায়ুর কার্য পরিচালিত করে। এই সিমপ্যাথেটিক্ স্নায়ুর নির্দেশেই প্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়া (Reflexes), পরিপাক ক্রিয়া, নিঃশ্রবণ ক্রিয়া প্রভৃতি মস্তিষ্কের বিনা আজ্ঞায় চলিতে থাকে।

"সাইন্যাপ্স" (The Synapse): নিম্ন প্রাণীদের মধ্যে একটি স্নায়ুকোষই তন্নিম্নস্থ পেশীকে কর্ম-নির্দেশ প্রেরণ করিতে পারে। কিন্তু উচ্চতর প্রাণীদের বিস্তৃততর দেহযন্ত্র আছে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে কর্মেন্দ্রিয়ে নির্দেশ পাঠাইতে হইলে অন্ততঃ দুইটি স্নায়ুকোষের প্রয়োজন হয়। যে স্থানে এই দুইটি স্নায়ুর কর্মগত মিলন হয় (স্পর্শ নয়), তাহাকে



synapse বলে। এই synapse-এর ক্ষেত্রে দুইটি স্নায়ুকোষের শাখা-প্রশাখাগুলি একেবারে জড়াজড়ি করিয়া মিলিত হয় না—শুধু এমন কাছাকাছি আসে যাহাতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মত অনুভূতি-নির্দেশের বা কর্ম-নির্দেশের তরঙ্গগুলি একটি পথ করিয়া লইয়া ছুটিতে থাকে। Synapse-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্নায়ুকোষগুলি পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া মিলিত হয় না বলিয়াই কোনও একটি স্নায়ুকোষ অসুস্থ বা বিনষ্ট হইলে অপরটিও তাহার আক্রমনে বিনষ্ট হয় না। Synapse-এর আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহার মধ্য দিয়া "One

way" পথের মত তরঙ্গগুলি একমুখী ভাবেই যাইতে পারে, অর্থাৎ জ্ঞানবহা হইতে জ্ঞানবহা অথবা কর্মবহা হইতে কর্মবহা স্নায়ুপথেই অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী গতি লইয়াই যাইতে পারে—বিপরীতমুখী যাত্রা করিতে পারে না।

স্নায়ু-তরঙ্গস্রোত যখন একটি স্থান হইতে অন্যত্র যাত্রা করে, Synapse তখন তাহাতে বাধাই দান করে। তবে একবার একটি স্নায়ু-প্রবাহ চলিয়া যাইলে দ্বিতীয় বারের বাধা অল্পতর হয়, পরে আরও অল্পতর হয় এবং পরে খাল-কাটা পথে জলস্রোতের মত স্নায়ুপ্রবাহের যাত্রা সহজ হইয়া যায়। অভ্যাসের জন্য আমাদের কাজে যে দক্ষতা আসে, তাহা হইতেছে এই খাল-কাটা পথে স্নায়ু-তরঙ্গের সহজতর যাত্রা-প্রবাহের ব্যাপার মাত্র। বর্তমান মনস্তত্ত্ব বলে, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা কোন আত্মা বা মন-মহারাজের কর্তৃত্বে নিষ্পন্ন হয় না, তাহা হইতেছে এই Synapse-এর বাধা ভাঙ্গিয়া স্নায়ুতরঙ্গের জন্য সহজ যাত্রাপথের সৃষ্টি করা। Synapse-এর বাধা বেশী হইলে কর্মের ক্ষমতা ও অনুভবের ক্ষমতা কমিয়া যায়। কারণ এই বাধা বেশী হইলে কর্ম-নির্দেশের বা অনুভূতি-বোধের চরম কেন্দ্র মস্তিষ্কের সহিত কর্মেন্দ্রিয়ের বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক কমিয়া যায়; এইজন্যই বড় বড় অস্ত্রোপচারের সময় ঔষধের দ্বারা Synapse-এর বাধা (Synaptical resistance) বাড়াইয়া দিয়া যন্ত্রণানুভূতির ক্ষমতা সাময়িকভাবে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। টেলিগ্রাফ তার কাটিয়া যাইলে যেমন দেশের প্রান্তের খবর রাজধানীতে পৌঁছায় না, সেইরূপ এই অবস্থায় মস্তিষ্কও খবর পায় না যে, শরীরের এই অংশটীতে কাটা-কাটি হইতেছে, তাই তখন মস্তিষ্ক শরীরকে যন্ত্রণার অনুভূতি দিতে পারে না।

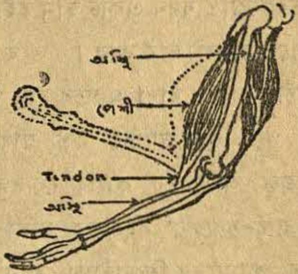
কর্মেন্দ্রিয় (Effectors ; muscles & glands) ঃ

শরীর-মানস যন্ত্রের কথা আলোচনা করিতে হইলে যে তিনটি প্রধান যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তাহাদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইটি হইতেছে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অনুভূতি গ্রহণের যন্ত্র (Receptors), দ্বিতীয়টি হইতেছে এই অনুভূতিজনিত শারীর রাসায়নিক পরিবর্তনের খবর মস্তিষ্কে প্রেরণ এবং মস্তিষ্ক হইতে কর্ম নির্দেশের খবর বহিয়া আনিবার যন্ত্র বা স্নায়ুতন্ত্র (Connec-

tors) এবং তৃতীয়টি হইতেছে মস্তিষ্ক হইতে আগত নির্দেশ অনুযায়ী কর্ম করিবার যন্ত্র (Effectors)। প্রথম দুই শ্রেণীর যন্ত্রের কথা ইতোপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, এইবার আমরা কর্মযন্ত্রগুলির কথা আলোচনা করিব।



(১) পেশী (২) ধমনী
(৩) শিরা (৪) স্নায়ু।



বাহুর Biceps ও Triceps পেশী ও "টেণ্ডন" চিম্‌টা জাতীয় লেভার্‌-এর দ্বারা অস্থিকে টানে।

আমাদের কর্মযন্ত্রগুলি পেশী ও গ্রন্থি এই দুই ভাগে বিভক্ত। পেশীগুলি আবার ঐচ্ছিক (Biceps, Triceps প্রভৃতি) এবং অনৈচ্ছিক (পেটের অভ্যন্তরের পেশী, শিরা, ধমনী প্রভৃতি)—এইভাবে বিভক্ত। গ্রন্থিগুলিকেও সচ্ছিদ্র বহির্মুখী রস-নিঃসারক (Duct gland) এবং নিশ্ছিদ্র অন্তর্মুখী রস-সিঃসারক (ductless glands)—এইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে।

ঐচ্ছিক পেশী ঃ ঐচ্ছিক পেশীকে আমরা ইচ্ছা করিলে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারি। ইহারা সংখ্যায় দুই শতেরও উপর এবং নরকঙ্কালের সমগ্র আবরণই প্রায় এই পেশীর দ্বারা গঠিত। এই পেশীগুলির দুইটি প্রান্ত দুইটি অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে। পাম্পের হাতল, জাঁতি, চিমটা প্রভৃতিতে যে তিন জাতীয় লেভার্ (Lever) আছে, অস্থি-সংলগ্ন পেশীগুলি সেই বিভিন্ন জাতীয় লেভার্‌-এর কার্য করিয়া আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়া-চাড়ার কাজ করে। আমরা যে মাথা নাড়ি তাহা হইতেছে প্রথম শ্রেণীর লেভার্‌-এর কার্য, যখন আমরা পায়ের গোড়ালি তুলিয়া বুড়া আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াই তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেভার্ কাজ করে এবং যখন আমরা biceps পেশীর

সাহায্যে নিম্ন হস্তটি যে উর্ধ্ব হস্তের সহিত মুড়িয়া থাকি তখন হয় তৃতীয় শ্রেণীর লেভার্-এর কাজ।

শরীরের এই পেশীগুলিকে সঙ্কোচক (Flexors) ও প্রসারক (Extensors) —এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। সঙ্কোচক পেশীর দ্বারা আমরা কোনও জিনিসকে কাছে টানা বা চাপা দেওয়ার কাজ করি, আর প্রসারক পেশী দ্বারা আমরা কোনও জিনিসকে দূরে ঠেলিবার চেষ্টা করি। শরীরের সর্বত্রই এই সঙ্কোচক এবং প্রসারক পেশীগুলি পরস্পর বিপরীত ভাবে জোড়ায় জোড়ায় সাজান আছে। যেমন হাতের সমুখ দিকের Biceps সঙ্কোচক পেশী, আবার পিছন দিকের Triceps প্রসারক-পেশী।

এই পেশীগুলি রক্তভর্তি স্পঞ্জের সূতার গুচ্ছের মত। সাধারণতঃ ইহাদের মধ্য ভাগ স্থূল এবং দুই প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া দুই দিকের অস্থির সহিত মিলিত হয়। এই প্রান্তদ্বয়ে মাংসের পরিবর্তে শক্ত সাদা ফিতার মত বন্ধনী দেখা যায়। ইহাদিগকে tendon বলে। পেশীতে বিশুদ্ধ রক্ত প্রেরণ করিবার জন্য এবং উহা হইতে দূষিত রক্ত বাহির করিয়া লইয়া যাইবার জন্য শিরা ও ধমনী আছে। মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত নার্ভ পেশীকে কাজ করিবার জন্য প্রেরণা দিয়া থাকে। এই প্রেরণা পাইবামাত্র পেশী-কোষটি সঙ্কুচিত হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং তাহার দৈর্ঘ কমিয়া যায়। ফলে যে অস্থি দুইটির সহিত পেশীটি সংযুক্ত, তাহারা পরস্পর কাছাকাছি আছে।

মানুষের সুখদুঃখ প্রভৃতির জন্য পেশীর শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পেশীর কার্য হইবার সময় শরীরে যে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, তাহা চমকৃপ্রদ। ধমনীযোগে রক্ত খাদ্যের রস ও শর্করা পেশীতে বহন করিয়া আনে। সেখানে পেশীর কোষগুলিতে সেগুলি glycogen প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া সঞ্চিত থাকে। পরে পেশীর কার্য যখন চলিতে থাকে, তখন এই খাদ্যরস হইতে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়, তাহার ফলে চলাফেরা সম্ভব হয় ও উত্তাপ তৈয়ারী হয়। পেশীর সঙ্কোচনের ফলে যে ক্ষয় হয় তাহাতে co_2, latic acid এবং acid Potessium phospate তৈয়ারী হয়। ইহার পর দূষিত জিনিসগুলি (Waste products) রক্তের সঙ্গে শিরার দ্বারা ফুস্‌ফুসে প্রেরিত হয় এবং

সেখানে প্রশ্বাসের বায়ুর সাহায্যে শোধিত হইয়া আবার হৃৎযন্ত্রের মধ্য দিয়া দেহের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

পেশীর কার্য যখন জোরে চলিতে থাকে, তখন শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। এই তাপের সমতা রক্ষার জন্য ঘর্মগ্রন্থি হইতে প্রচুর ঘর্ম নির্গত হয় এবং উত্তাপের সমতা রক্ষার সাহায্য করে।

অনৈচ্ছিক পেশী : অনৈচ্ছিক পেশীগুলি পাকস্থলী যন্ত্র, পিত্তকোষ, ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতিতে কাজ করে। আমাদের জ্ঞানের অগোচরে ইহারা আপনার মনে কাজ করিয়া যায় বলিয়া ইহাদের প্রয়োজন আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। কিন্তু এইগুলি দ্বারা আমাদের জীবনধারণের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজগুলি নিষ্পন্ন হয়।

ইচ্ছা করিয়া এই পেশীগুলিকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না বটে, তবে আমাদের মানসিক অবস্থার উপর ইহাদের কর্মশক্তির তারতম্য হয়। ক্রোধ, হিংসা, বিষণ্নতা প্রভৃতি এইসব পেশীগুলির কাজে বাধা দান করে; আবার আনন্দ, প্রেম প্রভৃতি এগুলিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে।

ব্যায়াম দ্বারা যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে আমরা ঐচ্ছিক পেশীগুলিকে সুস্থ ও পুষ্ট করিয়া তুলিতে পারি, অনৈচ্ছিক পেশীগুলিকে সেরূপ করিতে পারি না বটে, তবে পরোক্ষভাবে তাহা করা যায়। কারণ অনৈচ্ছিক পেশীরগুলির উপরে শরীরের বাহিরের দিকে যে সমস্ত ঐচ্ছিক পেশীর আস্তরণ আছে, সেই ঐচ্ছিক পেশীগুলির উপযুক্ত ব্যায়াম করিলে তাহাতে যে অধিকতর রক্ত চলাচল হইতে থাকে, সেই রক্তস্রোত যেমন বাহিরের দিকের পেশীগুলিকে পুষ্ট করে, তেমনই ভিতরের দিকের অনৈচ্ছিক পেশীগুলিকেও সমৃদ্ধ করিয়া তুলে।

সচ্ছিদ্র গ্রন্থি (Duct glands) ঃ এই গ্রন্থিগুলি ছিদ্র বা নালীর সাহায্যে বাহিরের দিকে রস নিঃসরণ করে। পিঁয়াজ কুটিবার সময় চোখ দিয়া জল পড়ে, লোভের খাদ্য দেখিলে জিহ্বা হইতে যে লালা নিঃসরণ হয় বা গরম হইলে যে দেহ হইতে ঘর্ম নির্গত হয়, তাহা এই সচ্ছিদ্র গ্রন্থির কার্য। এই গ্রন্থিগুলি সাধারণতঃ হজম কার্যের এবং শরীর হইতে দূষিত পদার্থের নির্গমনের সহায়তা করে।

নিশ্ছিদ্র গ্রন্থি (Ductless glands) : এই গ্রন্থিগুলি বাহিরের দিকে কোনও রস নিঃসরণ করে-না এবং ইহাদের মধ্যে ছিদ্র নাই.। ইহারা ভিতরের দিকে যে রসক্ষরণ করে, তাহা সোজাসুজি রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়।

মানস-বিজ্ঞানের দিক দিয়া এই গ্রন্থিগুলির কাজ খুব প্রয়োজনীয়।

থাইরয়েড্ গ্রন্থি (Thyroid glands) : ইহা গ্রীবাদেশের সম্মুখে ও নিম্নদেশে স্বরোৎপাদক যন্ত্র (larynx) এবং বায়ুনালীর (Wind pipe) দুই পার্শ্বে অবস্থিত। জন্ম হইতে থাইরয়েড্ গ্রন্থি অকর্মণ্য হইলে মানুষের জীবন-যাত্রার উপর তাহার প্রভাব অল্প হইবে না। গ্রীণ (Green), লিওপোল্ড লেভি (M. M. Leopold Levi), এইচ্. ডি. রথ্ চাইল্ড্ প্রভৃতি গবেষণার দ্বারা দেখাইয়াছেন, অল্প বয়সে থাইরয়েড্ অসুস্থ হইলে বালকের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হইবে, চর্ম শুষ্ক এবং চুল পাতলা হইবে, যৌনচেতনা ও যৌন পরিণতি বিলম্বিত হইবে এবং সে Cretin জাতীয় খর্বাকৃতি কুৎসিত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অপদার্থ যুবকে পরিণত হইবে।

পরিণত বয়সে থাইরয়েড শুষ্ক হইয়া যাইলে টিটানী (tetany), মৃগী, মূর্ছাদি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, শরীরের চর্ম পুরু ও শুক্না হইয়া যায়, চর্বি কমিয়া যায়, চুল উঠিয়া যাইতে থাকে, শরীরের তাপ, উৎসাহ, শক্তি কমিয়া যাইতে থাকে, শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়, পরিশ্রান্ত না হইয়াও অবসাদ অনুভূত হয় এবং অকারণে নিদ্রাপ্রবণতা দৃষ্ট হয়।

আবার থাইরয়েডের রস-নিঃসরণ বেশী হইলে হৃৎপিণ্ডের কাজ দ্রুততর হয়, মনের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, চক্ষুতারকা বড় হইয়া উঠে এবং অনিদ্রার লক্ষণ প্রকাশ পায়। থাইরয়েডের ক্রিয়া আরও বেশী হইলে গণ্ডমালা (Goitre) রোগ হয়। শরীর হইতে থাইরয়েড্ তুলিয়া ফেলিলে অকালে বার্ধক্য আসে, আবার অষ্টিয়ার ডাক্তার ভার্ণফ দেখাইয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে অকর্মণ্য থাইরয়েড্ তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে যুবক বানরের থাইরয়েড বসাইলে মানুষের পুনর্যৌবন লাভ হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, থাইরয়েড গ্রন্থি আমাদের শরীর-মন তথা

ক্রিয়াকলাপের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। ইহা বেশী ক্রিয়াশীল হইলেও ক্ষতি হয়, কম হইলেও ক্ষতি।

থাইরয়েডের রসক্ষরণের স্বল্পতাজনিত অসুখগুলি দুশ্চিকিৎস্য নহে। থাইরয়েড পদার্থ সেবন করাইয়া এই অসুখের প্রতিকার হইতে পারে। সাধারণতঃ মেষ দেহের থাইরয়েড হইতে এই ঔষধ তৈয়ারী হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া Cretin জাতীয় বহু জড়বুদ্ধি বালক স্বাভাবিক যুবকে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া ইহা একটি প্রয়োজনীয় তথ্য।

থাইরয়েডের রসক্ষরণের প্রাচুর্যজনিত Goitre প্রভৃতি খানিকটা দুশ্চিকিৎস্য হইলেও, ইহা potassium iodine-ঘটিত পদার্থযোগে নিবারণ করা যায়। যোগব্যায়ামের সর্বাঙ্গাসন, হলাসন জাতীয় আসন অভ্যাস করিলেও থাইরয়েডের কাজ ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal gland): এই গ্রন্থি দুইটি **কিডনির** উপরে ছোট হল্‌দে রংয়ের টুপীর আকারে অবস্থিত আছে। ইহাদের প্রত্যেকটির ওজন চার গ্রাম করিয়া। ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে: (১) শরীরের রক্ত-চাপ (blood pressure) ঠিক রাখা এবং (২) যৌন-ভাবটি নিয়মিত রাখা।

যে সব পুরুষের দেহ বেশী রোমশ, ঘৃণা ও ক্রোধ যাহাদের খুব প্রবল, আনন্দ ও যন্ত্রণার সময় হৈ চৈ করিয়া যাহারা মনোভাব প্রকাশ করে, তাহাদের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি খুব ক্রিয়াশীল, আর যে নারীর মধ্যে পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, স্বর মোটা হইয়া যাইতেছে, গায়ে লোম ও মুখে গোঁফ-দাড়ী গজাইতেছে তাহাদের মধ্যেও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এমন কি ইহার অস্বাভাবিক রসক্ষরণে নারীর লৈঙ্গিক পরিবর্তনও হইতে পারে।

আমাদের মধ্যে যে সমস্ত অনৈচ্ছিক পেশী আছে, সেগুলি যেমন সমবেদনপ্রবণ স্নায়ুর (sympathetic nervous system) নির্দেশে পরিচালিত হয়, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির রসক্ষরণেও তেমনই সেগুলি অনেকখানি পরিচালিত হয়।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে: (১) অ্যাড্রিনাল রস লিভারের মধ্যে

সঞ্চিত glycogenকে মুক্ত করিয়া তাহাকে রক্তের মধ্যে চালাইয়া দেয়, ফলে তাহাতে পেশীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ; (২) ইহা পাকস্থলীর পেশীর কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া সেই কাজের জন্য যে পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন হইত, সেই রক্ত-টুকুকে ঐচ্ছিক পেশীর কাজে পাঠায়, ফলে অধিকতর রক্তের যোগান পাইয়া ঐচ্ছিক পেশীগুলির কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায় ; (৩) রক্তকণিকাগুলিকে জমাট বাঁধিবার শক্তি দান করে, ফলে যুদ্ধবিগ্রহের সময়, আপদবিপদের সময়, হাত-পা কাটিয়া যাইলে রক্তপাতের সম্ভাবনা কমিয়া যায় ; (৪) হৃদয়ের স্পন্দন ও ফুসফুসের কার্য বাড়াইয়া দিয়া শক্তি, পরিশ্রম, ক্ষিপ্রতা ও দুঃসাহসিকতার কার্য করিবার সাহায্য করে ; (৫) অত্যন্ত পরিশ্রমের সময় শরীরের যে তাপ বৃদ্ধি হয়, তাহার সমতা রক্ষার জন্য ঘর্মগ্রন্থিগুলি খুলিয়া দেয়।

ফলে দেখা যাইতেছে, এই গ্রন্থিটি দুঃসাহসিক বীরকে তাহার বীরত্বের কাজেও যেমন সাহায্য করে, চরম কাপুরুষকেও তেমনিই পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেও সাহায্য করে। সেই অতীত যুগ হইতে নানা আপদ-বিপদের সহিত লড়াই করিয়া আমরা যে আজ পর্যন্ত জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া আছি, তাহাতে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির দান সামান্য নহে।

অধ্যাপক ক্যানন (Prof. Cannon) তাঁহার "Bodily changes in Pain, Fear and Rage" নামক নিবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতির সময় রক্তের মধ্যে Adrinalinএর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। Adrinalinএর একটি প্রধান কার্য হইতেছে পাকস্থলীর রক্তস্রোত বন্ধ করিয়া হজমের কার্যকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া সেই রক্তস্রোতের দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের শক্তি বাড়াইয়া তোলা। অধ্যাপক ক্যানন আরও দেখাইয়াছেন, একটি খরগোসের শরীরে অন্য একটি শান্ত অবস্থার প্রাণীদেহের রক্ত ইন্‌জেক্‌শান করিলে তাহার পাকস্থলীর কার্য স্থগিত হয় নাই, কিন্তু একটি ক্রুদ্ধ বা ভীত প্রাণীর রক্ত ইন্‌জেক্‌শান্ করিলে তাহার পাকস্থলীর কার্য বন্ধ হইয়া যায়। Adrinalinএর শক্তি এত তীব্র যে, কুড়ি কোটি ভাগ দ্রবণের মধ্যে এক ভাগ মাত্র Adrinalin থাকিলেও তাহার প্রতিক্রিয়া কার্য্যকরী হয়। অধ্যাপক ক্যানন একটি জীবন্ত বিড়ালের উপর দিয়াও X-Rayর সাহায্যে

অ্যাড্রিনালের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। X-Rayর আলোকে যাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইভাবে খাদ্যের সহিত বিশমাথ্ মিশাইয়া তিনি একটি বিড়ালকে খাওয়াইয়াছিলেন। দেখা গেল পাকস্থলীর পেশীগুলি তালে তালে সঙ্কুচিত প্রসারিত হইয়া খাদ্য হজম করিতেছে। হঠাৎ বিড়ালটির সমুখে একটি কুকুর আনিয়া তাহাকে ভীত বা ক্রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে Adrinalinএর রসক্ষরণের জন্য পাকস্থলীর পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণ বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কুকুরটিকে তাহার দৃষ্টিপথ হইতে সরাইয়া লওয়া হইল। তবুও সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর পেশীর কার্য আরম্ভ হইল না, প্রায় আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পরে আবার স্বাভাবিকভাবে পেশীর কার্য আরম্ভ হইল। ভয় বা ক্রোধ যে আমাদের হজমের ব্যাঘাত করে, আর আনন্দ, সুমধুর সঙ্গীত প্রভৃতি যে আমাদের হজম কার্যে সহায়তা করে, ইহা আমরা বহুদিন হইতেই জানিতাম। এই Adrinalinএর পরীক্ষাগুলি আমাদের সেই জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

যৌগিক ব্যায়ামের ভুজঙ্গাসন জাতীয় আসন প্রভৃতির দ্বারা এই গ্রন্থিটি সমৃদ্ধ হয়।

পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary Glands) ঃ মাথার খুলির নিম্নদেশে একটি ফাঁপা নলের মত জিনিসের উপর মটর শুঁটির মত ইহারা অবস্থিত আছে। ইহাদের anterior ও posterior—দুইটি অংশ আছে এবং প্রত্যেকটি অংশের কার্যও পৃথক। Anterior অংশটির কার্য নিয়মিত না হইলে আমাদের দেহের উত্তাপ কমিয়া যায়, পদক্ষেপে গতি ভঙ্গ ও শিথিল হয়, দেহ শীর্ণ হয় এবং পেটের পীড়া হয়। আবার ইহাদের কাজ বেশী হইলে যৌনগ্রন্থি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, দেহ দৈত্যের মত অতিকায়বিশিষ্ট হইয়া উঠে।

পিটুইটারি গ্রন্থির posterior অংশটির সহিত পাকস্থলীর পেশী, কিড্নী প্রভৃতির সম্পর্ক আছে; ইহার রসক্ষরণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে মানসিক শক্তি, চিন্তাশীলতা এবং যৌনশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, দেহে শর্করার ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শরীর স্থূল ও অপটু হয়। এই গ্রন্থির রস শরীরের মধ্যে ইন্জেক্শান করিলে শিরা, ধমনী, অন্নবহা নলী, মূত্রাশয় এবং জরায়ুর কার্য বৃদ্ধি পায়।

পিটুইটারি রস জরায়ুর উপর এতটা ক্রিয়াশীল যে, অনেক সময় তাড়াতাড়ি প্রসব করান প্রভৃতির জন্য পিটুইটারি ঘটিত ঔষধ ইন্‌জেক্‌শান করা হয়।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid glands) : ইহারা থাইরয়েড গ্রন্থির নিকটেই অবস্থিত। এই গ্রন্থি সংখ্যায় চারিটি এবং ওজনে সর্বশুদ্ধ দু' গ্রেণ। ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে, শরীরের মধ্যে ক্যালসিয়ামের (Calcium) মাত্রা ঠিক রাখা। শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কম হইলে শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়, হাত পা কাঁপিতে থাকে, রক্ত জমিয়া যাইবার শক্তি হ্রাস পায়। ইহার যথাযথ রসক্ষরণে পরিশ্রমজনিত কর্মবহা স্নায়ুর ক্ষয়-ক্ষতি নিবারিত হয়, দন্ত ও অস্থির পুষ্টির দিক দিয়াও ইহা সাহায্য করে।

থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland) : হৃৎপিণ্ডের উপর দিকের ঘাড়ের গোড়ার কাছাকাছি ইহা অবস্থিত। শরীরের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির সহিত ইহার সম্পর্ক আছে। যৌবনে পদার্পণ করিবামাত্র এই গ্রন্থি শুকাইয়া যায়। ইহার প্রধান কাজ হইতেছে শিশুকে যুবক করিয়া তোলা। এই গ্রন্থির যথাযথ রসক্ষরণ না হইলে বালকবালিকাদের মধ্যে অকালে যৌনক্ষুধার উন্মেষ হয়, নতুবা তাহা অস্বাভাবিক ভাবে বিলম্বিত হইতে থাকে। এই দুইটি জিনিসই শরীর মন তথা সমাজের দিক দিয়া ক্ষতিকর এবং ইহা অনেক অস্বাভাবিক যৌন অপরাধেরও কারণ হইতে পারে।

গ্রন্থিতত্ত্ব একটি অর্বাচীন বিজ্ঞান। ইহার সম্বন্ধে সব কিছু জ্ঞাতব্যের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে মনুষ্যের আচরণের উপর এই গ্রন্থিগুলির যে বিশেষ একটা প্রভাব আছে, তাহা এখন স্বীকৃত হইয়াছে। জানা গিয়াছে, এমন অনেক দুর্বোধ্য জড়বুদ্ধি শিশু এমন কি অনেক অপরাধী পর্যন্ত তাহাদের ব্যক্তিগত আচরণের জন্য ততটা দায়ী নহে, যতটা দায়ী হইতেছে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে স্থিত এই ছোট ছোট গ্রন্থিগুলি।

মনের শক্তি

আমরা যে কত প্রকার কার্য করিতে পারি তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। আমরা দেখি, শুনি, শিখি, স্মরণ করি, ভাবি, কল্পনা করি, ভালবাসি, ঘৃণা করি, পছন্দ করি, অপছন্দ করি, অনুভব করি, অভিভূত হই, ইচ্ছা করি, কামনা করি, অভিনিবেশ করি, অনুরাগ করি, বিরক্ত হই, ভীত হই, ক্রুদ্ধ হই, উৎফুল্ল হই, অনুতপ্ত হই, সমবেদনা প্রকাশ করি, প্রিয়চিকীর্ষা করি, অনুকরণ করি—ইত্যাদি শত শত কাজের সন্ধান পাওয়া যায়। মনোবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীকগণ আমরা কি কি করি, কেন করি, কি ভাবে করি, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কি কি করি, ইহার উত্তর খুব কঠিন নহে; কিন্তু কিভাবে করি এবং কেন করি তাহার উত্তরটি খুব সহজ নহে।

প্রথমতঃ কি কি কাজ করি তাহার একটা শ্রেণীবদ্ধ তালিকা তৈয়ারী হইল। Aristotle কতকগুলি ক্রিয়াত্মক বিশেষ্য শব্দের (verbal noun) দ্বারা আমরা কি কি করি তাহার একটা তালিকা তৈয়ারী করেন।

পরবর্তী যুগে Aristotleএর গ্রীক ভাষায় লেখা রচনাগুলি ল্যাটিন ভাষার অনূদিত হয়। তখন গ্রীক ক্রিয়াত্মক বিশেষ্যপদগুলিকে ল্যাটিন ভাষায় ভাষান্তরিত করিবার সময় ল্যাটিনের বাগ্বিধির সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য faculty (শক্তি) কথাটির আমদানী করিতে হইল। ফলে গ্রীক ভাষায় "স্মরণ" (remembering) শব্দটির অনুবাদকল্পে ল্যাটিন ভাষায় হয়তো, "স্মরণের শক্তি" (faculity of remembering) এই জাতীয় শব্দ তৈয়ারী করিতে হইল। কি কি কাজ করি এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয় "স্মরণ শক্তির কাজ" করি বা "মনন" শক্তির কাজ করি তাহা হইলে খুব ভুল বলা হয় না; তবে কেন করি বা কি ভাবে করি, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে যদি শক্তিবাদের ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে ঠিক উত্তরটি দেওয়া হয় না। যদি জিজ্ঞাসা করি "আমরা কি ভাবে স্মরণ করি?" না, স্মরণের শক্তি দিয়া স্মরণ

করি, ; "কি ভাবে কল্পনা করি ?" না, কল্পনার শক্তি দিয়া কল্পনা করি ; তাহা হইলে নূতন কথাও কিছুই বলা হয় না, প্রকৃত ব্যাখ্যাও কিছুই দেওয়া হয় না।

ইহা ছাড়া প্রত্যেক কাজের পিছনেই যে একটা অনন্য-সাহায্য-নিরপেক্ষ পৃথক পৃথক শক্তির প্রভাব আছে, একথাও সত্য নহে। এই জন্যই অনুষঙ্গ-বাদীগণ (associationist) বলেন যে, মানুষের মনের একটি মাত্র গুণের প্রভাবেই মানুষের অসংখ্য ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হয়। সেই গুণটি হইতেছে **অনুষঙ্গ** (association)।

'আমরা কি কি করি'—তাহার তালিকা দিয়া যে সমস্ত মনোবিদ্‌গণ 'মনকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সৃষ্টি করিলেন তথাকথিত "faculty psychology"র ; এবং কিভাবে কাজ করি ও কেন করি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাঁহারা মনকে বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহারা সৃষ্টি করিলেন "functional psychology"র।

Functional Psychologyর কথা এখন থাক। উপস্থিত facultyর কথাই আমাদের আলোচ্য। এই শক্তিবাদের বিশ্বাস হইতেছে, মন জিনিসটা স্মরণ চিন্তন মনন আগ্রহ অভিনিবেশ প্রভৃতি শক্তির পুঁটুলি মাত্র। কিন্তু একথা সত্য নহে। গণিত শাস্ত্রে দুই আর দুইএর যোগফল অনিবার্যভাবেই চার হয়, কিন্তু মনস্তত্ত্বে তাহা হয় না। মনস্তত্ত্বে মনের সমষ্টির উপাদানীভূত শক্তির সমষ্টির চেয়ে সমগ্র মনের গুরুত্ব অনেক বেশী। স্মরণ মনন চিন্তন প্রভৃতি শক্তি মনের আছে বটে, কিন্তু আসল মন জিনিসটা এই শক্তিগুলির নিছক সমষ্টির চেয়ে অনেক বড়। যে 'আমি'কে কেন্দ্র করিয়া এই শক্তিগুলি কার্য করিতেছে, অতীতের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করিয়া বর্তমানের প্রয়োজনে নিযুক্ত করিতেছে এবং প্রয়োজন বোধে স্মৃতি অভিনিবেশ প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজের কাজ গুছাইয়া লইতেছে, সেই "আমি"টির পরিচয় এই অনন্য-নিরপেক্ষ শক্তি-সমষ্টির মধ্যে নাই। এই জন্যই বর্তমানে faculty psychology প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু মুস্কিল হইতেছে, নিছক শক্তির (faculty) সমষ্টি দিয়াও যেমন সম্পূর্ণ মনটির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনই এই শক্তিগুলির আলোচনাকে

বাদ দিয়াও মনের পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হয় এ কথা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সত্য। কাজেই কর্তার প্রসঙ্গ দিয়াই যে কর্মের ব্যাখ্যা হইবে এ কথাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কর্মের আলোচনাকে বাদ দিয়া কর্তার পরিচয়ই বা পাওয়া যাইবে কি প্রকারে? ফলের দ্বারাই যেমন বৃক্ষের পরিচয় হয়, তেমনই কর্মের দ্বারাই পরিচয় হয় কর্তার। কাজেই কর্তার আচরণের পরিচয় যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, সেই মনস্তত্ত্বে বিভিন্ন কর্ম বা কর্মের শক্তিগুলির (faculties) আলোচনা অনিবার্য ভাবেই আসিয়া পড়ে। এই জন্যই faculty psychology বর্তমানে পরিত্যক্ত হইলেও, মনের বিভিন্ন faculty-গুলির আলোচনা মনোবিদ্যার একটা অঙ্গ হিসাবে গণ্য করিতেই হইবে। এইজন্যই স্পিয়ারম্যান (Spearman) বলিয়াছেন, মনস্তত্ত্বের মধ্যে শক্তিবাদ (faculty) বিতর্কের প্রত্যেক খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হইলেও সে-ই পরিণামে যুদ্ধ জয়ী হয় (The faculties have a way of losing every battle but always winning the war)। কথাটার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, মনের অর্থ বুঝিতে হইলে ব্যষ্টিগতভাবে মনোযোগ, স্মৃতি প্রভৃতির অর্থ না থাকিলেও, মনের পূর্ণ পরিচয় লাভ করিবার জন্য ইহাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে। কোন্ কেন্দ্রীয় শক্তি এই সমস্ত শক্তিগুলিকে পরিচালিত করে, কাহার প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য এই শক্তিগুলি নিয়োজিত হয়, তাহার পরিচয় প্রাচীন faculty psychologyর মধ্যে মিলে না বলিয়াই মনের একত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। স্টাউট্ (Stout) বলিয়াছেন, চৈতন্যই হইতেছে আমাদের বিভিন্ন লীলার মূল কারণ; ম্যাক্‌ডুগাল বলিয়াছেন, সহজাত প্রবৃত্তি (instincts)গুলি হইতেই আমাদের মনের বিভিন্ন শক্তিগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

যাহাই হউক, মনের পরিচয় পাইবার জন্য মনের একত্ব ও একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিতে হইলেও, একটি একটি করিয়া তাহার বিভিন্ন শক্তিগুলির আলোচনার ব্যবহারিক প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। আমরা এই অধ্যায়ে প্রচীন faculty psychologyতে আলোচিত শক্তিগুলির আলোচনা না করিয়া মনের অন্য কতকগুলি ব্যপকতর শক্তির আলোচনা করিব।

(১) সংরক্ষণ প্রয়াস (Mneme) ঃ

মনের শক্তির আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই আলোচনা করিতে হয়, মনের অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা। অধ্যাপক নান্ (Nunn) এই শক্তিটির নাম দিয়াছেন Mneme বা 'সংরক্ষণ-প্রয়াস'। এই শক্তির দ্বারা অতীতের অনুভূতির অভিজ্ঞাগুলি আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু অনুভব করি, তাহার একটা ছাপ মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। এমন কি আমাদের জন্মের সময়ও আমরা মনের যে বিশেষত্ব-গুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহার মধ্যেও অতীতের পিতৃপুরুষের অভিজ্ঞতার ছাপ কিছু কিছু থাকিয়া যায়। যাহাকে আমরা স্মৃতি বলি, তাহা হইতেছে মনের এই সংরক্ষণ-প্রয়াসের একটা আংশিক এবং সচেতন অভিব্যক্তি মাত্র।

কিন্তু মনের মধ্যে আমাদের যত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহার অতি অল্প অংশই স্মৃতির সাহায্যে মনের চেতন-রাজ্যে ভাসিয়া উঠে। পথ চলিতে চলিতে যখন একটি লোককে দেখিয়া চিনি-চিনি বলিয়া মনে হয়, তখন বুঝিতে হইবে এই "সংরক্ষণ প্রয়াসের" জন্যই তাহা হইতেছে। রস্ (Ross) বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে বুঝাইয়াছেন। ধরা যাইতে পারে, আজ আমি কয়েকটি ছত্র অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করিলাম। কিছুদিন পরে সেগুলি হয়ত ভুলিয়া গেলাম। তখন শব্দগুলিকে আবার মুখস্থ করিতে চেষ্টা করিলাম। এবারে দেখিলাম, মুখস্থ করার কাজটি প্রথমবারের চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র করা গেল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সচেতন স্মৃতির রাজ্য হইতে সরিয়া গেলেও, এই শব্দগুলির অভিজ্ঞতার ছাপ মনের কোনও না কোনও স্থানে সংরক্ষিত ছিল।

স্মৃতি বলিতে মনের যে সচেতন অবস্থার কথা আমরা বুঝি, তাহা হয়ত ইতরপ্রাণীদের মধ্যে নাই, কিন্তু অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ তাহাদের মধ্যেও আছে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে, একটি পোকাকে "Y" আকারের নলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই নলটির একটি বাহুতে বৈদ্যুতিক ধাক্কা লাগাইবার ব্যবস্থা করা আছে। দেখা যাইবে যে, পোকাটী কয়েকবার ভুল ভ্রান্তির পর যে পথটি নিরাপদ সেই পথটিই বাছিয়া লইয়া সেই পথটি দিয়াই

বারবার চলিতে চেষ্টা করে। অতীতের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত হইয়া এইভাবে তাহার বর্তমানের কর্ম-প্রেরণাকে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে।

জীবজন্তুদের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে সহজাত সংস্কার বলিয়া আমরা ব্যাখ্যা করি তাহাদের অনেকগুলিই হইতেছে এই সংরক্ষণ প্রয়াসের জাতিগত বা গোষ্ঠীগত রূপ। শুইবার পূর্বে কুকুর যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া চারিদিক দেখিয়া লয়, পাখীরা যে নিজেদের জাতিগত বিশেষ ভঙ্গীতে বাসা তৈয়ারী করে এবং প্রতি বৎসর একটি বিশিষ্ট স্থান হইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্রে পাড়ি দেয়—সমস্তই হইতেছে এই সংরক্ষণ-প্রয়াসের গোষ্ঠীগত অভিব্যক্তি।

(২) সংরক্ষণ ছাপ (Engram) :

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই সংরক্ষণ প্রয়াসের দ্বারা মনের মধ্যে যাহা থাকিয়া যায়, তাহার প্রকার কি? পণ্ডিতেরা বলেন, যাহা সংরক্ষিত হইয়া মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে, তাহা হইতেছে অভিজ্ঞতার ছাপটুকু মাত্র।

কি ভাবে তাহা সম্ভব হয়? আমরা জানি অভিজ্ঞতা থাকে এবং চলিয়া যায়, হয়ত সারা জীবনেই আর তাহার প্রত্যাগমন হয় না। কিন্তু ব্যাপারটি এইখানেই শেষ হয় না। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই মনের মধ্যে একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা ছাপ রাখিয়া যায়। এই ছাপগুলি cold storage-এ সংরক্ষিত বস্তুভারের মত অচেতন সামগ্রীমাত্র নহে। তাহারা ক্রিয়াশীল। সেইজন্য অতীত অভিজ্ঞতার ছাপগুলি আমাদের বর্তমানের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। দেহবাদী মনোবিদ্গণ হয়ত বলিবেন, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থকে (brain staff) পরিবর্তিত করে বলিয়াই এই ব্যাপারটা ঘটে। আবার কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা আমাদের মানসিক কাঠামো (mental structure) বা স্ব-ভাব (disposition)কে পরিবর্তিত করে বলিয়া এইরূপ ঘটে। সে কথা যাক্। উপস্থিত দেখা যাইতেছে যে, অভিজ্ঞতার খানিকটা ছাপ আমাদের মনের মধ্যে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। অভিজ্ঞতার যে ছাপটি আমাদের মনের মধ্যে সংরক্ষিত হইয়া থাকে স্যার পার্শি নান্ তাহার নাম দিয়াছেন engram বা সংরক্ষণ ছাপ।

(৩) জীবন প্রয়াস ঃ

মনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণই হইতেছে তাহার কর্মক্ষমতা। একটি বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ভাবে কাজ করা, বিশেষ একটি অবস্থার মধ্যে বিশেষ ভাবে চিন্তা ও সিদ্ধান্ত করা এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের কর্ম-প্রেরণাকে নিযুক্ত করা হইতেছে মনের বিশেষত্ব। মনের এই বিশেষত্বটিকে লেমার্ক, বাট্‌লার, বের্গসঁ, বার্ণাড 'শ, ফ্রয়েড্ প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পরিভাষায় অভিহিত করিয়াছেন। কেহ ইহার নাম দিয়াছেন বাঁচিবার ইচ্ছা (will to live), কেহ ইহাকে বলিয়াছেন প্রাণশক্তি (Elan vital), কেহ বলিয়াছেন প্রাণ-প্রেরণা (life urge), কেহ বলিয়াছেন কাম-শক্তি (libido) ইত্যাদি। এই সম্বন্ধে মনে হয় নান্ সাহেবের Horme বা "জীবন-প্রয়াস" নামটি খুব সার্থক হইয়াছে। মনুষ্য বা ইতর প্রাণীদের আত্মসচেতন ক্রিয়াকলাপই হউক, অথবা কীট-পতঙ্গ বা গবাদি প্রাণীর নির্জ্ঞান বা স্বতঃস্ফূর্ত খাদ্যান্বেষণ বা আত্মরক্ষাজনিত অঙ্গসঞ্চালনাদিই হউক—সমস্ত ক্রিয়াকলাপই জীবন-প্রয়াসের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র।

(৪) কর্মপ্রয়াস (Conation) :

যাহাকে আমরা কর্মপ্রয়াস (Conation) বলি, সেইগুলি অর্থাৎ চেষ্টা করা, সঙ্কল্প করা, ইচ্ছা করা, সিদ্ধান্ত করা ইত্যাদি সমস্তই হইতেছে এই "জীবন-প্রয়াসের" সচেতন অভিব্যক্তি। স্মৃতির সহিত সংরক্ষণ প্রয়াসের যে সম্পর্ক, কর্মপ্রয়াসের সহিত জীবন-প্রয়াসের সেইরূপ সম্পর্ক! প্রথমগুলির কার্য শুধু আত্মসচেতন ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর দ্বিতীয়গুলির কার্য আরও একটু ব্যাপক। কাঁচপোকা যে তাহার সন্তানাদির জন্য তাজা খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য গুটিপোকাকে প্রাণে না মারিয়া শুধু হুল ফুটাইয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া নিজের বাসায় টানিয়া লইয়া যায়, তাহাতে আমরা এই জীবন-প্রয়াসের একটা সচেতন অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চ প্রাণীদের মধ্যেও এই

জীবন-প্রয়াসের সচেতন অথবা স্বতঃস্ফূর্ত কাজ আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। উজ্জ্বল আলোকে চোখের পাতা বন্ধ করা, আঘাতের ভয়ে মাথা নীচু করা হইতে আরম্ভ করিয়া রোগের বিরুদ্ধে জীবনী-শক্তির সংগ্রাম, রক্ত চলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য প্রভৃতি সমস্তই হইতেছে সজ্ঞান কর্মপ্রয়াসের নিম্নস্তরে প্রবাহিত নির্জ্ঞান জীবন-প্রয়াসের কার্য।

(৫) সংযোগ প্রয়াস (Co-hesion) :

এই সংরক্ষণ প্রয়াস ও জীবন-প্রয়াস ব্যতীত মনের আর একটি সম্পদ আছে। ডঃ ড্রেভার (Dr. Drever) ইহার নাম দিয়াছেন "সংযোগ-প্রয়াস" (Co-hesion)। এক জাতীয় অভিজ্ঞতার ছাপগুলি মনের মধ্যে অনন্য-নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে না। তাহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া নূতন নূতন একক বা জোট সৃষ্টি করে। তাহার কারণ হইতেছে, সংরক্ষণ ছাপগুলি অতীত অভিজ্ঞতার মৃত খোলস্ মাত্র নহে—তাহারা অনেকটা জীবন্ত জিনিস এবং জীবন্ত জিনিসের মত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দল পাকাইবার মত ক্ষমতা তাহাদের আছে। ডঃ ড্রেভার এই ক্ষমতাটির নাম দিয়াছেন অন্তর্মানসিক প্রক্রিয়া (endopsychic Process)।

অনুষঙ্গবাদী পণ্ডিতেরাও এক হিসাবে এই সংযোগ প্রয়াসকে স্বীকার করিয়াছেন। ভাবগুলি (idea) যে আপনা-আপনিই একটির সহিত আর একটি জুড়িয়া যায়, এই তত্ত্বটি স্বীকার করিয়া তাঁহারা মনোবিজ্ঞানের একটি প্রয়োজনীয় সত্যকে স্বীকার করিয়াছেন।

তবে তাঁহাদের ভুল হইয়াছিল এই যে, তাঁহারা ভাবগুলিকে স্বাধীন সত্ত্বা হিসাবে মনে করিয়াছিলেন—এবং মনের একত্বের কথা স্বীকার করেন নাই। চৈতন্যকে বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া তাঁহারা ভাব (idea), প্রতিরূপ (images), সংবেদন (sensation) প্রভৃতি কতকগুলি জিনিসের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে, শুধু অনুষঙ্গের প্রভাবেই খানিকটা যান্ত্রিক ভাবেই এই সমস্ত ভাবগুলির একটি আর একটির সহিত আপনা আপনি জুড়িয়া যায়—এবং তাহার ফলেই আমাদের আচরণে বিচিত্র লীলার সৃষ্টি হয়।

(৬) ছাপ জট (Engrams Complex) :

প্রাচীন অনুষঙ্গবাদ বর্তমানে পরিত্যক্ত হইলেও, এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, অনুষঙ্গবাদীগণ অনুষঙ্গবাদের দ্বারা মনের একটি অতি প্রয়োজনীয় শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। মনের একটি অভিজ্ঞতা আর একটি অভিজ্ঞতার সহিত মিলিত হইয়া যে নূতন এককের সৃষ্টি করে ইহা খুবই সত্য কথা। হার্বার্ট (Herbart) এই শক্তিটির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার "apperception masses" মতবাদ এই শক্তিটিরই সমর্থন মাত্র। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে (১৮৮০) ব্রাউন (Thomas Brown) তাঁহার "mental chemistry" মতবাদের দ্বারা এবং পরবর্তী যুগে হ্বুন্ (Wundt: ১৮৯৪) তাঁহার "creative synthesis" মতবাদের দ্বারা এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, একটি ভাব অন্য একটি ভাবের সহিত মিলিত হইয়া এমন একটি এককের সৃষ্টি করে যাহা দুইটি ভাবের নিছক সমষ্টি মাত্র নহে, তাহা সম্পূর্ণ একটি নূতন জিনিস। আরও পরবর্তীকালে (১৯২২-২৭) গেস্টাল্ট্ (Gestalt) পন্থী মনোবিদ্‌গণ এই মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই প্যাটার্ণ, গঠন সুর প্রভৃতি সম্বন্ধে চমক্‌প্রদ তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন।

তাঁহারা দেখাইয়াছেন, একটি জিনিসের অঙ্গীভূত উপাদানগুলির সংস্থান ও গ্রন্থন পার্থক্য সমগ্র রূপটিকে বদ্‌লাইয়া দিয়া তাহাকে একটি নূতন জিনিসে পরিণত করে। সা রে গা মা প্রভৃতি বিভিন্ন সুরের উপাদান লইয়াই রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সুরগুলির সংস্থানের পার্থক্যের জন্যই একটি রাগিণীকে অন্য একটি রাগিণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া মনে হয়।

যাক্ এই "Gestalt quality" উপস্থিত আমাদের আলোচ্য নহে। তবে এটুকুই আমরা বলিতে চাই যে, একটি অনুভূতির ছাপ অন্য একটি অনুভূতির ছাপের সহিত মিলিত হইয়া যে নূতন একটি এককের সৃষ্টি করিতে পারে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিকগণ প্রায় একমত। যে শক্তির প্রভাবে এই ব্যাপারটা ঘটে তাঁহার নাম association-ই হউক, co-hesionই হউক, mental chemistryই হউক. অথবা creative synthesis-ই হউক, তাহা লইয়া আমরা বিতর্ক তুলিব না। তবে বিভিন্ন অনুভূতির ছাপ লইয়া নূতন যে একটা এককের সৃষ্টি হয়, সেই বৃহত্তর এককের জন্য একটা সংজ্ঞার প্রয়োজন আমাদের

আছে। আমরা এই নূতন জিনিসগুলির নাম দিব "ছাপ জট্" (eugr..ms complex) বা জট্ (complex) ; অবশ্য এ কথা এইখানে স্মরণীয় যে, জট্ বা complex বলিতে ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণ যাহা বুঝিয়া থাকেন, সে অর্থে আমরা জট্ কথাটি ব্যবহার করিতেছি না। ফ্রয়েডীয় জট্ হইতেছে "গূঢ়ৈষা" বা মনের নির্জ্ঞানের রাজ্যে অবদমিত গোপন কামনা। উপস্থিত আমরা "যে জটের" কথা বলিতেছি, ইহা হইতেছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ছাপগুলি সংহত হইয়া নূতন নূতন একক সৃষ্টির ব্যাপার। বর্তমানে বহু মনস্তাত্ত্বিকের মতেই ইহা হইতেছে মনের একটা প্রয়োজনীয় শক্তি।

প্রশ্ন হইতেছে, একটি ছাপ আর একটি ছাপের সহিত জড়াইয়া গিয়া যে নূতন নূতন "জট্"-এর সৃষ্টি করে তাহার নিয়ম কি? কোন্ জাতীয় অভিজ্ঞতার ছাপ পরস্পর মিলিত হয় এবং কি নিয়মেই বা তাহা সংঘটিত হয়?

অনুষঙ্গবাদীরা বলিবেন, এই মিলিত হইবার কারণটি হইতেছে সময়ের দিক দিয়া সন্নিকটতা। যে দুইটি অভিজ্ঞতা কাছাকাছি সংঘটিত হয় তাহাদের ছাপটি জড়াইয়া যায়। যখন একটি ঘটনা ঘটে তখন যদি আর একটি ঘটনাও ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টিও আমাদের মনের মধ্যে গাঁথিয়া যায়। সুতরাং সময়ের দিক দিয়া অভিজ্ঞতার নৈকট্যই মনের সংযোগ-প্রয়াসকে সাহায্য করে।

অধ্যাপক স্টাউট্ (Stout) কিন্তু এই নিছক নৈকট্যবাদকে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, সংযোগ-প্রয়াসের মূল কথা হইতেছে অনুভূতির নৈকট্য নহে, তাহা হইতেছে "আগ্রহের নৈকট্য" অথবা "আগ্রহের রেশ" (not contiguity but continuity of interest)। যে ঘটনাগুলি, জাতকের জীবনের প্রয়োজনেই হউক অথবা আনন্দ প্রভৃতির জন্যই হউক, তাহার মনের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে, সেই ঘটনাগুলিই পরস্পর গাঁথিয়া যায়,—নিছক নৈকট্য সে সম্বন্ধে যথেষ্ট নয়।

রস্ (Ross) একটি চমৎকার উদাহরণের দ্বারা এই ব্যাপারটিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাড়ীর ঠিকা ঝি ঝাঁটা লইয়া ঘরদোর পরিষ্কার

করিতেছে, বাড়ীর পুষি বিড়ালটি তাহার সহিত একটু আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল। ঝাঁটাটিকে হয়ত সে খেলার বস্তু মনে করিয়া গোঁফ ফুলাইয়া লেজ তুলিয়া তাহাকে থাবা মারিতে গেল। ঝি বিড়ালের মনস্তত্ত্ব অত শত বুঝিল না এবং তাহার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য বিড়ালটির পিঠে বেশ দুই এক ঘা ঝাঁটা বসাইয়া দিল। এই ঘটনাটির পর হইতেই 'ঝাঁটা হস্তেন সংস্থিতা' গৃহভৃত্যাটি পুষির নিকটে একটি দৈত্য-দানবীর মত ভয়ের বস্তু হইয়া উঠিল এবং ইহার পর হইতে যখনই তাহার আবির্ভাব হইবে পুষি তখনই লুকাইয়া পড়িবে। শুধু তাহাই নহে, সেই ঝি-এর কণ্ঠস্বর, ঝাঁটার শব্দ, প্রহারের যন্ত্রণা, ভয়-ক্রোধ—এই সবগুলি একসঙ্গে জড়াইয়া গিয়া বিড়ালটির মনে একটি ছাপজটের সৃষ্টি করিবে।

একটি অভিজ্ঞতা যে আর একটি অভিজ্ঞতার সহিত জট্ পাকাইয়া একটি সংহত এককেরও সৃষ্টি করে, তাহার প্রমাণ আমরা আর একটি ঘটনা হইতে পাইয়া থাকি। অনেকেই জানেন, একটানা কাজ করার চেয়ে উপযুক্ত বিশ্রামের অবসর দিয়া কাজ করিয়া অধিকতর দক্ষতা অর্জন করা যায়। এই জাতীয় ব্যাপারের জন্যই ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, "আমরা গ্রীষ্মকালে স্কেট্ খেলিতে এবং শীতকালে সাঁতার কাটিতে শিখি।" কিন্তু এটা কি প্রকারে সম্ভব হয়? গ্রীষ্মকালে ত স্কেট্ খেলিবার মত বরফ থাকে না এবং শীতকালে বরফ-ঢাকা নদীতে সাঁতার কাটাও সম্ভবপর নয়। তাহা হইলে এই প্রবাদের অর্থ কি? ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, কাজের ব্যস্ততার সময় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ছাপগুলি ঠিক জট্ বাঁধিতে পারে না, কিন্তু অবসরের সময় একটি অভিজ্ঞতা অন্য একটি অভিজ্ঞতার সহিত জুড়িয়া গিয়া শিক্ষা ও দক্ষতাকে পূর্ণতর করিয়া তুলে। এইজন্যই আমরা ঘুমের পর অনেক সময় আমাদের জটিল সমস্যা প্রভৃতির সমাধান খুঁজিয়া পাই। নিদ্রান্তে শরীর মন তাজা হইয়া উঠে বলিয়াই যে এটা সম্ভব হয় তাহা নহে। ইহার প্রকৃত কারণ হইতেছে এই যে, নিদ্রিত অবস্থার নিরিবিলি সময়টিতে আমাদের অজ্ঞাতসারে মনের কার্য চলিতে থাকে এবং আমাদের মন এই অবসরে আমাদের অভিজ্ঞতার ছাপগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া একটির সহিত একটিকে

গাঁথিয়া গাঁথিয়া এমনভাবে জড়াইয়া রাখে যে, পরে কাজটি করিবার সময় আমরা অধিকতর দক্ষতার সহিত উহা করিতে সমর্থ হই।

মন যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই এইভাবে কাজ করিয়া যায়, তাহার পরিচয় আমরা আরও অন্যভাবে পাই। ধরুন, আমি একটি নাম স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তখন সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিলাম এবং অন্য কাজে মন দিলাম। এমন সময় দেখিলাম নামটি হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? আমি যখন স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম তখন আমার মনের বিভিন্ন ছাপজটের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং মনে করিবার চেষ্টাটি যখন সাময়িক ভাবে বাহ্যতঃ ত্যাগ করিয়াছিলাম তখনও সেই ছাপজটের তরঙ্গগুলি এটা ওটাকে আঘাত করিতে-করিতে প্রয়োজনীয় সত্যটিকে সন্ধান করিয়া তাহাকে যেই চৈতন্য রাজ্যের সীমানার মধ্যে আনিয়া হাজির করিয়া ফেলিল, অমনি নামটি আমার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল।

পড়াশুনার ব্যাপারে মনঃশক্তির অপচয় নিবারণের দিক দিয়া এই তত্ত্বটি খুবই প্রয়োজনীয়। ভাল ছাত্রদের এই সত্যটি মনে রাখা উচিত। হয়ত প্রবন্ধ লিখিতে হইবে—আমি কি করিব? হঠাৎ কালি কলম লইয়া রচনায় ঝাঁপাইয়া পড়িব? না, তাহাতে কাজ ভাল হইবে না। আমাকে প্রবন্ধের বিষয়টি লইয়া চিন্তা করিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতে হইবে, ইতোমধ্যে মনের ছাপজট্গুলি ভালভাবে সংহত হইতে থাকিবে এবং প্রবন্ধের তথ্যগুলি সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত হইতে থাকিবে; শুষ্ক তালিকা সুন্দর মালিকাতে পরিণত হইতে থাকিবে। কিন্তু ইহা হঠাৎ হইতে পারে না। প্রবন্ধটির জন্য পড়াশুনা করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে, মনকে নিজের অজ্ঞাতে কাজ করিবার জন্য বিশ্রাম ও অবসর দিতে হইবে। তাহার পর একটি নিদ্রান্তে হয়ত দেখিব প্রবন্ধের চিন্তাগুলি অদ্ভূতভাবে সংহত হইয়াছে; যুক্তিতে, সামঞ্জস্যে, সৌন্দর্যে তাহা বিস্ময়করভাবে লেখনী দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

যাহারা ভাল বক্তৃতা করিতে চাহেন, তাঁহারাও এই সত্যটিকে কাজে লাগাইতে পারেন। বক্তৃতার সব কথা হয়ত নোট করিবার প্রয়োজন হয় না,

কিন্তু তাহা লইয়া যদি মাঝে মাঝে চিন্তা করিবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং চিন্তার পর মনকে বিশ্রাম দিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে বক্তৃতাটী ভাল হইবে বলিয়াই আশা করা যাইতে পারে।

(৭) অন্তঃপূর্তি (Consolidation) :

বিশ্রাম এইভাবে অতীত অভিজ্ঞতার ছাপগুলি লইয়া একটা "অন্তপূর্তি"র (consolidation) ব্যবস্থা করে, তাহা জীবনের নানা ক্ষেত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথম যখন আমরা কোনও ক্রীড়া-কৌশলের কাজ করি, তখন প্রায়ই ভুলভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া থাকি, কিন্তু এই ভুল প্রচেষ্টাগুলি ক্রমশঃই অভ্যাসের মধ্য দিয়া কমিয়া যাইতে থাকে। কার্যে দক্ষতালাভের আগ্রহের জন্যই ক্রমশঃ ভ্রান্ত প্রচেষ্টাগুলি বাদ যাইতে থাকে এবং প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার ছাপগুলি অন্তঃপূর্তির প্রভাবে সুবিন্যস্ত হইয়া দক্ষতাটি অর্জিত হইতে থাকে। এই জন্যই কোনও কার্যে একবার কৃতকার্য হইলে সেই কৃতকার্যতা ভাবী কাজের কৃতকার্যতাকে সাহায্য করে।

আমাদের সজ্ঞান মনের অজ্ঞাতসারেই অন্তঃপূর্তির সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার ছাপগুলি একত্র হইয়া গ্রথিত হইতে থাকে—এই তত্ত্বটী শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়া নানাভাবে প্রয়োজনীয়। এই তত্ত্বটী আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সিদ্ধির জন্য কাজের প্রয়োজন যতটা আছে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রামের প্রয়োজনও ঠিক ততটাই আছে। এই তত্ত্বটী আরও এক দিক দিয়া প্রয়োজনীয়। আমাদের সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে যখন আমরা দেখি, আমাদের উন্নতি যেন খানিকটা থমকাইয়া বা থামিয়া গিয়াছে, তখন আমাদের হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার কারণ নাই। যেহেতু আপাতঃ দৃষ্টিতে যখন উন্নতি বন্ধ হইয়া আসে তখন মনের অগোচরে হয়ত ধীরে ধীরে অন্তঃপূর্তির কার্য চলিতেছে, শেষে হয়ত একদিন দীর্ঘ অপেক্ষার পর আমরা দেখিব, আমাদের তপস্যা বিপুল সিদ্ধিতে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

(Sensation and Perception) :

সংবেদন—

দুনিয়ার দৃশ্য গন্ধ গানে যাহা ঘটিতেছে, তাহার সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হয় চক্ষু, নাসা, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ঐ সমস্ত সংবাদগুলির সবগুলিকেই অভ্যর্থনা করিয়া লয় না ; তাহারা দৃশ্য গন্ধ গানের মধ্যে মাত্র কয়েকটিকেই বাছিয়া নেয় এবং অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে সেগুলিকে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্ক তখন তাহার পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই সংবাদগুলির ব্যাখ্যা করে এবং সেই অনুসারে প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য বহির্মুখী স্নায়ু দ্বারা কর্ম-নির্দেশ পাঠায়। ফলে আমরা নানা প্রকার প্রতিক্রিয়া করি।

দুনিয়ার খবর যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আসিয়া পৌঁছায়, তখন তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বাতিল করিয়া কতকগুলিকে গ্রহণ করা—এই ব্যাপারটার নাম হইতেছে **সংবেদন** (Sensation) বা প্রাথমিক বোধ। তাহার পর মস্তিষ্কের সাহায্যে এই সংবেদনের যে ব্যাখ্যাটা ঠিক করা হয়, তাহার নাম হইতেছে **প্রত্যক্ষণ** (Perception)।

আমরা জানি জগতের সহিত কারবার করিবার জন্য আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে প্রতিনিয়তই নানা প্রকার উপযোজন (adjustment) করিতে হয়। এই উপযোজনের প্রধান যন্ত্র হইতেছে স্নায়ুতন্ত্র। এই স্নায়ুতন্ত্রের বাহিরের দিকের প্রান্তে আছে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা প্রভৃতি—এক একটি গ্রাহক যন্ত্র। এই গ্রাহক যন্ত্রগুলির দ্বারাই আমরা শব্দতরঙ্গ, বর্ণতরঙ্গ প্রভৃতিকে গ্রহণ করি। কতকগুলি জিনিসকে গ্রহণ করিবার জন্য অন্যতর কতকগুলি জিনিসকে বাদ দিতেই হয়। ইহার পর স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে আর এক জাতীয় কাজের আরম্ভ হয়। গ্রাহক যন্ত্র দ্বারা গৃহীত শব্দ-তরঙ্গ, আলোক-তরঙ্গ প্রভৃতি শক্তিগুলি (physical and chemical energy) স্নায়ু শক্তিতে (nervous energy) পরিণত হয়। ইহাই হইতেছে সংবেদনের কাজ। ইহার ফলে বহির্জগতের আবেদনগুলি মনোজগতে

উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হইবার সুযোগ পায়। বহির্জগতের আবেদন ইন্দ্রিয় যন্ত্রদ্বারা গৃহীত হইবার পর মনোজগতের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইলে সংবেদনটি আর নিছক "সংবেদন" থাকে না, তাহা হইয়া পড়ে "প্রত্যক্ষণ" (perception)। "সংবেদন" হইতেছে সমস্ত জ্ঞানের মূল কারণ, তবে খাঁটি নির্জলা সংবেদন জিনিসটা হইতেছে একটা কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র। কারণ অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে যে অনুভূতির বিচার-ব্যাখ্যা হইবে না, তাৎপর্য বোধ হইবে না,—তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ কাজ নহে।

সংবেদনের সংজ্ঞা ঃ

বিভিন্ন মনোবিদ্ সংবেদনের বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা দিয়াছেন। জেমস্ (James) বলিয়াছেন, "মস্তিষ্কে উপস্থিত হইবার পূর্বে এবং প্রারব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইবার পূর্বে, বহির্বিশ্বের আবেদনগুলি স্নায়ুতন্ত্রের উপর যে প্রতিক্রিয়া করে, তাহার অনুভূতিই হইতেছে সংবেদন" (the immediate results upon consciousness of nerve-currents as they enter the brain and before they have awakened any suggestions or association with past experience)।

সালি (Sully) বলিয়াছেন, "অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্তের উপস্থাপিত উত্তেজকগুলির প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কে বাহিত হইবার সময় যে সহজ সরল মানস ক্রিয়াটি ঘটিয়া থাকে, তাহাই হইতেছে সংবেদন" (A sensation is a simple psychical phenomenon resulting from the stimulation of the penphral extremity of an afferent nerve, when this is propagated to the brain" : A Text book of Psychology)।

স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) বলিয়াছেন, "গ্রাহক যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে মস্তিষ্কের দিকে চলমান স্নায়ু স্রোতের সরল অনুভূতিটুকুই হইতেছে সংবেদন" ("A Sensation is···the simple consciousness aroused by the transmission of nervous energy from a receptor

or sense-organ to some part of the celebral cortex" : Physical and mental life cf school chiidren)।

জেমস্ ড্রেভার (James Drever) বলিয়াছেন, "বহিরিন্দ্রিয়ের উত্তেজনা জনিত প্রতিক্রিয়ার আদিমতম ও অবিশ্লেষণীয় অনুভূতিই হইতেছে সংবেদন" ("the ultimate and irreducible aspect or element of sense-perception dependent upon the stimulus affecting a sense receptor" : A Dictionary of psychology)।

সংবেদনের বিভিন্ন পর্ব :

ড্রেভার-এর এই সংজ্ঞার কয়েকটি পর্ব লক্ষনীয় :

প্রথমতঃ, সংবেদনের মধ্যে বহিরিন্দ্রিয়ের উপর বহির্জগতের আবেদনজনিত একটা উত্তেজনা আগে চাই, কারণ সংবেদন হইতেছে "dependent upon the stimulus affecting a sense receptor". আমরা জানি জগতের দৃশ্য গন্ধ গান প্রভৃতির আবেদনজনিত উদ্দীপকটি না থাকিলেও, কখন কখন অনুভূতি ঘটে। ইংরাজীতে সেই জাতীয় অনুভূতিকে hallucination বলে। বাংলায় এই hallucination শব্দটির পরিভাষা করা হইয়াছে "মায়া" বা "অমূল প্রত্যক্ষ"। এই মায়াজনিত বিভ্রম ও সংবেদন এক জিনিস নহে। বহির্জগতের আবেদন ব্যতিরেকেই অমূল প্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে। অনাগত আত্মীয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রতীক্ষমান তন্ময় অবস্থায় সেই আত্মীয়ের পদধ্বনি বা কণ্ঠস্বর হয়ত শুনিতে পাওয়া যায়, দিন দুপুরে হয়ত মনে হইতে পারে সে যেন পাশ দিয়া চলিয়া যাইল, কাহার যেন নিশ্বাস বায়ু গায়ে লাগিল। এগুলির পশ্চাতে কোনও বাস্তব উদ্দীপক নাই, স্নায়ুতন্ত্রের উপর বাস্তব প্রতিক্রিয়া নাই, অথচ অনুভূতি আছে, এগুলি সংবেদন নহে।

দ্বিতীয়তঃ, সংবেদন হইতেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার "আদিমতম"(ultimate) অনুভূতি। আদিমতম না হইলে তাহা আর সংবেদন থাকে না। একেবারে প্রথমবারে যাহা দেখিলাম বা যাহা শুনিলাম, দ্বিতীয়বার তাহা যখন ঘটে, তখন পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে সেই জিনিসটার একটা তাৎপর্যবোধ হয়,

একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; ফলে তখনই সেই জিনিসটার অনুভূতিটুকু সংবেদনের রাজ্য ছাড়িয়া প্রত্যক্ষণের (perception) ব্যাপার হইয়া পড়ে।

তৃতীয়তঃ, সংবেদন হইতেছে "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার অবিশ্লেষণীয় বা সরলতম (irreducible) অনুভূতি।" অবিশ্লেষণীয় শব্দটির ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে ইহাকে আর সরলতর কোনও অনুভূতিতে বিশ্লেষিত করা যায় না।

কাজেই দেখা যাইতেছে, সংবেদন হইতেছে প্রকৃত প্রস্তাবে একটা কাল্পনিক মানস ক্রিয়া। বাস্তব জীবনে তাহার উদাহরণ একান্তই দুর্লভ। যে অনুভূতির ব্যাখ্যা হয় না, যাহার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় না, অতীত ঘটনার সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়া যাহার শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি করা যায় না, সংবেদন সেই অদ্বিতীয় অননুভূত ব্যপারটির মনোবিদ্যার একটা পরিভাষা মাত্র।

সংবেদনের সীমাবদ্ধতা :

একটি বাড়ীর দরজা দিয়া সব জিনিসই প্রবেশ করিতে পারে না। যে দরজা দিয়া সাধারণ মানুষ প্রবেশ করিতে পারে তাহার মধ্য দিয়া বিরাটকায় হস্তী বা গণ্ডার প্রবেশ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলিও সেইরূপ, বরং আরও একটু বেশী। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটা মাপ আছে। সেই মাপের চেয়ে বড় জিনিসকেও সে গ্রহণ করিতে পারে না, ছোট জিনিসকেও সে গ্রহণ করিতে পারে না। এই কথাটার অর্থ হইতেছে এই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনটা খুব সীমাবদ্ধ জিনিস। তাই বহির্জগতের সব কিছু আমাদের অনুভূতির যন্ত্রে ধরা পড়ে না। জগতে লক্ষ লক্ষ রংএর খেলা চলিতেছে, আমরা কিন্তু আমাদের চক্ষুর সাহায্যে সাতটি প্রধান রং এবং ১৫০টি মিশ্র রং বুঝিতে পারি। কাণ দিয়াও আমরা সব রকমের শব্দ শুনিতে পাই না। এক সেকেণ্ডে ১৬ (ষোল) বার কম্পন হইলে যে শব্দের সৃষ্টি হয়, সেই শব্দটি হইতে সেকেণ্ডে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) কম্পনবিশিষ্ট শব্দগুলি আমরা শুনিতে পাই! সেকেণ্ডে ১৬ বারের কম কম্পন হইলে আমাদের কর্ণপটাহে কোনও প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় না, আবার ৪০,০০০ এর বেশী কম্পন হইলে কর্ণপটাহ ছিঁড়িয়া ফাঁসিয়া যায়। খুব ছোট জিনিসকে আমরা চোখ দিয়া দেখিতে পাই না; আবার খুব বড় জিনিসকেও

চোখ দিয়া সমগ্রভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি না। শীত গ্রীষ্মের পার্থক্যটিও আমরা একটি নির্দিষ্ট মাপের পর আর অনুভব করিতে পারি না। আমাদের গন্ধ, স্পর্শের অনুভূতিও সীমাবদ্ধ। সেই সীমার উপরে ও নীচের দিকে যে অসংখ্য প্রকার ভেদ থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাহা হইলেও গন্ধ অনুভব করিবার জন্য আমাদের যে শক্তি আছে, তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। আশী লক্ষ ভাগ বাতাসে এক ভাগ মাত্র মৃগরেণু থাকিলে তাহার গন্ধ আমরা বুঝিতে পারি, চল্লিশ লক্ষ ভাগ বাতাসে একভাগ কর্পূরের গন্ধকেও আমরা অনুভব করিতে পারি।

মানুষের তুলনায় সাধারণ কীট পতঙ্গ ও জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে এই অনুভূতির শক্তির তারতম্য আছে। বহু উঁচু আকাশ হইতে শকুনি মরা জন্তু দেখিতে পায়, বর্ষার নদীর ঘোলা জলের মধ্যেই ইলিস প্রভৃতি মৎস বেশ দেখিতে পায়। মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। একটা আম বা কাঁঠাল কাটিলে সঙ্গে সঙ্গে শত শত মাছির আবির্ভাব হয়, বাড়ীতে যজ্ঞি হইলে পাড়ার কুকুর বাড়ীর দরজায় আসিয়া অপেক্ষা করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের মত ঘ্রাণ শক্তি মানুষের নাই। মানুষের শ্রবণ শক্তিও অনেক জীব জন্তুর চেয়ে কম। আস্বাদের শক্তি মানুষের মধ্যে খুব তীব্র বটে, কিন্তু তাহা হইলেও বন্য জন্তুরা যেভাবে আস্বাদের দ্বারাই খাদ্যাখাদ্য বুঝিতে পারে এবং বিষাক্ত জিনিস পরিহার করিতে পারে, মানুষ তাহা পারে না। মানুষের অনুভূতির শক্তি অনেক জন্তু জানোয়ারের তুলনাতেই কম। তাহা হইলেও মানুষ বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের জোরে তাহার দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ করিয়াছে। মাইক্রশস্কোপ ও টেলিস্কোপ দ্বারা সে চোখের সাধারণ শক্তির চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী দর্শন শক্তি আয়ত্বকরিয়াছে; শব্দ স্পর্শ শীত তাপ প্রভৃতিকেও সে বিজ্ঞানের যন্ত্রাদির প্রভাবে অনেক বেশী মাত্রায় বুঝিতে পারে। দূর আকাশের বিমানের অস্তিত্ব সে "রাডার" দিয়া বুঝিতে পারে, সাগরজলে ডোবা পাহাড় পর্বতকে বাঁচাইয়া সে "সাব্‌মেরিণ" চালাইতে পারে, সূক্ষ্মতম জীবাণুর চেয়ে ছোট "ভাইরাসে"র বিরুদ্ধে সে অভিযান চালাইতে পারে, ইথারের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গকেও রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে ধরিতে

ও শব্দপ্রেরণের কাজে লাগাইতে পারে। শীতাতপ বা বায়ুচাপের সামান্য পরিবর্তনকেও সে "থার্মোমিটার" "ব্যারোমিটার" প্রভৃতির দ্বারা এমন নিখুঁতভাবে ধরিতে পারে যে, অন্য কোনও প্রাণীর পক্ষেই তাহা সম্ভব হয় না।

সংবেদনের ধর্ম—(Attributes of sensations) :

সংবেদনের নানা জাতীয় বৈশিষ্ট আছে। সেই জন্য একই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনগুলির মধ্যে গুণগত, মাত্রাগত বিস্তারগত নানা প্রকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সংবেদনটা এবং আর একটা সংবেদন এক জিনিস নহে ; দুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে। সংবেদনের কি কি ধর্ম্ম বা কি কি বৈশিষ্ট্যের জন্য এই পার্থক্যগুলির ধরা যায় ? সংবেদনের ধর্ম্ম : (১) গুণ (quality); (২) পরিমাণ (quantity), (৩) ব্যাপ্তি (Extensity), (৪) কালগত ব্যাপ্তি বা স্থায়িত্ব (Potency or duration), (৫) স্পষ্টতা (clearness), (৬) স্থানগত পার্থক্য (local sign) এবং (৭) অনুভূতিগত পার্থক্য (feeling tone)।

(১) যে শক্তি দ্বারা চক্ষুর সাহায্যে বুঝিতে পারি, এটা লাল রং কিংবা হল্‌দে, সবুজ কি নীল, কর্ণের সাহায্যে বুঝিতে পারি এ স্বরটা ইমন্ কি ভূপালি, দেশ কি খাম্বাজ, জিহ্বা দ্বারা বুঝিতে পারি এই জিনিসটি টক্ কি নোন্‌তা, ঝাল কি মিষ্ট ইত্যাদি,—সেই শক্তিটা হইতেছে সংবেদনের গুণগত ধর্ম্ম।

(২) রংএর মধ্যে যেমন লাল নীল সবুজ হলদে প্রভৃতি শ্রেণীগত পার্থক্য আছে, তেমনি ফিকা ও গাঢ়, আব্‌ছা বা উজ্জ্বল এই জাতীয় পার্থক্যও আছে। স্বাদের মধ্যে আছে পান্‌সে ও গাঢ় মিষ্টত্বের পার্থক্য, স্বল্প ও ঘোর তিক্ততার পার্থক্য ইত্যাদি। এই জাতীয় পার্থক্যকে বলা হয় মাত্রা বা পরিমাণগত পার্থক্য।

(৩) এক বর্গ ইঞ্চি লাল কাগজের টুকরা আমাদের মনের মধ্যে যে অনুভূতি জাগায়, এক বর্গগজ লাল কাগজের টুকরা ঠিক সেই প্রকার

অনুভূতি জাগায় না ; একটা খেলার তাজমহল যে অনুভূতি জাগায়, সত্যি-কারের তাজমহল সে অনুভূতি জাগায় না। অনুভূতির যে ধর্মের জন্য এই জাতীয় পার্থক্যগুলি বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে বলা হয় ব্যাপ্তি।

(৪) অনুভূতির স্থায়িত্বের দিক দিয়াও একটা পার্থক্য আছে। এই স্থায়িত্বটা হয়ত সব সময় ঘড়ির কাঁটা দিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কারণ অনুভূতির রেশ-টা থাকিয়া যায় মনের গভীরে। অনুভূতির স্থায়িত্বের পার্থক্যটা যে ধর্মের জন্য বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে বলা হয় কালগত ব্যাপ্তি।

(৫) স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার বিচারেও সংবেদনের প্রকারভেদ আছে। টিক্‌নার (Titchener) দেখাইয়াছেন, যদি আমরা সমস্ত মন দিয়া একাগ্র ভাবে কতকগুলি স্বর শুনিয়া যাই, তাহা হইলে ঐ স্বরগুলি সম্বন্ধে আমাদের মনে যে স্পষ্ট সংবেদন জাগিবে, আমাদের অন্যমনস্ক অবস্থায় সেই স্বরগুলিই ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট ভাবে জাগিবে না। হয়ত তখন আমরা অন্য কোনও একটা কাজে ব্যস্ত আছি আর পাশের ঘরের ল্যারোরেটারিতে কেহ তখন স্বরগুলি লইয়া পরীক্ষা করিতেছে। এই অবস্থায় কানের ভিতর দিয়া স্বরগুলি আমাদের দেহযন্ত্রে প্রবেশ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে সংবেদনটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হইতেছে না।

(৬) স্থানগত পার্থক্যের জন্যও সংবেদনের পার্থক্য হয়। যদি শরীরের বিভিন্ন অংশে একই সময়ে একই মাত্রার দুইটি উত্তেজক প্রয়োগ করি (হয়ত ছুঁচ ফুটাইতে চেষ্টা করিলাম, কিংবা পালক দিয়া শুড়শুড়ি দিলাম, কিংবা চন্দনের ফোঁটা ছিটাইয়া দিলাম) তাহা হইলে আমরা ঠিক বুঝিতে পারি যে ব্যাপারটা দেহের দু' জায়গায় ঘটিতেছে। ঐ ছুঁচ দুইটি যদি খুব কাছা কাছি লইয়া আসা হয়, তাহা হইলে হয়ত আমরা ঠিক বলিতে পারিব না যে, ছুঁচ দুইটি পরস্পর হইতে কতটা দূরে থাকিয়া খোঁচা দিতেছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও একটা ছুঁচের খোঁচা ও দুইটি ছুঁচের খোঁচার পার্থক্যটা বুঝিতে পারিব।

(৭) সংবেদনের আরও একটা দিক আছে। তাহা হইতেছে সংবেদন

সম্বন্ধে ভাল-লাগা মন্দ-লাগা জাতীয় একটা অনুভূতির দিক। কালোর চেয়ে গাঢ়তর কালো আকাশ আমাদের মনে নিছক মাত্রাগত সংবেদনই জাগায় না, হয়ত একটা ভয়েরও সৃষ্টি করে ; তেমনি উজ্জলের চেয়ে উজ্জলতর আলো দেখিলে শুধু পরিমাণগত পার্থক্যটাই বুঝি না,—চোখ্ ঝলসান আলোর কষ্টটাও অনুভব করি ; চায়ের টেবিলে বসিয়া চা-পানের সময় চায়ে চিনিটি কম বলিয়া মনে হইল, তখন কাপে এক চামচ চিনি দেওয়া হইল, ইহাতে শুধু মিষ্টতার মাত্রাগত পার্থক্যটাই অনুভূত হইল না, উপরি পাওনা হিসাবে পাওয়া যাইল খানিকটা আরাম, একটু তৃপ্তি।

ইন্দ্রিয় যন্ত্রের জাড্য (Inertia) ও সংবেদনের সীমা :

একটা শব্দ এত অল্প হইতে পারে যে, সেটা আমরা শুনিতে পাই না, একটা আলো এত অস্পষ্ট হইতে পারে যে, সেটা বুঝিতে পারি না, একটু রস এত সামান্য হইতে পারে যে সেটা আমরা আস্বাদ করিতে পারি না। রূপ রস গন্ধ শব্দ প্রভৃতির উত্তেজনা একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্য্যন্ত না পৌঁছাইলে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে বুঝিতে পারিনা। কেন এইরূপ হয়? ইহার কারণ হইতেছে, ইন্দ্রিয়ের জাড্য (inertia)। একটা নির্দিষ্ট মাপের উত্তেজনা না হইলে সেই জাড্য কাটে না, ইন্দ্রিয় যন্ত্র কোনও প্রকার প্রতিক্রিয়া করে না।

জগতের সব জিনিসের মধ্যেই এক প্রকার জাড্য (inertia) আছে। এই জাড্যের জন্যই সে তাহার অবস্থার পরিবর্তনে বাধা দেয়—সেটা "চালু" অবস্থা হইতে "স্থিতু" অবস্থাতে পরিবর্তন হউক, অথবা "স্থিতু" অবস্থা হইতে "চালু অবস্থাতে পরিবর্তনই হউক। পথের ধারে শ্যাওলা-ধরা যে পাথরের টুকরাটুকু পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যেও এই জাড্য কাজ করিতেছে ; সেও পরিবর্তনে বাধা দেয় ; সামান্য বাতাস বহিলেই সে সরিয়া যায় না, বাতাসের উদ্দীপকটা যতক্ষণ না একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় হয়, ততক্ষণ সে প্রতিক্রিয়া করেনা, অর্থাৎ তাহাকে নাড়ান যায় না। একটা ভারী গাড়ীকে চালু করিতে হইলেও গাড়ীটি জাড্যের জন্য প্রথমটা তাহাতে বাধাই দেয়। পরে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার ধাক্কা পাইলে তবে সে চলিতে আরম্ভ করে।

টিক্‌নার বলিয়াছেন, আমাদের ইন্দ্রিয় যন্ত্রের মধ্যেও এই জাতীয় একটা জাড্য আছে, যাহার ফলে প্রত্যেক উত্তেজকেই সে একটা friction-গত বাধা দেয়। তাহার পর উত্তেজকটি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় শক্তিশালী হইলে ইন্দ্রিয় যন্ত্রটি চালু হয়। এই চালু হইবার পর ইন্দ্রিয় যন্ত্রটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির পরিচয় দিতে পারে এবং তাহার বেশী পারেনা। ফলে অত্যল্প মাত্রার উত্তেজকে যেমন তাহার সাড়া জাগে না, তেমনি অত্যধিক মাত্রার উত্তেজকে সে অসাড় হইয়া যায়। ব্যাপারটা যেন বিদ্যুৎ পরিচালিত যন্ত্রাদির মত। তাহাকে চালু করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট পরিমান বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়, আবার অত্যধিক মাত্রার শক্তি প্রযুক্ত হইলে যন্ত্রটি "ফিউজ" হইয়া বিকল ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

যে নিম্নতম আবেদনে ইন্দ্রিয় যন্ত্রের জাড্য কাটে, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সংবেদন জনিত অনুভূতি জাগে, তাহা হইতেছে "সংবেদনের নীম্ন সীমা" (threshhold ; আবার যে উচ্চতম আবেদনের পর আর আমাদের সংবেদনের সামর্থ থাকে না, তাহাকে বলা হয সংবেদনের "উচ্চতম সীমা" (acme or height of sensibility)

উচ্চতম সীমা এবং নিম্নতম সীমা—এই উভয় সীমা রেখার মধ্যেই সমস্ত সংবেদনের কারবার চলে। আমাদের ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলি জগতের কোটি কোটি মাত্রার আবেদনের মধ্যে হইতে উপরের দিকে এবং নীচের দিকের অনেকখানি অংশ বাদ দিয়াই খানিকটা মাত্র অংশকে চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি দ্বারা গ্রহণ করে এবং মনের রাজ্যে তাহাদের সহিত পরিচয় ঘটায়।

সংবেদনের এই যে নিম্নতম ও উচ্চতম সীমা, ইহারই মধ্যে উত্তেজকের তীব্রতা অনুসারে সংবেদনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহার পর আর সংবেদনজনিত কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটে না। এখন প্রশ্ন জাগে, উত্তেজকের তীব্রতার সহিত সংবেদনের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধির কোনও একটা বাঁধা ধরা নিয়ম আছে কি?—আছে। "ওয়েবার-ফেক্‌নারের" সূত্র দ্বারা (weber-Fechner Law) সেই নিয়মটির ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

ওয়েবার ফেক্‌নারের সূত্র—(weber Fechner Law) :

আমার হাতে যদি একটা এক ছটাক ওজনের বাটখারা থাকে এবং আমার চোখ বাঁধা অবস্থায় যদি ঐ ছটাকটির উপর একটি আধ-কাঁচ্চা ওজন চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেটা আমরা বুঝিতে পারি। অথচ আমার মাথায় যদি একমন বস্তা চাপান থাকে, এবং তাহা হইতে এক পোয়া জিনিস সরাইয়া দেওয়া হয়, অথবা নূতন করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই ওজনের পার্থক্যটা আমরা বুঝিতে পারি না। তেমনই একটা পাঁচ ওয়াট আলোর বদলে যদি হঠাৎ দশ ওয়াট্ আলো জ্বালান হয়, তাহা হইলে আলোর তীব্রতার পার্থক্যটা আমরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারি। কিন্তু হাজার ওয়াট আলোর পাশে আরও একটা দশ ওয়াট বাতি বসাইয়া দিলে আমরা উজ্জ্বলতার পার্থক্যটা বুঝিতে পারি না। এক পোয়া দুধে আধ পোয়া জল মিশাইলে আমরা দুধের পান্‌সে স্বাদটা বুঝিতে পারি, কিন্তু একমন দুধে এক সের জল মিশাইলে হয়ত স্বাদের তারতম্য বুঝিতে পারিব না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সংবেদনের মাত্রাগত পার্থক্য বুঝিবার জন্য একটা "নির্দিষ্ট মাপ" নাই, আছে একটা "আনুপাতিক মাপ"। অনুভূত জিনিসটির বিপুলতার অনুপাতে সেই মাপটি বদলাইয়া যায়।

আমাকে ২০ ইঞ্চি লম্বা একটি জিনিস দেখাইয়া যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, "বলত এটা কত লম্বা?" তাহা হইলে আমি হয়ত বলিব, "এটা ১৮ ইঞ্চি লম্বা", কিংবা হয়ত বলিব "এটা ২২ ইঞ্চি লম্বা।" এক্ষেত্রে আমার ভুলের মাত্রাটা হইবে দুই-এক ইঞ্চির মধ্যে। কিন্তু একটা ১০০ গজ খেলার মাঠের দৈর্ঘ সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে আমার ভুলের মাত্রাটা দুই এক ইঞ্চির মাপে হইবে না, হয়ত আট দশ গজের মাপে তাহা হইবে। তাই যখন ঐ মাঠটির দৈর্ঘ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন হয়ত আমি বলিব "মাঠটি প্রায় ৯০ গজ" কিংবা হয়ত বলিব "মাঠটি হইতেছে প্রায় ১১০ গজ।"

কাজেই দেখা যাইতেছে, অনুভূতির মাত্রাগত পরিবর্ত্তন বুঝিবার জন্য একটা নির্দিষ্ট মাপ নাই, আছে একটা অনুপাত; অর্থাৎ যে পরিমাণ জিনিস

অনুভব করা হইতেছে, তাহারই একটা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশের পরিবর্তন হইলেই তবে বোধজনিত তারতম্য ঘটিবে, নতুবা নহে।

এই ব্যাপারটি লইয়া "ওয়েবার" (Weber) প্রথম গবেষণা করেন। তিনি দেখিলেন, ৩০ আউন্স ওজনের সহিত ২৯ আউন্সের ওজনের পার্থক্যটি বেশ বুঝিতে পারা যায়, অর্থাৎ ৩০ আউন্স হইতে ১ আউন্স ওজন কম হইলে অথবা ৩০ আউন্সের $\frac{১}{৩০}$ ভাগ ওজন কম হইলে সে পার্থক্যটি বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ ৩০ আউন্স ওজন হইতে ১ ড্রাম ওজন কম হইলে সেটা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু ৩০ ড্রাম ওজন হইতে এক ড্রান তুলিয়া লইলে অর্থাৎ তাহার $\frac{১}{৩০}$ ভাগ কমিয়া যাইলে পার্থক্যটা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ওজনের পার্থক্যটা পেশীর টান দিয়া বুঝিতে হইলে ড্রাম বা আউন্সটা বিচার্য নয়, বিচার্য হইতেছে মোট ওজনের $\frac{১}{৩০}$ ভগ্নাংশ বা অনুপাতটা।

এই অনুপাতের ভগ্নাংশটা বিভিন্ন অনুভূতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার। Wundt-এর মতে তাহা হইতেছে :

আলোকের অনুভূতির ক্ষেত্রে	... ...	$\frac{১}{১০০}$
পেশীর অনুভূতির ক্ষেত্রে	... ...	$\frac{১}{১৭}$
চাপের অনুভূতির ক্ষেত্রে	... ...	$\frac{১}{৩}$
উত্তাপের অনুভূতির ক্ষেত্রে	... ...	$\frac{১}{৩}$
শব্দের অনুভূতিরর ক্ষেত্রে	... ...	$\frac{১}{৩}$ ইত্যাদি

ওয়েবারের (Weber) সিদ্ধান্ত লইয়া ফেক্‌নারও (Fechner) গবেষণা চালাইলেন। তিনি দেখিলেন, বোধের মাত্রাটাকে অনুভূতিগ্রাহ্য ভাবে বৃদ্ধি করিতে হইলে উত্তেজকটাকে একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাত দিয়া গুণ করিতে হইবে ; অর্থাৎ বোধ জিনিসটার "যোগোত্তর প্রগতির" (Arithmetical progression) জন্য তাহার উত্তেজকটিকে "গুণোত্তর প্রগতির" (geometrical progression) মাপে বাড়াইতে হইবে। ("To make sensation increase in arithmetical progression, the stimulus must increase in geometrical progression or in

a neater phrase, sensation is proportional in strength to the logarithem of the stimulus"—sandiford)।

ওয়েবারের সূত্রটিকে নানাভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। কোনও জিনিসের দৈর্ঘ, বিস্তার, ওজন প্রকৃতি আন্দাজ করিবার সময় আমাদের সম্ভাব্য ভুলের প্রসঙ্গে এই সূত্রটি হইতেছে: "আমাদের সম্ভাব্য ভুলটি হইতেছে আমাদের পরিমেয় বস্তুর সঙ্গে সমানুপাতিক" ("The variable error of an estimate is strictly proportional to quantity estimated."—Woodworth & marquis P. 419)।

কোনও জিনিসের মাত্রাগত পার্থক্য অনুভব করিবার প্রসঙ্গে এই সূত্রটি হইতেছে, "অনুভাব্য পার্থক্যটি নির্ভর করে সমগ্র অনুভাব্য জিনিসটির একটি অপরিবর্তনীয় (Constant) ভগ্নাংশের উপর, একটা নির্দিষ্ট (absolute) মাপের উপর নহে।"

এই কথাটিকেই স্টাউট্ (Stout) বলিয়াছেন: "...the fundamental fact which underlies weber's Law is that equal degreegs of unlikeness in sensation do not correspond to equal incrcase or drcrease in the absolute intensity of stimulus."

সালি (Sully) বলিয়াছেন: "...when the threshhold is passed any increase of the stimulus does not cause a corresponding increase in the intensity of the sensation."

হফ্‌ডিং (Hoffding) বোধহয় এই কথাটিকে আরও ভালভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "...the increase in sensation resulting from an increase in the strength of the stimulus depends not on the absolute increase, but on the relation of the increase to the preceding stimulus".

এই সূত্রের ফলে উত্তেজকের মাত্রার সহিত অনুভাব্য সংবেদনের মাত্রার একটা সম্পর্ক বুঝিতে পারা যায়। Titchner দেখাইয়াছেন, আদি উত্তেজকটি যদি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে উত্তেজকের মাত্রার সামান্য পরিবর্তনেই

সংবেদনের তীব্রতার পরিবর্তন বুঝিতে পারা যাইবে। উত্তেজকটি যতই তীব্রতর হইতে থাকিবে, ততই বেশী মাত্রার পরিবর্তনে সংবেদনের পরিবর্তন হইবে। ধরা যাউক ১০ মাত্রার উদ্দীপকে আমাদের এক প্রকার সংবেদন হয়, তখন ১১ মাত্রার উদ্দীপকে সংবেদনের তারতম্য হইবে, আবার যখন ২০ মাত্রার উদ্দীপকে একটা নির্দিষ্ট সংবেদন হয়, তখন ২২ মাত্রা হইলে তবে আমরা পার্থক্যটা বুঝিতে পারিব, যখন ৩০ মাত্রার উদ্দীপকে আমরা অভ্যস্ত আছি, তখন ৩৩ মাত্রা হইলে তবে সংবেদনের পার্থক্যটা বোধগম্য হইবে ইত্যাদি। ফলে এদিকে যখন 1, 2, 3, 4 করিয়া সংবেদনের তীব্রতা যোগোত্তর প্রগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন উদ্দীপকের দিকে R, R $(1+r)$, R $(1+r)^2$, R $(1+r)^3$ এই ভাবে গুণোত্তর প্রগতিতে তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে (এখানে R = প্রথম উদ্দীপক, r = R-এর একটা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ)।

এই কথাটিকেই পূর্বে সূত্রাকারে বলা হইয়াছে "to increase the intensity of sensation in arithmetical progression, the stimulus must be increased in geometrical progression."

ওয়েবারের সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ :

সংবেদনের ক্ষেত্রে ওয়েবারের সূত্রটি যে খুবই সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিস্তব্ধ ঘরে একটি আলপিন পড়িলে সেই শব্দটি শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হট্টগোলের সময় একটা পটকার শব্দও হয়ত শুনিতে পাওয়া যায় না। এক বস্তা আলু হইতে দশটা আলু তুলিয়া লইলে সেটা বুঝিতে পারা যায় না। অথচ দশটা আলু হইতে একটা তুলিয়া লইলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

Woodworth দেখাইয়াছেন, কোনও জিনিসের মাত্রাগত পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য ওয়েবারের নিয়মটি কখন কখন আমাদের সাহায্যই করে। দূর হইতে দুই জন লোক আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে একজনকে অপরের চেয়ে একটু বেশী বড় দেখাইতেছে। এখন ওয়েবারের নিয়ম অনুসারে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব, যে লোকটিকে সামান্য বড় দেখাইতেছে,

সে প্রকৃত প্রস্তাবে আরও অনেক বেশী দীর্ঘকায়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ওয়েবারের নিয়মটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের মাত্রাগত পার্থক্য বুঝিতে সহায়তাই করে, বাধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু ইহার বিপরীত দিকও আছে! সেখানে দেখা যায়, ওয়েবারের নিয়মটি আমাদের ইন্দ্রিয় যন্ত্রের ক্ষমতাকে বাধা দেয়। আমরা জানি দিনের বেলাতেও আকাশে "লক্ষ তারার দেয়ালি" জ্বলে, কিন্তু সেটা আমরা দেখিতে পাই না কেন? তাহার কারণ ওয়েবারের সূত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। সূর্যের তীব্র আলোকের অনুপাতে তারার আলো এত কম যে, ওটা আর চোখে ধরা পড়ে না।

ওয়েবারের সূত্রের সত্যতা ঃ

ওয়েবার-ফেক্‌নয়ের সূত্রটা সংবেদনের ব্যবহারিক দিক দিয়া সত্য হইলেও, তাহা সর্বতোভাবে সত্য নহে। ইহার মধ্যে যে একটা গণিতের অনুপাত আছে, তাহা হইতে সব ক্ষেত্রেই নিভু্‌র্ল হিসাব পাওয়া যায় না। আমরা জানি প্রত্যক্ষ সংবেদনের একটা বাঁধাধরা মাপ (Scale) আছে। এই Scaleএর মাঝামাঝি পর্দায় যে সমস্ত অনুভূতি আছে, সেই সব ক্ষেত্রে ওয়েবারের সূত্রটি প্রায় নিভু্‌র্লভাবে কাজ করে। তবে এই Scaleএর উচ্চতম এবং বিশেষভাবে নিম্নতম সীমারেখার দিকে ওয়েবারের সূত্রটি নিখুঁতভাবে খাটে না। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের মাত্রার অনুপাতের যে ভগ্নাংশটি ওয়েবারের সূত্রের মূল কথা, সেই ভগ্নাংশটি অপরিবর্তনশীল (Constant) নহে। সংবেদনের নিম্নতম সীমার দিকে (threshhold) ঐ ভগ্নাংশটি অনেক বাড়িয়া যায়। ওজনের সংবেদনের ক্ষেত্রে স্কেলের মাঝের স্থানটিতেও ঐ ভগ্নাংশটি অপরিবর্তনশীল থাকে না। এই হিসাবে ওয়েবারের মুল সূত্রটির চেয়ে ক্যাট্‌ল-এর (Cattle) সংশোধনী সূত্রটা (modification) আরও ভাল বলিয়া মনে হয়। Cattle বলিয়াছেন, সংবেদনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থক্যটা উদ্দীপকের বর্গমূল অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় "the just perceptible difference increase according to the squre-root of the stimulus.)।

প্রত্যক্ষণ ঃ

নির্জলা সংবেদনটা যে কি জিনিস, তাহা আমরা জানি না। শিশু যে মুহূর্তে দুনিয়ার অভিজ্ঞতা পাইয়াছিল সেই অভিজ্ঞতাই হয়ত সংবেদনের স্বরূপ। কিন্তু পরের মুহূর্তের সংবেদনগুলি আর নির্জলা সংবেদন রহিল না, কারণ তখন তাহার মধ্যে পরিচয় ও অভিজ্ঞতার রং ধরিয়া গিয়াছে ; তখন সেটি "প্রত্যক্ষণের" (percrption) পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সংবেদন ব্যতীত প্রত্যক্ষণের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু নিছক সংবেদনের জোড়াতালি দিয়াই প্রত্যক্ষণ তৈয়ারি হয় না। সংবেদনের ব্যঞ্জনা-বোধটাই হইতেছে প্রত্যক্ষণ। সংবেদনের মধ্যে জড় প্রকৃতির কাজ যতটা আছে, মানস প্রকৃতির কাজ ততটা নাই। সেই জন্যই জেমস্ সাহেব বলিয়াছেন, "সংবেদন শুধু বস্তুজগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়, আর প্রত্যক্ষণ (percrption) সেই বস্তুজগতের সম্বন্ধে জ্ঞানের ·অধিকার স্থাপন করে" ("Sensations gives us more acquaintance with objects, whereas perception gives us k*n*owledge about them")। বাতসে বহিয়া শব্দতরঙ্গ কর্ণের পটহে আঘাত করিল, কিংবা গন্ধরেণু নাসিকার দ্বারে উপস্থিত:হইল, তাহার পর কর্ণ বা নাসিকা হইতে স্নায়ুর পথ বহিয়া :একটা শারীর·মানসিক তরঙ্গ মস্তিষ্কের দিকে ছুটিল। এই ব্যাপারটা হইল সংবেদন। কিন্তু মস্তিষ্কের বিচার দিয়া যখন বুঝিতে পারিলাম যে, এই কাজটা হইতেছে অর্গানের সুর, বা এই গন্ধটা হইতেছে চাঁপা ফুলের গন্ধ, তখন সেটা হইবে প্রত্যক্ষণ (Percertion)।

সংবেদনের ক্ষেত্রটা হইতেছে শারীরিক ও মানসিক কাজের সীমারেখায় অবস্থিত। রাসেল্ (Russel) বলিয়াছেন, 'সংবেদনের ক্ষেত্রটা হইতেছে নিছক স্নায়ুর লীলা। কিন্তু প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রটা আরও ব্যাপক। তাহার মধ্যে অনেকগুলি মানসিক ব্যাপারও আছে'। যথা—

প্রথমতঃ আছে আয়ত্তীকরণের (assimilation) কাজ। ইহার দ্বারা আমরা আমাদের অনুভূত জিনিসটিকে একটা বিশেষ শ্রেণীগত পদার্থ হিসাবে বুঝিতে পারি। এই বুঝিতে পারার জন্য প্রয়োজন হইতেছে "বিনিশ্চয়ের"

(discrimination) কাজ, অর্থাৎ অন্য জিনিস হইতে এই জিনিসটার পার্থক্য বুঝিতে পারার কাজ। এই বিনিশ্চয় ও আয়ত্তীকরণের জন্য আবার প্রয়োজন হয় স্মৃতি এবং "প্রত্যভিজ্ঞার" (recognition)। ধরা যাইতে পারে, বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া যখন আমি লিখিতেছি তখন রাস্তা দিয়া একটা ভারী গাড়ী যাইবার শব্দ পাইলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম "একটি ট্রাক্টার চলিতেছে"। আমার এই প্রত্যক্ষণটি (perception) কিভাবে সম্ভব হইল? প্রথমতঃ আমি তাহার শব্দটি শুনিয়াছি, পরে বিনিশ্চয় করিয়া দেখিয়াছি এই শব্দটি গোরুর গাড়ীর শব্দ নহে, ঘোড়ার গাড়ীর নহে, ট্যাক্সির শব্দ নহে ইত্যাদি। তাহার পর এই শব্দটিকে আমি "আয়ত্ত" করিয়াছি একটা ভারী গাড়ীর শব্দ হিসাবে। এইবার স্মৃতির প্রত্যভিজ্ঞার (recognition) সাহায্যে বুঝিয়াছি ট্রাক্টারের ঐ জাতীয় শব্দ আগে শুনিয়াছি। তখন অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমানের অভিজ্ঞতা মিলাইয়া সিদ্ধান্ত করিলাম ঐটি হইতেছে ট্রাক্টারে শব্দ, অন্য শব্দ নহে। এই perception এর ব্যাপারটির জন্য ইন্দ্রিয় দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে শুধু শব্দ তরঙ্গ। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে এই উপস্থাপিত জিনিসের সূত্র ধরিয়া আমি যে অনুপস্থাপিত জিনিসের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলাম, জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অতীতের জিনিসকে বর্তমানের সঙ্গে গাঁট ছড়া বাঁধিয়া দিলাম, ইহা হইল perceptionএর বিশেষত্ব। এই জন্য সালি (Sully) প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা দিয়াছেন "a process of physical elaboration involving both presentative and representative elements."

মানুষের দেহ-যন্ত্রটার মধ্যে যেমন একটা সংবেদনের দিক আছে, তেমনই একটা চেষ্টার দিকও আছে, ইহা একটি "সংবেদ চেষ্টীয় (Sensory-motor) যন্ত্র। এই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া দিয়াই ইহার পরিচয়। সংবেদনের অর্থ-ব্যঞ্জনাটা প্রত্যক্ষণের (perception) দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাখ্যাত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নিছক সংবেদনটা কোনও প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে না। পথে যাইতে যাইতে আমি একটা সর্প দেখিলাম। কিন্তু নিছক সংবেদনের জন্য আমি ভয় পাইয়া সরিয়া দাঁড়াইব না। নিছক সংবেদনের অর্থ হইবে চোখ দিয়া অর্থাৎ চোখের ক্যামেরা দিয়া সর্পের প্রতিরূপটা গ্রহণ করা, তাহার পর একটা

শারীর-রাসায়ণিক পরিবর্ত্তন এবং চোখের স্নায়ুর মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার অনুভব করা, এই মাত্র। ইহার মধ্যে ভয়ের কিছুই নাই। কিন্তু যখন সর্পের সংবেদনটা প্রত্যক্ষণে পরিণত হইল, অর্থাৎ যখন ঐ দীর্ঘ কৃষ্ণ কুটিল ভয়ঙ্কর জীবটার অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে, তখনই আমাকে লাফ দিয়া পথের অপর প্রান্তে সরিয়া দাঁড়াইতে বা ছুটিয়া পালাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই জন্যই Angell বলিয়াছেন, "Perception represents the immediate organised reaction of the individual upon his environment." সংবেদনের মধ্যে শুধু বস্তুজগৎ মানস-জগতের সঙ্গে মিলিত হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষণের মধ্যে অতীত মিলিত হয় বর্তমানের সঙ্গে, বস্তুসত্তা মিলিত হয় ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে, ফলে সৃষ্ট হয় একটা নূতন পদার্থ। প্রত্যক্ষীভূত পদার্থটা শুধু অনুপরমাণুর কম্পনমাত্রই নহে, শুধ্ আলো, শুধু শব্দই নহে, তাহা একটা জ্ঞানের জিনিস, একটা অনুভূতির জিনিস, তাহার একটা পরিচয় আছে, বাণী আছে, কর্ম্ম-নির্দেশ আছে। নিছক সংবেদনের সেগুলি নাই।

প্রত্যক্ষণের সর্ত (Factors influencing perecption) :

(ক) মনোযোগ (attention) : সংবেদ্য বস্তুর আবেদন ইন্দ্রিয় দ্বারে উপস্থাপিত হইলেই তাহার প্রত্যক্ষণ হয় না। সংবেদনের অর্থ-ব্যঞ্জনা যতক্ষণ না ধরা পড়িতেছে, তাহার সঙ্কেতটা যতক্ষণ না বুঝিতে পারা যাইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানসরাজ্যে তাহার স্থান হয় না, অর্থাৎ তাহার প্রত্যক্ষণ হয় না। শুধু সেই জিনিসটিই আমরা প্রত্যক্ষ (perception) করি যাহার সম্বন্ধে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এই মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেই সংবেদন-প্রাপ্ত জিনিসটি চৈতন্যের আলোকে স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন আমরা জিনিসটিকে প্রত্যক্ষ করি। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, perception-এর একটা বড় সর্ত হইতেছে মনোযোগ। এই মনোযোগটুকু না থাকিলে জগতের দৃশ্য গন্ধ গানের আবেদন বৃথাই আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আসিয়া করাঘাত করে এবং আমাদের সাড়া না পাইয়া অবাঞ্ছিত অতিথির মত ফিরিয়া যায়।

(খ) প্রত্যাশা (expectation) : সংবেদনের সময় যে অব্যক্ত আবেদন আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই আবেদনটা

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয়। যাহার অভিজ্ঞতা যতটা সমৃদ্ধ, তাহার প্রত্যক্ষণটা ততই ব্যঞ্জনাময় হয়।

এই জন্যই Woodworth বলিয়াছেন, "We see things not as they are but as we are." আমাদের যেমন শিক্ষা দীক্ষা, আমদের যেমন আশা প্রত্যাশা, সেইভাবেই ব্যাখ্যাত হয় আমাদের সংবেদন, সেইভাবেই রূপায়িত হইয়া থাকে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত জিনিস। বস্তুতঃ এই প্রত্যাশা (expectation) প্রত্যক্ষণের (perception) একটা বড় সর্ত। আমরা কি দেখিব বা কি শুনিব তাহা অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করে আমরা কি প্রত্যাশা করিতেছি তাহার উপর। আরোহী ট্রেনের কামরার মধ্যে বসিয়া প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যাশা করিতেছে কখন ট্রেনটি ছাড়িবে। হঠাৎ তাহার মনে হইল ট্রেনটি চলিতেছে। কিন্তু একটু পরেই বুঝিল তাহাদের ট্রেনটি ছাড়ে নাই, ছাড়িয়াছে পাশের ট্রেনটা। প্রত্যক্ষণের ভুল হইল কেন? অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে সে জানিত যে, চলতি গাড়ী হইতে দৃশ্য বস্তুগুলিকে চলমান বলিয়া মনে হয়। তাই পাশের চলমান ট্রেনটি দেখিয়া প্রত্যাশার ফলেই নিজেদের ট্রেনটিকেই সে চলমান বলিয়া মনে করিল। ঈপ্সিত অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া উৎকর্ণ হইয়া আছি। এমন সময় গাছ হইতে পাতাটি খসিয়া পড়িল। ঐ পাতা পড়ার শব্দ শুনিয়াই মনে করিলাম ঐ বুঝি সে আসিল।

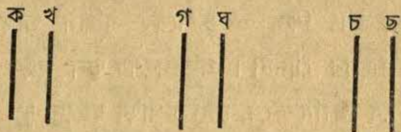
(গ) **কামনা (Desire):** আমাদের কামনা বা ইচ্ছাটাও আমাদের প্রত্যক্ষণকে প্রভাবান্বিত করে। রথের মেলায় অসংখ্য জিনিস বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে, কিন্তু বাড়ীর বর্ষীয়সী গিন্নীটির নজরে পড়িল (অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষণ করিলেন) একটি মাছকোটা বঁটির দিকে। ইহার কারণ কি? প্রয়োজন জনিত কামনা তাহাকে এই প্রত্যক্ষণে সাহায্য করিল।

প্রত্যক্ষণের সর্ত হিসাবে গেস্টাল্ট মতবাদ:

আমরা শুধু চক্ষু দিয়াই দেখি না, মস্তিষ্ক দিয়াও দেখি। রেটিনায় যে ছবিটি পড়ে, মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রে শুধু তাহার প্রতিচ্ছবিটাই প্রতিবিম্বিত হয় না, মস্তিষ্ক

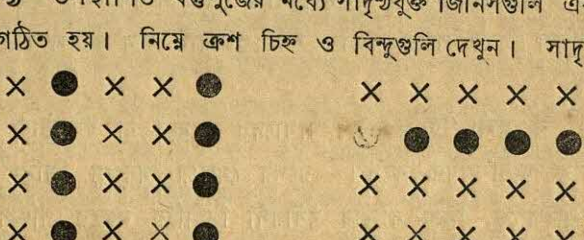
তাহার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যাখ্যাও করিয়া দেয়। এই ব্যাখ্যার জন্যই ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যে জিনিসটি সংবেদন হিসাবে উপস্থাপিত হয় সেটা পরে প্রত্যক্ষণ (perception) হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়। গেস্টাল্ট-মনোবিদ্‌গণ বলেন, মস্তিষ্ক শুধু স্নায়ুর সংবেদনটা রেকর্ডই করে না, ইন্দ্রিয়-দ্বারে উপস্থাপিত বস্তুপুঞ্জের "সংগঠন"ও (organise) করে। এই সংগঠনের জন্যই নানারূপ দর্শন বৈচিত্র ঘটিয়া থাকে। গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্‌দের মতে এই সংগঠনের কয়েকটি সর্ত আছে, যথা (১) নৈকট্য (proximity), (২) সাদৃশ্য (similarity), (৩) অবিচ্ছিন্নতা (continuity), (৪) পূর্ণতা (completeness), এবং (৫) সৌষম্য (symmetry)।

নৈকট্য—নীচের রেখাগুলির দিকে দেখুন ; কখ, গঘ, চছ এই রেখাগুলি



নিছক নৈকট্যের জন্যই এক একটি দলভুক্ত হইয়া আছে। কোনও লোকই এই রেখাগুলির দল ভাঙ্গিয়া কগ খঘ বা চছ প্রভৃতি ভাগে দলভুক্ত করিবে না।

সাদৃশ্য—উপস্থাপিত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে সাদৃশ্যযুক্ত জিনিসগুলি এক একটি দলে সংগঠিত হয়। নিম্নে ক্রশ চিহ্ন ও বিন্দুগুলি দেখুন। সাদৃশ্য বশতঃ



ক্রশগুলি একটি দলে এবং বিন্দুগুলি অন্য দল হিসাবে গণ্য হইবে।

অবিচ্ছিন্নতা—আকাশের নক্ষত্র পুঞ্জের নাম করণের কারণই হইতেছে এই অবিচ্ছিন্নতা। কালপুরুষ, নক্ষত্রের কোমর বন্ধনী, তরবারি প্রভৃতির কল্পনা এই অবিচ্ছিন্নতার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।

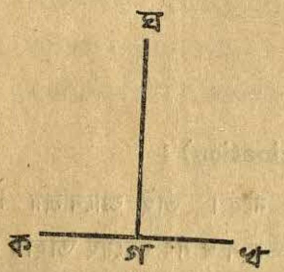
পূর্ণতা ও সৌষম্য—দৃশ্য-বস্তুপুঞ্জের গহনতার মধ্য হইতে সেই জিনিসটাই বিশেষভাবে প্রতিভাত হইয়া উঠে, যাহার মধ্যে একটা পূর্ণ ছবি বা "প্যাটার্ণ" ফুটিয়া উঠে। আকাশে ভাঙ্গাচোরা মেঘের চেয়ে সুগঠিত চাঁদের ছবিটি শিশুর নজরে পড়ে। মেঘের উজ্জ্বলতা চাঁদের সমান হইলেও এই ব্যাপারটিই ঘটিয়া থাকে চাঁদের পূর্ণতা ও সৌষম্যের জন্য ('সংগঠন'-এর অন্যান্য প্রয়োজনায় সর্ত পরবর্তী "শিক্ষার তত্ত্বকথা" প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে)।

অধ্যাস (Illusion) ও মায়া (hallucination) :

আমাদের কোনও ইন্দ্রির-যন্ত্রই অভ্রান্ত নহে। তাই জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়া আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, বস্তু জগতের সঙ্গে সব সময়েই তাহার মিল থাকে না। তাই আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, অন্ধকার ঘরে গায়ের কোট জামাটা টাঙ্গান থাকিলে আমরা তাহাকে মানুষ বলিয়া মনে করি, জঙ্গলের ধারে ছোট ঝোপ দেখিলে তাহাকে ভাল্লুক বলিয়া ভুল করি, জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোকে ভূত প্রেত দেখি। এই যে সংবেদনের ভুল ব্যাখ্যা—রজ্জুতে সর্প ভ্রম —ইহাই হইতেছে অধ্যাস (Illusion)। অধ্যাসজনিত ভুলভ্রান্তি সাধারণ মানুষের জীবনে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

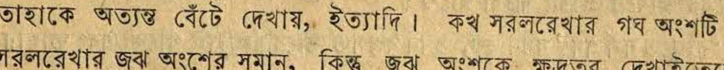
"রজ্জুতে সর্পভ্রম" যখন হয়, তখন বস্তুগত ভাবে রজ্জুটাই থাকে এবং তাহার একটা সংবেদনও থাকে, ভুলটা হয় শুধু সংবেদনের অর্থবোধের। কিন্তু কখন কখনও বস্তুগত জিনিসের উপস্থিতি না থাকিলেও আমাদের কাছে একটা জিনিস প্রত্যক্ষের মতই স্পষ্ট হইয়া উঠে। অন্যমনস্কভাবে ঘরে বসিয়া আছি, হয়ত মনে হইল কে যেন দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া দেখিলাম, দেখিলাম কেহই নাই। এই ব্যাপারটিকে মায়া বা অমূল প্রত্যয় (Hallucination) বলে। সুস্থ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই "মায়া" জাতীয় ভ্রান্তিটা খুব ঘটে না, তবে অধ্যাস জাতীয় ভ্রান্তি প্রায়ই ঘটে।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে "Seeing is believing", কিন্তু কথাটা সব ক্ষেত্রেই সত্য নহে। যাহা কিছু দেখিব, তাহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া ঠিক নহে, কারণ চোখে দেখার মধ্যেই বহু ভুল থাকিতে পারে। শুধু দেখা নহে, শ্রবণ করা, স্পর্শ করা, স্বাদ গ্রহণ করা—সব জিনিসেই আমাদের বহু ভুল হইতে পারে। নিম্নে দুই একটি অধ্যাসজনিত ভুলের কথা বলা হইল :



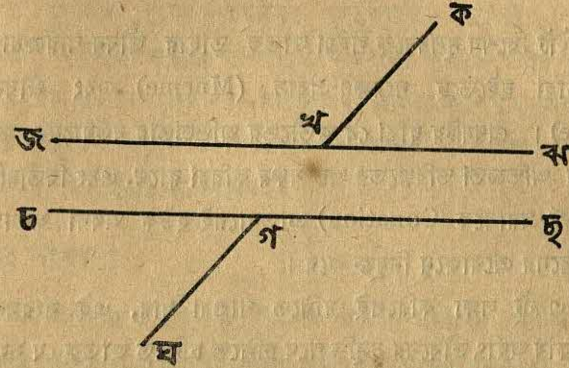
(১) আড়াআড়ি দূরত্বের (horizontal distance) চেয়ে উপর-নীচের দিকের দূরত্ব-টা বেশী বলিয়া মনে হয়। কখ ও গঘ রেখাদ্বয়ের মধ্যে গঘ রেখাকে বড় বলিয়া মনে হইতেছে, অথচ উভয় রেখার দৈর্ঘ্যই সমান (এক ইঞ্চি)।

(২) বৈসাদৃশ্যের জন্য (contrast effect) আমাদের প্রত্যক্ষণ প্রভাবান্বিত হয়। তীব্র মিষ্ট জিনিস খাইবার পর টক জিনিস খাইলে আরো বেশী টক্ লাগে, বিপরীত রং-এর দুইটি জিনিস পাশাপাশি থাকিলে দুইটিকেই উজ্জ্বলতর দেখায়, খুব লম্বা লোকের মধ্যে মাঝারি উচ্চতার লোক থাকিলে তাহাকে অত্যন্ত বেঁটে দেখায়, ইত্যাদি। কখ সরলরেখার গঘ অংশটি চছ সরলরেখার জঝ অংশের সমান, কিন্তু জঝ অংশকে ক্ষুদ্রতর দেখাইতেছে।



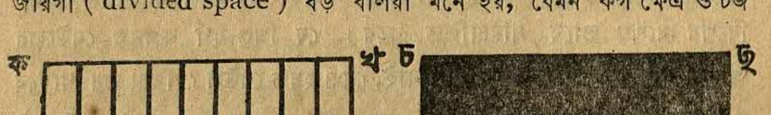
কখ-র তুলনায় চছ রেখার দৈর্ঘ বেশী বলিয়াই বৈসাদৃশ্যের জন্য এই ভুলটি হইতেছে। এই সাদৃশ্যের জন্যই হতাশার পর সামান্য কৃতকার্যতায় মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, "হরিষে বিষাদ" হইলে মানুষের মন ভাঙ্গিয়া পড়ে, দুঃখের পর সুখের অনুভব তীব্রতর হইয়া থাকে।

(৩) একটা রেখার গতিপথ অন্য রেখার অবস্থানের ফলে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। কখ গঘ রেখাটি একই সরলরেখায় অবস্থিত, কিন্তু জঝ ও চছ



রেখার অবস্থিতির জন্য কখ এবং গঘ-কে দুইটি পৃথক সরলরেখা বলিয়া মনে হইতেছে। এমন দৃষ্টিভ্রম আমাদের প্রায়ই হইয়া থাকে!

(৪) ভর্তি জায়গার (filled space) চেয়ে ফাঁকা জায়গা বা খাঁজকাটা জায়গা (divided space) বড় বলিয়া মনে হয়, যেমন কগ ক্ষেত্র ও চজ



ক্ষেত্র দুইটি একই কালিবিশিষ্ট, কিন্তু কগ খাঁজকাটা ক্ষেত্রটিকে চজ ভর্তি ক্ষেত্রটির চেয়ে বড় দেখাইতেছে।

(৫) ক্ষেত্রফল বা কালি সম্বন্ধেও আমাদের প্রায়ই অধ্যাস হয়। একই কালিবিশিষ্ট দুইটি ক্ষেত্রকে পাশাপাশি রাখিলে মনে হইবে একটি অপরটি হইতে ছোট বা বড়, কিন্তু মাপিয়া দেখিলেই ভুলটি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আরও নানা জাতীয় অধ্যাস আমাদের প্রায়ই হইয়া থাকে। নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিব।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ

(Instinct and Emotion)

যে দুইটি বিশেষ মূলধনকে লইয়া জাতক তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, তাহা হইতেছে সংরক্ষণ-প্রয়াস (Mneme) এবং জীবন-প্রয়াস (Horme)। প্রথমটির দ্বারা সে অতীতের অভিজ্ঞতার বর্তমানের জন্য এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা তাহার কর্ম্ম-প্রয়াসকে (Conation) জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক জীবনের প্রয়োজনে নিযুক্ত করে।

কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই সংরক্ষণ-প্রয়াস প্রভৃতির কার্য অর্থাৎ জীবনের চল্‌তি পথে চলিতে চলিতে জাতক যে সমস্ত টুকরা অভিজ্ঞতাকে অর্জন করে, তাহাকে সম্বল করিয়াই যে সে তাহার কাজ আরম্ভ করে, তাহা নহে। জীবনের কোনও অভিজ্ঞতাই যখন অর্জিত হয় নাই, তখনও যেন কতকগুলি বিশিষ্টতার অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার ফলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও পরিবেশ তাহার কর্মপ্রয়াসকে বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিচালিত করে। যে শিশু-সর্প কখনও নেউলের আক্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাই, সেও হয়ত নেউল দেখিয়া ভয় পাইবে এবং পলায়ন করিতে চেষ্টা করিবে, মোরগ-শিশু হয়ত শস্যের কণা দেখিলেই লুব্ধ হইবে এবং তাহা খুঁটিয়া খাইতে চেষ্টা করিবে এবং যে গৃহপালিত শারিকাটি কখনও পাখার বাসা দেখে নাই, সেও হয়ত সন্তান-সম্ভাবনার সময় খড়-কুটা লইয়া তাহাদের গোষ্ঠীগত প্রথামত বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বাসা বাঁধিতে চেষ্টা করিবে। যে গুণের জন্য এই সমস্ত অনুভূতি এবং প্রায় স্বয়ংসিদ্ধ এবং অশিক্ষিত-পটু-আচরণগুলি আমাদের মধ্যে আসে, তাহাকে মনস্তাত্ত্বিকগণ সহজাত প্রবৃত্তি বা বৃত্তি (instinct) নাম দিয়াছেন।

এগুলির বিশেষত্ব হইতেছে : (১) বিশেষ বিশেষ পরিবেশে এই আচরণগুলি বিশেষ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয় ; (২) এগুলি একটি গোষ্ঠীর

(species) প্রত্যেকের পক্ষেই সমানভাবে কার্যকরী হয়; (৩) এগুলি অভিজ্ঞতার দ্বারা শিখিতে হয় না।

এই জন্যই মনে হয়, প্রত্যেক জাতকই তাহারই জন্মের সময় হইতেই তাহাদের গোষ্ঠীর সংরক্ষণ-প্রয়াসের কতকগুলি ছাপজট (engrams complex) লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, যেন জাতির অতীত স্মৃতির অস্পষ্ট দাগ তাহাদের দেহ ও মনোযন্ত্রের মধ্যে থাকে এবং তাহার ফলে (১) একটি বিশিষ্ট পরিবেশে তাহার অনুভূতি বিশিষ্টভাবে অনুরঞ্জিত হয় এবং (২) তাহার আচরণটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হয়।

প্রবৃত্তির সংখ্যা ঃ

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি কি কি এবং আমাদের আচরণের মধ্যে কোন্‌গুলিই বা সহজাত প্রবৃত্তির লীলা, এই লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বহু বিতণ্ডা আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আমাদের প্রবৃত্তির সংখ্যা হইতেছে দুইটি মাত্র; আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহাদের সংখ্যা ছাপ্পান্নটি।

অত্যন্ত নিম্নস্তরের প্রাণীদিগের জীবন-প্রয়াসের আচরণ দেখিলে দুইটি জিনিস আমাদের নজরে পড়ে। একটি হইতেছে তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গলের প্রয়োজনে লাগে এইরূপ আচরণ করা, আর একটি হইতেছে তাহাদের জাতিগত বা গোষ্ঠীগত মঙ্গলের জন্য কাজ করা। একটি হইতেছে স্বার্থরক্ষামূলক, আর একটি হইতেছে বংশরক্ষামূলক, অর্থাৎ একটি হইতেছে স্বার্থসাধনপ্রবৃত্তি ও অপরটি হইতেছে যৌন-প্রবৃত্তি। এই দুইটি মূল প্রবৃত্তি লইয়াই তাহাদের কারবার।

এই দুইটি প্রবৃত্তির মধ্যে আবার কোন্‌টি মুখ্য এবং কোন্‌টি গৌণ, ইহা লইয়াও বিতণ্ডা আছে। কোন কোনও পণ্ডিত বলেন, যৌন-প্রবৃত্তিই হইতেছে মূলপ্রবৃত্তি, আবার কেহ কেহ স্বার্থকেই (self-interest) প্রধান প্রবৃত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই উভয় মতবাদের মধ্যেই একদেশদর্শিতা আছে। বস্তুতঃ যৌন-প্রবৃত্তি এবং স্বার্থপ্রবৃত্তি এই দুইটিই হইতেছে জীবনের প্রয়োজনের জন্য একই জীবন-প্রয়াসের দুইটি ভঙ্গী

মাত্র। বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইবার পর উদ্ভিদ-শিশুর একটিমাত্র মূল কাণ্ড থাকে। পরে ঐ মূল কাণ্ডটি হয়ত দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যায় এবং গাছটি যত বড় হইতে থাকে তাহার শাখা-প্রশাখা ততই অধিক সংখ্যক হইতে থাকে। প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও এই নিয়ম। জীবন-প্রয়াস হইতেছে মূল কাণ্ড-স্বরূপ এবং স্বার্থপ্রবৃত্তি (self-interest) ও যৌনপ্রবৃত্তি হইতেছে তাহার প্রথম দুইটি শাখা।

"এ্যামিবা" নামক একটিমাত্র জীবকোষবিশিষ্ট প্রাণীর জীবন-প্রণালী লক্ষ্য করিলে এই মতের সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহটি ছিন্ন হইয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং তাহার পর এই দুইটি অংশই স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে বাঁচিয়া থাকে। এ্যামিবার ক্ষেত্রে একই কার্যের দ্বারা মৃত্যুকে এড়াইয়া তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গলের (self interest) কাজ এবং বংশগত মঙ্গলের বা যৌন-প্রবৃত্তির কাজ হইয়া থাকে। কাজেই এ্যামিবার ক্ষেত্রে মনে হয় জীবন-প্রয়াস-বৃক্ষের মূল কাণ্ডটি এখনও বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয় নাই। সেইজন্য তাহাদের একই কাজের মধ্য দিয়া দুইটি বৃহৎ এবং বিভিন্নমুখী প্রবৃত্তির (যৌন-প্রবৃত্তির ও স্বার্থপ্রবৃত্তি) উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ; মানুষের মত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে তাহা হয় না। জীবনের বিবর্তনের পথে মানুষ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই তাহার প্রবৃত্তিগুলি বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ফলে মানুষের ক্ষেত্রে তাহার বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলি শুধু যে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এবং পৃথকই হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধীও হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ্যামিবা একটি কাজের দ্বারাই তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গল এবং জাতিগত মঙ্গল সাধন করে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য জাতির প্রতি "মীরজাফরের" কাজ করিতে হয়, আবার জাতির মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির স্বার্থ বলি দিতে হয়। যৌনপ্রবৃত্তির সহিত সমাজের দ্বন্দ্বও এ্যামিবার ক্ষেত্রে নাই ; যে কাজের দ্বারা তাহার যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহা দ্বারাই সমাজেরও মঙ্গল হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সমাজের কল্যাণে যৌনপ্রবৃত্তির দমন এবং যৌন-প্রবৃত্তির প্রেরণায় সমাজ-শাসনকে অগ্রাহ্য করা নিত্যই সংঘটিত হইতেছে। ব্যক্তি ও সমাজ,

দেহগত ক্ষুধা ও সমাজগত আদর্শের সংঘাত লইয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন প্রবৃত্তি:

কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া প্রাণী জীবনের কারবার আরম্ভ হয়, ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কিন্তু এই বিরোধের যথার্থ কারণ নাই। একটি পূর্ণ-বয়স্ক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা দুই হইবে, কি দশটি হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে কোন্ স্থান হইতে আমি গণনা করিতেছি। ম্যাক্‌ডুগাল (Mc. Dougall) তাঁহার 'Introduction to Social Psychology' গ্রন্থে প্রথমতঃ সাতটি প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার 'Outline of Psychology' নামক গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দটি প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রবৃত্তি হইতেছে একটি সহজাত বৈশিষ্ট, যাহার জন্য একটি বিশিষ্ট ঘটনা প্রাণীকে বিশেষভাবে কাজ করিবার প্রেরণা জাগায়। তাঁহার মতে এই প্রবৃত্তিগুলির দুইটি দিক আছে; একটি হইতেছে অনুভূতির দিক এবং আর একটি হইতেছে প্রতিক্রিয়ার দিক; ফলে প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা একটি বিশেষ পরিবেশের মধ্যে বিশেষভাবে অভিভূত হই এবং পরে বিশেষ-ভাবে কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করি। এই প্রবৃত্তিগুলিকে চিনিবার মাপকাঠি: (১) ইহারা সহজাত, (২) ইহারা গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই সমানভাবে ক্রিয়াশীল, (৩) ইহারা মনুষ্য ও ইতর প্রাণী সকলের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

(১) **অপত্য প্রবৃত্তি (Parental)**: প্রবৃত্তিগুলির তালিকার মধ্যে ম্যাক্‌ডুগাল প্রথমেই অপত্যপ্রবৃত্তি বা জনকের প্রবৃত্তিটি ধরিয়াছেন। এই প্রবৃত্তিকে তিনি প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম আবিষ্কার, বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতির জননীস্বরূপা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় প্রাণীসকল তাহাদের বৎসদের রক্ষার জন্য এবং তাহাদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তিটি নানাপ্রকার কর্মের জন্য প্রেরণা দান করে। মানুষের স্নেহ, মমতা, বাৎসল্য, করুণা প্রভৃতির শত সহস্র প্রকার কার্যই এই বৃত্তি হইতে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে।

ভবভূতি বলিয়াছেন : "একোরস করুণ এব নিমিত্ত ভেদাৎ
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্ !"
(৩।৪৭, উত্তর রাম চরিত)

সাহিত্যক্ষেত্রে এই কারুণ্য সব রসেরই উৎস, জীবনের ক্ষেত্রেও এই বৃত্তিটি সমস্ত প্রবৃত্তির উৎস।

(২) **যুযুৎসা (Combat) :** এই প্রবৃত্তিটি এক হিসাবে অপত্য প্রবৃত্তি হইতেই আসিয়াছে। কেহ হয়ত নবজাত শাবককে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মনের মধ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুযুৎসা জাগিয়া উঠে। অবশ্য অন্য কারণেও এই প্রবৃত্তিটি জাগে। সাধারণতঃ কোনও স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হইলেই এই প্রবৃত্তি জাগে। যেমন কোনও প্রাণীর খাদ্য অন্বেষণ বৃত্তিতে বাধা পড়িলেই তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় এবং ফলে যুযুৎসা জাগ্রত হয়। যাঁরা অহিংসাবাদী তাঁদের অনেকে হয়ত যুযুৎসা প্রবৃত্তির উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন, কিন্তু যে বালক খেলাধূলার সময় নিজ অধিকার লইয়া ঝগড়া করিবার সুযোগ পায় না বা পরাজয়ের গ্লানিতে অপমান বোধ করে না, সে বড় হইয়া দেশের ও দশের ন্যায্য দাবী লইয়াই হয়ত সংগ্রাম করিতে পারে না।

(৩) **কৌতূহল প্রবৃত্তি (Curiosity) :** যখন কোনও নূতন পরিবেশের মধ্যে আমরা পতিত হই এবং তাহার সহিত ভালভাবে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি, তখন এই প্রবৃত্তিটি জাগরিত হয়। এই প্রবৃত্তির সাহায্যেই আমরা জগতের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হই। এই প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই শিশু "কি" এবং "কেন" এই প্রশ্ন লইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনকে জ্বালাতন করে। শিশুর সব "কেন"র উত্তর দেওয়া হয়ত সহজ নয়। কিন্তু তাই বলিয়া এই "কি" ও "কেন" প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া শিশুর কৌতূহলে বাধা দেওয়া উচিত নহে ; যতদূর সম্ভব তাহার কৌতূহল-নিবারণ করাই উচিত।

(৪) **খাদ্য-সংগ্রহ প্রবৃত্তি (Food Seeking) :** ইহা জীবন-প্রয়াসের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবেই আমাদের মধ্যে আসিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজনই হইতেছে এই প্রবৃত্তিটির। এই খাদ্য-সংগ্রহ বৃত্তি বা

আহার প্রবৃত্তি শিক্ষার দোষে অনেক সময় বিকৃত হইয়া আমাদের ক্ষতি করে। কর্তব্যবিমুখ শিশুকে আহার্যের লোভ দেখাইয়া কাজে লাগান, মিষ্ট দ্রব্য দিয়া তাহার ক্রন্দন শান্ত করা, যখন তখন গুরুজনদের ভোজনের প্রসাদ-কণা দিবার জন্য আহ্বান করা—এই সমস্ত করিয়া অনেক বাড়ীতেই ছেলেদের খাদ্য সম্বন্ধে অসংযমী ও লোভী করিয়া তোলা হয়। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র উভয়েরই ক্ষতি করা হয়।

(৫) **ঘৃণা প্রবৃত্তি (Repulsion) :** আদিতে ইহা হয়ত খাদ্য-সংগ্রহের প্রবৃত্তি হইতেই আসিয়াছে। কোনও দ্রব্য মুখে পোরা হইল, তাহার দুর্গন্ধ অথবা বিস্বাদ হয়ত আমাদিগকে সেই জিনিসটিকে মুখ হইতে বাহির করিয়া দিবার প্রেরণা জাগাইল। এইভাবেই এই প্রবৃত্তিটি জন্মলাভ করিয়া পরে উচ্চতর প্রবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। মিথ্যাচার, হিংসা, জিঘাংসা, পাপ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আমাদের যে ঘৃণা তাহাও হয়ত এই আদিম প্রবৃত্তিটি হইতেই আসিয়াছে।

(৬) **পলায়নী প্রবৃত্তি (Escape) :** এই প্রবৃত্তিটি নানাভাবেই জাগ্রত হইতে পারে। হঠাৎ একটি শব্দ শুনিলাম, হঠাৎ কোন একটা ভীষণ জিনিস দেখিলাম, কোনো একটা বিস্ময় ও ভয়ের অনুভূতিতে "চাচা আপন বাঁচা" ভাবটি মনে আসিল, তখনই আমাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইবে পলায়ন।

(৭) **সংঘ প্রবৃত্তি (Gregariousness) :** নিজের জাতীয় প্রাণীকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া থাকিবার চেষ্টা করা প্রায় সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই আছে। অতি শিশু অবস্থাতেও এই প্রবৃত্তিটির অপরিস্ফুট ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধপোষ্য শিশুও একলা থাকিতে ভালবাসে না। সংঘপ্রিয়তা দশ হইতে পনের বৎসরের বালক-বালিকাদের মধ্যে অত্যন্ত তীব্র হয়। এই প্রবৃত্তিটিকে যথাযথ উৎসাহ দিলে ফল ভালই হয়। যে বালকের সংঘবৃত্তি ভালভাবে বিকশিত হয় না, সে প্রায়ই অসামাজিক অপদার্থ হইয়া উঠে।

(৮) **আত্মবিস্তার বা আস্ফালন প্রবৃত্তি (Self assertion) :** শক্তি সামর্থহীন প্রাণীর নিকট শক্তির আস্ফালন বা একটা আত্মপ্রসাদের ভাব ইতরপ্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চস্তরের সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, অর্থ, ঐশ্বর্য প্রভৃতি দেখাইয়া অপরের উপরে যে 'চাল' দেখাইবার চেষ্টা আমাদের অনেকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই আত্মবিস্তার বা আস্ফালন প্রবৃত্তিরই রূপ-ভেদ মাত্র। ব্যক্তিগত শক্তি, আঘাত-প্রবণতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া এই আস্ফালন প্রবৃত্তিটি অযথা পরিচালিত হইলে তাহা উত্তরকালে গুণ্ডামী প্রভৃতি সৃষ্টি করে। সংঘগত ক্রয়া-কৌশল প্রভৃতির পথে পরিচালিত করিয়া এই বৃত্তিকে উৎকর্ষিত করা যাইতে পারে।

(৯) **আত্মাবমাননা প্রবৃত্তি (Submisson) :** ইহা হইতেছে আস্ফালন বৃত্তিরই বিপরীত দিক। অধিকতর শক্তিমান বা ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির নিকট যে সঙ্কুচিত হইবার চেষ্টা, তাহারই মধ্যে এই প্রবৃত্তিটিকে কার্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। আস্ফালন ও আত্মাবমাননা বৃত্তিটি কুকুর প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। একটি হৃষ্টপুষ্ট কুকুরের সহিত আর একটি ক্ষীণকায় কুকুরের দেখা হইল। তখন হৃষ্টপুষ্ট কুকুরটি লেজ খাড়া করিয়া বুক ফুলাইয়া দুর্বল কুকুটির সম্মুখে দাঁড়াইল, দুর্বল কুকুরটি তখন নিজের দীনতা বুঝিতে পারিল। তখন সে লেজটিকে পিছনের পা দুইটির ভিতরে গুটাইয়া তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করিল। ব্যাপারটি এইখানেই মীমাংসা হইয়া যাইল ; কিন্তু দুর্বল কুকুরটি এইভাবে দীনতা স্বীকার না করিলেই একটা দ্বন্দ্ব, কামড়া-কামড়ি বাধিয়া যাইত।

(১০) **যৌন-প্রবৃত্তি (Sex instinct) :** ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণ এই প্রবৃত্তিটিকে মনস্তত্ত্বের আলোচনায় খুব বড় একটা স্থান দিয়াছেন। ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণের সহিত সকলে এক মত না হইলেও, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, এই প্রবৃত্তিটির ব্যপকতা অত্যন্ত বেশী। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এইজন্ত বোধহয় এই বৃত্তিটিকে কেন্দ্র করিয়া (মূল বা স্থায়ী-ভাব ধরিয়া) যে রসের সৃষ্টি হয়, তাহাকে "আদি রস" বলা হইয়াছে। সেখানেও 'আদি' এই বিশেবণটির দ্বারা এই প্রবৃত্তিটির শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করা হইয়াছে। ক্ষুধা বা খাদ্য-সংগ্রহ প্রবৃত্তির মত এই প্রবৃত্তিটিও শারীরিক ক্ষুধা এবং বহির্জগতে ক্ষুধা জাগাইবার জিনিসের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। শৈশবের কুশিক্ষা ও

আদরের দোষে অনেক সময় বালক-বালিকাদের মধ্যে এই প্রবৃত্তিটির বিকৃতি ঘটে। যৌনবোধ সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল উপস্থিত হইলে শুচিতা ও সরলতার সহিত তাহার আলোচনা করা উচিত। ছি-ছি করিয়া এই কৌতূহল দমন করিলে বালকেরা চাকরবাকরের নিকট হইতেও বিকৃতভাবে এই জ্ঞান আরহণ করিয়া থাকে।

(১১) **সঞ্চয়ী প্রবৃত্তি (Acquisition) :** খাদ্য অথবা গৃহসজ্জার জন্য উপযুক্ত জিনিস পাইলে তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা এবং সেই গৃহীত বস্তুগুলিকে সতর্কভাবে আগলাইয়া রাখার চেষ্টার মধ্যে এই প্রবৃত্তিটি কাজ করে। এই প্রবৃত্তির অসংযত বিকাশে কৃপণতা, চৌর্য প্রভৃতির উদ্ভব হয়, আবার উৎকর্ষণের দ্বারা ডাক টিকিট সংগ্রহ, প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ, প্রত্নতত্ত্বের উপাদান সংগ্রহ প্রভৃতি গুণও বিকশিত হয়।

(১২) **গঠনমূলক প্রবৃত্তি (Construction) :** পাখীদের বাসা বাঁধিবার চেষ্টার মধ্যে, মানব শিশুদের খেলাঘর তৈয়ারী করিবার চেষ্টার মধ্যে এই প্রবৃত্তিটিকে ক্রিয়াশীল অবস্থায় দেখা যায়।

(১৩) **দোহাই পাড়িবার প্রবৃত্তি (Instinct of appeal) :** যখন যুযুৎসা প্রবৃত্তিটি কার্যকরী হয় না, তখনই জাতক এই "দোহাই পাড়িবার" প্রবৃত্তিটির দ্বারা সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করে।

(১৪) **হাস্যপ্রবৃত্তি (Laughter) :** ইহা যে বাস্তবিকই একটি প্রবৃত্তি সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। তবে প্রবৃত্তি হইলেও ইহা শুধু মানব জাতিরই সম্পদ। প্রশ্ন আসিতে পারে, কিসের প্রেরণায় আমাদের হাস্যের উদ্রেক হয়? ম্যাকডুগাল বলেন, আমরা সেই অবস্থাতেই হাসি যে অবস্থায় না হাসিলে কষ্ট বা দুঃখ হয়। ইহা এক দিক দিয়া সমবেদনা, অপর দিক দিয়া ক্রোধের প্রতিশোধক। একজনের দুঃখ দেখিলে আমাদের সমবেদনাজনিত কষ্ট হয়, তখন হাস্য করিয়া আমরা এই কষ্টকে এড়াইয়া চলি; তেমনি যে অবস্থায় আমাদের ক্রোধের উদ্রেক হয়, সেই অবস্থায় না রাগিয়া হাস্য করিলে আমরা ক্রোধের যন্ত্রণা হইতে রেহাই পাই।

প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আচরণবাদীদের মত :

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেছে নান্, রস্ (Nunn, Ross) প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্দের মতবাদ অবলম্বন করিয়া। ইঁহারা প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে গোষ্ঠীগত সংরক্ষণ প্রয়াস, একটা প্রাক্জন্মগত সংস্কারের ছাপ প্রভৃতির কথা আনিয়াছেন। সাধারণ মানুষও প্রবৃত্তি (Instnict) সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই ভাবেন যে প্রবৃত্তি (Instinct) প্রকৃতির নির্দেশে প্রাপ্ত একটা সহযোগিতা, যাহার ফলে শিক্ষা-দীক্ষা না পাইয়াও প্রাণীরা তাহাদের জীবনের প্রয়োজনীয় কাজগুলি প্রায় অভ্রান্ত ভাবেই করিতে পারে। আর পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান বলিয়া প্রকৃতি তাকে সহযোগিতা দান করেন না, তাই মানুষকে বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া বুদ্ধি-পরিচালিত পথে চলিতে হয়। শিশু বয়সে মানুষ অসহায় থাকে এবং প্রকৃতির বিদ্রোহী হয় না বলিয়া এই বয়সটিতে প্রকৃতি মানুষকে সাহায্য করে, অর্থাৎ এই বয়সে শিক্ষাদীক্ষা ব্যতীতই মানুষ প্রবৃত্তির প্রেরণায় খানিকটা কাজ-কর্ম করিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে খানিকটা অধ্যাত্মবাদ, একটা দেহাতিরিক্ত সূক্ষ্ম শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস, অথবা প্রাক্জন্মগত সংস্কার প্রভৃতি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে দার্শনিকতার দৃষ্টিভঙ্গি যতটা আছে, জড়- বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ততটা নাই।

যাঁহারা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রটিকে জড়-বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়া দেখেন তাঁহারা প্রবৃত্তির (instinct) ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জন্মগত ছাপজট্ প্রভৃতির কথা বেশী আমলে আনিতে চাহেন না, নিছক দেহযন্ত্র এবং তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দিয়াই তাঁহারা প্রবৃত্তিকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন।

স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) বলিয়াছেন, প্রাণীজগতের বিবর্তনের পথে একটি মাত্র জীবকোষ লইয়া গঠিত প্রাণী (এ্যামিবা) হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যত উর্ধ্ব দিকে যাওয়া যায়, তাহাদের দেহযন্ত্র ততই জটিল ও সমৃদ্ধ হইতে থাকে। এই দেহযন্ত্রের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আচরণেরও জটিলতা ও সমৃদ্ধি হইতে থাকে। যাহাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি, তাহা হইতেছে এই দেহযন্ত্রের বিবর্তনের পথে একটা বিশিষ্ট পরিণতি-যুগের "আচরণ-বৈশিষ্ট" মাত্র।

প্রাণী-জগতের কার্যাবলীর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় আছে—কতকগুলি বৈচিত্র্যবিহীন অপরিবর্তনশীল (Non-variable), আর কতকগুলি বৈচিত্র্য-যুক্ত পরিবর্তনসাপেক্ষ (variable)। পর্যায়গুলি মোটামুটি এইরূপ :

(১) প্রাণী-জগতের কার্যগুলির প্রথম পর্যায়ে আছে অপরিবর্তনশীল নিছক **জৈব-ক্রিয়া** (physiological actions), যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস লওয়া, খাদ্য জীর্ণ করা, ঘর্ম নিঃসরণ করা প্রভৃতি।

(২) ইহার দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে "**আভিমুখী ক্রিয়া**" অর্থাৎ শীতাতপ, আলোক, বাতাস প্রভৃতির জন্য শারীর-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (tropisims)। নিম্নস্তরের বহু প্রাণীর প্রতিক্রিয়াই (যাহাকে প্রবৃত্তি বলা হয়) এই tropisims এর অন্তর্গত। বহ্নিমুখে গমনশীল পতঙ্গের কথা লইয়া কাব্যসাহিত্যে অনেক উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু আলোকের জন্য তাহার যে আকর্ষণ, তাহা রূপ-তৃষ্ণা জাতীয় কোনও প্রবৃত্তির প্রেরণায় ততটা নহে, যতটা হইতেছে আলোক-রশ্মি-জনিত শারীর-রাসায়নিক আকর্ষণের অনিবার্য ফল। একটি উদ্ভিদ শিশুও আলোকের দিকে তাহার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে। উদ্ভিদের মতো ইতর প্রাণীদেরও অনেক প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই তেমন প্রবৃত্তির লীলা নাই। একটি পোকা যে গর্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, তাহার মধ্যে আত্মরক্ষা বা পলায়নী প্রবৃত্তি ততটা নাই, যতটা আছে তাহার চারিদিকে যতটা সম্ভব কঠিন পদার্থের সহিত তাহার দেহকে ছুঁয়াইয়া রাখার চেষ্টা। এই আভিমুখী ক্রিয়া বা Tropisims-গুলি প্রায় সর্বতোভাবে অপরিবর্তনশীল।

(৩) প্রাণীজগতের তৃতীয় পর্যায়ে আছে **প্রতিবর্তক** ক্রিয়া (reflexes)। এই ক্রিয়াগুলির মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা বুদ্ধি-সচেতন নহে। ইহাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানবহা স্নায়ুপ্রবাহ মেরুদণ্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়াই মেরুদণ্ডের সমবেদন-প্রবণ (Sympathetic) গ্যাঙ্গ্লিয়াগুলি হইতেই একটা কর্ম-নির্দেশ লইয়া প্রতিক্রিয়া করে। এইগুলিকে Spinal reflex বলে। আরও কতকগুলি reflex আছে, তাহাকে brain refiex বলে। এই brain reflex এবং বুদ্ধিপ্রসূত কার্যগুলির পার্থক্য প্রকৃতগত ততটা নহে, যতটা হইতেছে মাত্রাগত।

reflexগুলির মোটামুটি পরিচয় হইতেছে, এগুলি খানিকটা স্বয়ংসিদ্ধ এবং ইহাদের প্রতিক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ক্ষিপ্র। চোখে একটা কি পড়িল, অমনি প্রতিবর্তক ক্রিয়া হিসাবে চক্ষু বন্ধ করিলাম, ইহাতে $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ড সময় লাগিল; পায়ে হয়ত বিছা কিংবা কিছু জড়াইয়া ধরিল, তখনি পা ঝাড়া দিলাম, এজন্য $\frac{১}{১০০}$ সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগিল। এই জাতীয় ক্রিয়া এবং চোখের পলক ফেলা, হাসা-কাঁদা, ভ্রূকুঞ্চিত করা, কাঁপা, মুখ বিকৃত করা, হাঁচা, জিহ্বার রসাস্বাদন করা, ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠা প্রভৃতি প্রতিবর্তক ক্রিয়া। এই ক্রিয়াগুলিও অনেক পরিমাণে অপরিবর্তনশীল।

(৪) চতুর্থ পর্যায়ের প্রতিক্রিয়াগুলিকে স্যাণ্ডিফোর্ড **প্রবৃত্তি** নাম দিয়াছেন। এগুলি প্রতিবর্তক ক্রিয়ার চেয়ে একটু জটিলতর। প্রাণীদের ক্রিয়াগুলি বৈচিত্র্যবিহীন (Non-variable) জৈব-প্রতিক্রিয়া হইতে বিবর্তনের পথে ক্রমশঃ পরিবর্তনশীল বা বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়া বুদ্ধিপ্রণোদিত কার্যে পরিণতি লাভ করে, সেই পরিণতি-পর্যায়ের বৃত্তিটি হইতেছে প্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী অধ্যায়। প্রবৃত্তির ব্যাখ্যার জন্য গোষ্ঠীগত জীবনের "অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ", "প্রকৃতির অভিভাবকত্ব" প্রভৃতি কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, জটিলতর এবং সমৃদ্ধতর দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া দিয়াই ইহার ব্যাখ্যা করা চলে।

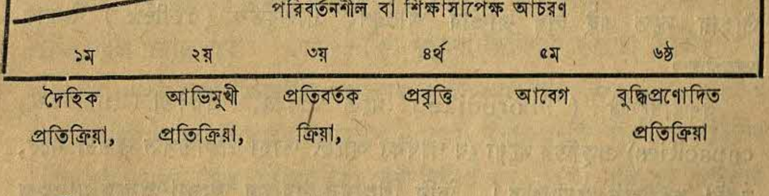
(৫) বিবর্তনের পঞ্চম পর্যায়ে আছে **আবেগ ও প্রক্ষোভ**। এই পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া আরও জটিল ও বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে। আবেগের প্রতিক্রিয়ায় হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতির রং ধরিয়াছে।

(৬) প্রাণী জগতের চরম পরিণতির পর্যায়ে আছে **বুদ্ধিপ্রণোদিত এবং অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়া**।

মানুষের একক জীবনেই এই বিবর্তনের সমস্ত অধ্যায়গুলিই দৃষ্ট হয়। যখন সে মাতৃগর্ভে তাহার জীবন আরম্ভ করে তখন একটিমাত্র জীব-কোষ লইয়াই তাহার দেহ-যন্ত্র কাজ আরম্ভ করিয়া থাকে, ধীরে ধীরে সে বর্ধিত হয়, তাহার দেহের জীব-কোষের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, দেহ-যন্ত্র জটিল হইতে জটিলতর হইয়া সমৃদ্ধ হইতে থাকে, স্নায়ুতন্ত্র, মেরুদণ্ড প্রভৃতি গঠিত হইতে থাকে।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রায় শারীরিক পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। নিছক জৈব-প্রতিক্রিয়া এবং আভিমুখী (Tropic) প্রতিক্রিয়া তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরেই Spinal reflexএর দ্বারা সে চোখ বুজিতে, হাসিতে, কাঁদিতে, বমি করিতে পারে, চিম্‌টি কাটিলে হাত সরাইয়া লইতে পারে, পায়ে সুড়সুড়ি দিলে পা গুটাইয়া লইতে পারে এবং এই কাজগুলি তাহাকে শিখিতে হয় না। পরে উপযুক্ত প্রেরণা পাইলে উত্তেজকের (stimuls) প্রতিক্রিয়া হিসাবে সে হাঁটিতে পারে, খাদ্য সংগ্রহ করিতে হাত বাড়ায়, কৌতূহল অনুভব করে, ক্রোধান্বিত হইয়া যুযুৎসু হইয়া উঠে। এই প্রতিক্রিয়াগুলি প্রবৃত্তির পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এক হিসাবে এইগুলিও প্রতিবর্তক ক্রিয়া, তবে ইহা নিছক প্রতিক্রিয়া হইতে একটু বৈচিত্র্যযুক্ত ও জটিলতর। এই জন্য হার্বার্ট স্পেন্সার (Hebert Spencer) প্রবৃত্তি গুলিকে মিশ্র প্রতিবর্তক (compound reflex) বলিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রতিক্রিয়া আরও সমৃদ্ধতর হইতে থাকে এবং শীঘ্রই সে উচ্চ-চিন্তাপ্রসূত কার্যাবলী করিতে সমর্থ হয়।

শৈশব **বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রিয়ার বিবর্তন :** পূর্ণ বয়স



প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অন্যান্য মতবাদ :

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা আলোচিত হইল, ইহা ছাড়া আরও অনেক বিতণ্ডা আছে। প্রবৃত্তির স্বরূপ নিরূপণ-প্রসঙ্গে সেগুলিরও আলোচনা প্রয়োজন।

জেমস্ (James) বলেন, প্রবৃত্তি হইতেছে মনের এমনই একটা শক্তি যাহা দ্বারা প্রাণী কোনও বিষয়ে না ভাবিয়া চিন্তিয়া, পূর্ব হইতে কোনও কিছু শিক্ষা লাভ না করিয়াই একটি বিশেষ রকম ফল পাইবার জন্য বিশেষভাবে কাজ করে : "Instinct is the faculty of acting in such a way as to produce certain ends without foresight of the ends and without previous education in the performance."

ওয়াট্‌সন্ (Watson) এই জাতীয় বিশেষ একটা দুর্জ্ঞেয় শক্তির কথা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তিনি বলেন, একটি বুমারাংকে (boomerang) হাত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলে তাহা আবার হাতে ফিরিয়া আসে। এই আচরণের জন্য বুমারাংটির মধ্যে কোনও প্রবৃত্তির প্রেরণা নাই, তাহার গঠন-কৌশলের মধ্যে এই আচরণের লীলা-রহস্য নিহিত আছে। তাহা হইলে মানুষের ক্ষেত্রেই বা প্রবৃত্তি জাতীয় একটা শক্তির কথা কল্পনা করিয়া লাভ কি? ওয়াট্‌সন্ প্রবৃত্তি বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং তথাকথিত প্রবৃত্তির কাজগুলিকে কর্মস্রোত (activity stream) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আচরণবাদী হইলেও, থর্ণডাইক্ (Thorndike) প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে খানিকটা জেমস্-এর পথের অনুবর্তন করিয়াছেন এবং প্রাণীদের আচরণগুলির মধ্যে প্রবৃত্তি (instinct), ক্ষমতা বা ধারকত্ব (capacity), প্রবণতা (tendency) এবং সম্ভাবনা (potentiality) প্রভৃতির পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই চার জাতীয় আচরণই প্রতিবর্তক (reflex) ক্রিয়ার অন্তর্গত।

থর্ণডাইকের (Thorndike) মতে প্রবৃত্তি, প্রবণতা (instinct, capacities) প্রভৃতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা প্রকৃতিগত ততটা নহে, যতটা হইতেছে মাত্রাগত। তিনি শিশুদের প্রবৃত্তির সংখ্যা-প্রসঙ্গে মাতৃস্তন্য পান, দংশন করা, চর্বন করা, লেহন করা, মুখভঙ্গী করা, থুথু ফেলা, কোন জিনিস ধরিতে চেষ্টা করা প্রভৃতি ছাপ্পান্নটি বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং capacity প্রসঙ্গে নেতৃত্ব, আত্ম-ত্যাগ, সমবেদনা, মুখস্থ করিবার শক্তি,

পর্যবেক্ষণ শক্তি, আত্ম-নির্ভরতা, মৌলিকতা প্রভৃতি মুখ্য ও গৌণ ভেদে তেইশটি শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতিবর্তক ক্রিয়াগুলি খানিকটা বিধিনির্দিষ্টভাবে ঘটিয়া থাকে এবং বুদ্ধিপ্রণোদিত ক্রিয়ার মত তাহাদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা থাকে না। এই জন্য যাঁহারা প্রবৃত্তিগুলিকে প্রতিবর্তক ক্রিয়ার পর্যায়ে ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের মতের সমালোচনা করিয়া ড্রেভার দেখাইয়াছেন, কৌতূক, ভয় প্রভৃতি ব্যাপারে আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলি একটি বিধিনির্দিষ্টভাবে হয় না। সুতরাং এগুলিকে প্রতিবর্তক ক্রিয়ার অন্তর্গত বলা উচিত নহে।

বের্গসঁ (Bergson) প্রাক্‌জন্মগত সংস্কারকে বিশ্বাস করেন। তাঁহার ধারণা একটা জীবন-প্রেরণা (Life-impulse) আমাদের সক্রিয় চেতনার আড়াল হইতেই আমাদের কাজকর্মে অনুপ্রেরণা দেয় ; ইহাই হইল প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তিগুলির বৈশিষ্ট্য ঃ

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতবাদের গহনতা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণভাবে পণ্ডিতেরা প্রবৃত্তির যে বিশিষ্টতাগুলি স্বীকার করেন, সেগুলি উল্লেখ করা অযৌক্তিক হইবে না। বিশেষত্বগুলি এই—

(১) ইহা শিক্ষা বা অভ্যাসসাপেক্ষ দক্ষতা নহে, ইহা সহজাত।

(২) ইহা গোষ্ঠীর সকলের মধ্যেই ক্রিয়াশীল।

(৩) গোষ্ঠীর সকলের উপরই ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইলেও, ইহার শক্তি সর্বত্র সমান নহে। যেমন—(ক) যুযুৎসা জিনিসটা হয়তো নারীর চেয়ে পুরুষের মধ্যে বেশী ক্রিয়াশীল, আবার অপত্য-প্রবৃত্তির ক্রিয়া হয়ত পুরুষের চেয়ে নারীর মধ্যে অধিকতর ক্রিয়াশীল ; (খ) যৌনপ্রবৃত্তি বাল্যে ও বার্ধক্যে যেমন দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যৌবনে ইহা বেশী উদ্দীপ্ত হয় ; (গ) মস্তিষ্কের সুস্থতার উপর প্রবৃত্তির ক্রিয়া অনেকখানি নির্ভর করে, যেমন Dementia জাতীয় মনো-বৈকল্য আসিলে মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি ব্যাহত হয়।

(৪) প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীর জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়। প্রবৃত্তিগুলির সাহায্য না পাইলে পরিবেশের প্রতিকূলতায় প্রাণীগুলিকে হয়ত

জীবনের আসর হইতে সরিয়া যাইতে হইত। শীতের আগমনে যে লক্ষ লক্ষ পক্ষী উষ্ণতর দেশে পলায়ন করে, শত্রুকে দেখিয়া দুর্বলতর প্রাণী যে আত্ম-গোপন করে, সন্তান সম্ভাবনায় যে পাখীরা বাসা তৈয়ারী করে, এ সমস্তই জীবন-সংগ্রামের প্রেরণাতেই হইয়া থাকে।

প্রক্ষোভ বা আবেগ (Emotions) :

মানুষের দেহযন্ত্র তথা তাহার আচরণের বিবর্তনের পথে প্রক্ষোভ বা আবেগ জিনিসটিকে শ্যাণ্ডিফোর্ড প্রভৃতি প্রবৃত্তির পরবর্তী পর্যায়ের ক্রম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও প্রতিবর্তক ক্রিয়ার সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত, তবে প্রতিবর্তক ক্রিয়ার সহিত ইহার পার্থক্য হইতেছে এই : (১) প্রতিবর্তক ক্রিয়ার সময় দেহের একটিমাত্র অংশ ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু প্রক্ষোভের সময় সমগ্র শরীরেই একটা পরিবর্তন দৃষ্ট হয় ; (২) ইহাতে গ্রন্থি সংক্রান্ত (glandular) এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ (visceral) পরিবর্তন হয়। (৩) প্রতিবর্তক ক্রিয়া অথবা প্রবৃত্তিগত প্রতিক্রিয়ার মতো প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তেমন সরলতা দৃষ্ট হয় না। ইহার মধ্যে খানিকটা অযৌক্তিক বিক্ষোভ, তীব্রতা, আকস্মিকতা জাতীয় ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) প্রক্ষোভের ফলে রক্ত-চলাচল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতির গতি পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা হিসাবে বিবর্তনবাদী পণ্ডিত ডারুইন বলেন, প্রক্ষোভের সময় আমাদের মধ্যে যে শরীরগত পরিবর্তন হয়, তাহার কারণ হইতেছে : (১) একদা প্রক্ষোভ প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। ক্রুদ্ধ হইলে আমরা যে হাতের মুঠা শক্ত করি, দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধরি, চক্ষু বিস্ফারিত করি—ইহা হইতেছে অতীত যুগের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ব্যাপার (Principle of serviceable habits) ; (২) কখন কখনও প্রক্ষোভের সময় আমরা বিপরীত-ধর্মী ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করি (Principle of antithesis), এইজন্য আদর দেখাইবার সময় আমরা অনেক সময় গাল টিপিয়া দেই, পিঠে চাপড় মারি, কুকুরেরা তাহাদের শিশুপুত্রদের আদর করিবার সময় কামড়াইয়া দেয়।

ক্যানন্ (Cannon) প্রভৃতি গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্ (endocrinologists) বলেন, প্রক্ষোভ হইতেছে অ্যাড্রিনেল্ প্রভৃতি গ্রন্থির রসক্ষরণের তারতম্যজনিত শারীরিক পরিবর্তন মাত্র।

ফ্রয়েড্, য়্যুঙ্ (Jung) প্রভৃতি মনোবিকলনকারী পণ্ডিতগণ বলেন, প্রক্ষোভ ব্যাপারটা একটা অযৌক্তিক বা আকস্মিক মনোবিকার মাত্র নহে, ইহার মধ্যে একটা গোপন ইতিহাস এবং অবদমন জাতীয় রহস্যের ইঙ্গিত আছে।

ওয়াট্‌সন্ প্রভৃতি আচরণবাদীগণ বলেন, ইহা শুধু কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র ('মৌলিক প্রকল্প' শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "Albert B" নামক শিশুর উপর ভয়ের প্রতিক্রিয়া-সম্বন্ধে পরীক্ষাটি দ্রষ্টব্য—২৬ পৃঃ)।

অধ্যাপক জেমস্ (James) এবং ল্যাঙ্গ্ (Lange) বলেন, কোনও একটি উত্তেজনায় আমাদের শরীরের মধ্যে কতকগুলি পরিবর্তন হয়, এই পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা যখন সচেতন হই, তখনই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

উড্ওয়ার্থ (Woodworth), ডাউনে (Downey) প্রভৃতি মনে করেন, প্রক্ষোভও আমাদের একটা সহজাত মানসিক সম্পদ এবং ইহাকেও মনস্বিতাংশের (I.Q.) মত পরিমাপ করিবার মাপকাঠি শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক :

ম্যাকডুগাল (Mc. Dougall)-এর বিশ্বাস, প্রত্যেক প্রবৃত্তির মূলেই এক একটি প্রক্ষোভের (আবেগের, emotion) লীলা আছে। যেমন পলায়ন-প্রবৃত্তির মূলে আছে ভয়ের প্রক্ষোভ, যুযুৎসার মূলে আছে ক্রোধ ইত্যাদি। মানুষ প্রভৃতি উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির সম্পর্কটি খানিকটা বুঝিতে পারা যাইলেও, নিম্নপ্রাণীদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটি ঠিক স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না। সেইজন্য অনেকের বিশ্বাস যে, ইতরপ্রাণীর আচরণ সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় আর উচ্চতর প্রাণীদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রক্ষোভ প্রভৃতির দ্বারা। যদি প্রশ্ন করা হয় "পিপীলিকারা এইভাবে বাসা বাঁধে কেন? অথবা মাকড়সা এইভাবে শিকার ধরে কেন?" সাধারণ লোকে

তাহার উত্তরে বলিবে—"সহজাত প্রবৃত্তিবশেই তাহারা এইরূপ করে।" কিন্তু যদি প্রশ্ন আসে "মানুষটি এভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল কেন?" তাহাতে সাধারণ লোকে উত্তর করিবে "রাগ করিয়াছে বলিয়া সে চীৎকার করিল।" যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "সে ছুটিয়া পলাইল কেন?" উত্তর আসিবে "ভয় পাইয়াছে বলিয়া" ইত্যাদি। তাহা হইল সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে এই যে, মাকড়সার শিকার-ধরা প্রবৃত্তির (instinct) ব্যাপার, আর মানুষের চীৎকার করা বা পলায়ন করা প্রক্ষোভের(emotion) ব্যাপার।

তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, কর্মের প্রেরণার জন্য প্রবৃত্তির রাজ্যে দুইটি পৃথক আইন আছে? নিম্নপ্রাণীদের জন্য প্রবৃত্তির এবং উচ্চতর প্রাণীদের জন্য প্রক্ষোভের প্রেরণা দিয়া প্রকৃতি তাঁহার জীব জগৎকে পরিচালিত করেন? ম্যাকডুগাল বলেন, "না, আইন একটিই আছে —উচ্চ এবং নিম্ন নির্বিশেষে তাহা কাজ করে, প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভকে পৃথক বলিয়া মনে করাটা ঠিক নহে। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ পৃথক নহে, প্রবৃত্তির কাজগুলি করিবার সময় উচ্চতর প্রাণীদের মনের মধ্যে যে একটা আত্ম-সচেতন অনুভূতির রং লাগিয়া যায় তাহাকেই প্রক্ষোভ (আবেগ) বলা হয়।" সুতরাং ম্যাকডুগাল-এর (Mc. Dougall) মতে বৃত্তির সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে হইলে প্রক্ষোভের কথা বাদ দিলে কিছুতেই চলিবে না। এই জন্যই ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তির (instinct) সংজ্ঞা নিরূপণকল্পে বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি হইতেছে একটি সহজাত সংস্কার যাহার জন্য একটি (১) বিশেষ প্রাণী বিশেষ জিনিসকে বিশেষভাবে অনুভব করে; (২) এই অনুভূতির জন্য বিশেষ ভাবে অভিভূত বা প্রক্ষোভিত হয় এবং (৩) শেষ পর্য্যন্ত সেই জিনিসটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আচরণ করে ("An Innate disposition which determines the organism to perceive (to pay attention to) any object of a certain class and to experience in its presence a certain emotional excitement and an impulse to action which find experession in a specific mode of behaviour in relation to that object.")।

এই ভাবে প্রবৃত্তির সংজ্ঞা স্থির করিয়া তিনি তাঁহার নির্ধারিত চৌদ্দটি প্রবৃত্তির জন্য চৌদ্দটি প্রক্ষোভেরও নাম করিয়াছেন। যথা—

প্রবৃত্তি	প্রক্ষোভ
পলায়ন (Escape)	ভয় (fear)
যুযুৎসা (Combat)	ক্রোধ (Anger)
ঘৃণা (Repulsion)	বিরক্তি (Disgust)
অপত্য (Parental)	স্নেহ (Tender emotion)
দোহাই পাড়া (Appeal)	দুঃখ (Distress)
রিরংসা বা যৌনপ্রবৃত্তি (Mating)	কাম (Lust)
কৌতূহল (Curiousity)	আশ্চর্যবোধ (Wonder)
বশ্যতা (Submission)	আত্মাবমাননা (Negative self feeling)
আস্ফালন প্রবৃত্তি (Self assertion)	আত্মগৌরব বোধ (Positive self feeling)
যৌথ প্রবৃত্তি (Gregaiiousness)	একাকীত্ব বোধ (Feeling of loneliness)
খাদ্য-সংগ্রহ প্রবৃত্তি (Food seeking)	ক্ষুধা (Gusto)
সঞ্চয়ী প্রবৃত্তি (Acquisition)	স্বাধিকার বোধ (Feeling of ownership)
গঠন প্রবৃত্তি (Construction)	সৃজনী স্পৃহা (Feeling of creativeness)
হাস্য (Laughter)	আনন্দ (Amusement)

প্রবৃত্তির সহিত সহযোগিতা করিয়া যে প্রক্ষোভ যুগপৎ কার্য করে, তাহাকে প্রাথমিক প্রক্ষোভ (primary emotiou) বলা হইয়াছে। দুই একটি প্রাথমিক প্রক্ষোভের মিশ্রণে যে প্রক্ষোভ সৃষ্ট হয়, তাহাকে গৌণ প্রক্ষোভ (secondary emotion) বলা হয়।

প্রক্ষোভের স্বরূপ :

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই প্রক্ষোভ বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি ? কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে জ্ঞানের দিক ছাড়া যে একটা অনুভূতির দিক আছে, যে একটা অভিভূত হইবার দিক আছে, তাহাকেই সাধারণতঃ আমরা প্রক্ষোভ বলিয়া থাকি। প্রক্ষোভের তীব্রতার সময় আমরা এই অভিভূত হইবার লক্ষণগুলি বিশেষভাবে বুঝিতে পারি। এই সময় মনের তরফ হইতে অভিভূত হওয়া ছাড়া শরীরের তরফ হইতেও একটা বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং বিশেষভাবে আচরণ করিবার জন্য একটা প্রেরণাও আমাদের মধ্যে আসে। প্রক্ষোভের সঙ্গে শরীরগত পরিবর্তন এবং কর্মপ্রয়াসের যে একটা সম্পর্ক আছে, তাহা স্টাউট্ বহুদিন পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন। বর্তমানে বহু পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, একটা বিশেষ রকম প্রক্ষোভের সময় শরীরের মধ্যে বিশেষ রকম পরিবর্তন আসে। ভয়ের সময় তাড়াতাড়ি পলাইবার জন্য যেন শরীর তৈয়ারী হইয়া উঠে, ক্রোধের সময় দেহযন্ত্র যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় ইত্যাদি। শুধু এই বাহ্যিক পরিবর্তনই নয়, বিভিন্ন প্রক্ষোভের সময় শরীরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আভ্যন্তরিক পরিবর্তনও সাধিত হয়। বর্তমানে শরীর-তত্ত্ববিদ্গণ দেখাইয়াছেন যে, ক্রোধের সময় অ্যাড্রিনেলিন্ গ্রন্থি হইতে রস ক্ষরিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতে রক্ত জমিয়া যায় এবং তাহার ফলে রক্তক্ষয়জনিত দুর্বলতায় মৃত্যুর সম্ভাবনা কমিয়া যায়। এইভাবে অন্যান্য প্রক্ষোভগুলির সময়ও প্রাণীর প্রয়োজন অনুযায়ী শরীরের পরিবর্তন হয়।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক (জেমস্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদ) :

অধ্যাপক জেমস্ প্রক্ষোভের সহিত শরীরগত পরিবর্তনটির অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, একটা অভিজ্ঞতার জন্য তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমাদের শরীরের মধ্যে যে সব পরিবর্তন আসে, সেই পরিবর্তনের চেতনাই হইতেছে "প্রক্ষোভ" ; তিনি বলেন, "সাধারণতঃ বলা হয় আমরা দুর্ভাগ্যে আপতিত হই, দুঃখ পাই এবং কাঁদি ; আমরা ভল্লুক দেখি, ভয় পাই এবং ছুটিয়া পলাই ; প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা অবমানিত হই, ক্রুদ্ধ

বোধ করি এবং তাহাকে আঘাত করি ইত্যাদি; কিন্তু আরও যুক্তিযুক্ত ভাবে বিচার করিয়া বলিতে হইলে আমাদের বলা উচিত যে, আমরা কাঁদি বলিয়া দুঃখ অনুভব করি, আঘাত করি বলিয়া ক্রুদ্ধ হই, কাঁপি বলিয়া ভীত হই। দুঃখ পাইয়া কাঁদি, ক্রুদ্ধ হইয়া আঘাত করি, ভীত হইয়া কাঁপি —ইহা ঠিক কথা নহে।"

অধ্যাপক জেমস্-এর এই মতবাদটির মধ্যে বিরোধোক্তি অলঙ্কারের আকস্মিকতা যতই থাক না কেন, ইহার মধ্যে খানিকটা সত্যও আছে। যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা জানেন ক্রোধ, শোক, প্রেম প্রভৃতির অভিনয় সুষ্ঠুভাবে করিতে হইলে ঐ সমস্ত প্রক্ষোভজনিত দেহ-বিকৃতি নিখুঁতভাবে আনয়ন করিতে পারিলে শুধু যে অভিনয়টিই ভাল হয় তাহা নহে, অভিনীত রসটির অনুভূতিও উৎকৃষ্টতর হয়। অপর পক্ষে যখন ভয়, ক্রোধ, শোক প্রভৃতির আবেগে আমরা অভিভূত হই, তখন শরীরগত বিকৃতিগুলিকে সংযত করিতে পারিলেই সেই প্রক্ষোভগুলি কাটিয়া যায়। যে ক্রোধে হাত পা কাঁপে না, চক্ষু লাল হয় না, স্বর বিকৃত হয় না, পেশীগুলি স্ফীত হয় না, সেই মানসিক প্রশান্তির অবস্থাটিকে আর যাহাই হউক ক্রোধের অবস্থা বলা যায় না। ভল্লুক দেখিয়া যদি বুক দুর দুর করিয়া না কাঁপে, পলাইতে ইচ্ছা না হয়, জোরে নিশ্বাস না পড়ে, বুদ্ধি বিকৃত হইয়া দিশাহারা হইতে না হয়, তাহা হইলে ভল্লুক দেখার ব্যাপারটা ভয়ের প্রক্ষোভের ব্যাপার না হইয়া মস্তিষ্কগত নিছক রূপানুভূতির (cold perception) ব্যাপারে নামিয়া আসে।

বর্তমানে শরীরতত্ত্ববিদ্যায় যে সমস্ত আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে শরীরগত পরিবর্তনের সহিত এক একটি প্রক্ষোভের সম্পর্ক যেন আরও গভীরভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এক একটি প্রক্ষোভের সহিত শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল এবং বিশেষভাবে নিশ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত প্রক্ষোভগুলির অনুভূতির জন্য একটি বিশেষ স্নায়ুকেন্দ্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বৃহৎ মস্তিকের নিম্নে "থালামি" (Thalami) নামক স্থানে অবস্থিত এবং তাহার সহিত মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা-বাহিত স্নায়ু-তন্ত্রের বিশেষ সম্পর্কও নাই।

এই সমস্ত আবিষ্কারের পূর্বেই জেমস্ এবং ল্যাঙ্গ্ (Lange) সাহেব শরীরগত বিকৃতি ও প্রক্ষোভের সম্পর্কটি নিপুণভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া তাঁহাদের কৃতিত্ব যথেষ্ট আছে। তবে আমরা "পালাই বলিয়া ভয় পাই, ভয় পাই বলিয়া পালাই না"—এই জাতীয় কথা না বলিয়া "জেমস্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদের" (James-Lange theory) গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া ম্যাকডুগাল-এর সহিত এইটুকু অনায়াসেই বলিতে পারি যে, পলায়ন, যুযুৎসা, ঘৃণা প্রভৃতি প্রবৃত্তির সহিত ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি তথা এই সমস্ত প্রক্ষোভের নিবিড় শরীরগত পরিবর্তনের একটি নিকট ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও মতামত:

ড্রেভার (Drever) কিন্তু এই বিষয়ে ম্যাক ডুগালের (Mc. Dougall)এর সহিত একমত নহেন। তিনি বলেন, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ঠিক এক জিনিসেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি নহে, একটি আসিলে যে অপরটি আসে তাহা নহে, বরং একটির অতৃপ্তি ও অভাবে অপরটির সৃষ্টি হয়। প্রবৃত্তির কার্যগুলি যখন বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই প্রক্ষোভ কাজ করিতে আরম্ভ করে। উদাহরণস্বরূপ পলায়ন প্রবৃত্তি ও ভয়ের প্রক্ষোভের কথা বলা যাইতে পারে। পলায়ন কাজটি আমরা যখন বিনা বাধায় করিতে পারি তখন ভয় অনুভূত হয় না। কিন্তু পলায়ন করিতে যখন বাধাপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তখনই ভয়ের আবির্ভাব হয়।

রিভারও (River) ড্রেভার-এর সহিত একমত। তিনি বলেন, বিপদের সময় ছুটিয়া পলায়ন করা, লাফ-ঝাঁপ করা, এ সমস্ত কাজ করিতে হয় সত্য কথা এবং বিপদের সময় এই সমস্ত কাজ আমরা অত্যাশ্চর্য নিপুণতার সহিত করিতে সমর্থ হই, এ কথাও সত্য; কিন্তু সেই সমস্ত কাজ তখনই ভালভাবে করিতে পারি যখন প্রক্ষোভজনিত চিত্তবিক্ষোভ আমাদের অভিভূত না করে। সুতরাং সমস্ত প্রবৃত্তির কার্যগুলির বিশেষত্বই হইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে প্রক্ষোভ বা চিত্ত-বিক্ষোভের কোনও অবকাশ নাই। ডঃ উইলিয়ম ব্রাউন (William Brown) বলিয়াছেন, ম্যাক্ ডুগাল নিজেও অন্ততঃ

একটি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে এই মতবাদের অনুচ্চারিত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যৌথপ্রবৃত্তি বা সংঘপ্রবৃত্তির সহকারী প্রক্ষোভ হইতেছে একাকীত্ব বোধ। কিন্তু এই সংঘ প্রবৃত্তিটি যখন ক্রিয়াশীল থাকে, তখন তাহার সহকারী প্রক্ষোভজনিত একাকীত্ব বোধটি আর থাকে না।

ড্রেভার (Drever) এইটুকু স্বীকার করেন যে, অনেক প্রবৃত্তিরই ক্রিয়াশীল অবস্থায় প্রক্ষোভের অনুরণন থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও, প্রক্ষোভ ক্রিয়াটা প্রবৃত্তিরই অনুভূতির (affective) দিক মাত্র নহে। প্রক্ষোভের মূল কথা হইতেছে একটি বিশিষ্ট পরিবেশে পড়িয়া "এই কাজটি করিলে মন্দ হয় না" এই জাতীয় একটা মনোভাব মাত্র (worth whileness); এই ভাবটি যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা প্রক্ষোভজনিত বিকারে পরিণত হয়।

ম্যাক্‌ডুগাল অবশ্য পরে ড্রেভার-এর এই আলোচনা খানিকটা মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবৃত্তির মূল কথা যে প্রক্ষোভ, এই জেদটুকু তিনি কিছুতেই ছাড়িতে রাজী হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ড্রেভার যাহা বলিয়াছেন, তাহা 'ক্রোধ' এই প্রবৃত্তিটি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অন্য আবেগ সম্বন্ধে নহে।

আবেগ ও প্রবৃত্তির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশের পথে প্রাণীদিগের সৃষ্টি হইয়াছে প্রবৃত্তির সৃষ্টির পূর্বেই এবং এই প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীদিগের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে একদিন আবির্ভাব হইয়াছিল প্রাণীদের জীবন-প্রয়াসের প্রয়োজনে জগতের সহিত কারবার চালাইবার সুবিধার জন্যই। এই জীবন-প্রয়াসের ক্রম-বিকাশের পথেই একদিন প্রক্ষোভগুলিও সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রক্ষোভ হইতেছে জগতের সহিত কারবার করিবার ব্যাপারে প্রাণীদের জীবন প্রেরণায় কর্ম-প্রয়াসের অনুভূতিগত অনুরণন মাত্র।

এই জন্যই নান্ (Nun) বলিয়াছেন, আবেগ হইতেছে "Local differentiations of the feeling that colours all the organism's hormic dealings with the world." তিনি বলিয়াছেন, আমাদের সমস্ত কার্যের মধ্যেই যে প্রক্ষোভজনিত বিকার-বিকৃতিগুলি দৃষ্ট হইবেই, তাহা

নাও হইতে পারে এবং তথাকথিত 'worth whileness'ই হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কার্যের প্রেরণা হইতে পারে, কিন্তু সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও প্রক্ষোভজনিত অনুভূতির রংটি থাকিয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন, "It is true that in solving a scientific problem or in repaying a good turn I am not swept along all the time on a full stream of wonder or gratitude. Nevertheless the 'worth whileness' experienced in such activities does seem in case each to be coloured, so to speak, with the same colour as the emotion". (Education : Data and first Principles pp. 157-158).

শিক্ষাতত্ত্বে সহজাত প্রবৃত্তির প্রয়োগ :

এখন এই আবেগ ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে দার্শনিক বিতর্ক ছাড়িয়া প্রবৃত্তিগুলিকে কিভাবে শিক্ষার কাজে লাগাইতে পারা যায়, তাহার আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হইবে। আমরা জানি, যে মূলধনগুলি লইয়া জাতক তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে প্রবৃত্তি হইতেছে অন্যতম প্রধান উপাদান। একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, "The instincts are the raw materials of character". সুতরাং এই 'raw materials'-গুলি যে কি ভাবে কাজে লাগাইতে হইবে, তাহা প্রত্যেক শিক্ষকেরই বিচার্য।

শৈশবে ও বাল্যে মানুষ প্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং এই সময়ে প্রবৃত্তির আবেদন এবং তাহার প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া মানুষ ও ইতরপ্রাণীদের মধ্যে প্রভেদ বিশেষ থাকে না। আদর্শবাদ, চরিত্রের দৃঢ়তা, মনের জোর, সংযম প্রভৃতি তখনও সৃষ্ট হয় না। কাজেই এই সময়ে আদর্শ, সংযম প্রভৃতির কথা আনিলে কোন ফল হইবে না। কারণ, আদর্শ প্রভৃতি তখনও তৈয়ারী হয় নাই। কাজেই শিশু তখন স্বভাবতঃ যাহা করিতে চায়, সেই পথেই তাহাকে চলিতে দিয়া তাহার খানিকটা অজ্ঞাতসারেই খেলা, আনন্দ প্রভৃতির ভিতর দিয়া সহজাত প্রবৃত্তির খাত বাহিয়া তাহাকে জ্ঞানের পথে ও শুভ কর্মের পথে লইয়া যাইতে হইবে। কিভাবে এই কাজটি করিতে হইবে তাহা জানিতে হইলে প্রবৃত্তিগুলির ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলি (attributes) ভাল ভাবে জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

(১) প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইতে হইবে, প্রবৃত্তিগুলি সহজাত হইলেও সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিই জাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত থাকে না, ধীরে ধীরে একটির পর আর একটি করিয়া প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠিতে থাকে। জন্মের সময়েই একটি শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতে পারে, কিন্তু তখনও সে কিছু ধরিতে পারে না। তাহার পর কোনও কিছু ধরিতে শিখে, কিন্তু তখনও চলিতে পারে না। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা ফুটিতে থাকে। বয়স অনুসারে প্রবৃত্তি বিকাশের এই ক্রমটি শিক্ষককে জানিয়া রাখিতে হইবে। তাহা না জানিয়া অকালে এক একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে ফল হইবে না। একটি দুই মাসের শিশুকে দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি উন্মেষ করিবার জন্য তাহাকে "চলি চলি পা পা" করিয়া টানাটানি করিলে সে চলিতে শিখিবে না। বরং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশতঃ সে শিখিতে অস্বীকারই করিবে।

এই জন্যই দেখা যায়, জেদী শিক্ষক বা মাতাপিতার শিক্ষা অনেক সময় ব্যর্থ হয়। শিক্ষার্থীর আগ্রহ-উন্মেষ হইবার পূর্বেই তাঁহারা শিক্ষার ব্যাপার লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে যাইয়া শিক্ষার বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর কাছে বিভীষিকার বস্তু করিয়া তুলেন; শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহের আতিশয্যে তাঁহারা অনেক সময় শিক্ষার বস্তুগুলিকে ধীরে ধীরে ক্রম-কঠিন না করিয়া ছেলেদের একদিনে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া শক্ত শক্ত বিষয় শিখাইতে চেষ্টা করেন। ফলে ছাত্রের অকৃতকার্যতার সংখ্যা বাড়িয়া যায়। প্রথবারের অকৃতকার্যতা দ্বিতীয়বারেয় সিদ্ধিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে ছাত্রের আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়।

অঙ্ক প্রভৃতি শাস্ত্রে অনেকের যে বিমুখতা দৃষ্ট হয়, তাহা এই ভুল শিক্ষা-প্রণালীর জন্য হইয়া থাকে।

(২) প্রবৃত্তির দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইতেছে, প্রবৃত্তিগুলি চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং সময়ে তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে না পারিলে প্রবৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যায়। একটি মোরগ-শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি হইতেছে তাহার মাতাকে অনুসরণ করা। এখন এই মোরগ-শিশুটিকে জন্মের পর হইতেই যদি সম্পূর্ণ

নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রবৃত্তিটি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইবে। শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া এই তথ্যটি খুবই প্রয়োজনীয়। ইহা আমাদের বুঝাইয়া দেয় যে, প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ সম্বন্ধে শিক্ষকের উৎসাহের বাড়াবাড়ি যেমন ক্ষতিকর, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতাও তেমনি ক্ষতিকর। মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রায় সকলেই একমত যে, মূক-বধির বালক বালিকাদিগকে যদি ভালভাবে কথা কহিতে শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সাধারণ বালকবালিকাদের মত ৬।৭ বৎসরে স্কুলে পাঠাইলে ভাল কাজ হইবে না। কারণ, কথা শিখিবার প্রবৃত্তিটি ছেলেদের মধ্যে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বিকশিত হয়। এই বয়সে সে যদি কথা কহিতে না শিখে এবং তিন চার বৎসর নষ্ট করিয়া পরে যদি তাহাকে স্কুলে পাঠান হয়, তাহা হইলে সে ভাল কথা শিখিতে পারিবে না।

প্রবৃত্তির পরিণতির হিসাব করিয়া সময় মত যথাযথ শিক্ষার বিষয় উপস্থাপিত করা শিক্ষাতত্ত্বের একটি বড় কথা। স্যাণ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, একটি দশ বৎসরের বালককে শরীরতত্ত্ব শিখাইবার চেষ্টা করা নিছক সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু ১০।১৬ বৎসরের কিশোরের কাছে এই শরীর-তত্ত্বটি একটি অত্যন্ত আগ্রহের জিনিস। কারণ, ঐ কৈশোর বয়সে তাহার নিজের শরীরগত পরিবর্তন প্রচুর হইতে থাকে, কাজেই শরীর সম্বন্ধে তাহার জিজ্ঞাসা ও আগ্রহ স্বতঃই তাহার মধ্যে উদিত হইতে থাকে। অতএব এই সময়ে শরীর-তত্ত্ব শিক্ষা দিলে তাহারা প্রচুর আনন্দের সহিত সেই শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

(৩) প্রবৃত্তির আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে যে, এইগুলি ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হয়। কাজেই যে সমস্ত অভ্যাসগুলি ভাবী জীবনে প্রয়োজনীয় হইবে, সেইগুলি শিশুকাল হইতেই গঠন করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। আমরা জানি, এই উৎসাহের অভাবে যে সব বাড়ীর ছেলেরা "পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে" বাঁধা থাকিয়া শুধু "ভাল ছেলেই" থাকিয়া যায়, নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবার সুবিধা পায় না এবং কর্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত থাকে, সেই ছেলেরা উত্তরজীবনে নেতৃত্ব করিতেও পারে না। এই নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির বিকাশের জন্য বালকদিগকে ক্লাসে, খেলার মাঠে এবং সভা-সমিতিতে,

পূজা-পার্বণ প্রভৃতিতে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অবকাশ দিতে হইবে ; তাহারা ভুল ভ্রান্তি করিবে বলিয়া তাহাদের দূরে রাখিলে চলিবে না।

(৪) প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে চতুর্থ কথা হইতেছে এই যে, প্রবৃত্তিগুলি জন্ম হইতেই অভ্রান্তও নহে এবং পূর্ণভাবে পরিপূর্ণও নহে। প্রাচীন পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, প্রবৃত্তি হইতেছে প্রকৃতির নির্দেশে প্রাপ্ত একটা জন্মগত এবং অভ্রান্ত অশিক্ষিত-পটুত্ব। কিন্তু বর্তমানে দেখা গিয়াছে যে, এই অশিক্ষিত-পটুত্বটি একেবারে অভ্রান্তও নহে এবং সম্পূর্ণও নহে। প্রবৃত্তি আমাদের ভ্রান্ত নির্দেশও দিয়া থাকে। প্রবৃত্তির ভ্রান্ত নির্দেশে চলিতে চলিতে লক্ষ লক্ষ পক্ষী মাঝ-সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া ডুবিয়া মরে, কুকুর বিড়াল প্রভৃতিও পথ ভুলিয়া যায়, অপত্য-প্রবৃত্তির ভ্রান্ত পরিতৃপ্তিতে খড়-পোরা মরা বাছুরের মূর্তি দেখিয়াই গো-মহিষের মাতৃদুগ্ধ ক্ষরিত হইতে থাকে ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, প্রবৃত্তিগুলি যে জন্ম হইতেই পূর্ণতা লইয়া আসে, তাহা নহে। নবজাত শিশু স্তন্যপান করিবার প্রবৃত্তিটির প্রেরণায় শুধু যে স্তন্যই পান করে, তাহা নহে—তাহার মুখের কাছে হাতের আঙ্গুল ধরিলেও সে তাহা চুষিতে চেষ্টা করিবে, আবার তাহার মুখে মুখ দিয়া তাহার বুড়ি ঠাকুমা যদি আদর করিতে যান, তাহা হইলে বৃদ্ধার নাকটিকেও সে পরম তৃপ্তির সহিত চুষিতে থাকিবে।

প্রবৃত্তি যে অনুশীলনের দ্বারা উৎকর্ষিত হয়, তাহার বহু প্রমাণই পাওয়া যায়। পাখীর বাসা প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারে ভাল হয়, মাকড়সার জাল প্রথম প্রচেষ্টায় যতটা ভাল হয়, দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তাহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।

এই তত্ত্বটি শিক্ষকদের নিকট খুব প্রয়োজনীয়। কারণ ইহা হইতে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের চেষ্টা ও সাহায্যে প্রবৃত্তিগুলি অনুশীলিত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে।

(৫) পঞ্চমতঃ মনে রাখা উচিত যে, প্রবৃত্তিগুলিকে বিষয়ান্তরে পরিচালিত বা পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। কিভাবে সেগুলিকে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে, কিভাবে সেগুলিকে পরিবর্তিত করা যায়, তাহা পরে আলোচিত হইবে। শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া উপস্থিত এই তথ্যটিকে

এইজন্যই খুব প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, অবাঞ্ছনীয় বা অসামাজিক বৃত্তিগুলিকে আমরা সংযত বা সংস্কৃত করিতে পারি।

(৬) ষষ্ঠতঃ প্রবৃত্তিগুলি কিছু-না- কিছু প্রেরণা ও-সঙ্কেতের অপেক্ষা রাখে। এই প্রেরণা ও সঙ্কেতটি না পাইলে প্রবৃত্তিগুলি আপনা আপনিই বিকশিত হইতে পারে না। এই তত্ত্বটিও শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়া খুবই প্রয়োজনীয়। শিক্ষক প্রেরণা ও সঙ্কেতের যথাযথ প্রয়োগ করিয়া বাঞ্ছনীয় প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ করিতে পারেন, আবার অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তির অকাল বোধন যাহাতে না হয়, সেই মত ব্যবস্থা করিবার জন্য সঙ্কেতগুলিকে বিলম্বিত করিতে পারেন।

প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত বা পরিবর্তিত করার উপায় :

(১) **শাস্তি ও পুরস্কারের দ্বারা :** এই উপায়টি অন্যান্য উপায়ের তুলনায় খুব কার্যকরী না হইলেও, ইহার প্রয়োগ খুব ব্যাপকভাবে হয়। তবে মাত্রার দিক দিয়া বাড়াবাড়ি না করিলে ইহাতে অনেকখানি ফল পাওয়া যাইতে পারে।

(২) **প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন দ্বারা** (change of response): আমরা একজন বিখ্যাত পালোয়ানের সম্বন্ধে শুনিয়াছি, তিনি যখন খুব ক্রুদ্ধ হইতেন এবং ক্রোধে যখন তাঁহার গা নিশ্‌পিশ্‌ করিত, তখন তিনি চেঁচামেচি মারধোর প্রভৃতি না করিয়া হাজারখানেক ডন্ বৈঠক দিয়া দিতেন। ফলে রাগের মাথায় অন্যায় কাজ করার হাঙ্গামা হইতে তিনি নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতেন। এই জাতীয় কাজ আমরাও প্রায়ই করিয়া থাকি। অন্ধকার রাস্তায় একা-একা চলিতে-চলিতে ভূতের ভয়ে শরীর অবসন্ন হইতে থাকিলে আমরা হয়ত জোরে গান ধরি, দুঃখে কান্না পাইলে তাহাকে হাসি দিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি। সুতরাং কার্পণ্যের জন্য যে-বালকের হাত দিয়া জল গলে না, তাহারই হাত দিয়া ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া, লোভী বালককে দিয়া ভাইবোনদের নিকট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন করার জন্য আমরা ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি।

(৩) **প্রবৃত্তিগুলির উন্নতি** (Sublimation) **বা উৎকর্ষণের দ্বারা :** এই উৎকর্ষণ ব্যাপারটি মনোবিজ্ঞানের তথা শিক্ষা-বিজ্ঞানের খুব

প্রয়োজনীয় বিষয়। আমরা জানি, প্রবৃত্তিগুলি প্রাণী-জগতের মধ্যে জীবনের প্রেরণাতেই সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনের প্রেরণা ও প্রয়োজন এবং সমাজগত নীতি বা কল্যাণ অনেক সময়েই একই খাতে প্রবাহিত হয় না। ব্যক্তিগত জীবন-প্রেরণা যাহা চায়, সমাজগত নীতি বা কল্যাণ হয়ত তাহাতে ব্যাহত হয়। উৎকর্ষণের মূল কথাটি হইতেছে, প্রবৃত্তির স্রোতটিকে মানুষের আদিম পশুজীবনের পর্যায় হইতে মোড় ফিরাইয়া সমাজ-কল্যাণকর খাতে প্রবাহিত করানো। তাহাতে প্রাণবেগ প্রতিরুদ্ধ হয় না, শুধু তাহার গতি-পথটি পরিবর্তিত হইয়া অন্য খাতে প্রবাহিত হয়। ফলে "সাব্‌লিমেশন্"-এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াজনিত প্রতিরোধ নাই, অবদমনজনিত গোপন বিদ্রোহ নাই, ভাবের ঘরে চুরি করার মত একটা গুণ্ডামির অবকাশও নাই। এই "সাব্‌লিমেশন্" কথাটি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে যৌনপ্রবৃত্তি সম্বন্ধেই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্তমান মনোবিজ্ঞান বলে, এই "সাব্‌লিমেশন্" ব্যাপারটি যৌনপ্রবৃত্তি ছাড়া অন্যান্য প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও কার্যকরী করা যাইতে পারে। মেয়েদের প্রতিবেশীদিগের রান্নাঘর ও আঁতুড় ঘর সম্বন্ধীয় কৌতূহল এবং পুরুষদিগের অহেতুক পরচর্চার কৌতূহলকে দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস সংক্রান্ত কৌতূহলের খাতে প্রবাহিত করা যাইতে পারে, শারীরিক ভয়ের প্রবৃত্তিকে পাপের প্রতি ভয়, আদর্শচ্যুতির ভয় প্রভৃতির খাতে মোড় ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, পশু-জীবনের আদিম সংঘপ্রবৃত্তিকে বর্তমান সভ্য-সমাজের লোক-লৌকিকতা সামাজিকতার খাতে প্রবাহিত করান যাইতে পারে, আদিম যুযুৎসা ও হিংসাকে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীলতার কাজে লাগান যাইতে পারে, সঞ্চয়ী-প্রবৃত্তিটাকে একটু মোড় ফিরাইয়া ডাক টিকিট সংগ্রহ, প্রত্নতত্ত্ব বা ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে নিযুক্ত করান যাইতে পারে। এক কথায় বলা যাইতে পারে, শিক্ষাতত্ত্বের শেষ কথাই হইতেছে, জৈব আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে সুসংস্কৃত উৎকর্ষিত করিয়া সমাজের কল্যাণের জন্য তথা মনুষ্যত্বের উন্নতি ও পরিপূর্ণতার জন্য নিযুক্ত করা। অবাঞ্ছিত মনে করিয়া প্রবৃত্তিগুলিকে গলা টিপিয়া মারিলে সে কাজ সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত, ভাল বা

মন্দের চিরন্তনী মাপকাঠি নাই, অহিংসা ভাল বলিয়া হিংসা বা যুযুৎসাকে বাদ দিলে চলিবে না, তাহা হইলে অহিংসার ছদ্মবেশে কাপুরুষতা আসিয়া পড়িবে; ত্যাগ বা সন্ন্যাস ভাল বলিয়া ভোগকে অস্বীকার করিলে চলিবে না, তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামে পরাজয় আসিবে; যৌনপ্রবৃত্তি মন্দ বলিয়া তাহাকে উৎখাত করিলে চলিবে না, তাহাতে ক্লীবত্ব আসিবে। কাজেই শিক্ষার বড় কথা হইতেছে, প্রবৃত্তিগুলিকে অবদমিত না করিয়া তাহাদিগকে উৎকর্ষিত করা। প্রবৃত্তির-"ছাঁটাই"-এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নাই, তাহার পূর্ণতা, সমন্বয় ও সমাজ-হিতৈষণার মধ্যেই মনুষ্যত্ব।

(৪) পরিবেশ বা প্রেরণার পরিবর্তনের দ্বারা (Change of environment or stimulii) :

"প্রক্ষালনাৎ হি পঙ্কস্য দূরাৎ স্পর্শনং বরং"—প্রবৃত্তির প্রলোভনের বস্তুকে সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া তাহার সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করার চেয়ে প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই ভাল। কবি বলিয়াছেন—

"কাজলকী ঘরমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে
থোড়া বু'দ লাগে পর লাগে
যুবতী কি সাথ মে যেত্তা সেয়ান হোয়ে
থোড়া কাম জাগে পর জাগে।

কাজলের ঘরে থাকিলে শরীরে কিছু না কিছু কালি লাগিবেই, যুবতীর সঙ্গ করিলে কিছু না কিছু কাম জাগিবেই। এই তত্ত্বটি শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়া খুবই প্রয়োজনীয়; ছাত্রের সঙ্গী-নির্বাচনের দিক দিয়া, বিদ্যালয় গৃহ ও ছাত্রাবাসের পরিবেশ নির্বাচনের দিক দিয়াও এই তত্ত্বটির খুব উপযোগিতা আছে। বার্ট (Cyril Burt) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন, লণ্ডনের খারাপ পাড়ার অথবা যে সমস্ত পাড়ায় সিনেমা থিয়েটার প্রভৃতির প্রলোভন বেশী, সেই সমস্ত পাড়ার ছেলেদের অপরাধ-প্রবণতা বেশী হয়।

(৫) প্রতিস্পর্ধী-আকর্ষণের (counter attraction) ব্যবস্থা দ্বারা : পরিবেশের পরিবর্তন করা হয়তো অনেক সময়েই অনেকের সাধ্যের অতীত হইতে পারে, সেই সব ক্ষেত্রে প্রতিস্পর্ধী আকর্ষণের

সৃষ্টি করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মহাত্মা অশ্বিনী-কুমার দত্ত যখন চাতরা (শ্রীরামপুর) স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন স্কুলের ছাত্রদের নৈতিক উন্নতির জন্য তাহাদের লইয়া নৌকাভ্রমণ এবং নৌকায় গান-বাজনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ছাত্রদের জন্য বিতর্ক-সভা, লাইব্রেরি প্রভৃতিরও ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। এইভাবে উচ্চতর আনন্দের প্রলোভন দেখাইয়া তিনি তাহাদিগকে বাজে অর্থহীন আনন্দের আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

(৬) **বিরোচনের (Cathersis) দ্বারা :** এই বিরোচন বা "ক্যাথার-সিস্" ব্যাপারটি হইতেছে ভোগের ভিতর দিয়া ভোগের **কামনাকে জয়** করিবার চেষ্টার মত। কামনাকে জোর করিয়া অবদমিত করিলে **অতৃপ্ত** কামনাজমিত জট্ (complex)*অথবা ভণ্ডামী জাতীয় একটা জিনিস সৃষ্ট হয় বলিয়া অনেক সময় ভোগের বস্তুর প্রাচুর্য দিয়া ভোগের বাসনাকে তৃপ্তি দিয়া ভোগেচ্ছাকে সংযত করিবার চেষ্টা করা হয়। বাস্তবিক ভোগকে একেবারে অস্বীকার করিয়া ত্যাগের সাধনা অনেক সময়েই ব্যর্থ হয়। এই জাতীয় ব্যর্থতাকে ইঙ্গিত করিয়াই শেষ প্রশ্নের কমল হরেন্দ্রের আশ্রমে বলিয়াছিল "যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে তাদের হাত দিয়েই তাঁর ভাঁড়ারের চাবি? হরেনবাবু, পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখুন, যারা অনেক পেয়েছে, তারা সহজেই দিয়েছে। এমন অকিঞ্চনতার ইস্কুল খুলে তাদের ত্যাগের গ্রাজুয়েট তৈরী করতে হয় নি।" যুক্তিটা হয়ত খানিকটা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ভোগের জয়গানের ভিতর দিয়াও মনুষ্যত্ব অর্জিত হয় না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন সাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণমার্গেব ভূয়োএবাভিবর্দ্ধতে॥"

* বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় Complexকে "গূঢ়ৈষা" বলা হইয়াছে। ফ্রয়েডীর Complex প্রসঙ্গে এই "গূঢ়ৈষা" শব্দটি খুবই সার্থক। কিন্তু engram complex প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই "গূঢ়ৈষা" শব্দটি খানিকটা নিরর্থক বলিয়া আমরা Complex অর্থে জট্ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। ইহা খানিকটা সহজবোধ্য এবং ব্যঞ্জনাময়ও বটে।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত শুধু ভোগের দ্বারা কামের সাম্য সম্ভব নয়। এই হেতু ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য বিধান দরকার ; এ দিকটাও শিক্ষকের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রবৃত্তিগুলি যতই সহজাত বা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, তাহাদিগকে সংযত করা যায় এবং প্রবৃত্তির স্রোতকে শিক্ষার খাতে প্রবাহিত করিয়া মনুষ্যত্বকে বিকশিত করা যায়। তবে এই সম্বন্ধে একটি কথা আছে। অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিবার জন্য সাধারণতঃ যে দুইটি পথ অবলম্বন করা হয় অর্থাৎ (১) তাহাদিগকে জোর করিয়া অবদমিত করা (repression) অথবা (২) তাহাদিগকে অবহেলা করিয়া খোরাক না দিয়া বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করা, এই দুইটি পথ প্রায়ই ফলপ্রসূ হয় না। কারণ, প্রবৃত্তিগুলিকে জোর করিয়া অবদমিত করিলে "ফ্রয়েডীয় জট্" বা গূঢ়ৈষার (Complex) সৃষ্টি হয় এবং তাহাদিগকে খোরাক না দিয়া অনশনে মারিবার ব্যবস্থা করিলে তাহারা উপসী ছারপোকার মত একবার সুযোগ পাইলে বাধ্যতামূলক সংযমের বঞ্চনাকে সুদে আসলে পুষাইয়া লয়। এইজন্য কৃপণ ধনীর ছেলে বাপের সম্পত্তি পাইলেই বেপরোয়া বিলাসে দু'দিনেই সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়া তাহার নাবালক জীবনের বঞ্চনার শোধ লইয়া থাকে, অথবা অতি গোঁড়া, আচারনিষ্ঠ, কড়া বাপের ছেলে বড় হইয়াই ব্যাভিচারী হইয়া উঠে। পিউরিটান্ যুগে ইংলণ্ডের নর-নারীকে জোর করিয়া ধার্মিক করিবার জন্য থিয়েটারের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পার্কের উলঙ্গ মর্মর প্রতিমূর্তিগুলিকে চুণ-বালির আস্তরণ দিয়া ভব্য করিয়া তোলা হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরবর্তী Restoration যুগে নরনারীর (তথা শিল্প সাহিত্যের) মধ্যে ব্যাভিচারের বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবন আসিয়াছিল।

এইজন্য অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিগুলিকে অবদমিত করিলে অথবা তাহাদের অনশনের ব্যবস্থা করিলে ফল ততটা ভাল হয় না। ইহার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হইতেছে প্রবৃত্তিগুলির উদ্‌গতি বা উৎকর্ষণ করা অথবা প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজ-কল্যাণকর খাতে প্রবাহিত করা। খারাপ প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে শুধু "চুপ, চুপ"

বা "ছি ছি" নীতি ভাল না; ছেলেদের "কি ও কেন" প্রশ্নগুলিকে শুধু দাবাইয়া দিলেও চলিবে না।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়া বৃত্তিগুলির যথাযথ ব্যবহার ও পরিচালনা সম্বন্ধে বক্তব্য এইখানেই শেষ হইল না। ম্যাকৃডুগাল খেলা জিনিসটিকে প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কিন্তু থর্নডাইক, স্যাণ্ডিফোর্ড খেলাকেও প্রবৃত্তি বলিয়াছেন। শিক্ষা-বিজ্ঞানের ব্যাপারে ক্রীড়া এবং ক্রীড়াচ্ছলে (Play-way in Education) শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এইগুলি সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই ক্রীড়াচ্ছল ছাড়া কৌতূহল, ভয়, গঠন-প্রবৃত্তি, সঞ্চয়ী-প্রবৃত্তি, যৌথ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকেই ক্লাশের পাঠন-ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য কাজে লাগান যাইতে পারে।

গ্রীক পুরাণে Pandora-র কৌতূহল লইয়া গল্প আছে এবং সেখানে দেখান হইয়াছে, এই আদিম কৌতূহল মানুষের অনেক ক্ষতিই করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া কথাটা সত্য নহে। কৌতূহলই মানুষকে প্রথম অজানার সন্ধানে প্রেরণা দিয়াছে এবং শিক্ষার ও সাধনার রুক্ষতাকে সুন্দরের অভিসারের আনন্দ দিয়া মধুরায়িত করিয়া তুলিয়াছে। ক্লাশের পাঠনের এবং ডিসিপ্লিনের শতকরা নব্বই ভাগই সিদ্ধ হইয়া যায়, যদি পাঠনের বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত করা যায়।

এইভাবে আস্ফালন প্রবৃত্তি, যৌথপ্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রায় সব প্রবৃত্তিগুলিকেই একটু উৎকর্ষিত করিয়া ক্লাসের পাঠান কার্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া প্রবৃত্তির যে একটি অনুভূতির দিক আছে, সেই অনুভূতির দিকটি অর্থাৎ আবেগ বা প্রক্ষোভ জিনিসটিও শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। শিল্প-কলা সম্বন্ধে আগ্রহ-সৃষ্টি করা, নীতি-ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করা, জাতীয়ত্বের প্রেরণা সৃষ্টি করা—এই সমস্ত ব্যাপারে শুষ্ক যুক্তিবাদের চেয়ে আবেগের আবেদন অনেক বেশী। এই আবেগকে জাগ্রত করিয়াই শিক্ষক তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ছাত্রদের প্রভাবিত করিতে পারেন।

নোদনা ও প্রেষণা
(Drive & Mitivation)

প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য লইয়া বিতণ্ডা নানা প্রকার থাকিলেও, প্রবৃত্তিকে যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই একমত যে, (১) ইহা একটি সহজাত জিনিস। (২) ইহা গোষ্ঠীর সকলের উপরই কার্যকরী।

কিন্তু নাইট্ (Knight), ডানল্যাপ (Dunlap), ওয়াটসন্ (Watson), হপকিন্স (Hopkins), বার্ণার্ড (Bernard), উড্ওয়ার্থ (Woodworth) প্রভৃতি মনস্তাত্বিকগণ কোনও প্রকার সহজাত বুদ্ধি বা কর্মপটুত্বকে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সমস্ত আচরণই অর্জিত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই জন্য প্রবৃত্তি (instinct) জিনিসটির অস্তিত্বে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এমনকি তাঁহাদের অনেকেরই পুস্তকে প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কোনও পরিচ্ছেদই দৃষ্ট হয় না। আর দুই একটি পুস্তকে যদি প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখও থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রবৃত্তিবাদকে খণ্ডন করিবার জন্যই, সমর্থনের জন্য নহে। অথচ প্রাণীদের আচরণের এমন কতকগুলি উদাহরণ পাওয়া যায় সেগুলিকে নিছক শিক্ষাসাপেক্ষ ক্রিয়া (learned activity) বলা যায় না। এ গুলিকে ইঁহারা বরং প্রবৃত্তিমূলক আচরণ (instinctive activity) বলিবেন, তবু প্রবৃত্তি (instinct) বলিবেন না। তাহা হইলে সেকেলে হইয়া যাইতে হইবে। তাহা যেন বড় অপবাদের কথা। কেহ কেহ এই জাতীয় ক্রিয়াগুলিকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত (inherited বা unlearned) ক্রিয়া বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রকার কথার মারপ্যাঁচ্ করিয়া প্রবৃত্তিবাদের মূল তত্ত্বটিকে অস্বীকার করা যায় না। যাহাই হউক যাঁহারা প্রবৃত্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না তাঁহারা প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহা দেখা যাউক।

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়াবাদ ঃ

কেহ কেহ বলেন, প্রাণীজগতের আচরণের মধ্যে সহজাত (instinct) কর্মপটুতা কিছুই নাই। তাঁহাদের মতে প্রাণীদের সমস্ত আচরণই উদ্দীপক

প্রতিক্রিয়া ও কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া দ্বারা বুঝান যায়। প্রাণীদের সমস্ত আচরণই জন্মোত্তর যুগের অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লিওনার্ড ব্লুমফীল্ড (Leonard Bloomfield) দেখাইয়াছেন, বিড়াল ও কুকুরের বৈরিতা অহি-নকুলের বৈরিতার মতই সহজাত বলিয়া সুপরিচিত। কিন্তু কুকুর ও বিড়াল শিশুকে একত্র পালন করিলে তাহারা বেশ বন্ধুভাবেই আচরণ করে। সুতরাং কোনও আচরণই সহজাতও নহে, নির্ব্বিকল্পও নহে। ওয়াট্‌সন (Watson) দেখাইয়াছেন, "ভয়" বলিয়া তথাকথিত প্রবৃত্তিটি আদৌ প্রবৃত্তি নহে। ইহা অভিজ্ঞতা দ্বারা সৃষ্ট হয়।

শুধু তাহাই নহে। প্রবৃত্তির (instinct) যাহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে সমভাবে ক্রিয়াশীলত্ব, তাহাও সর্বত্র লক্ষিত হয় না। দেখা যায় যে, তথাকথিত প্রবৃত্তিমূলক কাজগুলি প্রায়ই পরিবেশ-সাপেক্ষ। এই যুক্তির সমর্থন প্রসঙ্গে তাঁহারা নৃতত্ত্ববিদ্যার (Anthropology) বহু দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। রিভার (H. R. River) দেখাইয়াছেন যে, মারে নামক দ্বীপে অপত্যবৃত্তির প্রেরণায় আত্মজ সন্তান-পালন রীতি নহে। সেখানে পরের পুত্রকে পোষ্যপুত্র হিসাবে পালন করাই রীতি। সেখানে অধিক সংখ্যক পুত্র বা কন্যা হইলে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। মীড্ (Mead) লক্ষ্য করিয়াছেন যে, Manees সমাজে পিতাই করে লালন-পালন, মাতা নহে। কোন কোনও এস্কিমোদের মধ্যে যুযুৎসা প্রবৃত্তি নাই, সেখানে কলহের নিষ্পত্তি হয় একটা সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া। যে সঞ্চয়ী প্রবৃত্তি এতটা সার্বজনীন বলিয়া মনে হয় তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে সার্বজনীন নহে। কোন কোনও সমাজে পাহাড়, ঝর্ণা প্রভৃতি জিনিসগুলি পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়, আবার কোন কোনও সমাজে অলঙ্কার-পত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সামান্য দুই একটি জিনিস ব্যতীত বাকী সব জিনিসকেই আলোবাতাসের মত সর্বসাধারণের জিনিস বলিয়া ধরা হয়। আমাদের সমাজে প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তিটি একটি সর্বসাধারণ গুণ বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু এমন মনুষ্য সমাজও আছে যেখানে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা একেবারেই নিষিদ্ধ জিনিস। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা বা সঞ্চয়ী-বৃত্তির সংঘাতে সভ্য-

সমাজে কত হানাহানি, কত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়; কিন্তু Kwakinti Indians-দের মধ্যে এই হানাহানি নাই। স্বার্থের সংঘাতে কলহ যখন অনিবার্য হয়, তখন সেই কলহের নিষ্পত্তি হয় একটা যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া নহে, একটা ভোজের ব্যবস্থার মধ্য দিয়া। কাজেই যে প্রবৃত্তিকে একটা প্রাক্‌জন্মগত এবং অনিবার্য ও অপরিবর্তনশীল আচরণ বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়, সেই প্রবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ইঁহারা সন্দেহ করেন।

নোদনা বাদ (Drive) :

সেইজন্যই মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উডওয়ার্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রবৃত্তি বলিয়া কোনও জিনিসকে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, জীবজগতের কর্মের প্রেষণা প্রবৃত্তি নহে—"নোদনা" (drive)। এই নোদনার স্বরূপ কি? প্রথম প্রথম নোদনা বলিতে বুঝা যাইত ইহা এমন একটা শক্তি যাহা কোনও জিনিসকে গতিবেগ দেয় বা চালিত করে। পরে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনকামনা প্রভৃতি শারীরিক প্রয়োজনকেই নোদনার স্বরূপ বলিয়া ধরা হইয়াছিল। উডওয়ার্থ (Woodworth)-এর মতে এই নোদনাই (drive) নাকি জীব-জগতের সমস্ত কর্মের কারণ।

নোদনার শক্তি ও পারস্পরিক প্রভাব লইয়া পরীক্ষা হইয়াছে। ক্যানন (Cannon), কার্লসন (Carlson) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন, অল্প ক্ষুধা প্রাণীদিগের কর্মশক্তি ও মানসিক সতর্কতা বৃদ্ধি করে।

সিওয়াং (Hsiwang) নামে একজন চীনা মনস্তাত্ত্বিক সাদা ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যৌন-ক্ষুধার ঋতুর সময় (sexual cycle) স্ত্রী-ইঁদুরগুলির কর্মশক্তি অত্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

আমাদের নিশ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের সহিত কর্মশক্তির সম্পর্ক আছে কিনা, এই ব্যাপার লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইঁদুরের সমস্ত পিটুইটারি বা থাইরয়েড্ গ্রন্থি কাটিয়া ফেলা হইলে তাহার কর্ম-চাঞ্চল্য প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়া থাকে।

বিভিন্ন নোদনাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, জলের অভাব হইলে ক্ষুধার প্রেরণা কমিয়া যায়, ক্ষুধার তীব্রতা

যৌন কামনাকে হ্রাস করে ইত্যাদি। প্রত্যেক নোদনারই একটি প্রয়োজক আছে। যেমন খাদ্য হইতেছে প্রয়োজক এবং তাহার নোদনা হইতেছে ক্ষুধা, বৎস হইতেছে প্রয়োজক এবং বাৎসল্য হইতেছে নোদনা ইত্যাদি। দরজাবন্ধ খাঁচার মধ্যের কোনও জন্তুর সম্মুখে কোন্ প্রয়োজককে কতবার রাখিলে সে খাঁচার দ্বার খুলিয়া কতবার বাহির হয় তাহা দেখিয়া নোদনার তীব্রতা মাপিবার চেষ্টা হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখিলে কোন্ নোদনার কতটা শক্তি তাহার একটা হিসাব পাওয়া যাইতে পারে—

নোদনা (drive)	প্রয়োজক (incentive)	কতবার দরজা খোলা হইয়াছে (Number of crossing)
অপত্য ...	বৎস ...	২২.৪
তৃষ্ণা ...	জল ...	২০.৪
ক্ষুধা ...	খাদ্য ...	১৮.২
যৌনক্ষুধা ...	দয়িতা বা দয়িতের উপস্থিতি ...	১৩.২
অন্বেষণ চেষ্টা ...	নূতন সংস্থান ...	৬.৮

প্রেষণাবাদ (motivation):

কিন্তু মানুষের কার্যকলাপ এতই জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে নোদনার মত একটা নিছক শারারিক বা শারীর-রাসায়নিক প্রেরণা দিয়া তাহাদের সমস্ত আচরণকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের আচরণ শারীরিক প্রয়োজন বা শারীরিক প্রেরণা ব্যতীত জাতি, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, কলা, কৃষ্টি, আদর্শ প্রভৃতি নানা কারণেই নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু তাহাই নহে, দেহগত ক্ষুধা, তৃষ্ণা যৌনকামনা, অপত্য-প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়াও মানুষ (অন্ততঃ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ) তাহার জাতি, ধর্ম, আদর্শ প্রভৃতির জন্য একটা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কাজ করিয়া যায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া বৈজ্ঞানিক তাহার বিজ্ঞান-সাধনা করিয়া যান। যৌনকামনাকে অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মচারি সন্ন্যাসী তাঁহার সাধন-ভজন চালাইয়া থাকেন, অপত্য প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করিয়া ধাত্রীপান্নার মতো কত মহীয়সী মাতা প্রভুর কল্যাণের জন্য আত্মজ পুত্রের বলির ব্যবস্থা করেন, রাজভৃত্য বীরবর, দাতাকর্ণ প্রভৃতি আদর্শের জন্য স্বহস্তে পুত্রবধ

করিয়াছেন। ইঁহাদের এই সমস্ত আচরণকে নিছক সহজাত প্রবৃত্তি (instinct), উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া (Stimulus response) বা নোদনা (drive) প্রভৃতি দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। সেইজন্য মানুষের আচরণের প্রেরণার জন্য একটা ব্যাপকতর সংজ্ঞার প্রয়োজন। যে সমস্ত শক্তি মানুষকে তাহার এই সমস্ত বৈচিত্র্যময় আচরণে নিযুক্ত করে, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার পারিভাষিক নাম দিয়াছেন 'প্রেষণা'।

বিভিন্ন পণ্ডিত এই প্রেষণার স্বরূপ ও প্রসার লইয়া বিভিন্নরূপ কথা বলিয়াছেন। তবে এই সমস্ত প্রেষণার মধ্যে কাহার শক্তি কতটা অথবা তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কই বা কিরূপ, কোন্ প্রেষণা অন্য একটি প্রেষণার সহযোগিতা বা বিরোধিতা করে, তাহার সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে।

প্রয়োজক (incentive) :

তবে এই সমস্ত প্রেষণার শক্তি অথবা পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলেও, কতকগুলি জিনিসের প্রভাবে ইহাদের শক্তির তারতম্য ঘটান যাইতে পারে। শাস্তি, পুরস্কার, স্তুতি, নিন্দা প্রভৃতির দ্বারা প্রেষণাকে প্রভাবান্বিত করা যাইতে পারে। যে জিনিসগুলি এইভাবে প্রেষণাকে প্রভাবান্বিত করে তাহাদিগকে প্রয়োজক (incentive) বলা হয়।

এই প্রয়োজকগুলি কিভাবে আমাদের প্রেষণাকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে তাহা লইয়া বহু পরীক্ষা করা হইয়াছে।

ছোট ছোট বালকেরা অঙ্ক কষিতে ভালবাসে না। কিন্তু দেখা গিয়াছে, চকলেট খণ্ডের লোভ দেখাইলে ছাত্রদের কর্মশক্তি শতকরা ৫২% ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহার উপর আবার সফলতার জন্য প্রশংসা ও উৎসাহ দেওয়ার ফলে এই কর্মনৈপুণ্য প্রায় ৬২% ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

শাস্তি বা পুরস্কার ইতরপ্রাণীদের নোদনাকেও প্রভাবিত করে। গোলক ধাঁধাঁ হইতে বাহির হইতে শিক্ষা দিতে হইলে ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীকে খাদ্যের প্রলোভন দিতে হয়। সার্কাসের কুকুর, বানর প্রভৃতিকেও খেলা শিখাইবার সময় খাদ্যের প্রলোভন দেখাইতে হয়

শুধু কি পুরস্কারের লোভেই কর্মের প্রেরণা বৃদ্ধি পায়? শাস্তির ভয় দেখাইয়া অথবা সত্যিকারের শাস্তি দিয়াও কি কর্মপ্রেরণার বৃদ্ধি সাধন করা যায় না? যায়।

গোলক ধাঁধাঁ ধরণের পরীক্ষায় ইয়ার্কিস (Yearkes) এবং ডডেন (Dodden) দেখাইয়াছেন, সহজসাধ্য কাজের ব্যাপারে খানিকটা মাত্রা পর্যন্ত শাস্তির তীব্রতা অনুসারে কাজের নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কঠিন ও জটিল কাজগুলির ক্ষেত্রে ঐ নৈপুণ্য শুধু মৃদু শাসনেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কঠোর শাসনে মনোজগতের মধ্যে একটা বিকলতা আসে এবং তাহার ফলে কর্মনৈপুণ্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সাধনার সফলতা কিভাবে অগ্রসর হইতেছে সেই সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে অনেক সময় কর্মের প্রেরণা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

প্রশস্তি ও তিরস্কার কিভাবে আমাদের কাজকে প্রভাবান্বিত করে তাহা লইয়া হার্লক (Elizabeth Hurlock) গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম দলের ছাত্রদিগকে প্রতিদিন ভাল কাজের জন্য সুখ্যাতি করা হইত। দ্বিতীয় দলের ছাত্রদিগকে প্রতি দিনের মন্দ কার্যের জন্য তিরস্কার করা হইত। তৃতীয় দলকে স্তুতি নিন্দা কিছুই করা হইত না, তবে প্রথম দল দুটীর সাধনা ও সিদ্ধির ফলাফলের সংবাদগুলি তাদের জানান হইত। আর চতুর্থ দলটিকে সম্পূর্ণ অবহেলার মধ্যে রাখা হইত। তাহাদের নিজেদের কাজের সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য স্তুতি নিন্দাও করা হইত না এবং প্রথম দল দুইটির সাধনার ফলাফলের কথাও তাহাদের জানান হইত না। এই ব্যবস্থার প্রথমেই দেখা গেল, প্রথম দলটি শতকরা ৩৫ ভাগ উন্নতি করিল, দ্বিতীয় দলটি ৪০ ভাগ উন্নতি করিল এবং তৃতীয় দলটি ইহাদের অর্ধেক মাত্র উন্নতি করিল।

ইহার কিছুদিন পরে দেখা গেল, যে দলটিকে তিরস্কার করা হইত তাহাদের উন্নতির হারও কিছু হ্রাস পাইল। তৃতীয় দলটির উন্নতির হারও কিছুটা হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু যে দলটি সফলতার জন্য প্রসংসিত হইত তাহাদের উন্নতি ধীরে-ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শতকরা ৭৯-তে গিয়া পৌঁছাইল। অবহেলিত চতুর্থ দলটি প্রথম হইতেই কিছুই উন্নতি দেখাইতে পারে

নাই এবং ইহাদের কর্মশক্তির একটা বেশী রকম অবনতিও দৃষ্ট হয় নাই।

এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে ডাঃ হার্লক (Hurlock) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দু'চারদিন কাজ করিলেই যে সমস্ত সাধনায় সিদ্ধি আয়ত্ত হয় তাহাতে শাস্তি বা পুরস্কার, স্তুতি বা তিরস্কার প্রায় একই ভাবে কাজ করে। কিন্তু যে সব দুঃসাধ্য কার্যের সিদ্ধির জন্য দীর্ঘমিয়াদী সাধনার প্রয়োজন, তাহাতে তিরস্কার বা শাস্তির চেয়ে উৎসাহ ও প্রশংসাই অধিকতর ফলপ্রসূ।

তবে এই স্তুতি বা প্রশংসার আতিশয্য এই কর্মশক্তিকে হ্রাস করিয়া দেয়। প্রশংসার আতিশয্য অনেক সময়েই ছেলেদের মহামানী দুর্য্যোধন করিয়া তুলে। ফলে আত্মাদরের অনুভূতিতে তাহারা সাধনার কঠিন মার্গ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব সঞ্চিত সাধনার উপর সুদ খাটান মহাজনের মত নিশ্চিন্ত হইয়া আরাম করিতে চায়। এই জন্যই অনেক সময় দেখা যায়, উত্তম চরিত্রগুণের (Best conduct) পুরস্কার পাইবার পর ছেলেদের আচরণ যেন অবিনীত হইয়া উঠে এবং ডবল প্রমোশন বা স্থলভে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া ছাত্রদের কৃতিত্বের মান নামিয়া যায়।

এই সমস্ত পরীক্ষা ও তাহাদের সিদ্ধান্তগুলি খুব চমৎকার এবং তথ্যসমৃদ্ধ হইলেও, এই সব সিদ্ধান্ত লইয়া ব্যবহারিক জীবনে কিছু কিছু ভুল করিবার সম্ভাবনাও আছে। এই পরীক্ষাগুলির অধিকাংশই হইয়াছে ইঁদুর, গিনিপিগ্, খরগোস, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীদের লইয়া এবং কিছু কিছু হইয়াছে ছোট ছোট বালকবালিকাদের লইয়া। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রাণী মনোবিদ্যা (animal psychology) ও শিশু মনোবিদ্যা (child pspchology) এবং বয়স্ক মনোবিদ্যা (adult psychology) এক জিনিস নহে। কাজেই ইঁদুর, গিনিপিগ্ প্রভৃতির পক্ষে যাহা কর্ম-প্রেরণা, মানুষের পক্ষে তাহা সর্বতোভাবে সত্য নহে। মানুষ বাল্য-শৈশব ছাড়িয়া যতই সাবালক হইতে থাকে, তাহার আচরণ ততই প্রাণীদের অপেক্ষা বিভিন্ন হইতে থাকে। তখন ক্রমশঃই তাহার মধ্যে এমন একটা অবস্থা আসে যখন সে শাস্তি-পুরস্কার, স্তুতি-নিন্দা এমনকি সিদ্ধি-অসিদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়াই সাধনার পথে চলিতে পারে। গীতায়

এই কর্মকৌশল বা কর্মযোগের তত্ত্বটি ব্যাখাত হইয়াছে। এই কর্মযোগের যাহারা সাধক, সেই কর্মযোগীরা লাভ-অলাভকে সমান করিয়া, জয়ে-অ-জয়ে অবিচলিত থাকিয়া, স্তুতি-নিন্দাকে সমান চক্ষে দেখিয়া কর্মের পথে চলেন। কাজকে তাঁহারা investment বলিয়া মনে করেন না, বা সামান্য ব্যর্থতা ও পরাজয়ে অভিভূত হন না। ইঁহারা সিদ্ধি চিরায়িত হইলে বিলচিত হইয়া কর্ম-পরিত্যাগ করেন না, কর্মের কঠোরতা দেখিয়াও কর্তব্যভ্রষ্ট হন না।

এই কর্মযোগ কিভাবে সম্ভব? মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় যাহাকে রস (sentiment) বলে সেই রস হইতে অধিরাজ রস (master sentiment), অধিরাজ রস হইতে আমিত্ববোধ, নীতিবোধ, চরিত্রের বিকাশ, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর বহিয়া মনের মধ্যে বৈরাগ্যযুক্ত নিষ্কাম কর্মের অবস্থা মানুষের পক্ষে আসা সম্ভবপর। সেই সময়ে কর্মকে শুধু অবশ্য প্রতিপাল্য কর্তব্য (categorical imperitive) বলিয়া মনে করিয়াই লোকে তাহা করিয়া যাইতে পারে। সেই অবস্থায় নাম-যশের 'টোপ্'-এর প্রয়োজন হয় না, প্রতিযোগিতার উত্তেজনার প্রয়োজন হয় না, উৎসাহের মদের নেশার প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থায় কর্মযোগী পথের কাঁটাকে "রক্তমাখা চরণতলে" একলা দলিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হয়। তাহার ডাক শুনিয়া কেহ না আসিলেও, সে একলাই সাধনার দুর্গম পথের অভিযাত্রী হয়। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যে শিশুকে একদিন অঙ্ক কষাইবার জন্য দুইটি চকলেট্ খণ্ডের লোভ দেখাইতে হইয়াছে, বাহাদুরির খোরাক হিসাবে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিতে হইয়াছে, উত্তরকালে সেই বালকটীই হয়ত দিনের পর দিন আনন্দভোগের আমন্ত্রণকে অস্বীকার করিয়া নির্জন গবেষণাগারে জটিল গণিত-বিজ্ঞানের সাধনায় দিন কাটাইতেছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহার সাধনা হয়ত ব্যর্থ সাধনা, তাহার সিদ্ধি হয়ত দুরধিগম্য, কিন্তু তাহাতেও সে পশ্চাৎপদ হয় না। তখন আদর্শই তাহার প্রয়োজক (inncentive) এবং চরিত্রই ("চরিত্রের পথে" নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তাহার প্রেরণা।

বংশগতি ও উত্তরাধিকার
(Heredity*)

কবি বলিয়াছেন—

"এই প্রভাতের প্রসূনের কলি
হ'তে পারি আমি হায়
এই কি আমার শেষ পরিচয় ?
কেমনে মানিব তায় ?
কত অতীতের বরষা-বাদল,
কত মলয়ের পরশ কোমল,
রাঙায়েছে মোর পরাণের দল
কতবার তুলিকায়
বীজ হ'তে ফুলে, ফুল হ'তে বীজে
কত না ঘুরেছি হায় !"

কথাটা শুধু কবির উচ্ছ্বাসমাত্রই নহে ; প্রত্যেক মানুষের জীবনের ইতিহাসের মধ্যেই এই জাতীয় একটা জটিল আবর্তন ও বিবর্তনের রহস্য রহিয়াছে। অসংখ্য পূর্বপুরুষগণের কর্মসংস্কার এবং বহুবিস্মৃত অতীতের পরিবেশের প্রভাব লইয়াই আমাদের প্রত্যেকের আমিত্বটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমার বর্তমানের আমিত্বটুকুকে গঠন করিবার জন্য আমার পরিবেশই বা কতটা দায়ী এবং পূর্বপুরুষাগত উত্তরাধিকারই বা কতটা দায়ী ?

এ প্রশ্নের আলোচনার পূর্বে বংশগত উত্তরাধিকার (heredity) বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহার আলোচনা প্রয়োজনীয়।

বংশগত উত্তরাধিকার (heredity) **কি ?** : সাধারণের মতে উত্তরাধিকার হইতেছে এমন একটি দুজ্ঞেয় শক্তি, যাহার দ্বারা মাতা-পিতার

---

* বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরিভাষায় Heredityকে বংশগতি বলা হইয়াছে।

দোষগুণগুলি সন্তানাদির মধ্যে সংক্রমিত হয়। সাধারণের মতে মাতাপিতার সহিত সন্তানাদির গুণের সমতাই যেন উত্তরাধিকারত্বের কাজ—গুণের বৈষম্যের সহিত যেন উহার কোনও যোগ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতে, পিতৃপুরুষগণের সহিত সাম্য এবং বৈষম্যগত যাহা কিছু বিশিষ্টতা লইয়া জাতক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার সমষ্টিকেই উত্তরাধিকার বলা হয়; সুতরাং সুস্থ-সবল মাতাপিতার সুস্থ সন্তান হওয়া অথবা গৌরবর্ণ মাতাপিতার গৌরবর্ণ সন্তান হওয়া যতটা উত্তরাধিকারের বিষয়, তেমনি সুস্থ লোকের অসুস্থ সন্তান হওয়া, সুন্দর লোকের কালো ছেলে হওয়া, সৎ লোকের অসাধু ছেলে হওয়াটাও ততটাই উত্তরাধিকারের বিষয়। এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—

(১) কি নিয়মেই বা পুত্র পিতার গুণাবলী প্রাপ্ত হয়?

(২) কি নিয়মেই বা তাহার ব্যতিক্রম ঘটে?

উত্তরাধিকারের নিয়ম : উত্তরাধিকার ব্যাপারটি দুইটি নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যথা (১) সমজাতীয় গুণাবলী সমজাতীয় গুণাবলী সৃষ্টি করে, (২) এই সমত্বের মধ্যেও মাঝে-মাঝে বৈষম্য ও নূতনত্বের জন্য একটা ব্যগ্রতা দৃষ্ট হয়।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে এই নিয়মগুলি আসিল কোথা হইতে?

প্রথম নিয়মটি অর্থাৎ সমজাতীয় গুণাবলী সমজাতীয় গুণাবলী সৃষ্টি করে। ইহার হেতু হইতেছে, রেতঃ বা ধাতুর অপরিবর্তনীয়তা ও অমরত্ব। ওয়েইজম্যান (Weishman) বলিয়াছেন, শুক্রের শুক্রকীট বা বীজপঙ্কগুলি (Germ-plasm) শুধু জাতকের দেহ নির্মাণ করিয়াই নিঃশেষিত হয় না, জাতকের দেহ গঠন করিবার পরও কয়েকটি বীজকোষ (Germ cells) অবিকৃত অবস্থায় নরদেহে অবস্থান করিয়া ভবিষ্যতের বংশধরগণের মধ্যে দেহ হইতে দেহান্তরে চলিতে থাকে। সুতরাং জাতকের পিতা শুধু তাহার জননকর্তাই নহে, তাহাদের বংশের বীর্যধারার ন্যস্ত-সম্পত্তির রক্ষকও বটে। এই জন্যই একটি বিশিষ্ট বংশের বিশিষ্টতাগুলি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে গমন করিতে থাকে। পরিবেশ বা অনুশীলন বংশগত বিশিষ্টতার উপর তেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ফলে ভাল লোকের বংশে

ক্রমাগত ভাল লোক এবং মন্দ বংশে ক্রমাগত মন্দ লোকই জন্মগ্রহণ করিবে। গ্যাল্‌টন্, ডাগ্‌ডেল্ (Galton, Dugdale) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরিসংখ্যান (satistics)-এর দ্বারা ইহার প্রমাণও দিয়াছেন। তাঁহারা ভাল ও মন্দ লোকের বংশধারার ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভাল বংশে ভাল এবং মন্দ বংশে মন্দ লোক জন্মগ্রহণ করিবেই। উদাহরণস্বরূপ আমরা বৈজ্ঞানিক ডারউইন (Darwin) এবং বিখ্যাত অপরাধী জুকের (Jukc) বংশধারার ইতিহাস আলোচনা করিতে পারি। ডারউইনের বংশে ঠিক তাঁহার মতো না হইলেও, বহু কুশাগ্রধী মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে এবং জুকের বংশে অধিকাংশ লোকের মধ্যেই নানাজাতীয় অপরাধের কলঙ্কের ইতিহাস পাওয়া যায়।

গডার্ড (H. H. Gaddard)-এর ক্যালিকাক (Kalikak) বংশ সম্বন্ধে গবেষণাটি আরও চমকপ্রদ। ক্যালিকাকের দুইটি স্ত্রী ছিল; একজন ছিল নির্বোধ ও মূর্খ বংশজাত এবং আর একজন ছিল সুশিক্ষিত অভিজাত বংশজাত। এই প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত ৪৮০ জন লোকের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে একটি প্রাণীও দেশের গৌরবস্বরূপ হইতে পারে নাই; অপর পক্ষে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত বংশধারার ৪৯৬ জন লোকের মধ্যে বহু সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত নেতৃস্থানীয় লোকের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছিল।

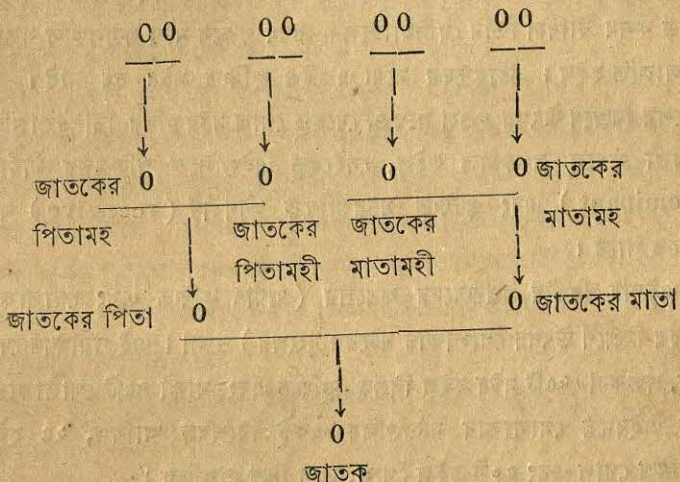
এই সমস্ত ঘটনা আমাদের মন নৈরাশ্যে পূর্ণ করিয়া দেয়। মনে হয়, তাহা হইলে কি মন্দ বংশে ভাল লোক জন্মগ্রহণ করিবে না? গ্যাল্‌টন বলেন, "না, কি করিয়া তাহা হইবে? আমড়া গাছে কি ন্যাংড়া আম ফলিতে পারে? পরিবেশ ও অনুশীলন কতটুকু কার্য করিতে পারে? বীর্যগত ধারার বিশিষ্টতা প্রায় অপরিবর্তনীয়। এই অপরিবর্তনীয় ধারার জন্যই দেখা যায় যে, একটি বিশিষ্ট বংশের লোকেরা দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট হয়, অন্য বংশের হয়ত কুঞ্চিত কেশ অথবা প্রশস্ত হনু অথবা কটা চক্ষু হয়।

এই উত্তরাধিকার কি পরিমাণে সংক্রামিত হয়? গ্যাল্‌টন্ বলেন—জাতক পিতার নিকট হইতে ১/২, পিতা পিতামহের নিকট হইতে

$\frac{১}{৪}$, প্রপিতামহের নিকট হইতে $\frac{১}{৮}$—এইভাবে বিশিষ্টতাগুলি পাইয়া থাকে।

কথাটা কিন্তু সর্বতোভাবে ঠিক নয়। নানা জাতীয় জটিল প্রভাব লইয়া জাতকের বর্তমান আমিত্বটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতকের মাতাপিতার দুইজন এবং তাহাদের মাতাপিতার চারজন, একুনে সাতজন—এইভাবে ঊর্দ্ধতন কুড়ি পুরুষ গণনা করিলে আমরা দশ লক্ষেরও অধিক সংখ্যক লোকের সন্ধান পাই। বর্তমান জাতকের মধ্যে এই বিরাট জনসঙ্ঘের প্রত্যেকেরই প্রভাব অল্প-বিস্তরভাবে কাজ করিতেছে।

এই উত্তরাধিকারিত্বের স্রোত কিভাবে প্রবাহিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত হিসাবটি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে।



এখানে ঊর্ধ্বতন চার পুরুষের উত্তরাধিকারিত্বের স্রোতটি দেখান হইয়াছে। এইভাবে ঊর্ধ্বতন কুড়ি পুরুষ যাইলে জনসংখ্যা কি বিরাট হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বিরাট জনসংখ্যার প্রত্যেকেই জাতককে কিছু না কিছু প্রভাবিত করিয়াছে।

ম্যাক্ ব্রাইড্ (Mc. Bride) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বীর্যের ধারাবাহিকতায় গ্যালটনের মত স্বীকার করেন বটে, তবে তিনি এ কথা বলেন না যে, একই বীজপঙ্ক (germ plasm) দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়। তিনি বলেন, একই বীজপঙ্ক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয় না বটে তবে এক জাতীয় জিনিস সংক্রমিত হইয়া থাকে।

মেনডেলীয় মতবাদ ঃ

এই ব্যাপারে মেন্‌ডেল সাহেবের (Mendel) পরীক্ষাটি (১৮৬৫ খ্রীঃ) আরও তথ্যপূর্ণ। তিনি দুই জাতীয় মটর সুটি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এক জাতীয় মটর শুখাইয়া যাইলে কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং আর এক জাতীয় মটর শুখাইয়া যাইলেও ঠিক গোলই থাকে। এই দুই জাতীয় মটরের জোড় কলম বাঁধিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রথম পুরুষে মটর ফসলগুলি সকলই গোলাকৃতি হইল। তাহাদের মধ্যে একটিও কুঞ্চিত মটর হয় নাই। দুই ফসলের মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়া সত্বেও, যেহেতু গোল মটরগুলির বিশিষ্টতাগুলিই পরবর্ত্তী ফসলে সংক্রমিত হইল, সেইহেতু এইগুলিকে শক্তিমত্তর বীর্যযুক্ত (dominant) এবং কুঞ্চিত মটরগুলিকে ক্ষীণবীর্য (recessive) বলা যাইতে পারে।

এইবার দ্বিতীয় পুরুষদের ফসলের (অর্থাৎ কুঞ্চিত এবং গোলাকার মটরের মিশ্রণে উৎপন্ন গোলাকার মটরের বংশের) পালা। এই পরীক্ষায় দেখা গেল, শতকরা ২৫টি মটর হইল বিশুদ্ধ কুঞ্চিত এবং বাকী ৭৫টি গোলাকার। তবে এইবারে গোলাকার মটরগুলির একটু বিশেষত্ব আসিল, ২৫ হইল অবিমিশ্র গোল এবং ৫০টি হইল গোল, তবে মিশ্র প্রকৃতির।

তৃতীয় পুরুষে দেখা যাইল, অবিমিশ্র গোল মটরগুলির সন্ততিগুলি ঠিক গোলই হইল, অবিমিশ্র কুঞ্চিত মটরগুলির সন্ততিও কুঞ্চিত হইল, কিন্তু প্রত্যেকটি মিশ্র প্রকৃতির মটর হইতে শতকরা ২৫টি মাত্র কুঞ্চিত এবং বাকী ৭৫টি পূর্ববৎ গোল (অর্থাৎ ২৫টি বিশুদ্ধ গোল এবং ৫০টি মিশ্র গোলাকৃতি) মটর হইল। ব্যাপারটা এইভাবে চার্টের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে।

গোল মটর + কুঞ্চিত মটর

(Dominant) | (Recessive)

↓

১ম পুরুষের ফসল ১০০% গোল

↓

২য় পুরুষের ফসল

২৫% গোল ৫০% মিশ্র ২৫%কুঞ্চিত

৩য় „ „ ১০০% গোল | ১০০%কুঞ্চিত

২৫% গোল ৫০% মিশ্র ২৫% কুঞ্চিত

এই পরীক্ষার পর মেণ্ডেল (Mendel) আরও নানা জাতীয় মটর এবং ছোট ছোট জন্তু লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে তিনি যে তিনটি সূত্র পাইয়াছিলেন তাহা এই :

(১) একটি গাছ বা প্রাণীর মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্য আছে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লইয়াই সে একটি একক (unit); কিন্তু প্রজনন ও উত্তরাধিকারের দিক দিয়া প্রত্যেক পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলিই এক একটি একক। আলোচ্য মটরগুলির ক্ষেত্রে তাহাদের গাছের রং, গাছের ঝাড়, ফুলের গঠন, ফুলের কুঞ্চন বা গোলত্ব—এইগুলির মধ্যে গোলত্বই তাহার উত্তরাধিকারের দিক দিয়া বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ অন্যান্য বিশেষত্ব নিরপেক্ষভাবেই এই বৈশিষ্ট্যটিই বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইবে।

(২) এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কতকগুলি ক্ষীণবীর্য এবং আর কতকগুলি শক্তিমত্তর।

(৩) যখন এই উভয়ের সংমিশ্রণে নূতন বংশের সৃষ্টি হয়, তখন প্রথম পুরুষের সন্ততিরা হয় মাতার, নয়তো পিতার শক্তিমত্তর (dominaut) গুণগুলি পাইবে—উভয়ের মিশ্র গুণগুলি পাইবে না।

এখন এই মেণ্ডেলীয় মতবাদ মানুষের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য হইবে? দেখা গিয়াছে, মানুষের ক্ষেত্রে চক্ষুতারকার রং, চুলের রং, আঙ্গুলের হ্রস্বতা, ওষ্ঠের স্থূলতা, নৈশান্ধতা প্রভৃতি dominant প্রকৃতির।

উত্তরাধিকারের দ্বিতীয় নিয়ম অর্থাৎ 'সমত্বের মধ্যেও মাঝে মাঝে বৈষম্য ও নূতনত্বের জন্য প্রকৃতির যে প্রবণতা' দৃষ্ট হয়, এইবার তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা জানি, পুত্রকন্যা বাপ-মার মত হইলেও, ঠিক সর্বতোভাবে তাহাদের মত হয় না—কিছু বৈষম্য থাকিয়াই যায়। মাতাপিতা হইতে পুত্রের বৈষম্যের দুইটি কারণ আছে। যথা।

(১) প্রকৃতির খামখেয়ালী ও আকস্মিকতা (Law of change)।

(২) বিশিষ্টের সাধারণ গড়ে (*average*) ফিরিয়া যাইবার প্রবণতা (Law of return to average)।

প্রথম নিয়মটি এইভাবে বুঝান যাইতে পারে। যদি ১০,০০০ লোককে উচ্চতা অনুযায়ী দাঁড় করান হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে হয়ত দুই তিন জন ৭ ফুটের অধিক এবং দুই এক জন ৪ ফুটের কম উচ্চ হইবে; আবার হয়ত দশ বার জন ৬ ফুট হইতে ৭ ফুটের মধ্যে এবং দশ বার জন ৪ ফুট হইতে ৫ ফুটের মধ্যে হইবে। এই ১০,০০০এর মধ্যে হয়ত দেখা যাইবে —৮০০০-এর উপর লোক ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি হইতে ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির মধ্যে হইবে।

এই ভাবে দেখা যাইবে, এই বিরাট্ জনতার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই অত্যন্ত দীর্ঘ অথবা অত্যন্ত খর্ব। শরীরের অনুপাত হিসাবে এই কথাটি যত সত্য, মানসিক শক্তি বা প্রতিভার প্রখরতার দিক্ দিয়াও ইহা ততখানিই সত্য। হয়ত এক সহস্রের মধ্যে একজন বা দুই-জন অলৌকিক প্রতিভাশালী লোক মিলিবে এবং একজন বা দুইজন একেবারে নির্বোধ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে—বাকী সকলেই প্রায় এক ধরণের হইবে। প্রকৃতির মধ্যে অসাধারণত্বের স্থান খুবই অল্প।

দ্বিতীয় নিয়মটি অনেকটা প্রথম নিয়মেরই মতো। প্রকৃতি অসাধারণের পক্ষপাতী নয়। তাই দেখা যায়, অত্যন্ত দীর্ঘ গঠনের মাতাপিতার সন্তানেরা সাধারণ লোকের অপেক্ষা দীর্ঘতর হইলেও এবং মাতাপিতা অপেক্ষা খর্বাকৃতি হইলেও, ঠিক বামন হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে পিতার সহিত পুত্রের শরীরের অনুপাতের যতটা সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে। প্রকৃতির এই সাধারণত্বের

দিকে প্রত্যাবর্তনের খেয়ালের জন্যই দেখা যায় যে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পুত্র হয়ত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে। প্রকৃতি যেন বুদ্ধি প্রভৃতি জিনিসগুলিকে গড়ে ঠিক রাখিতে চায়। তাহা না রাখিলে প্রকৃতির জাতিগত বিভিন্ন ছাঁচগুলি (type) নষ্ট হইয়া যাইত; দীর্ঘ মানুষের দীর্ঘতর পুত্র, সেই দীর্ঘতর পুত্রের আবার দীর্ঘতর পৌত্র, এইভাবে বাড়িয়া যাইলে তাহার বংশটি দৈত্যের বংশে পরিণত ইইত; অপর পক্ষে আবার বামনের বংশটি বালখিল্যের বংশে পরিণত হইত। এই জন্যই বোধহয় গড় ঠিক রাখিবার জন্য প্রভৃতির মধ্যে একটা ব্যস্ততা দৃষ্ট হয়।

কিন্তু এই সমের দিকের **প্রত্যাবর্তন-প্রবণতার** (law of return to average) জন্য যদিও পুত্রকন্যা মাতাপিতার গুণাবলী লাভ করে না, তাহা হইলেও এই নিয়মটি প্রাণীদিগের গোষ্ঠীগত সাদৃশ্য (type) বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

সমজাতীয় প্রাণীদিগের মধ্য হইতে অসমজাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হইয়া কি ভাবে নানা প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হইতেছে তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইলে **বিবর্তনবাদের** (evolution theory) আশ্রয় লইতে হয়।

বিবর্তনবাদী পণ্ডিত ল্যামার্ক (Lammarck : 1744-1829) বলেন, প্রাণীজগতের একটা **জীবন-প্রেরণা** (inner urge) সব সময়েই কাজ করিতেছে। এই জীবন-প্রেরণা জীবনের প্রয়োজন বুঝিয়া এবং পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইবার জন্য প্রাণীর মধ্যে দেহগত পরিবর্তন আনয়ন করে। পরে সেই পরিবর্তনটি তাহার পুত্রকন্যার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আজ যে জন্তুটিকে আমরা জিরাফ বলিয়া অভিহিত করি, সে হয়ত অতীত যুগে একদিন খাদ্য সন্ধানের জীবন-প্রেরণায় তাহার গলাটিকে বড় করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল এবং ক্রমাগত গলা বাড়াইয়া-বাড়াইয়া খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টার ফলে হয়ত তাহার গলাটি সত্য সত্যই একটু দীর্ঘতর হইয়াছিল। পরে তাহার বংশধরেরা দীর্ঘতর গলা লইয়া জন্মগ্রহণ করিল এবং ঐ একই জীবন-প্রেরণার বশে আরও দীর্ঘতর গলা লাভ করিয়াছিল। এইভাবে জীবন-প্রেরণাবশে অতীতের জেব্রা জাতীয় একটি প্রাণী বর্তমানের জিরাফে পরিণত হইয়াছে।

ডারউইন-মতবাদ :

বিবর্তনবাদী পণ্ডিত ডারউইন (Darwin : 1809-1828) বলিয়াছেন, পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাণিগণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, সেই দ্বন্দ্বে যে উপযুক্ততম হইতেছে, প্রকৃতি তাহাকেই যেন পছন্দ করিয়া বাছিয়া রাখিতেছেন, আর বাকী সকলকে জীবনের আসর হইতে দূর করিয়া দিতেছেন।

ডারউইনের মতে প্রকৃতি যেন দায়িত্বজ্ঞানহীন জননীর মত সৃষ্টির আনন্দে শুধু সৃষ্টিই করিয়া যাইতেছেন, তাহার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে খাদ্য অন্বেষণের প্রয়োজনে, খাদ্যের প্রাচুর্য ও অপ্রাচুর্যের মধ্যে নিজেদের খাপ খাওয়াইবার চেষ্টায়, এই সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হইতেছে। এই পরিবর্তনগুলি বংশক্রমে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন শ্রেণীর বিবর্তন হইতেছে এবং যে শ্রেণীটি বাঁচিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হইতেছে, সে-ই টিকিয়া যাইতেছে এবং বাকী সকলের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে।

যে জগতে আমরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া প্রীতির নীড় রচনা করিয়া সুখে পরম নির্ভরশীলতা লইয়া কাজ করিতেছি, সেই জগতটিকে ডারউইন (Darwin) যেন একটি গ্লাডিয়েটারের যুদ্ধ-ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিষ্করুণা স্পার্টান মাতার মতই প্রকৃতিও যেন অক্ষম পুত্রকে নির্মম ভাবে হত্যা করিয়া শুধু শক্তিমান পুত্রগুলি লইয়াই বাহাদুরী করেন। কাজেই জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার জন্য তাঁহার সৃষ্ট সন্তানদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চলিতেছে, ক্ষমতার প্রতিযোগিতা চলিতেছে, ভাইয়ে-ভাইয়ে হানাহানি ও বঞ্চনা চলিতেছে, বাঁচিবার আঁকুপাকুতে হিংসা দ্বন্দ্ব চলিতেছে।

এই মতবাদটি খানিকটা বিজ্ঞানের দিক দিয়া সত্য হইলেও, ইহা আমাদের আদর্শবাদকে আঘাত করে। সেই জন্য বের্গসঁয়ের (Bergson) **সৃজনপ্রবণ অভিব্যক্তি** (Creative Evolution)-বাদের ভিতর দিয়া ল্যামার্কের (Lammarck) সিদ্ধান্তটিই যেন আবার নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বিবর্তনবাদের অন্য একটি ব্যাখ্যা হিসাবে অধ্যাপক হিউগো (Prof. Hugo de Vries ; 1900) নামক পণ্ডিত তাঁহার **ব্যতিক্রমবাদ** (Mutation theory) উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি সান্ধ্য প্রিম্‌রোজ (Primrose) গাছের আচরণ দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল, গাছটি নূতন ধরণের ফুল প্রসব করিল, তাহার পর পরবর্তী বংশধরেরা ফুলের গঠনের দিক দিয়া গাছটির প্রাচীন গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যে ফিরিয়া না যাইয়া নূতন বৈশিষ্ট্যগুলিকেই গ্রহণ করিল। এই ভাবে এক দিনের হঠাৎ-ঘটা খেয়াল বা ব্যতিক্রমটিই উত্তরকালে নূতন এক শ্রেণীর (type) গাছের সৃষ্টি করিল।

প্রাণী জগতের মধ্যে এই ভাবে হঠাৎ-ঘটা পরিবর্তনটি স্থায়ী হইয়া গিয়া নূতন জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হওয়া প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যালটন (Galton) এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া ইহাকে একটি "পলিগনের" (polygon) উল্টাইয়া যাইয়া নূতন একটি ভূমিতে (base) ভর করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ানোর সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন।

শক্তি-গোষ্ঠীর প্রকল্প (Factorial hypothesis) :

এই প্রসঙ্গে মরগ্যান-এর (Morgan) 'Factorial hypothesis'-এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তরাধিকারের প্রথম নিয়ম অর্থাৎ "Like tends to beget like"-এর কারণ হিসাবে আমরা ওয়েইজম্যানের (Weisman) বীজপঙ্কের অমরত্ব ও অব্যাহত ধারার কথা ইতোপূর্বেই বলিয়াছি। মেণ্ডেলের মতবাদও পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই হিসাবে মেণ্ডেলের তত্ত্বটি উত্তরাধিকারের প্রথম নিয়মটিই বুঝাইয়া দেয় না, ইহা দ্বিতীয় নিয়মটিও অর্থাৎ সমজাতীয় জিনিস হইতে নূতন নূতন শ্রেণী (type) কি ভাবে সৃষ্টি হয়, তাহাও খানিকটা বুঝাইয়া দেয়। প্রজননের ভিতর দিয়া, সৃষ্টির বৈচিত্র্য কিভাবে বাড়িয়া যাইতেছে মরগ্যান তাঁহার 'Factorial hypothesis'-এ অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে এই প্রকল্প (hypothesis)-টি কি ?

মেণ্ডেলীয় (Mendelin) তত্ত্ব হইতে আমরা দেখিয়াছি, বীজের মধ্যস্থ gametes বা জননকোষই হইতেছে উত্তরাধিকারগত বৈচিত্র্যের কারণ। এই জননকোষগুলির মধ্যে ক্রমোসম (chromosomes) নামে এক প্রকার সূত্রাকার পদার্থ থাকে। প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদের বীর্যকোষের মধ্যেই কতকগুলি বিশিষ্ট সংখ্যক ক্রমোসম থাকে। মানুষের ক্রমোসমের সংখ্যা হইতেছে ৪৮ ; গোরু, পিঁয়াজ, গম ও গিনিপিগের ১৬ ; বানরের ৫৬, ইঁদুরের ৪০, আলুর ৩৭, তুলা গাছের ৫৬ ইত্যাদি।

মেণ্ডেলের পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের বিশ্বাস ছিল স্ত্রী পুরুষের ক্রমোসমের মিশ্রণ ও গ্রন্থন-বৈচিত্র্যের জন্যই জাতকের দেহ ও চরিত্রগত বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়।

মরগ্যান দেখাইয়াছেন, জাতকের চরিত্র বা দেহগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য ক্রমোসমই শেষ কথা নয়, তাহার মধ্যে আরও অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। ক্রমোসমের মধ্যে আবার Genes বা factors নামক আরও সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। প্রত্যেক ক্রমোসমের মধ্যে যতগুলি genes বা factors আছে, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই, তবে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, মানুষের ক্ষেত্রে পিতার বীর্যকোষ (sperm) ও মাতার ডিম্বকোষের (ova) মিশ্রণে যে নূতন কোষটির উদ্ভব হয়, তাহার শক্তির (factor) সংখ্যা, মিশ্রণ-বিন্যাস ও গ্রন্থনের দিক দিয়া দশ লক্ষেরও অধিক প্রকারের বিচিত্রতার সৃষ্টি হইতে পারে এবং এই বিচিত্রতা হইতেই প্রজননগত সৃষ্টিবৈচিত্র্য ঘটিতে থাকে।

মরগ্যান প্রজননের বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে gene বা factorকে আদি কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার তত্ত্বটিকে শক্তি-গোষ্ঠীর প্রকল্প (Factorial hypothesis) বলা হয়।

অর্জিত বৈশিষ্ট্য ও উত্তরাধিকার ঃ

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রজনন সম্বন্ধে দুইটি নিয়মের কারণ না হয় বুঝিলাম ; কিন্তু এই প্রজননের ব্যাপারটিকে মানুষ কতখানি প্রভাবিত করিতে পারে? প্রজননগত উত্তরাধিকার কি নিছক প্রকৃতির খেয়াল

অনুসারেই চলে? অথবা মানুষ তাহার জীবনের সিদ্ধি ও শক্তি অর্জনের সম্ভাবনাটিকেও তাহার ভাবী বংশের জন্য রিদ্ধি হিসাবে রাখিয়া যাইতে পারে?

এই সম্বন্ধে আরও একটি প্রশ্ন আছে। সেটি হইতেছে, পিতৃপুরুষের শক্তি বা প্রতিভার দান যদি আমরা নাও পাই, তাহা হইলে এই ইহ জীবনের চেষ্টায় উন্নতি করিতে পারি কি না? এই দুইটি প্রশ্নকে অন্য ভাষায় বলা যাইতে পারে (১) অর্জিত বৈশিষ্ট্য বা শক্তি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় কি না, এবং (২) পরিবেশ বা শিক্ষা বংশগত উত্তরাধিকার-দৈন্যকে ছাপাইয়া কাজ করিতে পারে কি না?

এখন প্রথম প্রশ্নটি অর্থাৎ অর্জিত বৈশিষ্ট্য (acquired traits) উত্তরাধিকার হিসাবে চলিতে পারে কি মা, এই বিষয়টি আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা মোটামুটি জানি, কাহারও যদি হাত কাটিয়া যায় অথবা পা ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে তাহার পুত্রও কাটা হাত বা খোঁড়া পা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। ওয়েইজম্যানের (Weisman) জননকোষের অমরত্ব ও ধারাবাহিকত্ব সম্বন্ধে তত্ত্বটি যদি সত্য হয় অর্থাৎ পিতার শুক্রের একটা অংশ যদি পুত্রের দেহ তৈয়ারী করিবার পর আবার সেই পুত্রটির ভাবী বংশসৃষ্টির জন্য পুত্রেরই দেহে অবিকৃত ভাবে রক্ষিত থাকে তাহা হইলে বয়স্ক জীবনের অর্জিত নূতন কোনও বৈশিষ্ট্য সেই সংরক্ষিত জননকোষকে আর পরিবর্তিত করিতে পারে না। সুতরাং অর্জিত বৈশিষ্ট্য পুত্র-কন্যার মধ্যে সঞ্চারিত হইতেও পারে না। এই সত্যটি পরীক্ষা করিবার জন্য ওয়েইজম্যান বংশপরম্পরাক্রমে ইঁদুরদের লেজ কাটিয়া লাঙ্গুলবিহীন ইঁদুর সন্ততির সৃষ্টি হয় কি না, পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, কোনও লেজকাটা ইঁদুরের লেজকাটা বাচ্চা হইল না, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলি (acquired traits) বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় না।

কিন্তু জীবতত্ত্ববিদ্ টমসন্ (Thomson) এবং গেড্‌স (Geddes) ওয়েইজম্যানের এই মতবাদে ততটা বিশ্বাস করেন না। ইঁহারা তাঁহাদের 'Evolution' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, কোনও উত্তেজনা (stimulas)

বার বার ঘটিতে থাকিলে প্রতিক্রিয়ার ফলটি স্নায়ুপথ তথা জৈবনিক সেতু (Protoplasmic bridges) পর্যন্ত সংপৃক্ত (saturate) করিয়া থাকে। তাহা হইলে অন্ততঃ কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে ইহার ফলটি দেহীর দেহস্থ জননকোষকে পর্যন্ত পরিবর্তিত করিতে পারে, ইহা ভাবিতে বাধা কোথায় ?

ইহা ছাড়া ওয়েইজম্যানের পরীক্ষাটি অন্যদিক দিয়াও সিদ্ধ নহে। লামার্ক বলিয়াছিলেন, অর্জিত বৈশিষ্ট্য জীবন-প্রেরণাবশেই বশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। এই মতবাদকে খণ্ডিত করিবার জন্যই অর্থাৎ অর্জিত বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয় না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই ওয়েইজম্যান দেখাইয়াছিলেন যে, লেজ-কাটা ইঁদুরের লেজ-কাটা সন্তান হয় না। কিন্তু এক হিসাবে ওয়েইজম্যানের মতবাদটি লামার্কের বিপরীত সিদ্ধান্তটিই অথাৎ জীবন-প্রেরণাবাদকেই প্রমাণ করে। বার্ণাড শ' বলিয়াছেন, ইঁদুররা যে তাহাদের লেজ হারায় নাই তাহার কারণ তাহারা হারাইতে চেষ্টা করে নাই। তিনি বলিয়াছেন, "A vital conception of evolution would have taught Weisman that biological problems are not to be solved by assults on mice."

অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইতে পারে কিনা—ইহা লইয়া ওয়েইজম্যানের (Weisman) পরীক্ষাই শেষ কথা নয়।

গ্রিফিথ (Grifflth) এবং ম্যাক্‌ডুগাল এই বিষয় লইয়া বহু পরীক্ষা করিয়াছেন। গ্রিফিথ সাহেব দেখাইয়াছেন, কতকগুলি ইঁদুরকে বাম দিক হইতে ডান দিকে এবং ডান দিক হইতে বামদিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘুরাইবার পর, তাহাদের মাথার দিকে একটি বিশিষ্ট বক্রতার সৃষ্টি হইয়া থাকে। পরে ঐ ইঁদুরগুলির সন্ততির মধ্যেও ঐ বিশেষত্বগুলি সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। অর্জিত বিশেষত্বগুলি যে পুত্র-কন্যার মধ্যে সঞ্চারিত হয় এই ঘটনাটি তাহাই প্রমাণ করিতেছে। তবে এই পরীক্ষাটির বৈজ্ঞানিকতা অনেকে স্বীকার করেন না। কারণ এই ইঁদুরগুলি লইয়া পরীক্ষা হইয়ছিল, তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে বিকৃতিগুলি পূর্ব হইতেই ছিল কিনা, তাহা দেখিয়া লওয়া হয় নাই।

ম্যাক্‌ডুগাল-এর পরীক্ষাগুলি আরও সুচিন্তিত ছিল। ইঁদুরগুলিকে জলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিভিন্ন পথ দিয়া পলায়ন করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। কয়েকটি পথ দিয়া যাইতে হইলে বৈদ্যুতিক শক্‌ লাগিত। ক্রমাগত ভুল করিতে করিতে তাহারা যে পথটিতে যাইলে শক্‌ লাগে না, সেই পথটি বাছিয়া লইবার কৌশলটি শিখিল এবং পরে ইহাও দেখা গেল যে, তাহাদের এই অর্জিত বুদ্ধিটি সন্তান-সন্ততির মধ্যেও সংক্রামিত হইল।

মর্‌গ্যান বলেন, ম্যাকডুগাল-এর এ পরীক্ষাও সিদ্ধ নহে। কারণ আমরা জানি, অর্জিত কৌশল-পটুতা কালক্রমে শিথিল হইয়া যায় অথবা অনভ্যাসে অধিকতর ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহা হইলে সেই পটুতা যে জন্ম-জন্মান্তরে সংক্রামিত হইল, ইহা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র।

অপর পক্ষে আবার ব্রাউন (Brown Sequard) দেখাইয়াছেন, কয়েকটি গিনিপিগের মেরুদণ্ডে আঘাত করিয়া তাহাদের মধ্যে যে পক্ষাঘাত আনয়ন করা হইয়াছিল সেই পক্ষাঘাত দোষটি তাহাদের সন্ততির মধ্যেও দৃষ্ট হইয়াছিল—অবশ্য এক ক্ষেত্রেই নহে। আচরণবাদী পণ্ডিত প্যাভলভ-এর পরীক্ষাও একই জাতীয় সিদ্ধান্তকেই নির্দেশ করে। তিনি কতকগুলি কুকুর লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। খাবার দেখিলে কুকুরদের মুখে লালা নির্গত হওয়া একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। প্রত্যেকবার খাবার দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি ঘণ্টা বাজান হয় তাহা হইলে পরে ঐ ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই কুকুরের মুখে লালা নির্গত হইবে (খাবার না দেখাইলেও)। এই ঘটনাটিকে আমরা "কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া" (conditioned reflex) নাম দিতে পারি। প্যাভলভ দেখাইয়াছেন, এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াটিও সন্তান-সন্ততিক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে চলিতে থাকে।

এইবার আমরা প্রজনন সম্বন্ধে শেষ প্রশ্নটি আলোচনা করিতে পারি। এই প্রশ্নটি হইতেছে পিতৃপুরুষের শুক্রগত প্রতিভা, সংস্কৃতি বা সম্ভাবনা না লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও, শিক্ষার জোরে আমরা উন্নতি করিতে পারি কি না। এই প্রশ্নটিকেই একটু ঘুরাইয়া বলা যাইতে পারে, আমাদের বিকাশের জন্য জন্মের

(heredity) প্রভাব বড়, না শিক্ষা ও পরিবেশের (enviroment) প্রভাব বড়?

গ্যালটন বলেন, শিক্ষা ও পরিবেশ শুধু জন্মগত সম্ভাবনাটিকেই ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তাহার অধিক কিছু করিতে পারে না।

স্যাণ্ডিফোর্ড প্রভৃতি বলেন, মানুষ দুইটি প্রভাবের দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করে। একটি হইতেছে বংশগতি (heredity) এবং আর একটি হইতেছে পরিবেশ (environment)। ইহাদের মধ্যে বংশগতি তাহার সম্ভাবনার সীমাকে নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, বংশগতি বুঝাইয়া দেয় তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, একটি ছেলেকে ২০ ফিট লম্বা করিতে পারিবে না, দুর্মেধা বালককে পণ্ডিত করিতে পারিবে না, বোবাকে গায়ক করিয়া তুলিতে পারিবে না, ইত্যাদি।

পরিবেশ জাতকের শিক্ষা, সাধনা, অভ্যাস, সুযোগ, সুবিধা প্রভৃতি যে সমস্ত ঘটনা বা শক্তিগুলি তাহার জন্মের পর হইতে কার্য করে, তাহাদের সম্মিলিত প্রভাবকেই বুঝায়। এই পরিবেশ মানুষের বংশগতি হইতে প্রাপ্ত সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তুলে। পরিবেশ প্রতিকূল হইলে সেই সম্ভাবনাগুলি ফুটিয়া উঠে না। মাথায় আঘাত পাইলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তিও জড়বুদ্ধি হইয়া উঠিবে, শারীরিক আঘাত প্রভৃতিতে হয়ত কাহারও পা ছোট হইয়া যাইবে।

লক্ (Locke) বলিয়াছেন, মানুষের যাহা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, তাহা আসে অনুভূতির দ্বার বহিয়া। সুতরাং জন্মের সময় হইতে দুইটি শিশুকে যদি আমরা একই প্রকার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া মানুষ করি, তাহা হইলে দুইটি শিশুরই শিক্ষা-দীক্ষা একই রকম হইবে।

ফরাসী পণ্ডিত হাল্‌ভিটিয়ুস (Halvitius) মোটামুটি লক্-এর পথ অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, মানুষের চরিত্রগত, রুচিগত, শক্তি ও সামর্থ্যগত যাহা কিছু বৈচিত্র্য আছে, তাহা হয় শিক্ষা ও পরিবেশের জন্য।

অবশ্য এক দিক দিয়া তিনি লক্-এর মতের অনুবর্তন করেন না। তিনি বলেন, অনুভূতিই যদি শিক্ষার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে জন্ম হইতে যে

বালক শ্রেষ্ঠতর অনুভূতির যন্ত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারই শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর উন্নতি হইবে। তাহা হইলে লক্-এর মতবাদ দিয়াই আবার বংশগতির পক্ষেও ওকালতি করা যাইতে পারে। সেইজন্য হাল্‌ভিটিয়ুস বলিয়াছেন, শুধু অনুভূতির যন্ত্রই আমাদের শিক্ষা দান করে না। আমাদের আগ্রহ বা উৎসাহের দ্বারা আমরা অনুভূতির জিনিসগুলিকে যে ভাবে গ্রহণ করিব তাহারই উপর অনুভূতির প্রভাব নির্ভর করে। এই আগ্রহ প্রভৃতি সর্বসাধারণের সম্পত্তি, সুতরাং সর্বসাধারণেরই শিক্ষার দ্বারা বড় হইবার সুযোগ আছে।

মিল্ (J. Mill) বলিয়াছেন, "If education does not perform every thing, there is hardly anything that it does not perform."

হার্বার্ট (J. F. Herbart: ১৭৭৬-১৮৪১) বলেন, মানুষের আত্মা হইতেছে তাহার অর্জিত (শিক্ষালব্ধ) ভাবধারা ছাড়া আর কিছুই নহে। হেওয়ার্ড (Dr. F. H. Hayward) বলিয়াছেন, এখন হার্বার্ট-এর তত্ত্বটি পুরাপুরি ভাবে মানা চলে না বটে এবং এখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষ কতকগুলি ভালমন্দ সংস্কার বা সংস্কৃতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে ; তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই সমস্ত প্রাক্‌জন্মগত সম্ভাবনায় চেয়ে জন্মের পরবর্তী অধ্যায়ে শিক্ষা দীক্ষাগুলির প্রভাবই অধিকতর। ঝুক্ (Juke) বংশের ইতিহাস দেখাইয়া গ্যালটন যে বংশগতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, হেওয়ার্ড তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের জন্য "Barnardo Homes" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অতি নিম্ন শ্রেণীর মানুষের উপাদান লইয়া শিক্ষার গুণে সেই সমস্ত উপাদান হইতে সভ্য-ভব্য মানুষ তৈয়ারি করে।

'বংশগতি ও পরিবেশ' লইয়া এই সমস্ত দর্শন ও তত্ত্বমূলক আলোচনা বাদ দিয়া যদি আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের সন্ধান করিতে যাই, তবে এই ব্যাপার লইয়া যমজ শিশু এবং অনাথ-আশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রতি-পালিত শিশুদের যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়াছে, সেইগুলি লক্ষ্য করা উচিত। এই

ব্যাপার লইয়া গ্যালটন, থর্ণডাইক, মেরীম্যান, লওতারব্যাক প্রভৃতি মণীষিগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে, সাধারণ ভ্রাতা-ভগিনীর চেয়ে যমজদের বংশগতির ঐক্য অধিক, সুতরাং বংশগতির প্রভাব যদি বেশী হয় তাহা হইলে অনাথ আশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেখানে একজাতীয় শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে বহু মাতাপিতার সন্তান একত্র প্রতিপালিত হয়, তাহাদের উন্নতিও এক জাতীয় হইবে।

সমজাতীয় যমজ (identical twins) লইয়া পরীক্ষা ঃ

যমজদিগকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সমজাতীয় (identical) ও অসমজাতীয় (fraternal) এই ভাগে ভাগ করা হয়। সমজাতীয় যমজগুলি একই ডিম্বকোষ (ova) হইতে উদ্ভূত হয়। ইহাদের গায়ের রং, চুল ও চক্ষু তারকার রং, মুখের গঠন, মাথার গঠন, আঙ্গুলের রেখার ছাপ, এমন কি মাথার স্নায়ুতন্ত্রের সংস্থান একই প্রকারের হয়। অসমজাতীয় যমজগুলি একই সময়ে প্রজননের দ্বারা সৃষ্ট হয় বটে, তবে তাহারা একই ডিম্বকোষ ও বীর্যকোষ (spermatoza) দ্বারা সৃষ্ট হয় না। ইহাদের মধ্যে দেহগত সাদৃশ্য ততটা দৃষ্ট হয় না বটে, তবে সাধারণ সহোদর ভাইবোনের মধ্যে যতটা সাদৃশ্য আছে, তাহার চেয়ে বেশী সাদৃশ্য থাকে। বলা বাহুল্য, সমজাতীয় যমজেরা সমলৈঙ্গিক হয় ; অর্থাৎ তাহারা দুইজনেই ভাই বা দুইজনেই বোন হয়। মনোবিদ্যার গবেষণা এই সমজাতীয় যমজদের লইয়াই ভাল হয়।

গ্যাল্‌টন্ ৮০ জোড়া যমজ শিশু লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সমজাতীয় এবং অসমজাতীয় দুই প্রকারেরই যমজ শিশু ছিল। গ্যালটন্ দেখিয়াছিলেন, সমজাতীয় যমজগুলিকে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত করিলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্যগুলি যেন অনিবার্য ভাবে ফুটিয়া উঠে। বিপরীত পক্ষে বিভিন্ন পিতামাতার যমজ সন্তানগুলি একই পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও তাহাদের দেহগত বৈশিষ্ট্য ও আচরণ বিপুলভাবে পৃথক হইয়া পড়ে। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া গ্যালটন্ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, পরিবেশের চেয়ে বংশগতিই বলবত্তর।

ইহার পর ১৯০৫ সালে থর্ণডাইক ৫০ জোড়া যমজ শিশু লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। এই ৫০ জোড়া যমজ শিশুর সহিত ৫০ জোড়া সহোদর একই পরিবেশে প্রতিপালিত হইল। পরে ইহাদের উপর বুদ্ধি মাপকের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত ছয়টি করিয়া প্রশ্নগুচ্ছ দেওয়া হইল। দেখা গেল, এই পরীক্ষায় যমজ শিশুগুলির সফলাঙ্কের (score) সাদৃশ্য সাধারণ সহোদরদিগের সফলাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এই সকল পরীক্ষা হইতেও এইটুকু সিদ্ধান্ত করা অনায়াসেই যায় যে, বংশগতিই পরিবেশের চেয়ে বলবত্তর।

আরও পরবর্তী যুগে উইংফিল্ড (A. H. Wingfield) এই ব্যাপার লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষায় সমজাতীয় যমজ, অসমজাতীয় যমজ, সহোদর এবং পরস্পর সম্পর্কিত বালকবালিকা এই সব শ্রেণীরই বালক বালিকা লইয়াই বুদ্ধিমাপকের প্রশ্নগুচ্ছ দিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। দেখা গিয়াছিল যে বুদ্ধি, স্মৃতি, গণিতে পারদর্শিতা, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি ব্যাপারে পরস্পর অসম্পর্কিত বালক বালিকাদের চেয়ে জ্ঞাতিদের মধ্যে, জ্ঞাতিদের চেয়ে সাধারণ সহোদরদিগের মধ্যে, সহোদরদিগের চেয়ে অসমজাতীয় যমজদের মধ্যে এবং অসমজাতীয় যমজদের চেয়ে সমজাতীয় যমজদের মধ্যে সাদৃশ্য উত্তরোত্তর অধিকতর ভাবে দৃষ্ট হইয়াছিল। কাজেই এই পরীক্ষাতেও বংশগতির শক্তিটাকে বেশী বলিয়া মনে হইয়াছে।

সমজাতীয় যমজদিগকে বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত করিয়া বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব পরীক্ষা করা হইয়াছিল। নিউম্যান্ (H. Newman) ফ্রাঙ্ক্ ফ্রিম্যান্ (Frank N. Freeman) এবং কার্ল হল্‌জিঙ্গার (Karl, Hol. J. Zinger) নামে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক ১৯ জোড়া সমজাতীয় যমজকে একই পরিবেশে এবং পরে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পালিত পুত্র হিসাবে মানুষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে তাহাদের আকৃতি, ওজন, বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) প্রভৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হয়। এই সব পরীক্ষায় যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

	একত্রপালিত যমজদের বৈসাদৃশ্য	অন্যত্র পালিত যমজদের বৈসাদৃশ্য
উচ্চতা	১·৭ সেন্টিমিটার	১·৮ সেন্টিমিটার
ওজন	৪·১ পাউণ্ড	৯·৯ পাউণ্ড
বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)	৫ হইতে ৬ পয়েন্ট	৮ হইতে ৯ পয়েন্ট

এই তথ্য হইতে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন পরিবেশে (অর্থাৎ খাদ্য, পুষ্টি জলবায়ু, ব্যায়াম, শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতিতে) দৈহিক ওজনটাকে খানিকটা প্রভাবিত করা যাইলেও, উচ্চতাকে যেমনভাবে প্রভাবিত করা যায় না।

তবে পরিবেশের বিভিন্নতা বুদ্ধ্যঙ্কের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। এই ১৯ জোড়া যমজকে লইয়া এক জাতীয় পরিবেশে ও বিভিন্ন জাতীয় পরিবেশে মানুষ করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, একজাতীয় পরিবেশে তাহাদের বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য ৫ হইতে ৬ পয়েন্টের বেশী হয় নাই, কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে এই পার্থক্যটি কখন কখনও ১০ হইতে ১১ পয়েন্ট পর্যন্ত হইয়াছিল।

শিক্ষা দীক্ষা মানুষের বুদ্ধ্যঙ্ককে অনেকখানি প্রভাবিত করে। দুইটি যমজ ভগিনীর মধ্যে একটিকে মুর্খ পরিবারে এবং আর একটিকে শিক্ষিত পরিবারে মানুষ করা হইয়াছিল। মূর্খ পরিবারে প্রতিপালিতা বালিকাটি কোনও দিনই ৯২ এর বেশী বুদ্ধ্যঙ্কের পরিচয় দিতে পারে নাই, অথচ তাহারই যমজ ভগিনীটি শিক্ষিত পরিবারের মানুষ হইবার সুযোগ পাইয়া ১১৬ বুদ্ধ্যঙ্কের পরিচয় দিয়াছিল এবং কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিল।

পালিত শিশু লইয়া পরীক্ষা :

পরিবেশ ও বংশগতির প্রভাব পরীক্ষা করিবার জন্য পালিত শিশু (foster children) লইয়াও গবেষণা করা হইয়াছিল। ষ্ট্যান্‌ফোর্ড (Stanford) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বারবারা বার্ক (Barbara S. Burke) এই ব্যাপারটি লইয়া গবেষণা করেন। পালন ও পরিবেশের প্রভাবে পালিত শিশুগুলি কি পালক-পিতার অনুরূপ গুণাবলী প্রাপ্ত হয় অথবা তাহাদের নিজ নিজ জনকের দোষগুণগুলি তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া উঠে—ইহাই ছিল তাঁহার পরীক্ষার বিষয়। তিনি ২১৪টি পালিত শিশু এবং ১০৫টি সাধারণ শিশু (যাহারা

নিজ নিজ মাতা-পিতার নিকট মানুষ হইতেছে) লইয়া গবেষণা করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, অন্যত্র প্রতিপালিত শিশুগুলি তাহাদের পালক-পিতার গুণাবলী খুব কমই গ্রহণ করে ; পালক-পিতার পুত্র-কন্যার সহিত একই ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াও এবং একই পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াও তাহারা যেন অনিবার্যভাবে নিজ নিজ মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্যগুলিই অর্জন করিতে থাকে। পালিত শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতিতেও বংশগতির প্রভাবটাই সমধিক ভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই ব্যাপারে পরীক্ষা করিয়া ডঃ বার্ক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধ্যঙ্ক প্রভৃতির ব্যাপারে বংশগতির প্রভাব পরিবেশের প্রভাবের চেয়ে চার পাঁচ গুণ শক্তিশালী।

এই ব্যাপারটিরই অন্য একটি দিক লইয়া চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি ম্যান সাহেব পরীক্ষা করেন। তাঁহার প্রশ্ন ছিল পালন-গৃহ (foster homes) পালিত শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ককে প্রভাবান্বিত করিতে পারে কি না। বিভিন্ন পালনগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বে ও পরে তিনি ছেলেদের বুদ্ধ্যঙ্কের পরীক্ষা করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, চার পাঁচ বৎসর নূতন গৃহ-পরিবেশে অবস্থানের পর বালকগুলির বুদ্ধ্যঙ্ক ৭·৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা খুব ভাল পরিবেশে মানুষ হইয়াছিল তাহাদের মনস্বিতাংশ আবার ১০·০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মিঃ ফ্রিম্যান সহোদর ভাইবোনকেও বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভিন্ন গৃহে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। পাঁচ বছরের কিছু বেশীদিন এই ভাবে প্রতিপালিত হইবার পর তাহাদের মনস্বিতাংশের পরীক্ষা করা হইল। দেখা যাইল, যে সমস্ত সহোদরগুলি পিতৃ-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন সহোদরগুলির বুদ্ধ্যঙ্কের যথেষ্ট পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফলে, ফ্রিম্যানের সিদ্ধান্তটি ডঃ বার্কের সিদ্ধান্তের প্রতিস্পর্ধী হইয়া দাঁড়াইল। বার্ক মনে করিয়াছিলেন, বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যাপারে বংশগতির প্রভাবই বলবত্তর, আর ফ্রিম্যান প্রমাণ পাইলেন যে, ভাল গৃহপরিবেশ এই বুদ্ধ্যঙ্ককেও অনেকখানি পরিবর্তিত করিতে পারে। তবে বার্ক ও ফ্রিম্যানের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে মূলতঃ দ্বন্দ্ব খুব বেশী নাই। কারণ বার্ক এ কথা বলেন নাই যে, পরিবেশ বুদ্ধ্যঙ্ককে

একেবারেই পরিবর্তিত করিতে পারে না, আর ফ্রিম্যান্‌ও বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যাপারে বংশগতির প্রভাবকে একেবারে তুচ্ছ করেন নাই।

বন্য পরিবেশে প্রতিপালিত শিশু লইয়া পরীক্ষা :

পরিবেশের প্রভাব জাতকের আদিম গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে কতখানি পরিবর্তিত করিতে পারে তাহা জঙ্গলের পরিবেশে বন্যজন্তু কর্তৃক প্রতিপালিত বালক বালিকাদের ইতিহাস হইতে অনেকখানি বুঝিতে পারা যায়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সের আবেঁর (Averon) জঙ্গলে একটি বন্যশিশুকে ধরা হয়। জিন ইটার্ড (Gean Itard) তাহাকে সভ্য ও শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। বালকটি কিছুতেই মানুষের মত আচরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। "ভিক্টর" এই নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকিলে সে শুধু তাহাতে সাড়া দিত, আর দু' চারটি মাত্র শব্দ বুঝিতে ও উচ্চারণ করিতে পারিত।

এই বালকটির ইতিহাস হইতে অবশ্য কোনও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ বালকটি জন্ম হইতে একেবারে জড় বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল কিনা, তাহা আমাদের জানা নাই। কাজেই তাহার ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যর্থতা তাহার শৈশব পরিবেশের প্রভাবে হইয়াছিল অথবা তাহার জন্মগত নির্বুদ্ধিতার জন্য হইয়াছিল তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের এক জঙ্গলে নেকড়ে বাঘের দ্বারা প্রতিপালিত দুইটি বালিকাকে পাওয়া যায়। পরে ইহাদের নাম দেওয়া হয় অমলা ও কমলা। আমলার বয়স ছিল ২ বৎসর এবং কমলা ছিল প্রায় ৯ বৎসরের। ইহারা বন্যজীবনে চার পায়ে (হাতে ও পায়ে হামা দিয়া) ছুটাছুটি করিত, জিভ দিয়া চাটিয়া পানীয় দ্রব্যাদি পান করিত, থাবা ও দাঁত দিয়া আক্রমণ করিত, বাঘের মতই দন্ত বিকাশ করিয়া গর্জন করিত। ধরা পড়িবার পর অমলা শীঘ্রই মারা যায়, তবে কমলা আরও ৯ বৎসর বাঁচিয়াছিল। সে কাপড় পরিতে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে, হাত মুখ ধুইতে ও হাত দিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিল। তবে তাড়াতাড়ি যাইবার প্রয়োজন হইলে সে হামা দিয়াই ছুট দিত।

ক্রমশঃ সে তাহার বন্য অভ্যাস ত্যাগ করিয়া খানিকটা সভ্য হইয়াছিল। সে প্রায় ১০০টি শব্দ শিখিয়াছিল এবং কিছু কিছু হুকুম তামিল করিতে শিখিয়াছিল। শেষের দিকে সে অন্যান্য ছেলেমেয়ে দেখিলে গর্জন করিয়া আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিত না বরং তাহাদের খেলাধূলায় যোগ দিত।

এই কমলার ইতিহাস হইতেও অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা মনোবিদ্‌গণ কর্তৃক খুব বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত করা হয় নাই।

সাল্‌ভেডর (salvador) দেশের জঙ্গলে আর একটি বন্যশিশুকে পাওয়া যায়। যখন তাহাকে ধরা হয় তখন সে শুধু "তামাসা" এই কথাটি উচ্চারণ করিতে পারিত। "তামাসা" শব্দটি ঐ দেশের একটি গ্রামের নাম। মনুষ্য সমাজে প্রতিপালিত হইবার পর সে কাপড়-জামা পরা, স্নান করা ইত্যাদিতে রাজী হইত এবং শব্দ সম্পদও কিছু কিছু আরত্ত করিয়াছিল। তবে মাতা পিতার নাম সে কোনও দিনই স্মরণ করিতে পারে নাই।

বন্য পরিবেশের প্রভাব মানবশিশুকে কতখানি বন্য করিয়া তুলিতে পারে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ঘরের ছেলেদের বনে বাঘ ভাল্লুকদের হাতে সঁপিয়া দেওয়া যায় না। তবে বনের জানোয়ারকে ঘরের ছেলের সঙ্গে প্রতিপালিত করিয়া মনুষ্য পরিবেশের প্রভাব বন্যদের কতটা সংস্কৃত করিতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। কেলগ্‌ সাহেব (W. N. Kellog) এই দিক দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি গুয়া নামে সাড়ে সাত মাস বয়সের একটি শিম্পাঞ্জীকে তাহার দশ মাস বয়স্ক পুত্র ডোনাল্ড্‌ (Donald)-এর সহিত একই ভাবে প্রতিপালিত করিতে লাগিলেন। গুয়া সোজা হইয়া চলিতে ফিরিতে, করমর্দন করিতে, গ্লাস হইতে পানীয় গ্রহণ করিতে, কাঁটা চামচ লইয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে, দরজার খিল খুলিতে ও পেন্সিল লইয়া ইজি-বিজি লিখিতে শিখিয়াছিল। অশিক্ষিত লোকদিগের যে ভাবে বুদ্ধি পরীক্ষা করা হয় সেই জাতীয় পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, গুয়া এবং ডোনাল্ড প্রায় একই প্রকার বাহাদুরি দেখাইয়াছিল। তবে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে দুইজনের মধ্যে পার্থক্যটা অত্যন্ত বেশী ভাবে প্রকট হইয়াছিল। তাহা হইলেও

ভাষাগত নির্দেশ পালনের ব্যাপারে অর্থাৎ "ওরূপ করিও না" "বাঁশী বাজাও" "লাফ দাও" "বসিয়া পড়" "উঠিয়া দাঁড়াও" "তোমার নাক কোন্‌টি" ইত্যাদি প্রশ্ন বা আদেশে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে গুয়া খুব পিছাইয়া ছিল না। ১৬½ মাস পরে গুয়া ৫৮টি নির্দেশ নিভু ল ভাবে পালন করিতে পারিত এবং ডোনাল্ড পারিত ৬৮টি। তবে মানব শিশু ডোনাল্ড বানর শিশু গুয়ার চেয়ে যে কয়েক মাসের বড় ছিল তাহাও মনে রাখিতে হইবে। কেলগের এই পরীক্ষা হইতে মনে হয়, শিক্ষার ব্যাপারে পরিবেশের প্রভাবটাই বলবত্তর।

সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ লইয়া পরীক্ষা ঃ

পরিবেশের প্রভাব লইয়া ক্যাটেল্ (Cattel)-এর পরীক্ষাগুলিও এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৯০৬ সালে তিনি তাঁহার গবেষণার সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ১০০০ জন বৈজ্ঞানিকের জীবনের উপর বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল বংশগতির প্রভাবের অনিবার্যতা সম্বন্ধে গ্যাল্‌টন্, পিয়ারসন প্রভৃতি যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক নয়। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের জীবন সাফল্যের উপর পরিবেশের প্রভাবই অধিকতর কার্যকরী হইয়াছিল। পরে ১৯১৫ এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দেও তিনি এই একই বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন তাহাতে তাঁহার পূর্ব সিদ্ধান্তই দৃঢ়তর হইয়াছিল।

আমেরিকার ক্যাটেল্ যেমন বৈজ্ঞানিকদিগকে লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে সেইরূপ গর্ডন (Gordon) নৌকার মাঝি-মাল্লা ও জিপ্‌সি বালকদের লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সমাজ-পরিবেশের দীনতার জন্য এই সমস্ত বালকদিগের মনস্বিতাংশের হার অত্যন্ত কম ছিল। অধিকাংশ বালককেই প্রায় জড় বুদ্ধির সীমারেখায় দেখা গিয়াছিল এবং তাহাদের মনস্বিতাংশের গড় ছিল ৬৯·৬। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করা গিয়াছিল। দেখা গিয়াছিল, ৪ হইতে ৬ বৎসর বয়সে যে-সকল বালকের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ ছিল, তাহাদেরই বুদ্ধ্যঙ্ক ১২ হইতে ২২ বৎসর বয়সে ৬০এ নামিয়া আসিয়াছিল। ইহা হইতে এইটুকুই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে-সমস্ত বালক প্রায় সাধারণ

বুদ্ধি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই ক্রমশঃ পরিবেশের সুযোগ সুবিধার অভাবে মূর্খ জড়টি হইয়া উঠিয়াছে।

আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের নির্জন পার্বত্য অঞ্চলের বালকবালিকাদের লইয়াও অনুরূপ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সমস্ত তথ্য হইতে বংশগতি ও পরিবেশের মধ্যে কোন্‌টি বলবত্তর তাহা জোর করিয়া বলা যায় না, বরং এইটুকুই বলিতে ইচ্ছা করে, মানুষের বৈশিষ্ট্যের বুননের মধ্যে এই দুইটিই টানা-পোড়েনের কাজ করিয়া ইহাকে পূর্ণতা দান করে। বস্তুতঃ মানসিক পরিণতি শুধু স্বতস্ফূর্ত বিকাশ মাত্র নহে এবং পরিবেশ শুধু আদিম সম্ভাবনার বিকাশ বা বিনাশই করে না, ইহার নিজস্ব একটা শক্তিও আছে। ফ্রাঙ্ক ফ্রিম্যান্ (১৯৫১) বলিয়াছেন, "প্রকৃতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থাকে (nature and nurture) আর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রত্যেকটিরই ব্যঞ্জনা অপরের মধ্যে সীমায়িত।" ইহারা পরস্পর অনুপূরক, প্রত্যেকেই অপরকে লইয়া পূর্ণতা লাভ করে। কাজেই বর্তমান শিক্ষাতত্ত্বে প্রকৃতি (বংশগতি) বনাম পরিবেশ, অথবা প্রকৃতি-পরিবেশের দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি-পরিবেশের সম্মিলিত ফলটি আলোচনা করা উচিত। ইহাদের একটিকে তুচ্ছ করিয়া অপরটিকে লইয়া মাতামাতি করিবার কোনও সুযুক্তি বা পরীক্ষিত স্থির সিদ্ধান্ত নাই।

বহুদিন পূর্বে সার পার্শি নান্ তাঁহার অভ্রান্ত দৃষ্টি লইয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁর মতে, নিছক বংশগতির পক্ষে ওকালতি করিতে যাইয়া গ্যালটন এবং তাঁহার সহকর্মীরা এবং পরিবেশের পক্ষে ওকালতি করিতে যাইয়া হার্বার্ট ও তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়—উভয় পক্ষই ভুল করিয়াছেন। একপক্ষ বলিতেছেন, মানুষ যাহা হইবে তাহা তাহার জন্মের পূর্বেই তাহার মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, অপর পক্ষ বলিতেছেন, প্রাক্‌জন্মগত ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার দ্বারা তাহাকে যে কোনও অবস্থায় লইয়া যাইতে পারা যায়। নান্ বলেন, একদেশদর্শিতা লইয়া তর্ক করিয়া উভয় মতবাদই মানুষকে খানিকটা জড় পদার্থের পর্যায়ে নামাইয়া

আনিয়াছে; দুইটি মতবাদই মানুষকে কাদার ডেলার মত জিনিস বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; তবে এই মৃৎপিণ্ডটিকে যে-কুম্ভকার গড়িয়া তুলিতেছে, একদল বলিতেছেন, সে হইতেছে বংশগতি—সে জাতকের জন্মের পূর্ব হইতেই মৃৎপাত্রটির গঠন ঠিক করিয়া দিতেছে, এবং অপর দল বলিতেছেন, এই মৃৎকর্তাটি হইতেছে পরিবেশ; সে জাতকের জন্মের পর হইতে তাহাকে লইয়া মনোমত গঠন দিতেছে।

কিন্তু মানুষ নিছক মৃৎপিণ্ড নহে, সে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বংশাসিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিযুক্ত প্রাণী, সে একটি শক্তির কেন্দ্র, সে পরিবেশকে হয়ত ঠিক জয় করিতে পারে না, তবে নিজের সম্ভাবনা, সুবিধা ও প্রয়োজন মতো তাহাকে ব্যবহার করে এবং জন্মগত মূলধন এবং পরিবেশগত সুবিধা—এই উভয়কে লইয়াই তাহার জীবনের কারবার আরম্ভ করিতে করিতে তাহার চরিত্রের পথে চলিতে থাকে। যাহারা বলেন, বংশগতিই সব, তাঁহারা খানিকটা অদৃষ্টবাদে পরিচালিত হইয়া মানুষকে যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত করিয়া সমাজের অকল্যাণ করেন, ফলে দৈত্যকুলে যে সমস্ত প্রহ্লাদ তৈয়ারী হইতে পারিত, অথবা গোবরকুলে যে সব পদ্মফুল ফুটিতে পারিত—সে সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া যায়; আর যাঁহারা বলেন, পরিবেশই সব, তাঁহারাও অনেক অপাত্রে অথবা জড়-বুদ্ধিযুক্ত পাত্রে অযথা শিক্ষা-প্রচেষ্টার প্রয়োগ করিয়া অর্থ, সময় ও শক্তির অপচয় করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, "ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পাঠ্যতে বকঃ", শত চেষ্টা করিয়াও বককে শুকের মত পাঠ শিখান যায় না।

এই জন্যই শিক্ষাকে সার্থক করিতে হইলে এবং শিক্ষার ব্যাপারে অপচয় নিবারণ করিতে হইলে ছাত্রের সম্ভাবনা কতখানি তাহা মাপিয়া (বুদ্ধির মাপকাঠি নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) লওয়া ভাল।

তবে শুধু বুদ্ধি মাপিলেই চলিবে না। ছাত্রের অন্যান্য বিশেষত্ব, মানসিক গঠন—তাহা অন্তর্মুখী (introvert) অথবা বহির্মুখী (extrovert)—ছাত্র হাতে-কলমে কাজ করিতে ভালবাসে অথবা দার্শনিক আলোচনা ভালবাসে প্রভৃতি আরও অনেক কথাই পূর্ব হইতে জানিয়া লইতে হইবে এবং সেই হিসাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে শিক্ষক হয়ত খানিকটা ভীত হইয়া পড়িতে পারেন। তাঁহার মনে হইতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থাটা অত্যন্ত জটিল জিনিস। শিক্ষার সমস্যা যে জটিল, সে কথা সত্য হইলেও আমাদের মনে রাখা উচিত অধিকাংশ মানুষই সাধারণ ; অতি জড় বুদ্ধি অথবা অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা কোন সমাজেই বেশী নয়, কাজেই তাহাদের কথা বাদ দিয়া সাধারণের জন্য সাধারণ ব্যবস্থাও অনেকখানি কাজ করিতে পারে।

জন্মগত দীনতার জন্যও ততটা ভয়ের কারণ নাই। আমরা যদি জীবতত্ত্বগত উত্তরাধিকার ভাল নাও পাই, তাহা হইলেও সমাজগত উত্তরাধিকার (Social heritage) দ্বারা অনেকখানি কাজ করিতে পারি। ভাল শিক্ষক, ভাল শিক্ষা-ব্যবস্থা, ভাল গ্রন্থাগার, ভাল গৃহ-পরিবেশ, সুলিখিত পুস্তকাদি, শান্তিপূর্ণ সমাজ, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া, সৎসঙ্গ, উৎসাহ, উপদেশ, আদর্শ প্রভৃতি প্রায় অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম পথিকৃৎ রবার্ট ওয়েন (Robert Owen : ১৭৭১-১৮৫৮) বলেন, মানুষ তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র অথবা ব্যক্তিগত মতবাদ ইহাদের কোনটিকেই নিজে তৈয়ারী করিতে পারে না এবং কখনও পারে নাই, সে পূর্ব-পুরুষাগত ভাবধারা হইতে যাহা পাইয়াছে এবং শিক্ষা ও পরিবেশ হইতে যাহা অর্জন করিয়াছে তাহারই অনিবার্য ফল হিসাবেই তাহার জীবন, দর্শন ও চরিত্র সৃষ্ট হইতে থাকে।

এই মতবাদ সমাজগত উত্তরাধিকারেরই জয়গান করিতেছে। ব্যক্তিগত সাধনা ও সমাজ হিতৈষণার দ্বারা এই সমাজগত উত্তরাধিকারকে আমরা অনেকখানি প্রভাবিত করিতে পারি।

●

গণ-মন

হিন্দু পুরাণে 'গণ' শব্দ এবং 'গণেশ' শব্দটির অর্থ যাহাই হউক না কেন, 'গণ' শব্দটিকে যদি আমরা সাধারণ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করি, তাহা হইলে গণদেবতা গণেশ ঠাকুরটির সহিত গণ-মনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যঞ্জনা দেখিতে পাই। গণেশ ঠাকুরের বিপুল দেহ, দেহে বিষ্ণুর শক্তি—তাঁহার হস্তধৃত শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সেই বিষ্ণুর শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীক; কিন্তু তাঁহার মাথাটি হইতেছে একটি হস্তিমূর্খের। কাজেই তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে পারেন না। হয়ত হঠাৎ ক্ষেপিয়া যাইয়া অন্যায় কার্য করিয়া বসেন, হয়ত হঠাৎ মনের আবেগে অদ্ভুত ভাল কাজ করিয়া ফেলেন—এবং যাহাই কিছু করেন, তাহা সবই করেন বিপুল মাত্রায়। কাজেই তিনি ভয়ের বস্তু, সব দেবতার পূজার সময়েই আগে তাঁহাকে পূজা দিতে হয়। তিনি সিদ্ধিদাতা, বাঁকিয়া বসিলে আর রক্ষা নাই। গণ-মনটিও অনেককটা এই জাতীয় জিনিস; ইহাকে মানিয়া চলিতে হইবে, না মানিলে রক্ষা নাই, অথচ গণ-মনটি যে সব সময়েই সুচিন্তিত সুধীজনোচিত কাজ করে, তাহা নহে।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই গণ-মনটি কি জিনিস? প্রত্যেক গণ বা দলের মধ্যেই কি গণ-মনের লীলা চলিতে থাকে?

না, প্রত্যেক দলের মধ্যেই গণ-মনের লীলা নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—কলিকাতার রাস্তা দিয়া অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে, যে যাহার নিজের কাজে চঞ্চল, নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। এখানে গণ-মনের কোনও লীলা নাই। কিন্তু হঠাৎ যদি পাশের একটা বস্তিতে আগুন লাগিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ পথচারী জনতার মধ্যে গণ-মনের কার্য আরম্ভ হইবে, সকলের মধ্যেই তখন একটা আর্তত্রাণের অনুভূতি জাগিয়া উঠিবে, চীৎকারে, উৎসাহে, প্রতিযোগিতায় সকলেই আগুন নিভাইতে চেষ্টা করিবে, অতি ভীরু কাপুরুষও লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এমন বীরত্ব দেখাইবে যে, সেই লোকটি একা-একা স্বপ্নে বা উদ্ভট কল্পনাতেও হয়তো তাহা ভাবিতে

পারিত না। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মন দিয়া যাহা অসম্ভব, গণ-মনের প্রেরণায় তাহা সহজেই সম্ভবপর হইল।

এই গণ-মন যে সব সময় মানুষকে উন্নত স্তরেই তুলিয়া ধরিবে, এমন কোনও কথা নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতির সময় এই গণ-মনের প্রভাবেই অতি নিরীহ ভালমানুষ ব্যক্তিও এমন জঘন্য ও নৃশংস কাজ করিয়া বসে যে, সাধারণ সময়ে তাহা কিছুতেই তাহার দ্বারা সম্ভব হয় না।

এই জাতীয় উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, গণ-মন জিনিসটি ব্যক্তিগত মনের সমষ্টিমাত্র নয়, ইহা একটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। যেখানে দুইচারজন লোক একত্র হয়, সেইখানেই প্রায়ই একটি নূতন শক্তির লীলা আরম্ভ হয়। এই শক্তিগুলি অবশ্য গণের ব্যক্তির মধ্যেই বর্তমান ছিল, কিন্তু সেই শক্তিগুলিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য একটা গণ-পরিবেশের বা সমাজ-পরিবেশের প্রয়োজন হয়। মনের বিকাশের দিক দিয়া এই সমাজ-পরিবেশের দান সামান্য নহে। এমন কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) আছে, যাহা বিশেষভাবে সমাজ-পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। আত্মবিস্তার (self-assertion) বা আত্মাবমাননা (self-debasement) প্রবৃত্তিগুলি সমাজ-পরিবেশের মধ্যেই কাজ করিতে থাকে, সমাজ-পরিবেশের বাহিরে এই প্রবৃত্তিগুলির বিকাশের কোনও সম্ভাবনা নাই।

সমাজ পরিবেশের মধ্যে এই যে নূতন একটি গণ-মনের লীলা চলিতে থাকে, ইহা কোন্ শক্তির পরিচালনায় হইয়া থাকে? নান্ সাহেব ইহার নাম দিয়াছেন মাইমেসিস্ (Mimesis); ইহার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় নাই। তবে 'অনুকরণ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ধরিলে যাহা হয়, 'মাইমেসিস্' অনেকটা সেই জিনিস। ইহার মধ্যে একটা অনুভূতির দিক, একটা বুদ্ধির দিক এবং একটা কর্মের দিক আছে। ইহার অনুভূতির দিকটিকে সহানুভূতি (sympathy), বুদ্ধির দিকটিকে অভিভাবন (suggestion) এবং কর্মের দিকটিকে অনুকরণ (imitation) নাম দেওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত মূলধন লইয়া মানুষ তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, 'মাইমেসিস্' তাহার মধ্যে অন্যতম। গণ-মনের বিকাশের মূলেও 'মাইমেসিস্' বা ব্যাপক-অনুকরণের

লীলা আছে। নান্ সাহেব দেখাইয়াছেন, 'মাইমেসিস্'-এর ক্রিয়া ইতরপ্রাণী হইতে মানুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে চলিতে থাকে।

একটি মোরগ-শিশু যে তাহার মাতার কার্য দেখিয়া মাটি হইতে শস্যের কণা খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে, তাহাও 'মাইমেসিস্' এবং জাপান যে আত্মসচেতন প্রচেষ্টার দ্বারা ইউরোপীয় আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া তাহার সভ্যতাকে ইউরোপীয় ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাও 'মাইমেসিস্'; ইহারই প্রভাবে একজনের ভয়-ভাবনা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ইহারই প্রভাবে একজনের আদত অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং ইহারই প্রভাবে একজনের অনুকরণ করিয়া আর একজন শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। গণ-মনের বিকাশের জন্য অনুকরণের সহানুভূতিগত দিক (sympathy), চিন্তাগত দিক (suggestion) এবং কর্মগত দিক (imitation) এই সবগুলিই কার্য করে। কার্যের সুবিধার জন্য আমরা ইহাদের প্রত্যেকটির পৃথক ভাবে আলোচনা করিব। প্রথমে সহানুভূতির কথাই ধরা যাক।

সহানুভূতি (Sympathy):

সহানুভূতি জিনিসটি হইতেছে অপরের সহিত একই ভাবে অনুভব করা। এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, একজন যেভাবে অনুভব করিল, অপরে সেইভাবে অনুভব করিবে কেন? এই জিনিসটির ব্যাখ্যার জন্য অনেকে Telepathy বা "দূরানুভূতি"র অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, রেডিওর বার্তার মত মানুষের অনুভূতি প্রভৃতিকেও দূরে প্রেরণ করা সম্ভবপর। অনুভূতি প্রেরণের এই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়ত অনেকেই স্বীকার করিবেন না এবং তাঁহারা ম্যাক্‌ডুগাল্ সাহেব বর্ণিত "অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি" (Primitive Passive sympathy)-কেই সহানুভূতির মূল কারণ বলিয়া মনে করিবেন। ম্যাক্‌ড্যুগল্-এর মতে আমাদের প্রবৃত্তিগুলি (instincts) আমাদের মধ্যে এমনভাবে অবস্থান করে যে, অপরের মধ্যে তাহার ক্রিয়া দেখিলেই আমাদের মধ্যেও তাহাদের দ্বার খুলিয়া যায়।

সেইজন্যই কাহারও মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখিলে আমাদের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়, কাহাকেও হাসিতে দেখিলে আমাদেরও হাসি পায়।

ফ্রয়েড্ ম্যাক্‌ডুগাল্ সাহেবের এই অন্ধ অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে গণমনের আদি প্রেরণা বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অনুকরণ জিনিসটা নিছক অনুকরণ বা অন্ধ অনুকরণ নয়; যাহার সহিত আমরা একাত্মতা বা আত্মীয়তা অনুভব করি না, তাহার কার্যের অনুকরণও আমরা করি না। যে ইয়ার্কিতে ইতরজনসাধারণ আনন্দ পায়, একজন চালবাজ অভিজাত তাহাতে কৌতুক বোধ করে না। তাহার কারণ, এই চালবাজ অভিজাতটি নিজেকে ইতরজনসাধারণের স্বগোত্রীয় বলিয়া মনে করে না। ফ্রয়েড্ আরও দেখাইয়াছেন যে, ভয়ের বৃত্তিটিতে গণমনের কার্য সমধিক দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ভয়ের বৃত্তিটি তখনই প্রবল হইয়া উঠে, যখন সংঘের লোকগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; অর্থাৎ "গণ" যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, শুধু পাঁচজন একত্র হইলেই গণগনের কার্য আরম্ভ হয় না, সেই পাঁচজনের মধ্যে একটা একাত্মতা থাকা প্রয়োজন।

ফ্রয়েড্ বলেন, যে জন-সংঘের মধ্যে গণমনের ক্রিয়া চলে, সেখানে পারিবারিক সম্পর্ক জাতীয় একটা আত্মীয়তা থাকা প্রয়োজন। পরিবারের বালক-বালিকারা তাহাদের পিতামাতাকে কেন্দ্র করিয়া আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। মাতাপিতাকেই তাহারা আদর্শ হিসাবে অনুকরণ করে এবং সতীর্থ হিসাবে পরোক্ষভাবে ভ্রাতা ভগিনীরাও পরস্পর পরস্পরকে অনুকরণ করে। দেশাত্মবোধ প্রভৃতির মধ্যে যে গণমনের কার্য চলিতে থাকে, তাহাও এই পরিবার-কেন্দ্রিক মনোভাবের একটি বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। তবে সে ক্ষেত্রে আদর্শটি কোনও জীবন্ত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে না, তাহা উঠে নৈর্ব্যক্তিক দেশমাতৃকা, দেশের চিরাচরিত আচার ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতির প্রতি অনুরাগকে কেন্দ্র করিয়া।

নান্ সাহেব দেখাইয়াছেন, ফ্রয়েডের এই মতবাদটি স্কুল কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে মাতা-

পিতার যে স্থান, স্কুলের ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও সেই স্থান ; উভয়েই বালক বালিকাদের অনুকরণের পাত্র, উভয়েই তাহাদের স্বাভাবিক নেতা।

কিন্তু এই স্বাভাবিক নেতা ছাড়া স্কুল কলেজের খেলার ক্যাপ্টেন, মণিটার, রাজনৈতিক উৎসাহী প্রভৃতি অনেক উপনেতাও থাকে। এই উপনেতাদের উপেক্ষা করিলে চলিবে না, এবং শিক্ষকদিগকে বন্ধুভাবেই হউক অথবা শত্রুভাবেই হউক, ইহাদের সম্মুখীন হইতেই হইবে। যে স্কুলে নিয়ম-শৃংখলা ভাল, সেখানে নেতা ও উপনেতার দ্বন্দ্ব থাকে না, সকলেই একযোগে কাজ করে। কিন্তু যেখানে তাহা হয় না, সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল উপনেতৃত্বকে শক্তির জোরেই দাবাইয়া দিতে হইবে। তবে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা ও হানানানি কল্যাণকর নহে এবং যে স্কুলে ছাত্রনেতা ও শিক্ষকদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকে, সেখানেও ভাল ফল আশা করিতে পারা যায় না।

তাহা হইলে স্কুলের মধ্যে নেতা-উপনেতার দ্বন্দ্ব এড়াইয়া চলিবার উপায় কি? উপায় হইতেছে ছাত্রদের সহিত একাত্ম হইয়া তাহাদের আশা-আকঙ্ক্ষা, সুখদুঃখে সহানুভূতিশীল হইয়া, তাহাদের দলের সত্যিকারের সর্বাধিনায়ক হইয়া শিক্ষকদের কাজ করা। শিক্ষকরা যদি এই সর্বাধিনায়কত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে নেতা-উপনেতার দ্বন্দ্ব থাকে না। শিক্ষক যতই বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধ হউক না কেন, তাঁহার কেশে যতই পাক ধরুক না কেন, মনের দিক দিয়া, সহানুভূতির দিক দিয়া স্কুলের যত "নবীন এবং কাঁচা," যত "সবুজ এবং অবুঝ," যত দুরন্ত, যত জীবন্ত সকল ছাত্রদের সঙ্গে নিজেকে "এক বয়সী" বলিয়া মনে করিয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা উচিত। শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে অতি উৎসাহে স্থলভে ছাত্রনেতা হইবার জন্য অন্যায়ভাবে ছাত্র-তোষণের চেষ্টা করেন, কখন কখনও হয়ত প্রধান শিক্ষকের আইন-শৃংখলার প্রতি ছাত্রদের উত্তেজিত করিয়া তাহাদের প্রিয় হইবার চেষ্টা করেন, ইহাও ঠিক নহে। ছাত্র-তোষণ ও ছাত্র-নেতৃত্ব এক জিনিস নয়? যিনি প্রকৃত

ছাত্রনেতা, তিনি নিজে সর্বস্ব হারাইয়া ছাত্রদের দলে নামিয়া আসিবেন না, তিনি ভালবাসিয়া তাহাদের সহিত মিশিবেন এবং তাঁহার পরিপক্ক জ্ঞান, বুদ্ধি এবং সংযত চরিত্র-বলের দ্বারা ছাত্রদের উচ্চস্তরে টানিয়া তুলিবেন শুভ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া, আনন্দ সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের সহযোগিতার মধ্য দিয়া।

অভিভাবন (Suggestion) ঃ

মাইমেসিস-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা অনুকরণের অনুভূতিগত, চিন্তাগত এবং কর্মগত দিকের কথা বলিয়াছি। এইগুলিকে যথাক্রমে অনুভাবন (sympathy), অভিভাবন (suggestion) এবং অনুকরণ (imitation) বলা হয়। এখন এই অভিভাবন শব্দটি দ্বারা আমরা কি বুঝি ?

পাঁচজনের সঙ্গে একত্র থাকিতে হইলে পরস্পরের সুখ, দুঃখ, আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতির কষ যেমন আমাদের মধ্যে লাগিয়া যায়, তেমনই পরস্পরের চিন্তা, ভাবধারা প্রভৃতিও আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। চিন্তাগত এই সংক্রমণটিকেই সাধারণতঃ অভিভাবন বলা হয়। ম্যাক্ ডুগাল্ সাহেব অভিভাবনের সংজ্ঞা দিয়াছেন "a process of communication resulting in the acceptance with conviction of the communicated proposition in the absence of logically adequate grounds for its accepance."

অভিভাবনের দ্বারা একজনের চিন্তা যখন অপরের মধ্যে সংক্রমিত হয় তখন সে বুঝিতে পারে না যে, এই নবাগত চিন্তাটি তাহার নিজস্ব জিনিস অথবা অন্য কিছু। এই অভিভাবনের উদাহরণ হিসাবে রস্ সাহেব সেক্ষপীয়ারের ওথেলো নাটকের আয়াগো চরিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। আয়াগো ওথেলোর নিকট ডেস্‌ডিমোনার চরিত্র সমর্থন প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে এমন সব কথা বলিয়াছিলেন, যাহার অভিভাবনের ফলে ওথেলোর মন সন্দেহে কলুষিত হইয়া গিয়াছিল, অথচ ওথেলো বুঝিতেও পারে নাই যে, এই সন্দেহ জিনিসটি তাহার নিজস্ব সিদ্ধান্তের ফল অথবা অপরের দেওয়া জিনিস।

অভিভাবনের শক্তি সম্মোহন বিস্তার (hypnotism) প্রসঙ্গে প্রথম আলোচিত হইয়াছিল। সম্মোহনের ফলে কৃত্রিম নিদ্রার সময় সম্মোহিত ব্যক্তি

সম্মোহনকারীর অভিভাবন সহজেই গ্রহণ করে। জাগ্রদবস্থায় একজনকে যদি বলা হয় "তুমি ইন্দুর হইয়া গিয়াছ" তাহা হইলে সে কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু সম্মোহিত কোনও ব্যক্তিকে যদি ঐ কথা বলা হয়, তাহা হইলে সে সহজে তাহা মানিয়া লইবে এবং নিজেকে সত্য সত্যই ইঁদুর বলিয়া মনে করিয়া হয়ত ইঁদুরের মতই ঘরের কোন দিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিবে।

শুধু সম্মোহিত অবস্থাতেই যে এইরূপ ঘটে, তাহা নহে। সম্মোহিত অবস্থায় সম্মোহক সম্মোহিত ব্যক্তিকে যে সব অভিভাব দিয়া থাকেন, অনেক সময় সম্মোহনের পরেও তাহার ফল বর্তমান থাকিয়া যায়। ফলে সম্মোহিত অবস্থায় একজনকে যদি বলা হয়, "তুমি মদ খাইয়াছ" তাহা হইলে হয়ত সে সম্মোহনের পরেও মাতালের মত ঢুলিতে থাকিবে। যে অভিভাবনের ফলে এই জাতীয় ঘটনা ঘটে, তাহাকে উত্তর-সম্মোহক অভিভাবন (post-hypnotic suggestion) বলা হয়। এই অভিভাবনের কাজটি শুধু যে সম্মোহিত অবস্থাতে ক্রিয়াশীল থাকে তাহা নহে, আমাদের জাগ্রদবস্থাতেও আমরা প্রায় সকলে এই অভিভাবন শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হই। নান্ সাহেব এই অভিভাবনের শক্তির একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি কতকগুলি ছেলেমেয়েকে একটি নৌকার (Yacht) ফটো দেখাইলেন। প্রত্যেকেই ৩০ সেকেণ্ড ধরিয়া ছবিখানি দেখিল। তাহার পর নান্ তাহাদের এই ছবিটি সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন। এই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল "আচ্ছা বলত দেখি ষ্টীমারটি নৌকার সহিত একই দিকে যাইতেছিল, না পরস্পর বিপরীত দিকে যাইতেছিল?"

এই প্রশ্নে কুড়িটি বালক বালিকার মধ্যে মাত্র দুইজন জোর করিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তাহারা শুধু নৌকাই দেখিয়াছে, ষ্টীমার আদৌ দেখে নাই। বাকী সকলের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের পর্যবেক্ষণ শক্তির স্বল্পতার জন্য লজ্জায় পড়িল, কেহ কেহ বা ইতস্ততঃ করিয়া এদিকে বা ওদিকে উত্তর করিল, অনেকে আবার দৃঢ়তার সহিতই উত্তর করিল, ষ্টীমারটী নৌকার দিকে যাইতেছিল অথবা বিপরীত দিকে যাইতেছিল।

এই অভিভাবনের শক্তি শুধু যে সম্মোহিত অবস্থায়ই বালক-বালিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা নহে, পূর্ণবয়স্ক মানুষের মধ্যেও ইহার প্রভাব সামান্য নহে। গুজব রটনার মধ্যে এই অভিভাবনের শক্তি আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। দেশের মধ্যে হয়ত দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। একজন অখ্যাত লোক বাহাদুরী করিয়া বলিল, পাশের গ্রামটিতে একশত লোক হতাহত হইয়াছে। কথাটা বিশ্বাস্য না হইলেও, তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিলাম না, গল্পটী আমিও অপরের কাছে বলিলাম, সেও তাহা অন্যান্য অনেকের নিকট বলিল, ফলে শীঘ্রই গুজবটি দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। দাঙ্গাহাঙ্গামা, আকস্মিক বিপৎপাত, যুদ্ধ প্রভৃতির সময়, রাজনৈতিক বক্তৃতা ও অভিসন্ধিমূলক প্রচার প্রভৃতির মধ্যে এই অভিভাবনজনিত গণমনের ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাই।

এই অভিভাবনের কারণটি কি? মনের সম্মোহিত অবস্থায় অথবা অত্যন্ত উত্তেজনার সময় আমরা সহজেই অপরের দ্বারা প্রভাবিত হই। অসুস্থ অবস্থাতেও আমরা অপরের দ্বারা প্রভাবিত হই। সুস্থ অবস্থাতেও যে আমরা অপরের দ্বারা প্রভাবিত হই না, তাহা নহে। আমাদের মধ্যে যে দীনতার বৃত্তি আছে, (Instinct of submission) তাহারই ফলে এই জিনিসটি ঘটিয়া থাকে। সেইজন্যই সুস্থ অবস্থায় আমরা তাহাদের নিকট হইতেই অভিভাব গ্রহণ করিয়া থাকি যাহাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। শিশু এবং অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে অভিভাবন ক্রিয়াটি সমধিক দৃষ্ট হয়। তাহার কারণই হইতেছে, তাহাদের দীনতা ও শক্তিহীনতার অনুভূতির জন্য অপরকে শ্রদ্ধা করা এবং তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। অভিভাব গ্রহণ করা শিশু বা অশিক্ষিত মনের নিকট তাই খানিকটা সহজসাধ্য।

নান্ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই অভিভাব জিনিসটি মনুষ্য চরিত্রের একটি অনুশোচনীয় দুর্বলতা মাত্র নহে, ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের পরিপুষ্টির জন্য ইহা খুবই একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। বুদ্ধির সাহায্যে একটি সত্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া এবং তাহার পর আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা, ইহা একটী জটিল এবং সময়সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু আমাদের চেয়ে

যাহাদের অভিজ্ঞতা আরও বেশি তাহাদের নিকট হইতে অভিভাব গ্রহণ করিয়া আমাদের সক্রিয় বুদ্ধির অগোচরেই পরিপক্ক অভিজ্ঞতার সিদ্ধান্তগুলি লইয়া জীবনের পথে চলিলে কাজের সুবিধাই হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষা-তত্ত্বের একটি জটিল প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। এই অভিভাবনের প্রভাব শিক্ষক ছাত্রদের উপর প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাদান করিবেন, অথবা নৈর্ব্যক্তিকভাবে পড়াইয়া যাইবেন? এ সম্বন্ধে প্রথম কথা হইতেছে এই যে, আমরা যখন কাহারও সহিত মেলামেশা করি, তখন আমাদের ব্যক্তিত্বের ছাপ অপরের উপর লাগিবেই, ফলে আমরা পরস্পর পরস্পরকে অভিভাবের দ্বারা প্রভাবিত করিবই। কাজেই সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে শিক্ষা দান প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দ্বিতীয় কথা হইতেছে, অভিভাবন জিনিসটা আমাদের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব বা কল্পনাশক্তির বিকাশের পরিপন্থী নয়।

সুতরাং ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজের স্বতঃস্ফূর্ত মতবাদকে সঙ্কুচিত করিয়া, নিছক নির্জলা পাঠ্যপুস্তক লইয়াই শিক্ষকের কারবার করিবার প্রয়োজন নাই, ব্যক্তিগত চরিত্রের অভিভাবনের দ্বারা তিনি ছাত্রদিগকে প্রভাবিত করিতে পারেন। তবে এই অভিভাবটা যতটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক হয় ততই ভাল। অধিকারী ভেদে ছেলেরা যার যেমন প্রয়োজন, যার যেমন ক্ষমতা সেই ভাবেই তাহা গ্রহণ করিবে। শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের মধ্যে সর্বসংস্কারবিমুক্ত একটা সত্যদৃষ্টির ক্ষমতা সৃষ্টি করা, বিশুদ্ধ বিচার ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সহায়তা করা।

ছাত্রদের সহিত শিক্ষকদের এমনই একটা সম্পর্ক যে, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, শিক্ষকের মনের কষ ছাত্রদের মনে সংক্রমিত হইবেই। সে ক্ষেত্রে শিক্ষককে একটু সাবধানে চলা উচিত। তাঁহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক মতবাদ লইয়া ছাত্রদের বিভ্রান্ত করা তাঁহার উচিত নয়। তাহা হইলে কি রাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে শিক্ষক একেবারেই চুপ করিয়া থাকিবেন? এ সম্বন্ধে নিজের কথা কিছুই বলিবেন না? অনেকের মত তাহাই। কিন্তু ইহাতে বিপদ হইতেছে এই যে, শিক্ষকরা এই সম্বন্ধে নীরব থাকিলে এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য ছাত্ররা অযোগ্য

নেতা অথবা অযোগ্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ফলে তাহাতে রাষ্ট্রের ক্ষতিই হইবে। কাজেই যে রাজনীতি দেশের অধিকাংশ মনীষীদের অনুমোদিত এবং যে ধর্মনীতি "বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভিঃ নিত্যমদ্বেশরাগিভিঃ", সেই নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের পরিপক্ক জ্ঞানবুদ্ধির আলো হইতে ছাত্রদের বঞ্চিত করা শিক্ষকদের উচিত নয়। তবে রাজনৈতিক দল বা উপদলের মুখপাত্র হইয়া স্কুলের শ্রেণীগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক চক্রান্তের আখড়া করিয়া তুলাও শিক্ষকদের কর্তব্য নয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সংস্কারমুক্ত সত্যদৃষ্টির এবং সত্য সিদ্ধান্তের ক্ষমতা সৃষ্টিই হইতেছে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষকদের উচিত উপযুক্ত অভিভাবের দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে এই জিনিসটিই তৈয়ারী করিয়া তোলা। এজন্য আমাদের মনে হয়, শিক্ষকদের কোনও রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত নয়। কারণ একটা রাজনৈতিক দলের সভ্য হইলেই সেই দলের মতবাদের গোঁড়ামি তাঁহাদের মধ্যেও একটু আধটু আসিতে পারে এবং তাঁহাদের মারফৎ সেই গোঁড়ামি ছাত্রদের মধ্যেও সংক্রমিত হইতে পারে।

গোঁড়ামি সব সময়েই মানুষকে আপেক্ষিক অন্ধতা প্রদান করে। কাজেই ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে অকল্যাণকর। সুতরাং শিক্ষকদের উচিত সমস্ত গোঁড়ামির উর্ধ্বে থাকিয়া সমস্ত উপদলীয় সংঘের স্বার্থের বাহিরে থাকিয়া শিক্ষাদান করা এবং তাঁহার পরিশুদ্ধ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা ছাত্রদের দেওয়া। "ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুই বলিব না, সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই শিক্ষা দান করিব" ইহা ঠিক কথা নহে। কারণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানপরিবেশন নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ভাল পুস্তক এবং ভাল পুস্তকাগার দিয়াই শিক্ষার কার্য শেষ করা যাইত। কাজেই ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ দিয়া ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতেই হইবে এবং শিক্ষার্থীকে নিছক জ্ঞান বিজ্ঞানের জীবন্ত অভিধান মাত্র না করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ লাগাইব অথচ ব্যক্তিগত মতবাদ বা গোঁড়ামির ছোঁয়াচ লাগাইব না, ইহা খুব সোজা কাজ নয়। শিক্ষকের মতবাদ ছাত্রদের মধ্যে

খানিকটা সংক্রমিত হইবেই। কাজেই এই ব্যাপারে রাষ্ট্র (State) শিক্ষকদের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। রাষ্ট্র যদি শিক্ষকদিগকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পড়াইবার নির্দেশ দেন, তাহা হইলে ছাত্রেরা শিক্ষকদিগের পরিপক্ক জ্ঞানের অনেকখানি হইতে বঞ্চিত হইবে। আবার রাষ্ট্র যদি নিজের নিরাপত্তার নিমিত্ত একটা বিশিষ্ট উপদলীয় মতবাদ প্রচার করিবার জন্য শিক্ষকদের নির্দেশ দেন, তাহা হইলে ছাত্রসমাজ সত্যদৃষ্টির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহাতে একটি বিশিষ্ট উপদলের সাময়িক সুবিধা হইলেও, রাষ্ট্রের পরিণামে ক্ষতিই হইবে, এবং যে সত্যকে কুযুক্তি দিয়া চাপা দেওয়া হইল, পরিণামে হয়ত সশস্ত্র বিপ্লবের ভিতর দিয়া তাহা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে। এইজন্য বুভুক্ষিত অসন্তুষ্ট শিক্ষকসমাজের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর। তাহাদের অক্ষম এবং অপরিস্ফুট অসন্তোষই হয়ত ছাত্রসমাজের তথা ভবিষ্যতের নাগরিকদের মধ্যে সক্রিয় বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারে, তাহাদের নৈরাশ্য ও জীবন-সংগ্রামে পরাজয় হয়ত ছাত্রদের মধ্যে নৈরাশ্যবাদ, অক্ষমতা, ক্লৈব্যের সৃষ্টি করিতে পারে। ইহাতে জাতি পঙ্গু হইয়া পড়িতে পারে ; এই পঙ্গুত্বের লক্ষণ আজ বাংলা দেশে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দৃষ্ট হইতেছে।

শিক্ষকদিগের ব্যক্তিত্বের অভিভাবন না পাইলে ছাত্রসমাজ মানুষ হইবে না, কাজেই তাঁহাদের মতবাদ যাহাতে তাঁহারা অবাধে ছাত্রদের মধ্যে সংক্রমিত করিতে পারেন, এইরূপ স্বাধীনতা তাঁহাদের দেওয়া উচিত। আবার এই স্বাধীনতার অপব্যবহার হইলে শিক্ষকরাই লোকচক্ষুর অন্তরালে চুপে চুপে ছাত্রদিগের রাষ্ট্রবিরোধী মতবাদে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন।

এ অবস্থায় প্রতিকার কি ? নান্ বলিয়াছেন, ছাত্রদের উপদলীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে রাখিবার জন্য গোঁড়ামির প্রতিশেধক হিসাবে বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করা। তিনি বলেন, ছাত্ররা বিতর্ক সভার আলোচনায় বিভিন্ন মতবাদের যুক্তি লইয়া তর্ক করিবে এবং তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে উপদলীয় মতবাদের ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইয়া যাইবে।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই বিতর্ক সভাও অবস্থার আমূল প্রতিকার করিতে পারিবে না। কারণ এই বিতর্ক সভায় কি সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা বহুল

পরিমাণে নির্ভর করিবে তাঁহার উপর, যিনি সভাপতি হিসাবে এই বিতর্ক-সভাকে পরিচালিত করিবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যুক্তির অপকৌশলে এবং জ্ঞানের সমৃদ্ধিতে ছাত্রদের যুক্তিকে ধাঁধাইয়া দিয়া নিজের ব্যক্তিগত মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছাত্রদের পরোক্ষভাবে নিজের মতে দীক্ষিত করিতে পারেন।

কাজেই শিক্ষকদিগের অভিভাবনের শক্তিকে তাঁহারা কি ভাবে প্রয়োগ করিবেন, তাহা বর্তমান সময়ে শিক্ষাতত্ত্বের জটিলতম সমস্যাই হইয়া রহিয়াছে। ইহার সমাধান সহজ নহে। প্রাচীনকালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই সমস্যাটি ছিল না। কারণ প্রাচীনকালের তপোবনচারী শিক্ষাগুরুগণ রাষ্ট্রীয় দল, উপদলের সহিত নিজেদের জড়িত হইতে দিতেন না। তাঁহারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল ছিলেন না বলিয়া কোনও রাষ্ট্রীয় উপদলের মুখপাত্র হইবার প্রয়োজনও তাঁহাদের ছিল না, আর রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হইবার প্রয়োজন তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের মতো রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ, অন্নসমস্যাবিমুক্ত স্বাধীনচেতা, শুদ্ধ-চরিত্র-বিশিষ্ট শিক্ষক-সমাজ তৈয়ারী করিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

অনুকরণ:

গণমনের বিকাশের জন্য সহানুভূতি এবং অভিভাবনের প্রয়োজনের কথা ইতোপূর্বে অলোচিত হইয়াছে। এইবার অনুকরণের কথা আলোচিত হইবে। এক হিসাবে এই তিনটি একই কারণের বিভিন্ন অভিব্যাক্তি—একই মাইমেসিস্‌-এর হৃদয়গত দিক হইতেছে সহানুভূতি, বুদ্ধিগত দিক হইতেছে অভিভাবন এবং কর্মপ্রচেষ্টাগত দিক হইতেছে অনুকরণ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে 'অনুকরণ' ক্রিয়াটি কি? কাহাকেও কোনও একটা কিছু করিতে দেখিলাম এবং তাহার পর আমিও তাহাই করিতে চেষ্টা করিলাম—ইহাই হইল অনুকরণের মুল কথা। পাঁচজন লোক এক সঙ্গে থাকিলে তাহাদের চিন্তা, তাহাদের অনুভূতি এবং তাঁহাদের কার্য সবই প্রায় পরস্পরের প্রভাবে এক রকম হইয়া যাইতে থাকে। কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়া যখন সংঘগত একজন লোক অপরের কার্যের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, তখন তাহাকেই অনুকরণ বলা হয়।

এই অনুকরণ কাজটি যদিও আমরা সকলেই করিয়া থাকি, তাহা হইলেও ইহাকে ঠিক সহজাত প্রবৃত্তি (iustinct) বলা যাইতে পারে না। কারণ, প্রবৃত্তির মধ্যে যে বিশেষ একটি উদ্দীপক (stimulus) এবং বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া (response) দৃষ্টি হয়, ইহার মধ্যে তাহা নাই।

তাহা হইলে অনুকরণ ব্যাপারটার মনস্তত্ত্ব কি ? ইহা হইতেছে আমাদের সংঘবৃত্তির (gregarious instinct) সক্রিয় অবস্থা (doing aspect) ; ইহার জন্য সংঘগত সমস্ত প্রাণীই একভাবে কার্য করে, ইহা কখনও বা আত্মসচেতন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আবার কখনও বা আমাদের অজ্ঞাতসারেই অনুষ্ঠিত হয়।

মানুষের মধ্যে আত্মসচেতন এবং স্বতঃস্ফূর্ত এই দুই জাতীয় অনুকরণেরই লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। নান্ দেখাইয়াছেন, ক্লাশের পড়াশুনা শেষ হইল, বালিকাদের দল ক্লাশ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের ছুটাছুটি দেখিয়া ছোট্ট আর একটা বালিকাও ছুটিতে আরম্ভ করিল। এ ক্ষেত্রে চিন্তা, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির কোনও লীলা নাই। একটি কুকুর-শিশুও তাহার সঙ্গীদের এইরূপ ছুটাছুটি করিতে দেখিলে হয়ত এই ভাবেই তাহাদের ছুটাছুটির অনুকরণ করিবে। ইহার পর ঐ বালিকাটি যদি দেখে তাহার সঙ্গীরা আনন্দে নৃত্য করিতেছে, তাহা হইলে ঐ শিশুটিও নৃত্যের চেষ্টা করিবে এবং চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়া, প্রাথমিক অভ্যাসের অনিপুণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সেও নাচিতে আরম্ভ করিবে। এই ক্ষেত্রে চিন্তা ও বিবেচনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর একটু বড় হইলে সে যখন বন্ধুদের "স্কিপিং" করিতে দেখিবে, সেও তখন তাহার অনুকরণ করিবে। এ ক্ষেত্রে "স্কিপিং"-এর কৌশল, পদচালনা প্রভৃতি আয়ত্ব করিবার জন্য তাহাকে অধিকতর বুদ্ধি পরিচালনা করিতে হইবে। এইভাবে অন্ধ জৈবিক অনুকরণ ক্রমশঃ আত্মসচেতন বুদ্ধি-সিদ্ধান্ত-প্রাণোদিত অনুকরণে পরিণত হইতে থাকে এবং যে বালকটি প্রথমে শিশুসুলভ লাফালাফি করিতেও ভালভাবে সমর্থ হয় নাই, সে অনুকরণের দ্বারা একটা জটিল-"ভাবনৃত্যের" লালায়িত ভঙ্গীও আয়ত্ত করিতে পারিবে। অনুকরণের এই প্রকারভেদ

দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, নিছক সংরক্ষণ-প্রয়াস (mneme) যেমন ক্রমশঃ স্মৃতিতে পরিণত হয়, অন্ধ জীবন-প্রয়াস (Horme) যেমন কর্মপ্রয়াসে (Conation) পরিণত হয়, সেইরূপ অন্ধ জৈবিক অনুকরণ (Mimesis) আত্মসচেতন অনুকরণে (imitation) পরিণত হইয়া থাকে।

এখন এই অনুকরণের সহিত আমাদের দেহযন্ত্র (endowment) এবং অনুকৃত বস্তুটির কি সম্পর্ক, তাহার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যাহাকে আমরা নিছক 'অন্ধ জৈবিক অনুকরণ' বলিয়াছি, সেই ক্ষেত্রে অনুকৃত কার্যটি উদ্দীপকের (Stimulus) কার্য করে এবং এই উদ্দীপকটি তাহার অনুকরণকারীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া (Response) হিসাবে কতকগুলি সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ছাঁপিজটের * (engram-complex) চাবি খুলিয়া দেয়। মুরগীর শাবক যে তাহার মাতাকে খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে দেখিয়া খুঁটিয়া খাইতে অনুকরণ করে, অথবা শিশু বালিকাটি যে তাহার সঙ্গীদের দেখিয়া ছুটাছুটি লাফালাফি করিতে আরম্ভ করে, ইহা তাহারা করিত না, যদি সহজাত ছাপজট্ হিসাবে খুঁটিয়া খাইবার অথবা ছুটাছুটি লাফালাফি করিবার সংস্কার তাহাদের মধ্যে থাকিয়া না যাইত। একটি পাখীকে উড়িতে দেখিয়া মানব শিশু উড়িবার চেষ্টা করে না, কারণ উড়িবার সংস্কার বা দেহযন্ত্র তাহার নাই।

এই অন্ধ অনুকরণ (mimesis) ক্রমশঃ আত্মসচেতন অনুকরণে (imitation) পরিণত হয়। ব্যাপারটা এইভাবে খটিতে থাকে। একজনের 'স্কিপিং' দেখিয়া শিশু বালিকাটি যখন 'স্কিপিং' করিতে আরম্ভ করে তখন সে দেহযন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া হিসাবেই তাহা করিতে পারে না, ইহা তাহাকে শিক্ষা করিতে হয়। সহচরীর স্কিপিং দেখিয়া তাহাকে আত্ম-বিস্তারের উপায় হিসাবে সে ইহা গ্রহণ করে, তাহার পর চেষ্টা ও ভ্রান্তির (trial and error) ভিতর দিয়া সে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সার্থক প্রচেষ্টাকে অন্তঃপূর্তির (Consolidation) সাহায্যে

---

* বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় Complex-এর প্রতিশব্দ "গূঢ়ৈষণা" করা হইয়াছে ; বলা বাহুল্য এই Engram Complex-এর ক্ষেত্রে ঐ প্রতিশব্দটি সার্থক হইবে না।

আয়ত্ত করিয়া লয়। তখন স্কিপিং-এর কাজটি তাহার নিকট যান্ত্রিক ব্যাপারের মতই সুখসাধ্য হইয়া উঠে। তখন সে স্কিপিং জিনিসটিকে আরও জটিলতর করিয়া নৃত্যকলার মতো একটা শিল্পের বস্তু করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই অনুকরণ ব্যাপারটা কি আমাদের কল্পনা ও সৃজনীশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর ; বর্তমান সময়ে অনেক শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, অনুকরণ আমাদের সৃজনীশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে। যাঁহাদিগের আমরা মৌলিক সৃজনীশক্তির জন্য প্রশস্তি করি, তাঁহারাও তাঁহাদের পূর্বসূরীদিগের চক্রনেমী-খিন্ন পথে তাঁহাদের সাধনার রথকে অনুগত শিষ্যের মতই চালাইয়া গিয়াছেন। সেক্ষপীয়রের প্রথম দিকের রচনাবলীর মধ্যে আমরা এলিজাবেথীয় নাট্যকারদিগের অনুসরণ পাই, রবীন্দ্র-কাব্যের গোমুখীপ্রবাহ উজান ঠেলিয়া দেখিয়া আমরা বিহারীলাল প্রভৃতি অনেকেরই অনুকরণ দেখিতে পাই। জৈবিক অন্ধ অনুকরণ ক্রমশঃ আত্মসচেতন অনুকরণে পরিণত হয় এবং তাহাই শেষ পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যত প্রকারের অনুকরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহার ব্যক্তিত্বও ততখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

এই সত্য অনুসারে শিক্ষা-বিজ্ঞানের কয়েকটি কথা আসিয়া পড়ে। অনেকের ধারণা, ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য ; সুতরাং ক্লাশটি যত অল্পসংখ্যক ছাত্রযুক্ত হয়, ততই ভাল। এ এ ধারণাটি এক হিসাবে ভুল। শিশু যত বেশী সংখ্যক বন্ধুবান্ধবের সহিত মেলামেশা করিতে পারিবে, অনুকরণ করিবার যত বিস্তৃত ক্ষেত্র পাইবে, প্রতিযোগিতার যত তীব্রতা পাইবে, ততই তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে। অবশ্য এই অনুকরণ শিক্ষকের বেতের ভয়ে করাইলে চলিবে না, তাহা হইলে অনুকরণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংখ্যক সঙ্গী না থাকায় ছাত্রদের কল্পনাশক্তির দ্বারা খুলিবার সুবিধা নাই, সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত পুস্তকাদির দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা উচিত।

অনুকরণের নাম শুনিয়াই কাণে আঙ্গুল দিয়া ছি-ছি করিবার প্রয়োজন নাই। সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিখ্যাত 'অনুকরণ' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, অনুকরণ মাত্রই দুষ্য নহে। অনুকরণ করিতে করিতেই ছোট শিশু কথা কহিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সভ্যতর জাতির অনুকরণ করিতে করিতেই বড় হইয়া উঠে, গ্রীক্ সভ্যতার অনুকরণ করিয়াই রোমক সভ্যতা বড় হইয়াছে, রোমক সভ্যতার অনুকরণ করিয়াই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা বড় হইয়া উঠিয়াছে। পোপ্ ড্রাইডেনের অনুকরণ করিয়াছেন, জন্সন্ পোপের অনুকরণ করিয়াছেন, ভার্জিল হোমারের অনুকরণ করিয়াছেন, সারা রোমক সাহিত্য গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণ করিয়াছে। আমাদের শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্য মহাভারত আর একটি মহাকাব্য রামায়ণের অনুকরণ মাত্র।* মহাভারতের যুধিষ্ঠির রামায়ণের রামের অনুরূপ, অর্জ্জুন লক্ষ্মণের অনুরূপ, নকুল-সহদেব ভরতের অনুরূপ। ভীমের কথা স্বতন্ত্র, তাহা হইলেও তাহার মধ্যে কুম্ভকর্ণের ছায়া আছে। রামায়ণের বিভীষণ মহাভারতে বিদুর হইয়াছে। দুইটি মহাকাব্যের নায়কই সিংহাসন পাইবার প্রাক্কালে পত্নীসহ দীর্ঘকালের জন্য বনবাস বরণ করিয়াছেন, উভয়ের প্লট্ প্রায় একরূপ, রামায়ণের লব-কুশের কাজ মহাভারতে মণিপুরে বভ্রুবাহন করিয়াছে, রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের সহিত মহাভারতের শান্তি পর্বের বহু সাদৃশ্য আছে। এই সব সত্বেও, মহাভারত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। ইহাতে এমন সব ঘটনা ও চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা রামায়ণেও নাই। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ভীষ্ম, কর্ণ, সুভদ্রা, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি পৃথিবীর সাহিত্যে অতুলনীয়।

শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেন, সমাজ সভ্যতা কলা-কৃষ্টি সর্বত্রই অনুকরণ মৌলিকত্বের জননীর কাজ করিয়াছে। ইউরোপের ব্যবস্থা-শাস্ত্র, ইউরোপের শাসনপ্রণালী রোম হইতে অনুসৃত হইয়াছে। ইউরোপেয় স্থাপত্য-শিল্প ও চিত্রবিদ্যা গ্রীক ও রোমক অনুকরণ হইতে উদ্ভূত। অনুকরণ করিতে করিতে

* রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর রচনা তাহা লইয়া পণ্ডিতদের তর্ক ও মতভেদ আছে। তবে তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।

যখন দক্ষতা অর্জিত হয়, তখন মৌলিক সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় অনেক প্রতিভাবান্ শিষ্যই গুরুকে ছাড়াইয়া যায়।

(১) সহানুভূতির সাহায্যে অপরের ভয় ভাবনা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে নিজের মধ্যে অনুভব করা, (২) অভিভাবনের সাহায্যে অপরের চিন্তা, ভাবধারা প্রভৃতি নিজের মধ্যে গ্রহণ করা এবং (৩) অনুকরণের সাহায্যে অপরের ক্রিয়াকলাপ নিজের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া পুনরাবৃত্তি করা—ইহাই হইতেছে গণমনের বা সংঘচেতনার মূল কথা। লা-বঁ (Leo-Bon) নামক পণ্ডিত এই তিনটি ছাড়া আর একটি শক্তির কথা বলিয়াছেন—তাহা হইতেছে (৪) সংঘজাত শক্তির অনুভূতি। তিনি বলেন, জনসংঘস্থ ব্যক্তি জনতার অংশ হিসাবে শুধু সংখ্যা সম্বন্ধে সচেতন বলিয়াই একটা নূতন শক্তিতে স্বাধিকারপ্রমত্ত হইয়া উঠে। ফলে একাকী থাকিলে যে কাজটি সে করিতে পারে না, জনতার মধ্যে থাকিলে অনায়াসেই তাহা করিতে পারে। জনতার স্বাধিকারপ্রমত্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই ভাবে তাহার কাজের জন্য তাহার ব্যক্তিগত দায়িত্ব কিছুই নাই। ফলে দলগতভাবে এমন গোঁয়ার্তুমির কাজ সে করিতে পারে, যাহা ব্যক্তিগতভাবে সে কিছুতেই করিতে পারে না। যে নিয়মের জন্য একটি জনতা এই মূর্খজনোচিত কার্য করে, তাহাকে লা-বঁ "মিশ্রণ ও বাধার নিয়ম" (The law of fusion and arrest) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, জনতার মধ্যে যে গুণটি সাধারণ, তাহা মিশ্রণ হইয়া এক হইয়া যায় এবং যে গুণটি ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন প্রকারের তাহা পরস্পর কাটাকাটি করিয়া পরস্পরকে বাধা দিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলে সাধারণের আগ্রহ আছে এমন একটা মূর্খের দল যাহা সিদ্ধান্ত করে, পণ্ডিতের দল ব্যক্তিগতভাবে তাহাতে বাধা দিতে পারেন না। কবির কাব্যের ব্যঞ্জনা বদলাইয়া এ ক্ষেত্রে এই নিয়মটি সম্বন্ধে বলিতে পারি "ব্যক্তি ডুবে যায় দলে" এবং দলের অধিকাংশের সাধারণ সিদ্ধান্তই জয়ী হয় এবং 'জৈবিক অনুকরণের' নিম্নতম প্রেরণার অন্ধ অনুকরণে পরিচালিত হইয়া ভদ্র-অভদ্র সকলেই হয়ত ইতরজনোচিত ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করে না।

জনসংঘের মধ্যে গণমনের ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাতে মনে

হইতে পারে যে গণমনের কাজই হইতেছে ব্যক্তিগত আচরণকে নিম্নস্তরে লইয়া আসা। কিন্তু একথা সর্বথা প্রযোজ্য নহে। কারণ জনসংঘের সবগুলির কার্যই এক জাতীয় নহে এবং বিভিন্নভাবে ইহার শ্রেণীবিভাগও করা যাইতে পারে। ড্রেভার সাহেব জনসংঘের ক্রিয়াকলাপকে এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন :

(১) **জনতা জাতীয় গণসংঘ :** ইহরে মধ্যে একটা স্থায়ী বন্ধন কিছুই নাই, ইহার মধ্যস্থিত লোকগুলি সাময়িকভাবে মিলিত হয় আবার হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়, অতীতের কোনও সংস্কার বা ঐতিহ্য অথবা ভবিষ্যতের কোনও ভাবনা বা আদর্শ ইহার কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে না। ইহার কার্যকলাপ সমস্তই বর্তমানকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হয় এবং শিশু বা ইতরপ্রাণীদের মত সাময়িক উত্তেজনাই ইহার কার্যকলাপের উত্তেজক।

(২) **ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান জাতীয় জনসংঘ :** ইহার মধ্যে জনতার বর্তমান-সর্বস্বতা নাই ; প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠানের আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ববোধ এরূপ জনসংঘের সভ্যদিগের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাহাদের পরস্পরে মধ্যে একটা স্থায়িত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে।

(৩) **জাতিগত জনসংঘ :** একটা সাধারণ ঐতিহ্য, সাধারণ কৃষ্টি, সাধারণ গৌরব-বোধ এই জাতিগত জনসংঘের জনসাধারণকে একত্র বন্ধন করিয়া রাখে ; ফলে জাতিগত গণমনের প্রেরণায় জাতির গৌরবের জন্য স্বার্থত্যাগ, জীবন-সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দুঃখ বরণ, প্রাণান্তকর বীরত্ব প্রভৃতির উদাহরণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ হইয়া থাকে।

জনতার মধ্যে পূর্ব-সঞ্চিত সংস্কার, আদর্শ, ঐতিহ্য, উদ্দেশমূলক শক্তি প্রভৃতি কিছুই নাই, ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে ইহা কিছু কিছু মিলে এবং সমাজ বা জাতিগত জনসংঘের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। জাতীয়ত্ব বোধের মধ্যে এই গণমনের ক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই জাতির আদর্শ রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে লক্ষ লক্ষ লোক শত নির্যাতন বরণ করিতে পারে, অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে, নিষ্ঠা

ও আত্মত্যাগের গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারে। গণমনের এই দিকটি হইতেছে একটি স্পৃহনীয় ও গৌরবময় দিক!

নিছক জনতার মধ্যে যে গণমনের কার্য দৃষ্ট হয়, তাহা কখনও কখনও যে মানুষকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করায় না, তাহা নহে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা মানুষকে মূর্খ সিদ্ধান্ত ও অন্যায় দুঃসাহসিকতায় প্রেরণা দেয়। আর তাহা ছাড়া জনতার গণমন সম্বন্ধে একটা স্থায়ী রূপের কল্পনা করা যায় না। ইহা মানুষকে হিতাহিতবোধশূন্য করিয়া বর্তমান-সর্বস্ব ভাব-মত্ততায় অনুপ্রাণিত করে মাত্র। কিন্তু প্রতিষ্ঠান বা সমাজগত জনসংঘের মধ্যে যে গণমনের কার্য আরম্ভ হয়, তাহা সংঘগত মানুষদের কার্যকলাপে একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাদের সংঘের জন্য বীরত্ব প্রদর্শন, ত্যাগ-স্বীকার প্রভৃতি কার্যে প্রেরণা দেয়। কাজেই গণমনের এই দিকটির অনুশীলন স্কুল কলেজে খুব বাঞ্ছনীয়।

স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গণমনের বিকাশ ও অনুশীলনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে:

প্রথমতঃ, প্রতিষ্ঠানগত সভ্যদের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্নতার স্রোত থাকা প্রয়োজন। এই অবিচ্ছিন্নতা নানাভাবে থাকিতে পারে, যথা (ক) একই লোককে বহু বৎসর ধরিয়া প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত রাখিবার ব্যবস্থা করা, (খ) যতই নূতন লোকের স্রোত আসিতে থাকুক না কেন, পুরাতন ভাবধারা বজায় রাখিবার জন্য সমস্ত পুরাতন সভ্যকে হঠাৎ বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা না করা, (গ) প্রতিষ্ঠানের আইন, কানুন, কর্তৃত্ব, পরিচালনা প্রভৃতির জন্য একটা স্থায়ী নিয়মাবলীর ব্যবস্থা করা। স্কুল কলেজে এই সমস্ত উপায়গুলিই কার্যকরী করা যায়; তবে এই বিষয়ে সাধারণ স্কুল অপেক্ষা আবাসিক স্কুলের সুবিধা অনেক বেশী।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠানগত প্রত্যেক সভ্যের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একটা মমত্ববোধ, একটা সংঘ-চেতনা থাকা প্রয়োজন। এই সংঘ-চেতনার জন্য আবশ্যক হইতেছে সংঘের কার্যাবলীর সহিত মনে প্রাণে ঐক্যবোধ। নিছক দেহগত উপস্থিতি অথবা অর্থগত সাহায্যদান—এইটুকুই সংঘ-চেতনার সৃষ্টি করিতে পারে না। ক্লাশে যখন পড়াশুনা চলিতেছে, তখন যে বালক পড়াশুনায়

মনোযোগ দেয় না, সে পাঠনের সময় যে সংঘ-চেতনার স্বষ্টি হয় তাহাতে মোটেই সাহায্য করে না, বরং গণ-মনের পুষ্টিতে ব্যাঘাতই আনয়ন করে।

তৃতীয়তঃ, একটি সংঘের সহিত অন্য সংঘের প্রতিযোগিতা এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই প্রতিযোগিতা সংঘস্থ জনসাধারণকে সংঘ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। সংঘের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য, সংঘের প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণা দান করে।

চতুর্থতঃ, এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা যুগ-লালিত আচার ও ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন। এই ঐতিহ্যকে রস্ সাহেব 'Group Mneme' নাম দিয়াছেন। এই ঐতিহ্য সংঘগত ব্যক্তিদিগের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করিয়া প্রত্যেককেই একটা বিশেষ ভঙ্গীতে পরিচালিত করে। অবশ্য প্রাচীনপন্থী মনোভাব অনেক সময় আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া গতানুগতিকতার চক্রাবর্তে আমাদের পরিচালিত করিতে পারে এবং জীবনের নূতন সার্থকতার অভিযান হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়াও তুলিতে পারে। তাহা হইলেও অতীতের আচার-ব্যবহার ও ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলে আমাদের সভ্যতা ও সাধনা দানা বাঁধিয়া পরিপুষ্ট হইতে পারে না। কাজেই অতীতের রীতিনীতি, সংস্কার প্রভৃতিকে—এমন কি যে সমস্ত অনুষ্ঠানকে আপাতঃ দৃষ্টিতে অর্থহীন বলিয়াও মনে হয়, সেই সমস্তকেও খুব নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলা এবং বাহিরের সমস্ত আঘাত হইতে তাহাদের রক্ষা করা উচিত। স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্র-সম্মেলন, প্রাক্তন সভ্য-সম্মেলন প্রভৃতির দ্বারা অতীতের সহিত বর্তমানের যোগসূত্র বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পঞ্চমতঃ, এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা সুপরিচালিত এবং সুপরিকল্পিত নেতৃত্বের প্রয়োজন। এই নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠানের কর্মতন্ত্রকে প্রেরণা দিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে। সংঘগত এই প্রেরণাকে রস্ সাহেব 'Group horme' নাম দিয়াছেন। মানুষের জীবনে যেমন সংরক্ষণ-প্রয়াস এবং কর্ম-প্রয়াসের প্রয়োজন আছে, সংঘজীবনেও সেই প্রকার তাহাদের প্রয়োজন আছে। সংঘ-নেতৃত্ব এই সংরক্ষণ-প্রয়াস ও কর্ম-প্রয়াসকে

পরিচালিত করে। এই জন্য সংঘ-জীবনের গৌরবের জন্য মহাপুরুষদের নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন। আমরা জানি, জনতার মধ্যে যে জনসংঘের সৃষ্টি হয়, তাহাতে অযোগ্য নেতার নেতৃত্বে জনতার লোকেরা এমন সমস্ত কার্য করে যাহার জন্য পরে লজ্জা পাইতে হয়। প্রতিষ্ঠান-নেতার পক্ষেও এই জাতীয় কাজ করা সম্ভব। কিন্তু তিনি যদি সত্যকারের মহৎ ব্যক্তি হন তাহা হইলে নিজের ব্যক্তিগত আদর্শের গুণে সংঘের অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তাহাদের নিম্নতর স্তর হইতে উর্ধ্বে টানিয়া তুলিতে পারেন। এইভাবে যোগ্য নেতার পরিচালনায় একটা প্রতিষ্ঠান বা জাতির ইতিহাস একেবারে বদলাইয়া যাইতে পারে। কার্লাইল বলিয়াছেন, "একটা জাতির ইতিহাস হইতেছে সেই জাতির মহাপুরুষদের ইতিহাস"—কথাটা এই দিক দিয়া খুবই সত্য। এই মহাপুরুষদের আবির্ভাব না হইলে জাতির সাধারণ লোক সাধারণই থাকিয়া যায় ; কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্ব থাকিলে এই সাধারণ লোক দিয়াই অসাধারণ বীরত্ব, অসাধারণ ত্যাগ প্রভৃতির কার্য করাইয়া লওয়া যায়।

স্কুল কলেজে এই যোগ্য নেতৃত্বের প্রশ্নের সমাধান কিরূপে সম্ভব ? একটু লক্ষ্য করিলেই আমরা অনেক স্বাভাবিক নেতার সন্ধান পাই। এই নেতা কাহারা ? যাহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে ভাল ? আচরণে সৎ ?—না। অনেক সময়েই সেই সমস্ত বালকেরাই স্বাভাবিক নেতৃত্বের অধিকারী হয়, যাহারা শারীরিক শক্তিতে শক্তিমান, খেলাধূলায় দক্ষ এবং দুষ্টামির নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কারের ওস্তাদ। আবার অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে যাহাদের নেতা বলিয়া মনে হয়, সেই দুর্দান্ত ডাকাবুকো বেপরোয়া ছেলেটিকে আড়াল হইতে পরিচালিত করিতেছে একজন কুচক্রী বুদ্ধিমান বালক। উপর হইতে তাহাকে চেনা যায় না, অথচ এই অতি নিরীহ শান্ত প্রকৃতির বালকটিই হয়ত সমস্ত দুষ্টামির উৎস।

স্কুলের স্বাভাবিক নেতা এই ডাকাবুকো ছেলেটিই হউক, অথবা কুচক্রী সয়তানটিই হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তবে এ কথা নিশ্চয়ই সত্য যে, স্বাভাবিক নেতাদের দল সব সময়েই তাহাদের সহচরদের কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে পারে না। এই জন্য শিক্ষকদের উচিত এই নেতৃত্বের

অধিকার গ্রহণ করা। কিন্তু তাহা কিভাবে সম্ভব হইবে? অনেকে বলেন, ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তাহাদের খেলাধূলার সঙ্গী হইয়া এই কাজ করা সম্ভব। পরিহাস-রসিক ক্রীড়া-নিপুণ অমায়িক প্রকৃতির অল্পবয়স্ক শিক্ষকদের পক্ষে এই কাজটি খানিকটা সহজ। কিন্তু তাহা হইলেও, শিক্ষা দীক্ষা, বয়স এবং প্রবণতার দিক দিয়া শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে একটা বিভেদ থাকিয়া যাইবেই এবং এই বিভেদটি শিক্ষকের বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিবে। কাজেই শিক্ষকরা যতই চেষ্টা করুন না কেন, ছাত্রদল তাঁহাদিগকে মনেপ্রাণে নিজেদের দলের বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না।

কাজেই স্কুল কলেজ পরিচালনার শ্রেষ্ঠতর উপায় হইতেছে ছাত্রদের মধ্য হইতেই উপযুক্ত স্বাভাবিক নেতার সন্ধান করিয়া লইয়া সেই নেতাদের কার্যের উপর নেতৃত্ব করা এবং তাহাদের মারফৎ সমস্ত ছাত্রদিগকে আইন, শৃঙ্খলা ও কল্যাণের পথে সুপরিচালিত করা। পূর্বেকার যুগে "সর্দার পোড়ো"দের দিয়া এই জাতীয় কাজ করা হইত। বর্তমানে 'প্রিফেক্ট' প্রভৃতির দ্বারাও এইরূপ কাজ করানো সম্ভবপর। উপযুক্ত নেতার নির্বাচন হইলে এবং সেই নেতাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে "ছাত্র-শাসনতন্ত্রের" দ্বারা, "ছাত্র পঞ্চায়েৎ" জাতীয় প্রথার দ্বারা অনেক সুফল পাওয়া যাইতে পারে। এই সুযোগ্য ছাত্রনেতাদের উপর শিক্ষক যে ভার অর্পণ করেন, তাহারা প্রায়ই তাহার অমর্যাদা করে না।

গণমনের আলোচনাপ্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্মরণীয়। তাহা হইতেছে, বিদ্যালয়ে পঠনের সময় ছাত্রদের ব্যক্তিগত মনের উপর অথবা গণমনের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে? অর্থাৎ "পাঠন কার্য ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে হইলে ফল ভাল হইবে?'

অনেকের কাছে এই প্রশ্নটি একেবারে নিরর্থক বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দেওয়া যে খুবই প্রয়োজন, বহু সংখ্যক ছাত্রবিশিষ্ট 'হরি ঘোষের গোয়ালে'র চেয়ে ছোট ছোট ক্লাশে যে কাজ ভাল হয়, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। তাহা হইলে পাঠনের দিক দিয়া ছোট ক্লাশ ভাল, না বড় ক্লাশ ভাল—এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কেন?

যে সব ব্যাপারে বুদ্ধির কাজ বেশী, সেই সমস্ত বিষয় পাঠনের সময় ছোট ক্লাশে অথবা ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দিলে ফল ভাল হয়। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যাহাতে মস্তিষ্কগত বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়গত আবেগ, অনুভূতি ও অনুপ্রেরণার প্রয়োজন বেশী। এই সব ক্ষেত্রে ছোট ক্লাশের চেয়ে বড় ক্লাশে ফল ভাল হয়। ইহার কারণ খুবই স্পষ্ট। ইতোপূর্বে আমরা যে অভিভাবন, অনুকরণ ও সহানুভূতির কথা বলিয়াছি, তাহা সংঘজীবনেই বিশেষভাবে ক্রীয়াশীল হয়। ফলে সংঘটি যত বৃহৎ হইবে, পরস্পরের মনের রঙে পরস্পর অনুরঞ্জিত হওয়া, পরস্পরের সহানুভূতিতে হৃদয়াবেগে অভিভূত হওয়া, এইগুলি ততই বিশেষভাবে ঘটিতে থাকিবে। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে কোনও শোকের দৃশ্য দেখিয়া দুই একজন যখন রুমাল লইয়া চক্ষের জল মুছিতে আরম্ভ করিল অমনি চারিদিক হইতে ফোঁস ফোঁস ফুঁপাইয়া কান্নার রেষারেষি আরম্ভ হইয়া গেল, সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা জমাট কান্নার আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল। ক্লাশের মধ্যেও এই ব্যাপারটি হয়। কবিতা পাঠনের সময় অথবা যে সমস্ত পাঠ্য পাঠনের মধ্যে ছাত্রদের হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতির কাজ করিতে হয় সেই সব ক্ষেত্রে বৃহৎ ক্লাশের জমাট গম্‌গমে নিস্তব্ধতার মধ্যে পাঠন যত হৃদয়গ্রাহী হয়, ছোট ক্লাশের দু' চারটি ছাত্রের মধ্যে ততটা হয় না।

যাঁহারা বড় বড় সভা-সমিতিতে ভাষণ দেন তাঁহারাও জানেন, সভায় উপযুক্ত সংখ্যক শ্রোতা না থাকিলে ভাল বক্তৃতা দেওয়া যায় না। যাত্রা থিয়েটারের অভিনেতারাও ফাঁকা আসরে ভাল অভিনয় করিতে পারেন না।

কাজেই বড় ক্লাশ হইতে শিক্ষকদের হতাশ হইবার বা ভয় পাইবার কিছুই নাই। তাঁহাদের যদি ব্যক্তিত্ব থাকে, ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগকে অপরের হৃদয়ে অনুপ্রাণিত করিবার ক্ষমতা থাকে, ক্লাশের বিভিন্নমুখী আগ্রহকে একমুখী করিয়া পাঠ্য বিষয়ে নিযুক্ত করাইবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে বড় ক্লাশ তাঁহাদের পক্ষে সুবিধারই কারণ হইবে।

উৎসাহ, অনুপ্রেরণা প্রভৃতি সঞ্চারের জন্য স্কুলের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে-মধ্যে

সমাবেশ (assembly) করিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় মর্মস্পর্শী ভাবে তাহাদের নিকট ভাষণ দিতে পারেন এবং নানা প্রকার উৎসব আয়োজন করিয়া স্কুলের মধ্যে সামাজিক জীবনকে সুস্থ ও সরলতর করিয়া তুলিতে পারেন। স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভা, বাৎসরিক স্পোর্টস্, সাহিত্য-সভা, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নববর্ষ, মাঘোৎসব, বর্ষা-উৎসব প্রভৃতি এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য অনেকের মধ্যে যে একটা বাতিক দৃষ্ট হয় তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরর্থক। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য আগেকার দিনে বড়লোকেরা তাঁহাদের ছেলেদের গৃহ-শিক্ষক, গভর্ণেস্ প্রভৃতির দ্বারা পড়াইয়া সাধারণ বালকদের সংশ্রব বাঁচাইয়া আভিজাত্যের বিশুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে মানুষ করিবার চেষ্টা করিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা দিয়াছে যে, সেই সব ছেলেদের বেশীর ভাগই এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানুষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। অনুকরণ, অনুভাবন, সহানুভূতি প্রভৃতির সাহায্যে গণমন বিকাশের সুবিধা হয় নাই বলিয়া তাহারা প্রায়ই অপরিণত-বুদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নয়, সঙ্ঘকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পরের জন্য স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি প্রভৃতি যে বৃত্তিগুলির বিকাশ হয়, সেগুলি না হওয়ার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা অভিমানী, অতিমানী, স্বার্থপর, অসামাজিক, আত্মকেন্দ্রিক ও আদুরে দুলাল প্রকৃতির হইয়া পড়ে। শিক্ষা দ্বারা যেমন মানুষের ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তেমনই তাহার সামাজিক সত্তাকেও বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। অসামাজিক মানুষ মানুষই নয়, সে যত বিদ্বান, যত বুদ্ধিমানই হউক না কেন। শুধু তাই নয়, নিছক ব্যক্তিত্বকে জাগাইয়া তুলিতে হইলেও মানুষকে মানুষের কাছাকাছি আসিতে হয়, পরস্পরকে বুঝিতে হয়, পরস্পরের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, পরস্পরের সুবিধা, সম্মান ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষার প্রয়োজন হয়। এই জন্যই ব্যক্তিগত মনের বিকাশের চেয়ে গণমনের বিকাশের চেষ্টা শিক্ষা-ব্যবস্থায় বেশী প্রয়োজন।

তবে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রয়োজন, ব্যক্তিগত সাহায্য বা দান

প্রভৃতির উপযোগিতাকে আমরা অস্বীকার করিতেছি না। সকলকার শক্তি সমান নয়। কাজেই সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা সকলেই উপকৃত নাও হইতে পারে। এইজন্য দুর্মেধা বালকদের জন্য ব্যক্তিগত সাহায্য প্রভৃতির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। তেমনই অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী বালকদের জন্যও ব্যক্তিগত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। ইহা ছাড়া বুদ্ধিগত বিষয়ের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন।

কিন্তু বুদ্ধিই মানুষের সব কিছু নহে। হৃদয়হীন বুদ্ধি অনেক সময় মানুষের অকল্যাণই সাধন করে। বুদ্ধির শক্তিকে "গোব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায়" প্রযুক্ত করিতে হইলে প্রেম-প্রীতি ত্যাগ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির প্রয়োজন। এই হৃদয়-ধর্মের বিকাশ সঙ্ঘজীবনেই বিশেষভাবে সম্ভবপর। গণমনের সহানুভূতি, অভিভাব, অনুকরণ প্রভৃতির কার্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক একক জীবনে সম্ভব নহে। ছাত্রদের পরিপূর্ণ মানুষ করিয়া তোলা যদি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধিকেই শুধু উদ্বুদ্ধ করিলে চলিবে না, তাহার হৃদয়কেও বিকশিত করিতে হইবে। এই হৃদয়ের প্রেরণায় নীতির পথে চলা যতটা সহজ, শুষ্ক বুদ্ধির প্রেরণায় ততটা সহজ নহে। কাজেই হৃদয়ের প্রেরণাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য গনমনকে যতটা কাজে লাগান যায় ততই ভাল। এই জন্যই রস্ বলিয়াছেন "আমরা যদি নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই শিক্ষাদানের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি তাহা হইলে খুবই ভুল করিব। মোটামুটি আমরা বলিতে পারি, বুদ্ধিগত ব্যাপারে ব্যক্তিগত শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং নীতি, ধর্ম, আবেগ, দেশপ্রেম প্রভৃতি জাগাইবার ব্যাপারে সঙ্ঘগত শিক্ষাদান শ্রেষ্ঠতম উপায়।"

বড় ক্লাশ সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে। কারণ বড় ক্লাশের বিরুদ্ধে অনেক অভিভাবক এমন কি অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরও আপত্তি আছে। অনেক শিক্ষককে বলিতে শুনা যায় 'একটি পিরিয়ডে ৪০ মিনিট সময়, আর ক্লাশে ৫০টি ছাত্র পড়াইব কি করিয়া? ইহাতে ব্যক্তিগত ছাত্রের প্রতি গড়ে একটি মিনিটও সময় দেওয়া যায় না'—এ অনুযোগ সত্য নহে। এই ক্লাশটিতে মাত্র কুড়িজন ছাত্র থাকিলেও ছাত্র প্রতি গড়ে দুই মিনিটের বেশী সময়

দেওয়া যাইত না। এ কথা অনস্বীকার্য যে, দুই মিনিট সময়েও কোন ছাত্রেরই প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া সম্ভবপর নয়। কাজেই এই অসুবিধা দূর করিবার উপায় হইতেছে পাঠন ও প্রশ্ন করিবার প্রণালীর পরিবর্তন করা। ছোট ছোট প্রশ্ন তৈয়ারী করিতে হইবে, একটি ছাত্রকে যখন প্রশ্ন করা হইল তখন সমস্ত ক্লাসকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার দায়িত্ব শুধু ব্যক্তিগত নয়, তাহা সমগ্র ক্লাশেরই। তেমনি একজন ছাত্রকে যদি কিছু বুঝাইতে হয়, তখন তাহা শুনিবার দায়িত্বও সমগ্র ক্লাশের। ক্লাশে পড়াইবার সময় একজনের পর আর একজনের পাঠ-দেওয়া শুনিয়া অপর একজনের পাঠ তৈয়ারী হইয়া যায়, আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়া অধীত বিদ্যা মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে গাঁথিয়া যায়। কাজেই বড় ক্লাশে ছাত্রপ্রতি গড়ে খুব বেশী সময় না পাইলেও ক্ষতি হয় না, এবং একজনের উপকার অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বড় ক্লাশে সমগ্রভাবে গণমনটিকে একাগ্র করিতে পারিলে যত কাজ হয়, ব্যক্তিগত একাগ্রতায় সেই কাজ হওয়া সম্ভব নয়। বড় ক্লাশের মনোযোগ ঠিক রাখিবার জন্য শিক্ষককে আকস্মিকভাবে ক্লাশের নানাস্থানে ছড়াইয়া ছড়াইয়া প্রশ্নগুলিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং ক্লাশের গণমনকে কার্যকরী করিবার জন্য ব্যক্তিগত অমনোযোগকে যেমন করিয়াই হোক দমন করিতেই হইবে, ক্রীড়াচ্ছলে (Play Way) প্রতিযোগিতা প্রভৃতির দ্বারা গণমনের উত্তেজনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া আবেগ উৎসাহ প্রভৃতি হৃদয়-ধর্মের সাহায্যে বুদ্ধির কাজকে সহজতর করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহাতেও যাহাদের কাজ হইবে না, তাহাদের একান্তে লইয়া "টিউটোটিয়াল" প্রভৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার সাহাযে ভাল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, নেতাজীর ব্যবহৃত ফুলের মালা বারো লক্ষ টাকায় নিলাম হইয়াছিল। গণমনের উত্তেজনা ব্যতীত এই জাতীয় ব্যাপার কিছুতেই সম্ভব হয় না। স্বামীজী বলিয়াছেন, "দশ হাজার লোকের বাহবার সাম্‌নে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়"—ইহাই হইল গণমনের লীলা। কাজেই এই গণমনের উত্তেজনার সুযোগ শিক্ষকের নিকট হেলার বস্তু নহে। ইহাকে সুপরিচালিত করিতে পারিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়।

স্থিতিবাদ

এখন হইতেছে গতিবাদের যুগ। প্রগতি এখন উদ্ধত-পরিক্রমায় নব-নব অভিযানে চলিয়াছে। কিন্তু জীবনের পরিক্রমা নিছক গতিবাদেরই নামান্তর মাত্র নহে। গতি এবং স্থিতি এই উভয়কে লইয়াই জীবনের কারবার। যাহা কিছু করি তাহা গতিবাদ অথবা স্থিতিবাদেরই অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ স্থিতিবাদ মরা নদীর বদ্ধ জলস্রোতের মত জরা ও মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ মাত্রই নহে। বরং দেখিতে পাওয়া যায়, স্থিতিবাদ আমাদের জীবনের অধিকাংশ কার্যকেই নিয়ন্ত্রিত করে এবং অধিকাংশ মানুষই প্রগতির দিক্‌চিহ্নহীন অনিশ্চিত অভিযানের চেয়ে গতানুগতিকতার নেমি-খিন্ন বাঁধা পথেই চলা-ফেরা করিতে পছন্দ করে বেশী।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কার্যকলাপের মধ্যে এই স্থিতিবাদেরই একচ্ছত্র প্রভাব দৃষ্ট হয়। তাহারা সহজে "রুটিন্" ভাঙ্গিতে চায় না। তাহারা যে ভাবে খাইতে পরিতে শুইতে খেলা করিতে অভ্যস্ত, তাহার ব্যতিক্রম তাহারা সহ্য করিতে পারে না। অনেক সময় বাড়ীতে নূতন দাসী আসিলে অথবা বিপত্নীক গৃহকর্তা নূতন স্ত্রী পরিগ্রহ করিলে সেই নবাগতার সহিত বাড়ার ছেলে-মেয়েদের যে সংঘর্ষ হয়, তাহার কারণ হইতেছে এই নবাগতারা বাড়ীর ঐতিহ্যের সহিত ঠিক পরিচিত নয় বলিয়া নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং তাহার ফলে শিশু-মহলে একটা অসন্তোষ ও বিদ্রোহ জাগিয়া উঠে।

শিশুদের মধ্যে এই পরিবর্তন-বিরোধিতার কারণ কি? পুরাতনের আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির মধ্যে যে আনন্দ আছে, যে দক্ষতা-অর্জন ও আত্ম-বিস্তারের সুযোগ আছে, সেই আনন্দ ও সুযোগের প্রেরণাই হইতেছে ইহার কারণ। এই পরিবর্তন-বিরোধিতা ও পুনরাবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের দক্ষতা দানা বাঁধিয়া উঠে।

ছন্দের আনন্দও এই পুনরাবৃত্তির আনন্দের সহিত সম্পর্কিত। ছন্দের

আনন্দ মানুষের জীবনের সহিত গভীরভাবে জড়িত। ছন্দের তালে-তালে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি, ছন্দের তালে-তালে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়, ছন্দের ভিতর দিয়াই স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গবিক্ষেপ নৃত্যকলায় পরিণত হয়, ছন্দের ভিতর দিয়াই ছড়া গান, লাচাড়ী, পয়ার প্রভৃতির সৃষ্টি হয় এবং ছন্দের ভিতর দিয়াই চিত্রবিদ্যার অনুপাত জ্ঞান ও সামঞ্জস্য বোধ প্রভৃতির আরম্ভ হয়। এই ছন্দপ্রীতি ও পুনরাবৃত্তির আনন্দই পরিপক্ক হইয়া আমাদের মধ্যে যে স্থিতিবাদ ও রক্ষণশীলতার সৃষ্টি করে, তাহাই উত্তরকালে নীতিধর্মের প্রতি আনুগত্য ও আদর্শবাদ প্রভৃতিতে পরিণত হয়।

এই রক্ষণশীলতাকে গোঁড়ামির অপবাদ দিয়া অনেক সময় ছোট করিয়া দেখান হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে যতটা নিন্দা করা হয়, ইহা ততটা নিন্দনীয় নহে। অধ্যাপক গ্রাহাম ওয়ালেস্ (Graham Wallas) দেখাইয়াছেন, স্কুল-কলেজে "ডিসিপ্লিনের" অর্দ্ধেকের উপর নির্ভর করে রক্ষণশীলতা ও অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তার উপর। পূর্ববর্তীরা যে ভাবে কাজ করিয়াছে, সেই ভাবেই কাজ করিয়া যাইতে হইবে—এই বিশ্বাসই হইতেছে শৃঙ্খলার মূল কথা। যেখানে এই জিনিসটি নাই, যেখানে প্রধান শিক্ষক নিত্য নূতন আইন ও 'অর্ডিনান্স' জারি করেন, যেখানে কোনও "ট্রাডিশন" দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে না, সেখানে শৃঙ্খলার আশা করা নিরর্থক। একটি নিয়ম যদি যুক্তিযুক্ত নাও হয়; তাহা হইলেও তাহার পশ্চাতে যদি "ট্রাডিশন" থাকে, একটা সুপ্রাচীনত্বের মর্য্যাদা থাকে, তাহা হইলে নূতন নিয়মের প্রবর্তন না করিয়া প্রাচীন নিয়মকেই সহ্য করিয়া চলা উচিত, কারণ সেই খারাপ প্রাচীন আইনটি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে যতটা কার্যকরী হইবে, নব-প্রবর্তিত ভাল আইনটি ততটা কার্যকরী হইবে না। তাহা ছাড়া প্রাচীন আইন অমান্য করার মধ্যে যে বিদ্রোহ জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই বিদ্রোহ নূতন আইনটিকেও স্পর্দ্ধার চোখে দেখে। গীতায় যে বলা হইয়াছে "শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" (৩।৩৫), তাহার ব্যঞ্জনাও অনেকটা এইরূপ। ধর্মান্ধতার গোঁড়ামিতে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলেন নাই। স্বধর্মের প্রতি আমাদের যে একটা 'ট্রাডিশনে'র আনুগত্য আছে, সেই আনুগত্যই আমাদিগকে স্বধর্মের বিধি-নিষেধকে মানিয়া

চলিতে সাহায্য করে এবং এই আনুগত্যের জন্যই আমরা স্বধর্মের জন্য কৃচ্ছসাধনা, ত্যাগ, দুঃখবরণে সমর্থ হই। পরধর্মে এই সুবিধা নাই।

প্রতিষ্ঠান ও সমাজের রীতি-নীতি সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। তাহার আইন-শৃঙ্খলার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এমন কি 'নূতন কিছু করা', 'সংস্কার সাধন' প্রভৃতির অজুহাতেও নয়। প্রতিষ্ঠান ও সমাজের রীতি-নীতির সম্বন্ধে একটা রক্ষণশীল মনোভাব এই জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই জন্য যাহারা লঘুচিত্ততা বা অসংযমের জন্য এই আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, তাহাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। স্কুলের দুষ্ট বালক যখন এইরূপ কিছু করিবে, তখন প্রধান শিক্ষক তাহাকে দণ্ড দিবেন তাঁহার ব্যক্তিগত কর্তৃত্বকে সে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া ততটা নহে, যতটা হইতেছে সুপ্রাচীন ও সুপবিত্র বিধি-নিষেধকে সে অগ্রাহ্য করিয়াছে বলিয়া। স্কুল-জীবনেই হউক, আর সমাজ-জীবনেই হউক সর্ব ক্ষেত্রেই অসহিষ্ণু পরিবর্তন-বিলাস ও প্রগতিবাদের চেয়ে স্থিতিবাদই তাহার ঐতিহ্যকে বিশেষভাবে ধরিয়া রাখে এবং কল-কারখানার গুরুভার "ফ্লাই হুইলের" মত তাহার সুনির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তন করিয়া সমগ্র যন্ত্রটিকে চালু অবস্থায় রাখে।

আমরা শিশু-জীবনের রক্ষণশীলতার কথা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই রক্ষণশীলতা বার্ধক্যেরও একটা ধর্ম। তবে বার্ধক্যের রক্ষণশীলতা আর শৈশবের রক্ষণশীলতা এক জিনিস নয়। বার্ধক্যের রক্ষণশীলতা আত্ম-সঙ্কোচনের অভিব্যক্তি মাত্র; নূতন পথে চলিবার এবং অনিশ্চিত অভিযানে শক্তির অপব্যয়ের ভয়েই এই রক্ষণশীলতা আসে। আর শৈশবের রক্ষণশীলতা হইতেছে আত্ম-বিস্তারের উপায় মাত্র; এই রক্ষণশীলতার ভিতর দিয়া, শিশু পুরাণ কাজের পুনরাবৃত্তি করে এবং ক্রমশঃ কাজে দক্ষতা অর্জন করে।

এই রক্ষণশীলতা ও পুনরাবৃত্তির প্রচেষ্টাগুলিকে অনেক শিক্ষাতাত্ত্বিক আজকাল ভাল চক্ষে দেখেন না। "ইহার মধ্যে বুদ্ধির লীলা নাই", "ইহা যান্ত্রিক আবৃত্তি মাত্র" এই জাতীয় অপবাদ দিয়া আবৃত্তিমূলক নামতা পড়া, ধারাপাত পড়া, আর্যা, ছড়া, কবিতা প্রভৃতি মুখস্থ করা প্রভৃতিকে "সেকেলে জিনিস" বলিয়া বর্জন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা খুবই

ভুল কাজ; আবৃত্তির আনন্দ বালক-বালিকাদের অস্থিমজ্জাগত; আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়াই তাহারা নিজেদের খুঁজিয়া পায় এবং এই আবৃত্তিই তাহাদের বুদ্ধি, দক্ষতা ও সৃজনী শক্তির দ্বার খুলিয়া দেয়।

গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দিবার সময় এই সত্যটি মনে রাখা উচিত। শিশুকে হয়ত এক জাতীয় অঙ্ক শেখান হইল। তখন তাহাকে সেই জাতীয় শক্ত অঙ্ক তাড়াতাড়ি না দিয়া সহজ সহজ অঙ্কই বহু বার করাইতে হয়। তাহার ফলে কৃতকার্যতার আনন্দ ও পুনরাবৃত্তির দক্ষতা শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও আত্ম-প্রতায় বাড়াইয়া দেয় এবং তাহার বুদ্ধি-বিকাশে সাহায্য করে। ইহা না করিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি কঠিন অঙ্ক দিলে প্রত্যেক বারের অকৃতকার্যতা তাহার শক্তিকে কমাইয়া দিবে।

অনেক প্রগতিবাদী শিক্ষকদের ধারণা আছে যে, একটা পদ্ধতি শিখাইবার পর সময় নষ্ট না করিয়া নূতন নূতন পদ্ধতি শিখাইতে হয়—এই ধারণাটি ঠিক নহে। একটি কাজ শিক্ষা করিবার পর সেই কাজটিকে বহুবার আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। তাহা না হইলে সেই কাজটিকে সুন্দর করিয়া করা যায় না। ছবি, গান, নৃত্য, সূচী-বিদ্যা, কারিগরী, শিল্পকলা সব কিছুই আবৃত্তির ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং আবৃত্তির অভাবেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। বস্তুতঃ আবৃত্তিবাদ প্রগতির পরিপন্থী নহে। আবৃত্তির বাঁধা পথে চলিতে চলিতেই অভাবনীয়ের গোপন দরজা হঠাৎ এদিকে ওদিকে খুলিয়া যায় এবং তখনই নূতন শিল্পকলার জন্ম হয়।

কথাটা অনেকের কাছেই নূতন লাগিতে পারে। রক্ষণশীলতার পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়া নূতন শিল্পকলার সৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব হয়? রক্ষণশীলতাকে ত সৃষ্টির পরিপন্থী বলিয়াই আমরা জানি। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে; রক্ষণশীলতা অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পকলার জননীর কার্য করে। কথাটা একটু উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়া বলা যাইতে পারে। মৃৎশিল্পের কথাটাই ধরা যাউক। প্রাচীন মৃৎশিল্পী হয়ত নিছক প্রয়োজনের খাতিরে মৃৎপাত্র গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ যে সমস্ত মৃৎপাত্র সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা হয়ত সুগঠিত সুন্দর জিনিস তৈয়ারী হয় নাই।

তাহার পর আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়া তাহার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রকারিতা বাড়িতে লাগিল এবং বাড়্‌তি সময় ও দক্ষতা দিয়া সে প্রয়োজনের ঘরোয়া জিনিসটিকে শিল্পের সুন্দর জিনিস করিয়া গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইল। এইভাবে প্রয়োজনের চাহিদায় যাহার উদ্ভব হইল, শিল্পের সুষমায় তাহা পূর্ণতা লাভ করিল। এইভাবেই পুনরাবৃত্তির সঞ্চিত দক্ষতার ভিতর দিয়া শিল্পের জন্ম হয়। কিন্তু এই মৃৎশিল্পটি যদি তাহার প্রথম মৃৎপাত্র সৃষ্টির পরেই সেই পুরাণ গঠনের পাত্র নির্মাণ-কার্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়তই নূতন নূতন গঠনের দিকে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার দক্ষতা সহজে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিত না।

দক্ষতা অর্জনের জন্য যেমন পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন, দক্ষতা রক্ষণের জন্যও তাহার তেমনই প্রয়োজন। আমরা সকলেই জানি, বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী, সেতারী, গায়ক প্রভৃতিকে প্রতিদিন ৫।৬ ঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের অধীত বিদ্যার আবৃত্তি করিতে হয়। এই আবৃত্তির ভিতর দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের অর্জিত দক্ষতাকে যেমন বজায় রাখেন তেমনি তাঁহারা নূতন সৃষ্টিরও সন্ধান পান।

মানুষের রক্ষণশীলতার এই পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর একটি দিক আছে। তাহা হইতেছে উৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠানের দিক। পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যেই এই অনুষ্ঠানপ্রিয়তা দৃষ্ট হয়। রাজার অভিষেক উৎসব, ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন, বিবাহ, জয়ন্তী, মৃত্যু-বার্ষিকী প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত উৎসবের মধ্যে আসল অনুষ্ঠান তত বড় জিনিস নয়, যতটা হইতেছে এই অনুষ্ঠানগুলির ব্যঞ্জনা। এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে হয়ত বর্বর যুগের অতি সাধারণ ক্রিয়া-কলাপের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেই সমস্ত অতি সাধারণ জিনিসগুলিকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে সভ্য সমাজের বড় বড় ব্রত-পার্বণ উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

'মানুষের সভ্যতা ও ধর্ম-জীবনের সব কিছুই এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠান হইতে জন্মলাভ করিয়াছে অথবা ইহাদের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে'—এ কথা বলিলে হয়ত একটু বেশী বলা হইবে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, একটা জাতির জাতীয় জীবনে এই সব অনুষ্ঠান ব্রত-পার্বণ

প্রভৃতির একটা বিশেষ মূল্য আছে এবং এগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত পালন করিলে জাতির কল্যাণই হইবে। যে জাতি নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিকে সম্মান করে না, সে জাতি আত্মবিস্মৃত হইয়া লঘুচিত্ত ও পরানুকরণ-সর্বস্ব হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকে শুধু কবি হিসাবেই ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষাতাত্ত্বিক হিসাবেও তাঁহার অবদান সামান্য নহে। জাতীয়-জীবনের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রয়োজন তিনি বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার শিক্ষায়তনে মাঘোৎসব, বর্ষা-মঙ্গল, নববর্ষ, শারদোৎসব, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিকে তিনি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। শুধু তাই নয়, জাতীয় উন্নতির জন্য আমাদের মেলা, বারোয়ারী, যাত্রা গান, কথকতা প্রভৃতির সংস্কার করিতে পারিলে যতটা কাজ হয়, বিলাতী কায়দায় সভা-সমিতি বক্তৃতা প্রভৃতিতে ততটা হয় না—এই জাতীয় কথাও তিনি বলিয়াছেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার একাধিক রচনায় এই প্রকার কথা বলিয়াছেন।

একটা জাতির সংস্কৃতি অনেকখানি পরিমাণ রূপায়িত হইয়া উঠে তাহার উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়া। কাজেই স্কুল-কলেজেও এইগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান থাকা উচিত। আজকাল যে আমাদের ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে একটা লঘুচিত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়াছে, তাহার কারণ হইতেছে নূতনত্ব-বিলাস ও উগ্র প্রগতিবাদের প্রেরণায় আমরা প্রাচীন সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করিতেছি না, ফলে জাতীয়ত্বের প্রতি নিষ্ঠা হারাইয়া আমাদের ভারকেন্দ্র স্থানচ্যুত হইয়াছে এবং উৎকেন্দ্রিক আকর্ষণে আমরা কক্ষচ্যুত হইয়া অসংযত যাযাবরত্বে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছি ও ব্যর্থ কোলাহলের সৃষ্টি করিতেছি এবং নিষ্ঠাকে গোঁড়ামি বলিয়া, 'ট্রাডিশন্'কে কুসংস্কার বলিয়া, আদর্শবাদকে মূর্খতা বলিয়া পরিহার করিয়া লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত 'ফ্যাসনে'র রঙিন মরশুমী ফুলের আশে-পাশে ঘুরিতেছি।

●

ক্রীড়া

মানস-বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে ক্রীড়ার কথা উত্থাপন করা অনেকে হয়ত 'ধান ভানিতে শিবের গীত' জাতীয় অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু মানস-বিজ্ঞানে ইহা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নহে। কারণ যে সমস্ত মূলধন লইয়া মানুষ তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, ক্রীড়া তাহার মধ্যে অন্যতম। আমরা জানি সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) ছাড়া আরও কতকগুলি সহজাত গুণ আমাদের থাকে, যাহার ফলে আমাদের কার্যাবলী একটি বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয় এবং আমরা মনুষ্যত্বের পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। এইগুলি হইতেছে: (১) অনুকরণ (২) অনুমনন (৩) অভিভাবন (৪) পুনরাবৃত্তি প্রচেষ্টা (routine) (৫) ক্রীড়া (৬) অভ্যাস প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি "গণমন" পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে, চতুর্থটি "স্থিতিবাদ" প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। উপস্থিত আমরা ক্রীড়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ক্রীড়া জিনিসটিকে আমরা অনেক সময় কার্যের বিপরীতধর্মী জিনিস বলিয়াই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু কথাটা যতটা হাল্কা ভাবে ভাবা হইয়া থাকে, ক্রীড়া জিনিসটা ততটা হাল্কা জিনিস নয়। বস্তুতঃ ইহা কখনও অতিরিক্ত উৎসাহ উদ্যমের পরিবাহ, কখনও বা কাজের জন্য প্রস্তুতি, কখনও বা কাজের পরিশ্রমের অবসর, কখনও বা সৃজনীশক্তির সহায়ক; কখনও বা ইহা দক্ষতা অর্জনের উপায়, কখনও বা ভাবী জীবন-সংগ্রামের জন্য শক্তি-সঞ্চয়, কখনও বা জাতির অতীত ইতিহাসের অনুবৃত্তি অথবা বর্বরতার উৎকর্ষণ; আবার কখনও কখনও ইহা জীবনের রুক্ষতা হইতে পলায়নের আশ্রয়, কখনও বা অতৃপ্ত কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির উপায়। ইহার রূপ অসংখ্য ও বিচিত্র এবং ইহার প্রয়োজন জীবনের সকল অবস্থাতেই সমানভাবে দৃষ্ট হয়। তবে ক্রীড়ার লীলা-খেলা শৈশব এবং বাল্যেই সমধিক দৃষ্ট হয়।

পরীবাহবাদঃ

শীলার (Schiller), স্পেন্সার (Spencer) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বাল্য ও কৈশোর অবস্থায় আমরা জীবনী-শক্তির প্রাচুর্যে ভরপূর থাকি এবং আমাদের উৎসাহ উদ্যমের প্রাচুর্য অনেক সময় হয়ত আত্মঘাতী হইয়া আমাদের ক্ষতিও করিতে পারে। ক্রীড়া জিনিসটা এই অতিরিক্ত উদ্যমের পরীবাহ হইয়া আনাদের শরীর-মনের সমতা রক্ষা করে। ইঞ্জিনের 'বয়লার'-এ বাষ্প বেশী হইলে 'সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভ্‌' দিয়া তাহা যদি সময় সময় বাহির হইয়া না যায়, তাহা হইলে তাহা 'বয়লার'-কে ফাটাইয়া দিতে পারে। "সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভ্‌' দিয়া মাঝে মাঝে বাষ্প ছাড়িয়া দেওয়া যেমন 'বয়লার'-এর নিরাপত্তার পক্ষে প্রয়োজন, খেলা-ধূলার 'সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভ্‌'-এর ভিতর দিয়া আমাদের অতিরিক্ত শক্তির পরীবাহের ব্যবস্থা করাও তেমনই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। শিশুর অকারণে হস্ত পদাদির উৎক্ষেপ-নিক্ষেপ করা, বালকদের অকারণে লাফালাফি দাপাদাপি করা, এই সমস্ত নাকি এই পরীবাহেরই ক্রিয়া।

কিন্তু 'বয়লার'-এর অতিরিক্ত বাষ্পের পরীবাহের তুলনাটি মানুষের খেলা ধূলার শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে পুরাপুরি খাটে না। কারণ, শিশু যখন লাফালাফি করিয়া শক্তি ক্ষয় করে, তখন সে শুধু বাড়্‌তি শক্তি খরচ করিয়া দেহের ক্ষমতা রক্ষাই করে না, এই লাফালাফি অঙ্গচালনা প্রভৃতি করিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টি ও শক্তিবৃদ্ধি এবং অঙ্গসঞ্চালনের অধিকতর দক্ষতা অর্জনও করিয়া থাকে। সুতরাং খেলাধূলায় শক্তির যে অপচয় হয়, তাহা পরোক্ষ ভাবে নবতর শক্তি সঞ্চয়ের উপায় স্বরূপ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ক্রীড়া জিনিসটি যে শক্তির পরীবাহ মাত্র, এ কথা পুরাপুরি সত্য নহে।

প্রস্তুতিবাদঃ

কেহ কেহ বলেন, খেলাধূলা আমাদের বাড়্‌তি উদ্যমের খরচের উপায় মাত্র নহে, ইহা হইতেছে আমাদের ভাবী-কালের জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। ইহা আমাদের জীবনধারণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপায়।

খেলার এই দেহতান্ত্রিক ব্যাখ্যাটি প্রথমতঃ মেলব্রান্স্ (Malebrance) সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন, তবে কার্ল গ্রুস্ (Karl Groos) সাহেবই ইহাকে তত্ত্ব হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, খেলাধূলা জিনিসটা সেই সমস্ত জীব-জন্তর মধ্যেই বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা জন্মাইবার সময় অত্যন্ত অসহায় থাকে এবং মাতাপিতার সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারে না। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি শিশু বয়সে খেলা করিতে খুব ভালবাসে। ইহারা জন্মের সময় অন্ধ ও অসহায় হইয়া পৃথিবীতে আসে।

ইহারা শিশু বয়সে যে সমস্ত খেলা-ধূলা করে, সেই সব খেলা-ধূলার মধ্যে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা কাজে লাগিবে এইরূপ ক্রিয়া-কলাপেরই মহড়া দেওয়া হইয়া থাকে। বিড়াল-শিশু পশমের বল লইয়া যেভাবে খেলা করে, তাহা তাহার ভাবী জীবনে মূষিক শিকারেরই অনুরূপ ভঙ্গীতে করে। কুকুর-শিশুর খেলাও ভাবী শিকারকে আক্রমণ, শত্রু হইতে আত্মরক্ষা প্রভৃতিরই অনুরূপ।

মানবশিশুর ক্ষেত্রেও এই জাতীয় খেলা আছে। ছোট ছোট মেয়েরা যেভাবে 'বৌ-পাতি' খেলা খেলে, পুতুল-ছেলে-মেয়েদের খাওয়ায়, আদর-যত্ন করে, বিবাহ দেয়, ঘর-কন্না সাজায়—সে সমস্তও তাহার ভাবী গৃহিণী-জীবনের ঘর-সংসারের কাজের মহড়া মাত্র।

পুনরাবৃত্তিবাদ ঃ

স্ট্যান্লী হল্ (Stanly Hall) বলেন, শিশুর ক্রীড়া জিনিসটা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি নহে, ইহা তাহার অতীত জীবনের কার্যকলাপের পুনরাবৃত্তি মাত্র। মানুষের অতীত জীবনের ইতিহাস হইতেছে বর্বরতার ইতিহাস। সেই অতীত যুগের যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত সভ্য মানুষ একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারে না। তাই শিশু অবস্থায় সে ক্রড়া-কৌতুকের ভিতর দিয়া সেই ক্রূর জীবনের অভিনয় করিতে চায়। শিশু-বীরপুরুষের নকল যুদ্ধের অভিযান হইতেছে সেই অতীত ইতিহাসের ক্রোড় অঙ্ক।

প্রশ্ন আসিতে পারে, খেলা-ধূলার ভিতর দিয়া শিশু অতীতের বর্বর যুগের ক্রিয়াকলাপের পুনরাবৃত্তি করিবে কেন? ইহাতে প্রকৃতি কোন্ শিবের সাধনা করিতেছে? তাহার উত্তর হইতেছে, অতীতের দুর্বলতার পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা বর্বরতার উৎকর্ষণ করি অর্থাৎ নকল বর্বরতার অভিনয় করিয়া আসল বর্বরতা যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করি।

ক্রীড়াতত্ত্ব সম্বন্ধে এই পুনরাবৃত্তিবাদ এবং গ্রুস্-এর প্রস্তুতিবাদ, এই দুইটি মত পরস্পরবিরোধী মত নহে, ইহারা পরস্পর অনুপূরক। ক্রীড়া একদিক দিয়া যেমন ভাবী বয়সের কর্মপদ্ধতির মহড়া দিয়া আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে, অন্যদিক দিয়া তেমনি অতীত যুগের বর্বর কর্মপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করিয়া বর্বরতার উৎকর্ষণ (Sublimation) করিয়া সেই দোষ হইতে আমাদের মুক্ত করে। নান্ বলিয়াছেন, ইহা হয়ত সত্য হইতে পারে যে, আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রীড়াগুলি অতীত যুগের বয়স্ক জীবনের কর্মপ্রচেষ্টা হইতে প্রেরণা পায়, তেমনি হয়ত ইহাও সত্য হইতে পারে যে, আমাদের গোষ্ঠীগত স্মৃতি এই সমস্ত কাজ করিবার জন্য যুগে যুগে বারবার আমাদের প্রবুদ্ধ করে; কারণ বর্তমান জীবনেও ঐ জাতীয় কাজের জন্য আমাদের প্রয়োজন হইতে পারে। অথবা এই কথাটি অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, শিশুর ক্রীড়ার মধ্য দিয়া যে কর্মপ্রচেষ্টা রূপ পায়, তাহার মূলে রহিয়াছে অতীতের সংরক্ষণশীলতার প্রেরণা এবং এই সমস্ত ক্রীড়ার মধ্যে যে উৎসাহ ও শক্তির ব্যয় হয়, তাহার ভিতর রহিয়াছে সেই অতীতের অবাঞ্ছনীয় বিশেষত্বগুলি ক্ষয় করিয়া ফেলার কৌশল: "The atavistic factors are the mnemic basis from which the child's forward directed horme proceeds while the "cathartic" action of the play is the sublimation of the energies associated with them." (Eduction : its data and first principles p. p. 83-84 : Nunn)

সাধারণতঃ বলা হইতে পারে যে, লাফালাফি, দাপাদাপি, হট্টগোল প্রভৃতি করিয়া শরীরের উৎসাহ ও শক্তি ক্ষয় করিয়া আমরা যে সব খেলাধুলা করি তাহার প্রেরণা হইতেছে ষ্ট্যান্লী হল্ বর্ণিত পুনরাবৃত্তি ও উৎকর্ষণ

এবং যে সমস্ত খেলা-ধূলার মধ্যে শারীরিক শক্তির চেয়ে বুদ্ধি, কল্পনা প্রভৃতির লীলা বেশী আছে, তাহার ব্যাখ্যা হইতেছে কার্ল গ্রুস-এর প্রস্তুতিবাদ।

আনন্দাভিযানবাদ :

কিন্তু সব খেলাকেই প্রস্তুতি বা পুনরাবৃত্তি অথবা অতিরিক্ত উৎসাহের পরীবাহ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। সারাদিনের স্কুলের পরিশ্রমে ক্লান্ত বালক যখন মচকান পায়ের যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া মাইল দুই হাঁটিয়া বল খেলিতে যায়, অথবা সারাদিনের অফিসের পরিশ্রমের পর কেরাণী যুবক যখন বিজলী বাতি জ্বালাইয়া ব্যাড্‌মিণ্টন্ খেলায় মাতামাতি করে, তখন সেই কাজটিকে বাড়্‌তি উৎসাহের খরচ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। সাধারণ লোকেরা এই জাতীয় ক্রীড়াকে 'রিক্রিয়েশন' বা জীবনের একঘেয়েমিত্ব হইতে অব্যাহতির উপায় বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। তাঁহারা বলেন, কাজের রুটিন পরিবর্তন করিয়া আমরা এইভাবে দৈনন্দিন কর্মজীবনের শুষ্কতা ও একঘেয়েমি হইতে পলায়ন করিয়া আনন্দের অভিযানের মধ্যে আমরা মুক্তির আস্বাদ অনুভব করি।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাবাদ :

ম্যাক ডুগাল্ বলেন, আমাদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবৃত্তি (instinct of rivalry) আছে, তাহাই হইতেছে খেলা-ধূলার মূল প্রেরণা। এই বৃত্তিটি যোধন প্রবৃত্তি হইতে পৃথক, কারণ যোধন প্রবৃত্তির ফলে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিতে চাই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবৃত্তিতে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে শুধু হারাইয়া দিয়া জয়ী হইতে চাই।

ক্রীড়ার মূল কারণ হিসাবে ম্যাক্‌ডুগাল সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বিতাবাদ অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত সত্য। যে কেরাণী অফিসে পদে পদে শুধু বড়বাবুর ভৎর্সনাই পায় এবং আত্মবিস্তারের কোনও সুযোগই পায় না, তাহার পক্ষে "ব্যাড্‌মিণ্টন্", "অক্‌সন্ ব্রিজ্" প্রভৃতি খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরোক্ষ ভাবে আত্মবিস্তারের সুযোগটা কম আকর্ষণের বস্তু নয়। কিন্তু এমন

অনেক খেলাই আছে, যেখানে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ নাই। সে সকল ক্ষেত্রে ম্যাক্‌ডুগালের এই মতবাদ প্রযোজ্য হয় না।

আচরণবাদ, উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়া ঃ

উড্‌-ওয়ার্থ প্রভৃতি আচরণবাদী পণ্ডিতগণ বলেন, খেলার মধ্যে "বায়োলজির" ইঙ্গিত কিছুই নাই ; ইহা জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতিও না, অতীত সংগ্রামের পুনরাবৃত্তিও নয়, "উত্তেজনা আর তাহার প্রতিক্রিয়া" —এই ভাবেই খেলার তত্ত্বটি বুঝান যায়। খেলার জিনিসগুলি শুধু উত্তেজক এবং খেলা এই কাজটা হইতেছে তাহার প্রতিক্রিয়া।

সমানুভূতিবাদ ঃ

লিপ্‌ সাহেব খেলার অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন, খেলার মূল প্রেরণা হইতেছে সমানুভূতি (Empathy) অর্থাৎ কোনও একটি জিনিসের সহিত একাত্মতাবোধ। তিনি এই তত্ত্বটি ছেলেদের ঘুড়ি উড়াইবার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন। ছেলেটি ঘুড়ি উড়াইবার সময় ঘুড়ির সহিত নিজের একাত্মতা কল্পনা করিয়া ঘুড়ির আকাশে উড়িবার ক্ষমতার বাহাদুরিটা খানিকটা নিজের জিনিস মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং খেলার বস্তুর ভিতর দিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতায় আনন্দলাভ করে।

ক্ষমতালিপ্সাবাদ ঃ

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, খেলা-ধূলার মধ্যে—বিশেষতঃ সেই সমস্ত খেলা-দূলা, যাহাতে সজ্ঘবৃত্তির লীলা নাই—সেখানে বালকবালিকারা অনেক সময়েই বড়দের কাজকর্মের অনুকরণ করে। এই অনুকরণটি ভাবীকালের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নহে। ইহা হইতেছে ক্ষমতা অধিকারের জন্য আগ্রহের অভিব্যক্তি (will to power)। তাহার শরীর-মনের বৃদ্ধি হইতেছে, সেই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহার শক্তি ও পটুতা বাড়িতেছে না, তাই খেলার ভিতর দিয়া বড়দের কাজকর্মের

অনুকরণ করিয়া যে সব কাজ সে করিতে ইচ্ছা করে, অথচ পারে না, সেই সব কাজের অভিনয় করে।

অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তিবাদ (**Repetition compulsion**) ঃ

ফ্রয়েড বলেন, সাধারণ লোকে যে মনে করে খেলা জিনিসটা শুধু আনন্দের সঙ্গেই সম্পর্কিত, তাহা ঠিক নহে। একটি বালকের খেলিবার ধারা দেখিয়া তিনি এই জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বালকটি মায়ের একমাত্র পুত্র এবং মায়ের খুব অনুরক্ত। অন্যান্য দিক দিয়া ছেলেটি শান্তশিষ্ট এবং সুশীল। কিন্তু তাহার একটি অদ্ভুত খেলা ছিল ; তাহা এইরূপ—ছেলেটি তাহার প্রিয় খেল্‌নাগুলিকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত এবং বলিত "চলে যাও"—এই খেলাটি সে প্রায়ই খেলিত। ফ্রয়েড্ এই খেলাটির মধ্যে একটি তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, এই খেলার ভিতর দিয়া বালকটি তাহার দুঃখের সহিত একটা সন্ধি করিতেছে। তাহার মাতা তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং মাতৃ-বিরহ তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। কিন্তু মাতার বাহিরের কাজকর্ম এবং সামাজিক জীবনযাত্রার জন্য তাহাকে প্রায়ই মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইত। তাই শিশুটি খেলার ভিতর দিয়া এই বিচ্ছেদকে অভ্যাস করিয়া লইত। সেইজন্য শিশুটি তাহার প্রিয়বস্তু খেল্‌নাগুলিকে ইচ্ছা করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া প্রিয়-বিরহ সহ্য করিয়া লইত।

গত মহাযুদ্ধের সময় একটি বালক তাহার মাতাপিতাকে বোমার আঘাতে মারা যাইতে দেখিয়াছিল। এই ঘটনাটি তাহার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। এই দুঃখকে অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়া সহ্য করিয়া লইবার জন্য বালকটি একটি অদ্ভুত খেলা করিত। সে দুইটি পুতুলকে একটি বালির খেলা-ঘরের মধ্যে রাখিত, তাহার পর জোরে আঘাত করিয়া পুতুল দুইটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। এই ভাবে যে ঘটনার স্মৃতি তাহার নিকট গভীরতম মর্মন্তুদ ব্যাপার, সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করিয়া (অথবা পুনরাবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়া) খেলার ছদ্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই সেই দুঃখের ঘটনাটিকে

সহ্য করিয়া লইবার চেষ্টা করিত। ফ্রয়েডীয় মতে অনেক খেলার মধ্যেই এই জাতীয় দুঃখের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি বা 'অনুকর্ষী পুনরাবৃত্তি'র লীলা আছে।

কল্পনা বিলাসবাদ ঃ

ক্রীড়াতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলাচনা করিতে হইলে 'Make believe' সম্বন্ধে কিছু না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই 'Make believe' শব্দটি কেহ কেহ "মনবুঝ দেওয়া" এইরূপ বাংলা করিয়াছেন। একটু সংস্কৃত ভাবে এই শব্দটিকে আমরা "কল্পনা-বিলাস"—এই ভাবে নামকরণ করিতে পারি।

বয়স্ক লোকের কাছে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার জগতের একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। কিন্তু শিশু বা বালকের নিকট এই পার্থক্যটা ততটা সুস্পষ্ট নহে। অনেক দুঃখের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তবে সে ধীরে ধীরে কল্পনা ও বাস্তবের পার্থক্যটা বুঝিতে শিক্ষা করে। তাহাদের মনোরাজ্যে কল্পনা ও বাস্তব জড়াজড়ি করিয়া মিশিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলায় পুরাণো আমলের অব্যবহৃত পাল্‌কির ভিতর বসিয়া যে রকম কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেন তাহার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন ঃ "চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পালকি, হাওয়ায় তৈরী বেহারাগুলো আমারই মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই মনের খেয়ালে··· কখনো বা তার পথটা ঢুলে পড়ে মন-বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল্ জ্বল্ করছে, গা করছে ছম্ ছম্······তারপর পালকীর চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে উঠে ময়ূরপঙ্খী, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙ্গা যায় না দেখা।" এই যে বাস্তবের সামান্য একটা কিছুকে উপলক্ষ্য করিয়া বাস্তব জগৎকে ছাড়াইয়া স্বপ্নের কল্পলোকে বিচরণ, ইহা শিশুমনের একটা অলস বিলাস মাত্র নয়, ইহা তাহার একটা বিশিষ্ট সম্পদও বটে। যে ছেলে কল্পনায় এই সব খেলা খেলিতে জানে না, সে যে জীবনের একটি বিশিষ্ট আনন্দ হইতেই শুধু বঞ্চিত তাহা নহে, তাহার ভবিষ্যৎও ভাল হয় না, জীবনের অনেক সৃষ্টির সম্ভাবনা হইতেও সে বঞ্চিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এইতো ছিল পাল্‌কীর

ভিতর আমার সফর, পাল্কীর বাইরে এক এক দিন ছিল আমার মাষ্টারী,—রেলিংগুলো আমার ছাত্র, ভয়ে থাকতো চুপ। এক একটা ছিল ভারী দুষ্ট, পড়াশুনায় কিছুই মন নেই, ভয় দেখাই যে বড় হলে কুলীগিরি করতে হবে। মার খেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে, দুষ্টুমি থামতে চায় না, কেন না, থামলে যে চলে না, খেলা বন্ধ হয়ে যায়।" এইখানেই হইতেছে সাধারণ শিশুর কল্পনার কল্পোলোক। এই কল্পোলোক হইতে তাহাকে টানিয়া আনিলে সব সময়েই তাহার মঙ্গল করা হয় না। অনেকে হয়ত বলিতে পারেন, এইরূপ কল্পনার জগতে পাগল বা মাতাল লোকেরাও বাস করে, তাহাতে তাহাদের কি মঙ্গল হয়? ইহার উত্তর হইতেছে, বালকের কল্পনা-বিলাস আর পাগলের কল্পনা-বিলাস এক জিনিস নহে। পাগল কঠিন বাস্তবকে জয় করিতে পারে না বলিয়াই পলায়নী বৃত্তি লইয়া কল্পনার রাজ্যে আশ্রয় লয়। সেই জন্যই অনেক সময় ঘুঁটে কুড়ুনির মা-ও হয়ত নিজেকে রাজরাণী বলিয়া ভাবে এবং "নির্মম ক্রূর সত্যের চেয়ে মিথ্যা আমার ঢের ভাল; আঁধারও চাই, চাইনা তবু ঝল্সায় চোখ্ যেই আলো"—এই জাতীয় একটা অপরিস্ফুট মনোবৃত্তির মধ্যে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিশুর কল্পনা-বিলাস এই পলায়নী-প্রবৃত্তি প্রসূত নহে, ইহা তাহার আত্মবিস্তারের সহায়ক।

এতক্ষণ পর্যন্ত ক্রীড়াতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ আলোচনা করা হইল, আমাদের মনে হয় তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে এবং এই মতগুলি পরস্পর বিরোধী নহে, বরং পরস্পরের পরিপূরক।

খেলা ও কাজ:

খেলা জিনিসটাকে অনেক কাজের লোকই সন্দেহের চোখে দেখেন এবং ভাবেন যে এটা কাজের বিপরীত ধর্মী ও কাজের বিঘ্নকর জিনিস। সাধারণের ধারণা খেলা হইতেছে এমনই একটা জিনিস, যেটা খুসীর খেয়ালেই চলে; তার মধ্যে কোনও লাভের হিসাব নাই। কাজ জিনিসটা হইতেছে ঠিক তাহার বিপরীত। একটা লাভের উদ্দেশ্য লইয়াই লোকে কাজ করে।

অবশ্য প্রশ্ন আসিতে পারে, খেলার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য থাকে ত ? কিন্তু সে উদ্দেশ্যটা সেখানে পরোক্ষভাবে কাজ করে। বল খেলিলে পায়ের পেশী দৃঢ় হইবে, এটা হইতেছে বল খেলার পরোক্ষ ফল ; কিন্তু সাধারণ খেলোয়াড়রা খেলার জন্যই খেলে, এমন কি জয়লাভের জন্যও নহে—জয়লাভের আনন্দটা অনেক ক্ষেত্রেই হইতেছে একটা উপরি পাওনা।

যাঁহারা অভিনয় করেন, কি ভাল যন্ত্র-সঙ্গীত করিতে পারেন, ইংরাজীতে তাঁহাদের Player বলা হয়। এই কথাটির মধ্যে একটা ব্যঞ্জনা আছে। শিল্প সাধনার চরম অবস্থায় খেলার আনন্দের একটা স্বগোত্রীয় আনন্দ আছে।

খেলার একটি বড় বিশেষত্ব হইতেছে, ইহা কাহারও দ্বারা ঘাড়ে চাপানো জিনিস নহে। ফুটবল খেলাকে আমরা খেলা বলিয়াই জানি। কিন্তু যখন ঐ ফুটবল খেলাটি স্কুল বা কলেজের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ছাত্রদের খেলিতে হয় এবং না খেলিলে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়, তখন খেলা জিনিসটা তাহাদের নিকট আর খেলা ততটা থাকে না, যতটা হয় কাজ।

যে নৃত্যগীত আমাদের এত আনন্দের জিনিস, তাহাও যদি পরের নির্দেশে কর্তব্য হিসাবে করিতে হয়, তাহাও আমাদের কাছে কাজ হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে আমরা যে নাচ-গান করি তাহা খেলার পর্যায়ে পড়ে। যাত্রাদলের কচি বালক যখন অধিকারী মহাশয়ের বেত খাইয়া গান শিখে, কিংবা সার্কাসের ছোট ছেলে ম্যানেজারের ধমকানি খাইয়া তারের উপর নৃত্য শিখে, তা খেলা ততটা নয়—যতটা হইতেছে কাজ।

আবার যে কাজ আমরা খুব দক্ষভাবে করিতে পারি, এবং যে দক্ষতা আমাদের আত্মবিস্তার-বৃত্তির পোষকতা করে এবং পাঁচজনের নিকট আমাদের প্রশংসার দ্বার খুলিয়া দেয়, তাহা যত কঠিন কাজই হউক না কেন, তাহা আমাদের কাছে খেলার পর্যায়ে পড়িবে। এই হিসাবে নৃত্যগীতের ভাল ভাল শিল্পীদের Player বলা খুব সার্থক। কারণ তাহাদের সাধনা তখন সিদ্ধির স্পর্শ পাইয়া বিশুষ্ক কর্তব্য পালনের স্তর অতিক্রম করিয়া শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উৎস হইয়া উঠিয়াছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, বড় বড় সাধকদের কাছে খেলা ও কাজ একই জিনিস। সিদ্ধির চরম অবস্থাতে খেলা ও কাজের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। কারণ সেই সাধনার মধ্যেই আছে সহজ স্ফূর্তি ও সৃষ্টির আনন্দ।

মহামানুষেরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির সাধনা করিতে পারেন, দীর্ঘ সময় একটানা ভাবে কাজ করিতে পারেন, তাহার একটা রহস্য এখানে পাওয়া গেল। কাজ তাঁহাদের কাছে ভয় বা দুঃখের বস্তু নহে। তাই কাজে তাহাদের মাথাও ধরে না, বিরক্তিও আসে না। খেলোয়াড়রা খেলার আনন্দে যেমন খেলিয়া যায়, তাঁহারাও তেমনি কাজের আনন্দে ও কাজের নেশায় কাজ করিয়া যান। ফলে সাধারণ লোকে টেনিস্ খেলিয়া বা সিনেমা দেখিয়া যতটা আনন্দ পায়, একজন গণিত-সাধকও হয়ত অঙ্ক কষিয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করেন।

আর একটি রহস্য এই ক্রীড়াতত্ত্বের মধ্যে উদ্ঘাটিত হইল—কর্মমার্গের সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে কাজকে নিছক কর্তব্যের বেগার বলিয়া মনে না করিয়া খেলার মত আনন্দ ও আকর্ষণের জিনিস বলিয়া মনে করা। তাহা হইলেই কর্তব্যের গুরুভার আমাদের কাছে আনন্দের স্বর্ণসোপান হইয়া উঠিবে। সেই সোপান বাহিয়া আমরা যতই উঠিতে থাকিব, আমাদের আনন্দ ততই অধিক হইবে এবং সোপানের শেষপ্রান্তে সিদ্ধির মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমরা দেখিব কর্মযোগীর রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ভিতর হইতেই বাণীর আনন্দ-সঙ্গীতের সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে। বস্তুতঃ খেলাকে যে ব্যক্তি কাজের মত নিষ্ঠার জিনিস বলিয়া মনে করে এবং কাজকে খেলার মত আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করে, সেই-ই প্রকৃত কর্মযোগী।
কবি বলিয়াছেন—

"কর্তব্য সে হোক্ সুকঠিন, করা তারে চাই হাস্য মুখে
নতুন তাহার পৃথুল সে ভার, দলিবে তোমার সকল সুখে॥"

এ কথা শুধু ধর্মতত্ত্বের আদর্শবাদিতার বাণীমাত্র নয়, ইহা মনস্তত্ত্বের ব্যবহারিক উপদেশও বটে। কর্তব্যকে ব্যাগার বলিয়া মুখভার না করিয়া

যদি কাজ হাসিমুখে করিয়া যাইতে শিখি, তাহা হইলে কাজে দক্ষতা ও সিদ্ধি যতই নিকটবর্তী হইতে থাকিবে, কর্তব্য ততই সুমধুর আনন্দ-প্রেরণার উৎস হইয়া উঠিবে। প্রেমের সহিত সমাজনীতির, কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত আনন্দের, ভোগের সহিত ত্যাগের সংঘাত লইয়া অনেক বেদনার ইতিহাস শুনা গিয়াছে ; সেই জন্য কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

"Serene will be our days and bright
And happy will our nature be
When love is an unerring light
And joy its own security"

কিন্তু কর্মযোগীর নিকট এই সংঘাতের বিক্ষোভ নাই ; তাহার মন যাহা চায়, কর্তব্যও সেই পথকেই নির্দেশ করে, খেলার যে আনন্দ, কর্তব্য পালনেরও সেই আনন্দ, খেলার আকর্ষণ তাহার মনকে কাজের সাধনক্ষেত্র হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যায় না—কারণ, খেলা এবং সাধনা তাহার কাছে একই বিষয় ; তাহার মনের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী শক্তির টানাটানি হানাহানি নাই, প্রলোভনের বিভীষিকা নাই, অনুশোচনার অনুতাপ নাই, চিত্তের বিক্ষোভ নাই। তিনি প্রকৃত সুখী, এই দুঃখের জগতে কাজের স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া তিনিই তাহার মধ্যে নিজের গৌরবে, আনন্দের কল্পলোকে দেবতার মত বিরাজ করেন।

বিঃ দ্রঃ—ক্রীড়াকে কি ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা পরবর্তী "ক্রীড়াচ্ছল" নামক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

জীবন-পরিক্রমা

মাতৃগর্ভের নিরাপদ নিরালা এবং নিবিড় আশ্রয়টি হইতে চ্যুত হইয়া জাতক যেদিন এই "দৃশ্য গন্ধ গানে" ভরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া তাহার অপরিচিত জগতের অসংখ্য আবেদন তাহার অনভ্যস্ত অনুভূতিকে যুগপৎভাবে এমনই বিব্রত করিয়া তুলে যে, ভয়, বিস্ময়, আনন্দ, কৌতুক প্রভৃতির মিশ্র অনুভূতিতে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে কাঁদিয়া ফেলে। তাহার পর জগতের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহার পরিচয় আরম্ভ হয় এবং সে ধীরে ধীরে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

কিন্তু তাহার এই জীবন-পরিক্রমা একটানা ছন্দোহীন বৈচিত্র্যহীনভাবেই চলিতে থাকে না। তাহার মধ্যে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রকম লীলা আছে, এ যেন একটি নাটকের বিভিন্ন অঙ্কের ব্যাপার। আমাদের জীবন-নাটক মোটামুটি চার অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে আছে শৈশব—জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত; দ্বিতীয় অঙ্ক বাল্য—ছয় হইতে বার বৎসর পর্যন্ত; তৃতীয় অঙ্ক কৈশোর—বারো হইতে আঠারো বৎসর পর্যন্ত এবং চতুর্থ অঙ্ক যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব। বার্দ্ধক্যকে আর একটি অঙ্ক ধরিলে জীবনটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মত পঞ্চাঙ্কই হইয়া পড়ে।

জীবন-পরিক্রমায় এই যে বিভিন্ন অধ্যায়, এই সম্বন্ধে ডাঃ আর্নেস্ট জোন্‌স্ (Dr. Earuest Jones) অনেকগুলি নূতন তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এক হিসাবে আমরা সকলেই দ্বিজ; সকলেই দুইবার করিয়া জন্মগ্রহণ করি, সকলেই যৌবনের প্রারম্ভে আর একবার ছেলেমানুষ হইয়া পড়ি। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কৈশোর এবং যৌবন হইতেছে শৈশব ও বাল্যলীলার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

শৈশবের বিশেষত্ব হইতেছে নিছক সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে চলা। এইখানেই তাহার সঙ্গে একজন প্রৌঢ়ের তফাৎ। একজন প্রৌঢ় তাহার

কামনা বাসনাগুলিকে সমাজ-বুদ্ধি, নীতি, লোকাচার প্রভৃতির অনুশাসনে সংযত করিয়া চলে, কিন্তু একটি শিশু এ বিষয়ে একেবারে নিরঙ্কুশ। কোন কিছুর আবেদন তাহার অনুভূতিতে যেমনই সাড়া জাগাইল অমনই সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া তাহার মনে আরম্ভ হইল এবং সেই প্রতিক্রিয়া প্রকৃতিদত্ত সহজাত প্রবৃত্তির পথ অবলম্বন করিয়া চলিল। শিশু প্রবৃত্তির সংযম মানেও না, জানেও না। অভিজ্ঞতার অনেক দুঃখ, অনেক আঘাত, অনেক শিক্ষা পাইয়া ক্রমশঃ সে প্রকৃতির মুখে লাগাম পরাইয়া চলিতে শিখে। আগুনের দীপ্তি দেখিয়া সে হাত বাড়াইতে চাহিয়াছে, হাত পুড়িবার তিক্ত অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত তাহাকে শিখাইয়াছে যে সব কামনাকেই প্রশ্রয় দিতে নাই।

শৈশবের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে আত্মকেন্দ্রিক পর-নির্ভরতা; সে চায় দুনিয়ার মনোযোগ তাহারই উপর নিবদ্ধ হউক, দুনিয়ার সকলেই তাহার সুখের জন্য আকাশ পাতাল তোলপাড় করুক। সে যেন শুধু সকলের নিকট হইতে আদর যত্ন পাইবার জন্য অধিকারের রাজটীকা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভালবাসা পাওয়াই যেন তাহার ন্যায্য অধিকার, ভালবাসা দিবার, ভালবাসার জন্য ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিবার দায়িত্ব যেন তাহার কিছুই নাই।

শৈশবের এই আত্মকেন্দ্রিকতার ও এই স্বার্থপরতার রেশ সারা জীবনই আমাদের মধ্যে কিছুটা থাকিয়া যায়। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন খানিকটা বহির্মুখী বা বহির্বৃত্ত (extrovert) হইয়া পড়ে। তখন আমরা হয়ত ভালবাসা পাইবার চেয়ে ভালবাসা দিবার মধ্যে আনন্দ বেশী পাই, অপরকে বঞ্চিত করিয়া ভোগ করার চেয়ে প্রেমাস্পদ বা স্নেহাস্পদের জন্য আত্মত্যাগ ও আত্মবিলোপে বেশী তৃপ্তি পাই।

শৈশবের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে তাহার কল্পনা-বিলাস। এই কল্পনা-বিলাসের মধ্য দিয়া সে তাহার জীবনের তুচ্ছতা ও শক্তিহীনতা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করে এবং কল্পনার মধ্য দিয়া নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্টু বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা করে। এই ভাবেই তাহার আত্মবিস্তারের (self assertion) কাজ আরম্ভ হয়। ফ্রয়েড বলেন, এই সময়েই সে তাহার

পরিবেশের পরিচিত ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া সে তাহার অপরিতৃপ্ত প্রভুত্ব-শক্তির বিকাশ করিতে চেষ্টা করে। যে সব লোককে সে শ্রদ্ধা করে অথবা ভয় করে, কল্পনার আতিশয্যে অনেক সময় সে তাহাদের ভূমিকার অভিনয় করে, কখনও বা তাহার ভয়ের বস্তুর প্রতিনায়কের ভূমিকাও গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের "শিশু"র 'বীরপুরুষ' কবিতার খোকাটি সেই জন্যই কল্পনায় দেখিয়াছিল, তার মা "দরজা দুটো একটু ফাঁক করে পাল্‌কীতে চড়িয়া চলিয়াছেন আর সে টক্‌বগিয়ে" তাঁর পাশে পাশে "রাঙা ঘোড়ার পরে" চলিতেছে!〉 তাহার পর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল, বাতাস থম্‌থম্ হইয়া উঠিল, এমন সময় দীঘির ধারে কিসের আলো দেখা যাইল, "হাঁরে রে রে রে রেরে" শব্দ করিতে করিতে "হাতে লাঠি মাথায় ঝাকড়া চুল ডাকাতের দল তাহাদের আক্রমণ করিল। খোকা তখন বীরদাপে অগ্রসর হইল, ঢাল তরোয়াল "ঝন্‌ঝনিয়ে" বাজিয়া উঠিল, খোকার বীরত্বে "কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, কত লোকের মাথা পড়ল কাটা!" কিন্তু এত বীরত্বের ভিতরও খোকার আদর খাইবার লোভটি ঠিক আছে। তাই কল্পনায় সে বলিতেছে —

"লড়াই গেছে থেমে তুমি শুনে পালকী থেকে নেমে
চুমা খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে"

এই ভাবেই সে জীবনের পথে চলিতে থাকে; কখনও উঠিয়া, কখনো নামিয়া, কখনও ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া আবার কখনও বা সাহসে স্ফীত হইয়া, কাল্পনিক বীরত্বে উৎফুল্ল হইয়া একটি স্বাভাবিক ছন্দের লীলায় শিশু তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে।

এই ছন্দটি, এই দীনতা ও দ্বন্দ্বের ক্রমিক অভিনয়টি, শিশুর মনের স্বাস্থ্যের দিক দিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নতুবা তাহার শিশু-জীবনের তুচ্ছতা ও শক্তিহীনতার অনুভূতিটি যদি ভূতের মত তাহার উপর ভর করিয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহার জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিত। শিশুদের সহিত ব্যবহার করিবার সময়ে মাতা ও শিক্ষকদের এই সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিৎ। রবীন্দ্রনাথের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পে দেখিতে পাওয়া যায়,

ভৃত্য রাইচরণকে মল্ল সাজিয়া শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত, আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত। রাইচরণ স্নেহের অন্তর্দৃষ্টি দিয়া বিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিকের মতই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মাঝে মাঝে শিশুকে বাহবার খোরাক না দিলে তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও এই সত্যটি মনে রাখিতে হইবে।

পূর্বগামী মনস্তাত্ত্বিকগণের ধারণা ছিল যে, যৌনক্ষুধা ও যৌনলালসা ব্যাপারটা যৌবনেরই বিশেষত্ব, শিশুদের এ বৃত্তি নাই। কিন্তু বর্তমান মনস্তাত্ত্বিকগণ, বিশেষভাবে ফ্রয়েড প্রভৃতি বলেন যে, এই যৌন-বৃত্তিটি শিশুদিগের মধ্যেও আছে এবং তাহাও বিশেষভাবেই সমৃদ্ধ ও বহুরূপে অভিব্যক্ত। শৈশবের যুগে শিশুর যৌনবৃত্তি নিজেকে লইয়াই আরম্ভ হয়; নিজের দেহটিকে তাহার অত্যন্ত ভাল লাগে এবং তাহার সহিতই সে যেন প্রেমে পড়িয়া যায়। এই অবস্থাটিকে ফ্রয়েড **"নার্শিশিজম্"** নাম দিয়াছেন। এই কথাটি আসিয়াছে গ্রীক পুরাণের "নার্শিশাস্"-এর নাম হইতে। তিনি ছিলেন একজন সুন্দর যুবক; জলের মধ্যে নিজের প্রতিকৃতি দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া এমন ক্ষেপিয়া উঠিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাহাকে আত্মহত্যা করিয়া এই ছায়া-নায়কের বিরহ দুঃখের অবসান ঘটাইতে হইল।

ইহার পরের অবস্থায় শিশু নিজেকে ছাড়া আশেপাশের বাহিরের জিনিস দেখিতে আরম্ভ করে এবং প্রথমেই তাহার লক্ষ্যের বস্তু হয় তাহার মাতা। নিজের দেহকে ভালবাসিতে-বাসিতে সেই দেহের যত্নকারিণীকেও সে ভালবাসিতে আরম্ভ করে, ক্রমশঃ সে যেন মাতাকে নিজের দেহেরই রূপান্তরিত অভিব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহাকেও ভালবাসিতে আরম্ভ করে। ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিকগণ এই ভালবাসার মধ্যেও যৌন-তত্ত্বের লীলা দেখিতে পান। মাতার প্রতি শিশুর এই অনুরক্তিকে তাহারা **"ইডিপাস্ জট্"** (Oedipus Complex) এই আখ্যা দিয়াছেন। ঘটনার চক্রান্তে "ইডিপাস্" নিজের পিতাকে হত্যা করিয়া মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াই মাতার প্রতি শিশুর এই অনুরক্তির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ফ্রয়েড বলেন, মাতার প্রতি এই অনুরক্তির তীব্রতার জন্য শিশু অনেক সময় পিতাকে ঘৃণা করে।

ফ্রয়েডীয় মতবাদে সকলে যে বিশ্বাস করে তাহা নহে। তবে পিতা অনেক সময়েই শিশু ও তাহার মাতার মধ্যে আসিয়া মায়ের সান্নিধ্য ও অধিকার হইতে শিশুকে বঞ্চিত করে, অনেক সময়েই তাহাকে তাড়ন ভৎর্সন প্রভৃতি করেন; এইজন্য শিশু অনেক সময়েই পিতাকে ঠিক ঘৃণা বা ভয় না করিলেও, তাঁহার প্রতি বিমুখ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এই বিমুখতা প্রায়ই অহেতুক অবাধ্যতার সৃষ্টি করে। বাল্যজীবনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনেক সময় পিতার স্থান গ্রহণ করিয়া তাহাকে শাসন-তাড়ন করেন বলিয়া শিক্ষকের প্রতিও বালক প্রায়ই বিমুখ হইয়া উঠে।

ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণ বলেন, বালকদের মধ্যে যেমন "ইডিপাস জট্" আছে, বালিকাদের মধ্যে তেমনই **"ইলেক্ট্রা জট্"** (Electra Complex) আসিয়া থাকে। ইলেক্ট্রা গ্রীক পুরাণের একজন নায়িকা। তিনি পিতা 'অ্যাগমেম্নন্'কে ভালবাসিতেন বলিয়া নিজের ভাইকে দিয়া নিজের মাতাকে হত্যা করাইয়াছিলেন।

শিশু বালক যে কারণে মাতাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে, শিশু বালিকার ক্ষেত্রেও সেই একই কারণ কাজ করে। সুতরাং বালিকা কেন যে মাতার প্রতি বিরূপ হইবে, এই সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাগুলি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

ফ্রয়েডের এই সমস্ত জট্ এবং ব্যাখ্যা আমাদের যে বিশ্বাস করিতেই হইবে, এমন কোনই কথা নাই, তবে তাঁহার ব্যাখ্যা হইতে আমরা কতগুলি সত্যের সন্ধান পাই এবং সেগুলিকে কাজে লাগাইতে পারিলে ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক সুবিধা হয়।

শিশুর জীবন-পরিক্রমায় তাহার যৌন-তত্ত্বের কথা বাদ দিয়া এইবার আমরা তাহার অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শিশুর দেহ ও মনের দিক দিয়া বৃদ্ধিটা একটানা ভাবে হয় না। ইহা যেন তরঙ্গে তরঙ্গে চলিতে থাকে, ইহার গতিবেগ কখনও তীব্র, কখনও বা মন্দ হয়। প্রথম তিন বৎসর শিশু অত্যন্ত দ্রুতভাবে বাড়িতে থাকে, তারপর আসে একটা অন্তঃপূর্তির (consolidation) সময়। ছয় বৎসরের পর হইতে তাহার জীবনে আবার

একটা বৃদ্ধির সময় আসে, তাহার পর আবার একটা স্থির ভাব, একটা গতিমান্দ্য আসিয়া উপস্থিত হয়।)

বাল্যের বিশেষত্ব ঃ

শৈশব অতিক্রম করিয়া জাতক যখন বাল্যে পদার্পণ করে তখন তাহার মধ্যে কতকগুলি নূতন বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে। একটি বিশেষত্ব হইতেছে সংঘ-চেতনার বিকাশ। অবশ্য শৈশবে শিশু যে সব সময়েই একা থাকিতে ভালবাসে তাহা নহে। তবে শিশুকালে সে যে লোকজন চাহিত তাহা সেবা-যত্ন পাইবার জন্য ; কিন্তু বাল্যে সে সঙ্গী চায় অন্য কারণে। এখন যে সে সঙ্গী চায় তাহার কারণ হইতেছে সঙ্গীদের সাহায্য না পাইলে তাহার আত্মবিস্তারের (self assertion) ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। সেইজন্যই এই সময়ে সে মার কাছাকাছি তাঁর আঁচলে-বাঁধা ভাল ছেলেটি হইয়া ঘুরিতে চাহে না ; তখন সে মাকে ছাড়িয়া সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধুলায় মাতিয়া থাকিতে ভালবাসে।) সংঘ-চেতনার ফলে পরার্থে আত্মত্যাগ, দুঃখ বরণ প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলি যৌবনের পরে বিকশিত হইয়া উঠে, তাহা এখনও ফুটিয়া উঠে না, তবে (সংঘকে সে নিজের বাহাদুরী প্রকাশের একটা যন্ত্র হিসাবে মনে করে বলিয়াই সে সংঘকে এবং সঙ্গীকে চায়।) এই সময়ে নীতিজ্ঞান, ভাল-মন্দবোধ প্রভৃতি এই সংঘের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সংঘ বা দলের নিকট হইতে বাহাদুরী পাইবার জন্য সে পরের বাগানে ফল-ফুল চুরি করিতে, ফেরিওয়ালাকে ঠকাইতে বা শিক্ষকের নিকট মিথ্যা কথা বলিতে বা দম্ভ প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করে না।) ইহা হয়ত ভাল কথা নয়, কিন্তু ইহাই যখন প্রকৃতির অপ্রতিবিধেয় বিধান, তখন ইহাকে মানিয়া লইয়াই শিক্ষক ও অভিভাবদের ইহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় শিক্ষককে ছাত্রদের বুঝাইয়া দিতে হইবে, তিনিও বালকদের সংঘের একজন সভ্য, তিনি অন্য দলের বা শত্রু দলের কেহ নহেন, সুতরাং তাঁহার সহিত ছাত্রদের বিরোধ থাকিবার কথা নাই, সুতরাং ছাত্রদের সংঘের অধিনায়ক হিসাবে তাঁহার স্তুতি নিন্দার মূল্য ছাত্রদের নিকট থাকা উচিত।

এই সংঘ-চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বালকের মনে একটা বহির্মুখী বৃত্তিরও বিকাশ হয়। এই বহির্মুখী (extrovert) চেতনার জন্যই সে বাহিরের সঙ্গে একটা পরিচয় লাভের চেষ্টা করে, ফলে তাহাদের মনে 'কি' 'কেন' 'কবে' এই জাতীয় প্রশ্ন প্রতিনিয়তই জাগিতে থাকে। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের তরফ হইতে এই সব প্রশ্নের যতদূর সম্ভব সদুত্তর দানের চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্পর্কটিও নিবিড় হইয়া উঠে এবং বালকদের অনুসন্ধিৎসাও উৎসাহ পাইতে থাকে, জগৎকে এবং পরিবেশকে ভালভাবে চিনিবার সুযোগও পাইতে-পাইতে তাহারা ভাবী-কালের জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত হইতে থাকে।

কৈশোরের বিশেষত্ব :

বাল্যের পর কৈশোর। কৈশোরকে আমরা এক হিসাবে শৈশবের পুনরাবৃত্তি বলিতে পারি। বাল্যের আত্মনির্ভরতা, কর্মনিপুণতা প্রভৃতি এখন আর থাকে না। এখন যেন তাহার জগতের সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয়ের প্রয়োজন হয়, এখন যেন পুরাতন অভিজ্ঞতা দিয়া আর কাজ হয় না। ফলে সে যেন দিশেহারা হইয়া পড়ে। সে ভাবে, দুনিয়ার সমস্ত লোকই যেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে, সে যাহা করিতেছে সকলেই যেন তাহা দেখিতেছে, ফলে সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই সময়েই তাহার ভাবপ্রবণতা বাড়িয়া উঠে, কখনও বা গভীর বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে কখনও বা আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে। এই সময়ে শৈশবের কল্পনাপ্রবণতা আবার ফিরিয়া আসে। শৈশবে যেমন অসহায়তা ও শক্তি-দৈন্যের মধ্যে মনের স্বাস্থ্যের জন্য সে মনে মনে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিত, এখন সে সেইরূপ করে। ফলে বাল্যের বহির্বৃত্ত (extrovett) মন তাহার চলিয়া যায় এবং আবার সে শিশুর মত আত্মকেন্দ্রিক বা অন্তর্বৃত্ত (introvert) মনবিশিষ্ট হইয়া উঠে।

শৈশবের মত যৌন-চেতনাও এই সময়ে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। বাল্যে খেলাধূলার ব্যস্ততায় এবং বহির্বৃত্ত মনের বিভিন্ন আবেদনে এই

চেতনাটি খানিকটা স্তিমিত থাকিত, এখন আবার তাহা নূতন বিক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে। প্রথমে শৈশবের মত একটা 'নার্শিশিসম্ (Narcissism)-এর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি বর্ণিত শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিতে এই "নার্শিশিসম্"-এর ভাবটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীরাধা যেন নিজের রূপে মুগ্ধ হইয়া নিজেই নিজের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছেন :

"খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরই
খনে খনে বসন ধূলি তনু ভরই ॥
খনে খনে দশনক ছটা ছট হাস
খনে খনে অধর আগে করু বাস ॥
চঁওকি চলয়ে খনে খনে চলু মন্দ
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর
খনে আঁচর দেই খনে হয় ভোর ॥"

ইহার পরেই এই আত্মকেন্দ্রিক প্রেমটি ক্রমশঃ বহির্মুখী হইয়া বন্ধুগণের দিকে প্রসারিত হইতে থাকে—প্রথমতঃ একটা অস্ফুট সমকামত্বমূলক (homo sexual) আকর্ষণে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ বয়সে শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে (অর্থাৎ পুরুষের প্রতি নারীর এবং নারীর প্রতি পুরুষের এই ভাবে) ফুটিয়া উঠে।

কৈশোরের শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা কঠিনতম সমস্যা হইতেছে তাহার নব সঞ্জীবিত যৌন-চেতনাকে কিভাবে সংযত করা যায়। অনেকের বিশ্বাস প্রচুর খেলা-ধূলা, আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে ছেলেদের ব্যস্ত করিতে পারিলে এ সমস্যার খানিকটা সমাধান হয়। অবশ্য এই ভাবে সমস্যার যে সমাধান হয় না, তাহা নহে। তবে সমাধান সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নয়। কারণ যৌনবোধটা নিছক শারীরিক বৃত্তি নয়। ইহার মধ্যে মনের লীলাও আছে। কাজেই যৌনবোধকে সুসংযত করিতে হইলে এই বৃত্তিটির উপযুক্ত উৎকর্ষণ বা উদ্গতির (sublimation) প্রয়োজন হয়। শিল্প-কলা আনন্দ ও সৃষ্টিমূলক কর্মপদ্ধতির খাতে আমাদের কর্মপ্রেরণাকে বহাইতে পারিলে এই

সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান হয়। প্রাচীনকালে ছাত্রদিগের ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়া এই জাতীয় একটা সমাধানের চেষ্টা হইত।

কাহারও কাহারও মতে এই সময়ে কিছু কিছু যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা করাও মন্দ নয়। যৌন-শিক্ষা সম্বন্ধে যে নানা তরফ হইতে চুপ্-চুপ্ ভাবটি আছে, তাহার জন্য ইহা যেন আরও প্রলোভন ও পাপের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। এই শিক্ষাটি সুস্থ সরল পবিত্র ভাবে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকতার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দান করা উচিত এবং যে শিক্ষক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র, তিনি ছাড়া অন্য কেহ এই শিক্ষাদানের অধিকারীও নহেন।

কৈশোরের অনেক দুঃখ-যন্ত্রণাই কমিয়া যাইতে পারে যদি এই সময়ে তাহাদের প্রতি আমাদের আচরণ সহানুভূতিমূলক হয়। বয়ঃসন্ধির যুগে শরীর মনের দিক দিয়া যে সমস্ত পরিবর্তনগুলি আসিতে থাকে, নূতন নূতন অনুভূতি, নূতন নূতন কামনা অঙ্কুরিত হইতে থাকে, ইহাকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া অনেকেই যেন দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, ভাবিতে থাকে সে বুঝি পথভ্রষ্ট হইয়া পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে, তাহার আর বুঝি আশা-ভরসা নাই ইত্যাদি। এই অবস্থায় সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইতেছে তাহাদের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও দরদী আত্মীয়তা।

শিক্ষক প্রভৃতির তরফ হইতে এই আত্মীয়তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ শৈশবের মত কৈশোরের বয়ঃসন্ধির যুগেও মানুষ যেন খানিকটা পরমুখাপেক্ষী ও পরসাহায্যপ্রত্যাশী হইয়া উঠে। এইজন্যই এই যুগে সে এমন একটি আদর্শ খুঁজিয়া লইতে চায়, যাহাকে দেখিয়া সে নিজের জীবনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। এইজন্য এই যুগটিতে আদর্শ চরিত্রের মহাপুরুষদিগের সংস্পর্শে যদি তাহারা আসিতে না পারে, অথবা পুস্তকাদি হইতে উপযুক্ত আদর্শের সন্ধান না পায়, তাহা হইলে সিনেমা-থিয়েটারের জনপ্রিয় অভিনেতা ও খেলার মাঠের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় প্রভৃতির মধ্য হইতে তাহাদের আদর্শ বাছিয়া লয় এবং তাহার ফলে তাহার জীবনের বৃহত্তম সম্ভাবনাগুলির ক্ষতি হয়।

এই সময়ের পরিনির্ভরতার জন্যই কিশোরদের মন অনেক সময় ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয় ; এই সময়ে তাহারা যেন—

"দেবতুল্য বাসনায় উর্ধ্বদিকে গতি
পশুতুল্য পিপাসায় সদা দগ্ধ মতি"

হইয়া মাটির শরীরের সহিত দৈব বাসনার সামঞ্জস্য করিতে পারে না। তখন অনেকেই ঈশ্বরের নিকট শক্তিভিক্ষার জন্য চেষ্টা করে এবং ধর্মের মধ্য দিয়া তাহাদের সমস্যার সমাধান খুঁজিতে চেষ্টা করে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মশাস্ত্র এ সমাধান দিতে পারে না, ফলে ব্যর্থ হইয়া অনেকেই হয়ত অবিশ্বাসী ও জড়বাদী হইয়া উঠে, কেহ কেহ হয়ত ধর্ম হইতে দর্শনতত্ত্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, কেহ কেহ আবার বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতির সাধনার মধ্যে একটা আশ্রয় খুঁজিতে চেষ্টা করে।

যাহাই হউক, ক্রমশঃ তাহার হৃদয়ের ফেনিলতা, উচ্ছলতা মন্দীভূত হইয়া আসে, কল্পনার রাজ্য হইতে তাহার মন ক্রমশঃ বাস্তব জগতের দিকে ফিরিতে থাকে, তাহার সংঘ-চেতনা ক্রমশঃ উৎকর্ষণ লাভ করিতে-করিতে সে জীবন-পরিক্রমায় পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। শৈশবের আত্মম্ভরিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা, বাল্যের আত্মোৎসর্গের বৃত্তি প্রভৃতি ক্রমশঃই "গোব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায়" আত্মত্যাগ ও পরার্থে আত্মবিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ব্যক্তিগত কাজকর্মের মধ্যে সে সাধারণের হাততালির বাহবা লইবার চেষ্টা ছাড়িয়া আদর্শগত নিষ্ঠার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকে, আদর্শের জন্য শহীদ হইবার প্রেরণা অনুভব করিতে থাকে, ভালবাসা পাইবার চেয়ে ভালবাসা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে, তাহার মনে যে সমস্ত সম্পদ কুঁড়ির মধ্যে পাপড়ির আড়ালে অবরুদ্ধ সৌরভের মত একান্তভাবে আত্মগত হইয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহা এখন হইতে বিকশিত হইয়া বিশ্বের সেবার জন্য উপযুক্ত হইয়া উঠিতে থাকে।

কিন্তু এই পূর্ণতা অনায়াসলভ্যও নহে, সহজলভ্যও নহে। জীবন-পরিক্রমায় জাতক যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা প্রত্যেক অবস্থাতেই উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনার অপেক্ষা রাখে। সেই জন্য যথাযথ

শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। শরীর ও মনের দিক দিয়া বিভিন্ন বয়সে জাতকের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার প্রেরণা ও বিশেষত্ব ক্রিয়া করিতে থাকে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালীকে পরিচালিত করিতে হইবে। অনেকের গৃহের পরিবেশ মনের বিকাশের অনুকূল নহে, এইজন্য উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে তাহাদের মানুষ করিবার জন্য পাঁচ বৎসরে নিম্নতর বয়স্ক শিশুদের জন্য নার্শারী স্কুলের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহার পর পাঁচ হইতে সাত বৎসরের বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য শিশু মনস্তত্ত্বসম্মত অন্য প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার পর আসিবে তথাকথিত প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাথমিক শিক্ষার পর একাদশোত্তর বয়সে শিক্ষার সুযোগ অনেকেই পায় না। ফলে জীবনের এই কঠিনতম সমস্যার যুগে ষড়রিপুর আবর্তে বিক্ষুব্ধ কৈশোরের এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার যুগে অনেকেই উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনার অভাবে কর্ণধারহীন তরণীর মত অন্ধ ভাগ্যের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

ইহাতে জাতির কল্যাণে ব্যাহত হয়। কাজেই একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত বয়সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যাহাতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয় সে বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্র হইতে সর্বসাধারণের অধিগম্য তথাকথিত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। হয় প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বাড়াইতে হইবে অথবা মাধ্যমিক শিক্ষার খানিকটা অংশ পর্যন্ত সাধারণের অধিগম্য করিতে হইবে। মোট কথা, কৈশোরের প্রথম অবস্থাটিতে জীবনের জটিলতম সমস্যার যুগটিতে শিক্ষা-ব্যবস্থায় বঞ্চিত হইয়া ছাত্রেরা যাহাতে দিশেহারা হইয়া পথে বিপথে ঘুরিয়া না বেড়ায় সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব

জাতক তাহার জন্মের পর হইতে শৈশব, কৈশোর, বাল্য, বিভিন্ন পরিবেশ ও বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংশয়-দ্বন্দ্ব, প্রশ্নসমাধানের মধ্য দিয়া তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃই তাহার ক্ষুদ্রতা অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি কাটাইয়া উঠিয়া শরীর-মনের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু এই পূর্ণতা সকল ক্ষেত্রেই একটানা এবং একমুখী সরল রেখায় অগ্রসর হয় না, তাহার মধ্যে উত্থান-পতন, অগ্রগতি-পশ্চাদগতি ঘূর্ণীর মধ্যে একই স্থানে আবর্তন, গতি-মান্দ্য, গতি-তীব্রতা প্রভৃতি নানা জাতীয় জিনিস দৃষ্ট হয়।

মনের যে সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য তাহার গতি ব্যাহত হয়, তাহার সম্বন্ধে প্রাচীন মনস্তাত্ত্বিকগণ বিশেষ খবর রাখিতেন না। ফ্রয়েড্ এই সম্বন্ধে অনেক নূতন সত্যের সন্ধান দিয়াছেন। নির্ভীক এবং খানিকটা নির্লজ্জ যৌনতত্ত্বের জন্যই ফ্রয়েড্ সাধারণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার সেই সমস্ত মতবাদ অনেক মনস্তাত্ত্বিকই স্বীকার করেন না। কিন্তু এই যৌন-তত্ত্ব ছাড়াও ফ্রয়েড্ আরও অনেক কথাই বলিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রতিস্পর্ধী পণ্ডিতগণও সহজে অস্বীকার করিতে পারেন না। মানুষের নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে, মানুষের মনের **ইদ্** (id), **অহম্** (ego), **অধিশাস্তা** (super-ego) প্রভৃতি সম্বন্ধে ফ্রয়েড্ যাহা বলিয়াছেন, অধিকাংশ পণ্ডিতই এখন তাহা স্বীকার করেন। এখন অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে, আমাদের নির্জ্ঞান মন সক্রিয়ভাবেই আমাদের জীবনের গতিপথকে পরিচালিত অথবা প্রভাবিত করে।

অধ্যাপক নান্ জড়বাদী পণ্ডিতদের মতো মনের সমস্ত ক্রিয়াকে দেহযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বুঝিতে চাহেন না অথবা অধ্যাত্মবাদীদের মতো দেহ-নিরপেক্ষ মনের অস্তিত্বও স্বীকার করেন না। তবুও তিনি একটা সক্রিয় নির্জ্ঞান মনের কথা পাকে-প্রকারে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে আমাদের নির্জ্ঞান মনের দুইটি গুণ আছে, একটি হইতেছে তাহার **সংরক্ষণ প্রয়াস** এবং আর একটি হইতেছে তাহার **কর্মপ্রয়াস**। প্রথম গুণটি দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত

হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা আমরা সজ্ঞানেই হউক অথবা অজ্ঞানেই হউক জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার জন্য চেষ্টা করি।

আমাদের জন্মের সময় আমরা একেবারে সর্বসংস্কারমুক্ত অলিখিত পুঁথির মতো হইয়া জগতে আসি না। আমাদের জাতি বা বংশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি। আমাদের বংশের অতীত অভিজ্ঞতার ইতিহাস আমাদের মনের মধ্যে যেন কতকগুলি **ছাপ** (engrams) রাখিয়া যায়। অচেতন অথচ সক্রিয় স্মৃতির মত হইয়া এগুলি যেন আমাদের সহজাত সংস্কারকে অথবা স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। তাহার পর আমাদের জীবন পরিবেশের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের অনুভূতি ও কর্ম-প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে পরিচালিত করিয়া অভ্যাসের মধ্য দিয়া, কতকগুলি বিশেষ রকম ঝোঁক, বিশেষ রকম **রসবোধ** বা ভাল-লাগা মন্দ-লাগা (sentiment *) সৃষ্টি করে। এই জিনিসটি আবার ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত চরিত্রগুলি সৃষ্টি করে, আমাদের ব্যক্তিত্ব একটা বিশেষভাবে দানা বাঁধিয়া উঠে।

কিন্তু আমাদের নির্জ্ঞান মনের মধ্যে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছাপ পড়িয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে যদি অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকে, তাহা হইলে এই স্বাভাবিক পরিণতিটি স্বাভাবিক ভাবে ঘটিতে থাকে। কিন্তু নির্জ্ঞান মনের ছাপগুলি অনেক সময়েই যে একটি বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ একক হইয়া জমিতে থাকে তাহা নহে। ফলে নির্জ্ঞান মনের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষার দলাদলি সৃষ্টি হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে শক্তিশালী দলটি যদি পূর্ণভাবে দমন করিয়া নিজের পথে চলিতে না পারে, তাহা হইলেই আমাদের চরিত্রের ও বাক্-ব্যবহারের মধ্যে আসিয়া পড়ে একটা অস্বাভাবিকতা।

মনের মধ্যে এই বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব আমরা অনেকেই নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারি। করুণার সহিত ক্রোধের, লোভের সহিত ত্যাগের, ভয়ের সহিত অনুসন্ধিৎসার দ্বন্দ্ব আমাদের সকলেরই জানা আছে। ফ্রয়েড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলিয়াছেন,

* বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় sentiment শব্দটির প্রতিশব্দ "রস" করা হইয়াছে।

তাহা এই সর্বজনপরিচিত দ্বন্দ্বের কথা নহে। আমাদের অনুভূতির অগোচরে, আমাদের মনের সমর-ক্ষেত্রে বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষার দলগত দাবীর যে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রতিনিয়তই চলিতেছে, সেই যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে আমাদের ব্যবহার যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হইতেছে এবং কখনও বা আপাতঃ প্রতীয়মান অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার ব্যাখ্যাই হইতেছে মনোবিজ্ঞান-জগতে ফ্রয়েডীয় দলের শ্রেষ্ঠ দান।

আমাদের সজ্ঞান মনে যখন অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন আমরা কিরূপ বিক্ষুব্ধ ও ক্লান্ত হইয়া উঠি তাহা অনেকেরই জানা আছে। আমাদের নির্জ্ঞান মনেও যখন এইরূপ কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখনও আমরা সেইরূপই ক্লান্ত হইয়া উঠি—যেন গৃহযুদ্ধের অকারণ এবং অনিবার্য হানাহানিতে আমাদের শক্তির অপচয় ঘটিতে থাকে, অন্তর্বিপ্লবে ক্ষত-বিক্ষত মনরাষ্ট্র যেন তাহার বৈদেশিক নীতিও সামলাইতে পারে না, আর তাহার নিজের শাসন ব্যবস্থাতেও যেন একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এই অন্তর্বিপ্লবজনিত অচল অবস্থা নির্ধারণ করিবার জন্য প্রকৃতির কতকগুলি বিশেষ উপায় আছে এবং এই উপায়গুলির দ্বারা মনের গৃহ-বিবাদ শান্ত হয় ও বিবাদমান দাবীগুলির মধ্যে একটা সন্ধিও স্থাপিত হয়।

কিন্তু এই সন্ধির কার্য সহজে সম্পন্ন হয় না। মনের অন্তঃস্থলে যে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি কাজ করিতেছে, এই খবরটি যদি সজ্ঞান মনের জানা থাকে, তবেই সন্ধির প্রসঙ্গ আসিতে পারে। কিন্তু সে খবরটি জানা না থাকিলে মন সেই সন্ধির প্রয়োজনও অনুভব করিবে না এবং নিজেও সাবধান হইবে না। ফলে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার গোপন শত্রু অতর্কিত-বিরোধিতার এবং গোপন আক্রমণে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। গোপন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিকার যেমন সহজে হয় না, সেইরূপ নির্জ্ঞান মনের বিরুদ্ধে কামনার বিদ্রোহও মনের পক্ষে দমন করা সহজ হয় না। এইজন্য নির্জ্ঞান মনের বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্যে মনোবিকলনকারী পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করেন। এই প্রক্রিয়ার কার্যই হইতেছে নির্জ্ঞান মনের বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে সজ্ঞান মনকে সচেতন করিয়া দেওয়া। মনোবিকলনের

দ্বারা, স্বপ্নবিকলনের দ্বারা, শব্দের অনুষঙ্গ (word association) বিচারের দ্বারা মনোবিকলনকারী পণ্ডিতগণ রোগীকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহার মনের তলে তলে এই সমস্ত নিষিদ্ধ কামনার অভিযান চলিতেছে। রোগী তখন নিষিদ্ধ কামনাগুলিকে বিচার বুদ্ধির দ্বারা সংযত করিয়া তাহাকে মনের কেন্দ্রীয় শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে।

কিন্তু কখন কখনও নির্জ্জন মনের প্রতিপক্ষ দলটি এত সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, তাহাকে সহজে বশ্যতা স্বীকার করানো যায় না, তখন শক্তিশালী বিদ্রোহী সামন্তরাজকে সম্রাট যেমন কখন কখন স্বাধীন রাজা হিসাবে মানিয়া লইতে বাধ্য হন, মনকেও সেইরূপ একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। তখন আমাদের মধ্যে একটা দ্বৈত শাসন অথবা **দ্বৈত ব্যক্তিত্বের** অবস্থা আসে, তখন মনোরাজ্যের মধ্যে দুইটি শাসক শক্তির পালাক্রমে আধিপত্য চলিতে থাকে। ইহা মনের মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ব্যাপার নহে, ইহা যেন একই ডোমিনিয়নের কখনও বা এপ্রদেশ কখনও বা ও-প্রদেশ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের মালিক হইয়া উঠে। মন এই দুইটি শক্তির যেন ঠিক পরিচয় জানে না, নিজের অজ্ঞাতসারেই কখনও সে প্রথম শক্তি কখনও বা দ্বিতীয় শক্তিটির নির্দেশ অনুসারে চলিতে থাকে, ফলে কখনও বা সে মহাপুরুষের মত কার্যকলাপ করিতে থাকে, কখনও বা হয়ত নরাধমের মত ব্যবহার করিতে থাকে। অথচ কেন যে তাহার এইরূপ মতিভ্রম হয়, তাহার খবরও সে রাখিতে পারে না—প্রতিকারও করিতে পারে না।

অনেক সময় এই বিরুদ্ধ দলটি তেমন শক্তিশালী থাকে না এবং আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ খাড়া করাইতে পারে না বলিয়া "দ্বৈত ব্যক্তিত্ব" প্রভৃতি উপায়ে তাহাদের তোষণ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। তখন যে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি আমাদের ব্যক্তিত্বের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগকে জোর করিয়া দাবাইয়া দেওয়া হয়। তখন সেই সমস্ত অবদমিত ইচ্ছাগুলি নির্জ্জন মনোরাজ্যে জট পাকাইয়া অবস্থান করে এবং সুযোগ পাইলেই ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করিয়া তাহাদের অতৃপ্ত কামনাগুলিকে পূর্ণ করিয়া লয়।

ফ্রয়েড এই ব্যাপারটিকে একটি চমৎকার উপমার সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের নির্জ্জান মনটির মধ্যে যে সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার দল ভিড় করিয়া আছে, তাহারা যে কক্ষে অবস্থান করে তাহারই পাশের কক্ষটিতে আছে সজ্ঞান মনের গৃহ। এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রতিনিয়তই সজ্ঞান মনের দরবারে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই দরবার কক্ষের দ্বারদেশে বসিয়া আছে প্রহরী। যে-সমস্ত কামনাকে সে অনীতিমূলক বা তাহার ব্যক্তিত্বের পরিপন্থীমূলক বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে সে সহজে সজ্ঞান মনের দরবারে প্রবেশাধিকার দিতে চাহে না। ফলে সেই সমস্ত চিন্তাগুলি বার বার সজ্ঞান মনের দরজায় আসিয়া প্রহরী মহাশয়ের তাড়া খাইয়া ফিরিয়া যায়। শেষ পর্যন্ত তাহারা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। নিজেদের স্বরূপ মূর্ত্তিতে আসিলে প্রহরী মহাশয় তাহাদের চিনিয়া ফেলিবেন বলিয়া তাহারা ছদ্মবেশের আশ্রয় লয়। প্রহরী তখন তাহাদের চিনিতে না পারিয়া তাহাদিগকে দরবারে প্রবেশ করিতে দেন। ফলে ছদ্মবেশে সজ্ঞান মনের দরবারে প্রবেশাধিকার পাইয়া অতৃপ্ত কামনাগুলি দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইয়া খানিকটা তৃপ্তি লাভ করে। একটা উদাহরণ দিলেই ঘটনাটি বুঝা যাইতে পারে। ধরা যাইতে পারে, আমাদের গল্পের নায়ক অজিতকুমার একজন নারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে। তাহার নাম অমিতা। কিন্তু সামাজিক ও নীতিগত কারণে অজিতের সহিত অমিতার মিলন হইতে পারে না। তাই সজ্ঞান মনে অজিত অমিতার কথা ভাবিতে পারে না। কিন্তু অমিতার কথা সে মন হইতে উপড়াইয়াও ফেলিতে পারে না। ফলে তাহার অতৃপ্ত সঙ্গলিপ্সা তাহার নির্জ্জান মনের নিভৃত প্রদেশে বাসা বাঁধিল এবং স্বপ্নের মধ্য দিয়াই অমিতার সঙ্গলাভ করিয়া তাহার অতৃপ্ত কামনা তৃপ্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বপ্নের দ্বারদেশেও প্রহরী বসিয়া আছেন, তিনি এই অনীতিমূলক কামনাকে প্রবেশাধিকার দিবেন না। কাজেই সে-স্বপ্ন আর দেখা হইল না। কিছুদিন পরে অজিতকুমার স্বপ্ন দেখিল, সে একটি বিলাতী কুকুরকে বুকে লইয়া আদর করিতেছে। প্রহরী মহাশয় এ স্বপ্নটিতে আপত্তি করেন নাই। কিন্তু প্রহরী মহাশয় স্বপ্নটিকে

যতটা নিরীহ মনে করিয়াছিলেন, স্বপ্নটি আদৌ ততটা নিরীহ ছিল না। যে কুকুরটিকে অজিতকুমার বুকে লইয়া স্বপ্নে আদর করিয়াছেন—সেই কুকুরটি হইতেছে তাঁহার নায়িকার ছদ্মরূপ !

ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যাগুলিকে আক্ষরিভাবে মানিয়া না লইলেও, এটুকু ধরিয়া লইতে আপত্তি নাই যে, সংরুদ্ধ বাসনার জট্‌গুলি সক্রিয় শক্তি লইয়াই আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। যে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, নীতি-অনীতিবোধ আমাদের ব্যক্তিত্বকে তৈয়ারী করে, সেই ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অন্য কোনও শক্তি নির্জ্ঞান মনের মধ্যে থাকার অর্থই হইতেছে যে, সেই বিরুদ্ধ শক্তিটি পদে পদে আমাদের বাধার সৃষ্টি করিবে, আমাদের সমগ্র সম্ভাবনা দিয়া আমাদের কাজ করিতে দিবে না, প্রত্যক্ষে নকল বিনয়, নকল আনুগত্য দেখাইয়া অথবা ছদ্ম ব্যবহার করিয়া পরোক্ষে কার্যহন্তারক হইয়া সে আমাদের ক্ষতিই করিবে।

নিরুদ্ধ কামনা অথবা অনীতিমূলক অভিজ্ঞতার স্মৃতিজনিত জট্‌গুলি আমাদের প্রতি নকল আনুগত্য দেখায় বলিয়াই আমরা তাহাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি না। এইজন্যই আমাদের অনেক ক্রিয়াকলাপের অর্থ উপর হইতে দেখিলে যাহা মনে হয়, তাহাদের ভিতরের অর্থ তাহা নহে। একজন লোকের হয়ত অনবরত হাত ধুইবার শুচি-বাতিক আছে। কিন্তু এই শুচি-বাতিকের গূঢ় অর্থ হয়ত এই হইতে পারে যে, ঐ লোকটি ঐ হাত দিয়া এমন কোনও পাপের কার্য করিয়াছে, যাহার স্মৃতি সে ঐভাবে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে চাহে।

কৈশোরে আমরা যে সমস্ত ভয়ের বা পতনের স্বপ্ন দেখি, তাহারও এই জাতীয় একটা গূঢ় ব্যাখ্যা হইতে পারে। শারীরিক পতন হয়ত নৈতিক পতনের সূচনা করে, ভয়ের ব্যাপারটা হয়ত ব্যাক্তিত্বের সহিত নিজ্ঞান মনের বিদ্রোহী চিন্তাগুলির সংঘর্ষের ফল হইতে পারে।

এই জাতীয় স্বপ্নের কথাগুলি আমরা প্রায়ই স্বপ্নান্তে ভুলিয়া যাই, তাহার কারণ এই সমস্ত স্বপ্নের মধ্যে যে সমস্ত অনীতির অভিযান থাকে, তাহার সংবাদ পাইলে সজ্ঞান মনের দুঃখই বাড়িবে।

স্বপ্নে চলাফেরা (Somnambulism) করার অভ্যাস অনেকের আছে।

এই অভ্যাসের অর্থই হইতেছে স্বপ্নের সময় অদমিত কামনা সজ্ঞান মনের অগোচরে তাহার ইপ্সিত কাজ সারিয়া লয়। এই জন্যই যাহারা স্বপ্নে চলা ফেরা করে তাহারা সে সব কথা সমস্তই ভুলিয়া যায়।

তোত্‌লামি প্রভৃতি মুদ্রাদোষ অনেক সময় অবদমিত ইচ্ছার জট্ হইতে উদ্ভূত হয়। অধিশাস্তার (super ego) ভয় এবং 'ইদ'-এর (Id) আগ্রহ, এই দুইটির সংঘর্ষ হইতে অনেক সময় তোত্‌লামি আসিয়া থাকে। লোটা হওয়া বা বাম হাতে কাজকর্ম করাও নাকি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পিতা যে ভাবে কাজকর্ম করেন তাহার বিপরীতাচারণ করারই ইহা প্রতীক।

আমাদের অনেকের মধ্যে অদ্ভুত খেয়াল বা ক্ষেপামি আছে। কেহ হয়ত ফাঁকা মাঠ দেখিয়া ভয় পায়, কেহ হয়ত ছুরি বা দড়ি দেখিলে ক্ষেপিয়া উঠে; রাস্তা দিয়া হয়ত একটি নিরীহ বৃদ্ধা চলিতেছে, পিছনে ছেলের দল হঠাৎ "ডাক্তার" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, অমনি দেখা গেল বৃদ্ধাটি মুখ ভ্যাংচাইয়া গলা ফাটাইয়া গালাগালি করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিল। উপর হইতে দেখিলে এই সমস্ত ব্যাপারের যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু নিজ্ঞান মনের তত্ত্বের খবর লইলে এই সমস্ত ক্ষেপামির অর্থ ও ইঙ্গিত বুঝিতে পারা যায়।

ফ্রয়েডীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, আমাদের যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি হয়, তাহা নিতান্ত অকারণে বা হঠাৎ হয় না—তাহা নিজ্ঞান মনের প্রেরণাতেই ঘটিয়া থাকে। ছেলেরা যে কালি ছিটাইয়া বই নোংরা করে, তাহা নাকি স্কুলের কর্তৃপক্ষের নিয়ম-নিষ্ঠার বিরুদ্ধে নিজ্ঞান মনের বিদ্রোহের প্রতীক, আমরা যে আত্মীয়কুটুম্বের নিকট লৌকিকতার চিঠিপত্র লিখিবার সময় ভুলভ্রান্তি করি তাহা নাকি সামাজিক "আমড়াগাছি", ভণ্ডামি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই দ্যোতক। ফ্রয়েড বলেন, তাহা হইতেছে নিজ্ঞান মনের তরফ হইতে আমরা ইহা ভুলিয়া যাইতে চাই বলিয়াই এমনটি ঘটিয়া থাকে।

অনেক সময় একজন লোককে একটা বিষয়ে অত্যধিক আসক্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যেও নিজ্ঞান মনের একটি লীলা আছে। নিজ্ঞান মনের অত্যধিক কামুকতা বা অবদমিত কামনা হয়ত বাহিরের আচরণে অস্বাভাবিক লজ্জায় বা ন্যাকামিতে প্রকাশ পায়,

অপরের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অস্বাভাবিক ক্রোধ হয়ত আমাদেরই নির্জ্জান মনের মধ্যে ঐ সমস্ত ত্রুটির অস্তিত্বের ইঙ্গিত করে। কোনও কারণে বাল্য হইতে যাহারা ভোগবিলাসে বঞ্চিত হইতে বাধ্য হয়, অনেক সময় তাহাদের অবদমিত কামনা তাহাদের নির্জ্জান মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া থাকে এবং তাহার ফলে সে বাড়ীর অন্যান্য সকলের ছোটখাট ভোগ-বিলাসগুলিকেও সহ্য করিতে পারে না এবং সেই সমস্ত ভোগবিলাসের ব্যবস্থা দেখিলে হিংসা প্রকাশ করিয়া গৃহের শান্তির ব্যাঘাত করে।

যে সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য আমাদের আচরণের মধ্যে এই জাতীয় অসামঞ্জস্য-গুলি ঘটিতে থাকে, আমাদের কৈশোরে সেই সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব অত্যন্ত বেশী ভাবে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া কিশোরদের যারা শিক্ষক তাদের এ সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত এবং সহানুভূতিকোমল ব্যবহারের দ্বারা এই সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা উচিত।

শৈশবের সহিত কৈশোরের একটা সাদৃশ্য আছে। শৈশবের মতো এই সময়টিতেও জাতক বাহিরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খাওয়াইতে পারে না এবং সেই জন্যই যেন সে শিশুর মতই বাহিরের জগৎ হইতে পলায়ন করিয়া অন্তর্বৃত্ত (introvert) হইয়া উঠে। জীবন যুদ্ধে পরাজয়ের ভয়ে সে যেন কুণো হইয়া উঠে। আলস্য, ক্লান্তি, অকারণ ভয় বা অকারণ অপরাধের অনুভূতিতে ক্লান্ত হইয়া সে কল্পনার রাজ্যে কাজ করিতে চায়, দিবাস্বপ্নের কল্পিত আনন্দে মশগুল থাকিতে চায়। এই সময়ে বাহিরের খেলাধূলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া বালকের মনের কল্পনা-বিলাসের প্রতিষেধের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

শৈশবের অসহায় অবস্থার পর বাল্যে জাতক জগতের সঙ্গে অধিকতর পরিচয়ের জন্য সে জগতের খানিকটা খাপ খাওয়াইয়া লইতে সমর্থ হয়। ইহার পর কৈশোরে আবার একটা অসহায় অবস্থা আসে। সেইজন্য কৈশোরের দিবাস্বপ্নগুলি প্রায়ই **পশ্চাৎমুখী** (regressive) হইয়া বাল্যের সাফল্যের দিকে ঝুঁকিতে থাকে এবং সে নূতন করিয়া কিছু শেখা বা করার চেয়ে পুরাতন পথেই চলিতে যেন সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে।

কৈশোরের **বিষাদ-প্রিয়তা** বা খিট্‌-খিটে ভাবটি মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের

সূচক। জগতের সহিত খাপ খাওয়াইতে না পারার জন্য নিজের প্রতি বা জগতের প্রতি যে বিরক্তি, তাহাই হয়ত মনের রুক্ষতা হইয়া প্রকাশ পায়, অতীত অন্যায়ের অনুভূতি হয়ত বিষাদ-প্রিয়তা রূপে দেখা দিয়া থাকে।

এই বয়সে জগতের সঙ্গে এই খাপ খাওয়াইবার অক্ষমতাটি অনেক সময় আমাদের বেপরোয়া করিয়া সমাজদ্রোহী ও অনীতি-পরায়ণ করিয়া তোলে, কখনও বা হয়ত যৌন-অপরাধ-প্রবণতার সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত **অপরাধ-প্রবণতা** যে নির্জ্ঞান মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে অনেক সময় উদ্ভুত হয়, তাহার একটি প্রমাণ হইতেছে যে, অপরাধী অনেক সময়েই তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। সে জানে না কেন সে অপরাধ করিতেছে, সে যেন "বলাৎ এব নিয়োজিত" হইয়াই অন্যায় কাজগুলি করিয়া যায়।

এই অপরাধ-প্রবণতা নানা রূপেই প্রকটিত হইতে পারে। কখনও বা হয়ত স্কুল-পলাতক বা গৃহ-পলাতক হইয়া বালক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। মনের স্বাভাবিক স্বাধীনতা-প্রিয়তা এবং গৃহ বা স্কুলের নিয়ম, নিষ্ঠা—এই দুইটি জিনিসের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ফলে সংঘর্ষজনিত গূঢ়ৈষা হইতে ইহা সৃষ্ট হয়। কখনও বা হয়ত অকারণে মিথ্যা বলিবার অভ্যাসে ইহারা প্রকটিত হইয়া উঠে। বিদ্যাবুদ্ধি বা শক্তিতে যে বালকটি খাটো এবং তাহার শক্তি-দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন, তাহার নির্জ্ঞান মনে প্রায়ই **আত্মাবমাননাজনিত** জট্ বা **হীনমন্যতার** (inferiority complex) সৃষ্টি হয়। তখন সে অকারণে মিথ্যা কথা কহিয়া, তাক লাগাইয়া লোকজনকে চমকাইয়া দিয়া নিজের বাহাদুরী প্রচারের চেষ্টা করে।

চৌর্য কৈশোরের আর একটি অপরাধ। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ছোট ছোট চুরির অভ্যাস প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রিদিগকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় করিয়া দিলেই রোগের প্রতিকার হয় না, মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক উপার্জ্জনী-বৃত্তিটি আছে, তাহারই বিকৃত রূপে এই দোষটি প্রকটিত হইয়া উঠে। এই দোষের প্রতিকার বা উৎকর্ষণ খুব সহজ নয় এবং নানা ছদ্মরূপে এই দোষটি মানুষের মনের উপর কার্য করিতে থাকে। রস্ (Ross) বলেন, বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিয়া রেল কোম্পানীকে ফাঁকি

দেওয়া, কাহারও নিকট বই চাহিয়া লইয়া ফিরাইয়া না দেওয়া, ইন্‌কাম্ ট্যাক্স এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করা, 'দেখ্ তোর না দেখ্ মোর' এই ভাবে এটা-ওটা হাতড়াইবার চেষ্টা করা—এইগুলিকে চুরির মনোভাব ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ? অথচ এই সমস্ত অভ্যাসগুলি অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এই সমস্ত অভ্যাসগুলি সব সময়েই যে উপার্জ্জনী-বৃত্তির অস্বাভাবিক বিকাশ, তাহা নহে। অনেক সময় এই জাতীয় দোষগুলি অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা হইতেও সৃষ্টি হয়। ফ্রয়েড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, আমরা যে সমস্ত জিনিস চুরি করি তাহা অনেক সময়েই যৌন-ক্ষুধার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতীক। নির্জ্ঞান মন সেই প্রতীকগুলিকে চুরি করিবার প্রেরণা দিয়া আমাদের অতৃপ্ত বাসনাকে তৃপ্ত করায়।

অনেক সময় দল পাকাইয়া গুণ্ডামি করা প্রভৃতিও ছেলেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই দোষের উৎকর্ষণ খুব কঠিন নয়। সহানুভূতির সহিত কথাবার্তা কহিতে এবং উপযুক্তভাবে যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিলে এই দলগুলিকে সমাজ-সেবা প্রভৃতি কাজে লাগান যাইতে পারে।

মোটামুটি বলিতে পারা যায়, কৈশোরে যে সমস্ত অপরাধ, যে সমস্ত "স্খলন পতন ত্রুটি" সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় তাহার অনেকগুলিই নির্জ্ঞান মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গূঢ়ৈষা হইতে উদ্ভূত। অনেক ক্ষেত্রেই শাস্তি বিধানের দ্বারা ইহার প্রতিকার হয় না। শিক্ষককে ধৈর্য ও সহানুভূতির সহিত দেখিতে হইবে জটগুলি কেন হইল এবং তারপর যুক্তির দ্বারা, সহানুভূতির দ্বারা তাহার দ্বন্দ্বের নিরসন করিতে হইবে। শিশু যেমন পিতাকে অনেক সময় সন্দেহের চোখে দেখে এবং শত্রু বলিয়া মনে করে, কৈশোরের অবস্থায় বালক বালিকাও তেমনই শিক্ষককে শত্রুস্থানীয় অথবা বিরোধী বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং তাহার আদেশের বিপরীতাচরণ করিতে চাহে। এইজন্য শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের বুঝাইয়া দেওয়া যে, তিনি ছাত্রদেরই দলের লোক, সুতরাং ছাত্রদের সহিত তাহার বিরোধ নাই। ছাত্রগণ যখন শিক্ষককে তাহাদের দলের লোক বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখনই সে তাঁহার উপদেশ মানিয়া লইবে, নতুবা নহে।

চিন্তার বিবর্তন

অনেকের বিশ্বাস, চিন্তা জিনিসটা একান্ত ভাবে মানুষেরই সম্পদ, মনুষ্যেতর প্রাণীদের ইহাতে কোনও অধিকারই নাই, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির স্তরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। নান্ সাহেব বলেন, একটি কুকুরের চিন্তাধারার সহিত একজন ঋষির চিন্তাধারার পার্থক্যটা প্রণালীগত ততটা নহে, যতটা হইতেছে মাত্রাগত। মানুষ জগতের সহিত যতই নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে থাকে, ততই তাহার মনোযন্ত্রের বিকাশ হইতে থাকে। এই বিকাশ ত্রিধারায় চলে : (১) কোনও একটা অভিজ্ঞতায় অভিভূত হওয়া (affective aspect) (২) সেই অভিজ্ঞতার ফলে কোনও কিছু কর্মপ্রচেষ্টা করা (conative aspect) এবং (৩) অভিজ্ঞতা-জনিত একটা কিছু জ্ঞান সঞ্চয় বা সিদ্ধান্ত করা (cognitive aspect)। এই জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ একটা হঠাৎ-ঘটা কাণ্ড নহে। ইহার বিকাশের পথে নানা প্রকার স্তর আছে এবং প্রাণীজগৎ হইতে মনুষ্যজগৎ সকলের মধ্যেই ইহার লীলা অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলিতেছে।

এই চিন্তাশক্তির বিকাশের ইতিহাস অত্যন্ত বিচিত্র।

জাতক যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন এই দৃশ্য-গন্ধ-গানে ভরা জগতে সে একেবারেই অপরিচিত ও নবাগত। সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে কোন জড়বুদ্ধি বালককে ধরিয়া আনিয়া যদি কলিকাতার জনাকীর্ণ পথে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে রিক্সার টুং টাং, ট্রামের ঢং ঢং, মোটারের প্যাক্ প্যাক্, ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘড়্ ঘড়, জনতার হট্টগোল, ভীড়ের ঠেলাঠেলি, ভিখারীর আবেদন, সেলস্‌ম্যানের টানাটানি, আত্মীয় বন্ধুর বিপদ-সঙ্কেত প্রভৃতিতে সে যতটা দিশেহারা হইয়া পড়ে, তাহার সহস্রগুণ দিশেহারা হইয়া পড়ে এই নবজাত শিশু। মাতৃগর্ভের নিরালা গর্ভনীড় হইতে সে হঠাৎ যখন সহস্র আবেদনে পূর্ণ এই পৃথিবীতে আসিয়া পড়িল, তখন তাহার অনভ্যস্ত কাণে কত রকম অপরিচিত শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল,

অনভ্যস্থ চোখে পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যপট হঠাৎ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, অনভ্যস্ত নাসিকায় হয়ত কত রকমের নাম-না-জানা, গন্ধ প্রবেশ করিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল, তাহার অনভ্যস্ত ত্বক্ দিয়া আবহাওয়ার শীতাতপ বোধ, পার্থিব জিনিসের কঠিন-কোমল স্পর্শ-বোধ তাহাকে চেতাইয়া তুলিল এবং এই সমস্ত জিনিসগুলিই একই সঙ্গে তাহার অনুভূতির রাজ্যে হানা দিল। অনুভূতির এই যুগপৎ আক্রমণে সে এতই দিশেহারা হইয়া পড়িল যে, বেচারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু যে কাঁদিয়া উঠে, ইহাই হইল তাহার কারণ।

তারপর ধীরে ধীরে জগতের সঙ্গে তাহার পরিচয় আরম্ভ হয়। এই পরিচয়ের ইতিহাস অতি বিচিত্র। বিরাট্ কলগুঞ্জনে গুঞ্জিত, সহস্র আবেদনে পুঞ্জিত, হঠাৎ ফাটিয়া-পড়া বিস্ময়ের জগতে জাতক যখন আসিয়া পড়িল, তখন সে বুঝিতেই পারিল না যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহস্র আবেদনের মধ্যে কোনটির প্রতি সে মনোযোগ দিবে। তখন অতীতের কোনও অভিজ্ঞতাই তাহার সম্বল নাই, তাহার আছে শুধু কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) এবং অপরিস্ফুট দেহযন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবর্তক ক্রিয়ার ক্ষমতা (reflexes); এই প্রবৃত্তি এবং দেহের প্রয়োজন তাহাকে যে বিষয়ে প্রেরণা দিবে তাহার মনোযোগ সেই দিকেই আকৃষ্ট হইবে। নান্ সাহেবের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী ধরা যাইতে পারে, তাহার জন্মের কয়েকদিন পরেই জাতক তাহার অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির প্রেরণায় তাহার চামচের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তার পর নানাভাবে হাত পা নাড়িয়া বহু চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়া সে চামচটিকে ধরিল এবং একবার বাঁ চোখে, একবার বাঁ নাকে, একবার বা কাণে গুঁজিতে গুঁজিতে শেষ পর্যন্ত সে চামচটিকে মুখে পুরিতে সমর্থ হইল।

তাহার একটি **অভিজ্ঞতা** হইল।

পরে আর একদিন সে ঐ চামচটিকে পুনরায় দেখিতে পাইল। এবারে আশেপাশের অন্যান্য জিনিসের তুলনায় এই চামচটি সে অধিকতর স্পষ্টতার সহিত অন্যান্য জিনিস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লক্ষ্য করিল, কারণ এই জিনিসটির সহিত তাহার পূর্ব পরিচয়ের একটা সম্পর্ক আছে এবং তাহার ফলে দ্বিতীয়

বারের অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ অর্থ ও ব্যঞ্জনা আছে। এইভাবে অভিজ্ঞতার **প্রাথমিক সঙ্কেত** (primary meaning) দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতায় বদ্‌লাইয়া যায়। শিশুটির প্রথম অভিজ্ঞতাটি ছিল চামচ সম্বন্ধে নিছক **অনুভূতি** (sensation), দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতাটিতে তাহার পরিচিত ভাল-লাগা মন্দ-লাগা প্রভৃতির রং লাগিয়া গিয়াছে। নিছক নির্জলা অনুভূতির এই যে একটা মনের রং লাগাইয়া নূতন ব্যঞ্জনায় তাহাকে নূতন করিয়া পাওয়া (perception), ইহাই হইতেছে চিন্তার মূল কথা। অনুভূতির সঞ্চয় যতই বাড়িতে থাকে, জগৎকে ততই নূতন করিয়া বুঝিতে শিখি। এই হিসাবে প্রত্যেক অভিজ্ঞতাকেই আমরা খানিকটা নূতন করিয়া পাই, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রাচীনের স্মৃতির সঙ্গে বর্তমান অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটে। এই মিশ্রণ শুধু যৌগিক মিশ্রণ নহে, ইহা খানিকটা রাসায়নিক মিশ্রণের মত, যাহার ফলে পুরাতনের স্মৃতি ও নূতনের অভিজ্ঞতা, এই দুইটি মিলিয়া একটি নূতন জিনিসের সৃষ্টি হয়।

এই সৃষ্টির জন্য আমাদের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ শক্তি প্রচুর সাহায্য করে। জিসিসটা এইভাবে ঘটে। শিশুটি প্রথমতঃ তাহাদের বাড়ীর গাইটিকে দেখিল। গোরু সম্বন্ধে তাহার ধারণা এখনও স্পষ্ট জমাট হয় নাই, তবে অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট গোরুটি সম্বন্ধে একটি অস্পষ্ট **প্রতিরূপ** (image) তাহার মনের মধ্যে রহিয়া গেল। পরে সে বুধি ছাড়া মঙ্গলা, শ্যামলী, ধবলী প্রভৃতি আরও অনেকগুলি গোরু দেখিল। ইহাদের কোনটিই ঠিক অবিকল এক রকম দেখিতে নয়। তাহা হইলেও গোরু সম্বন্ধে একটা ধারণা ঠিক করিয়া সে এই গোরুগুলিকেও বুধির স্বগোত্রীয় জীব বলিয়া বুঝিতে পারিল। কি ভাবে ইহা সম্ভব হইল ?

সে প্রত্যেক গোরুরই কতকগুলি সাধারণ বিশেষত্ব এবং কতকগুলি ব্যক্তিগত বিশেষত্ব লক্ষ্য করিল, পরে তাহাদের সাধারণ বিশেষত্বগুলিকে গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত বিশেষত্বগুলিকে বর্জন করিয়া গো-জাতি সম্বন্ধে একটি **ধারণা**র (concept) তৈয়ারী করিল। এইভাবে প্রাথমিক অনুভূতির (sensation) অস্পষ্ট চেতনা দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতার পরিচয় ও ব্যঞ্জনায় (preception)

পরিপক্ক হইয়া বহুবারের অনুভূতির অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণী (twin methods of analysis and synthesis) শক্তির সাহায্যে **'ধারণা'**র (concepts patterns or schemas) সৃষ্টি করিল।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয় না। বালকটি যখন "গোরু" সম্বন্ধে ধারণা খাড়া করিয়াছে, তাহার পর সে হয়ত একদিন একটি মহিষকে দেখিতে পাইল। অনেক দিক দিয়াই মহিষটিকে দেখিতে ঠিক গোরুর মত নহে, তবে গোরুর সহিত তাহার মিলও খানিকটা আছে। এতক্ষণ যে বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তির দ্বারা সে শ্যামলী, ধবলী প্রভৃতির সাধারণ গুণগুলিকে গোরু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গোরু সম্বন্ধে একটি ধারণা (concept) তৈয়ারী করিয়াছিল, সেই বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তির সাহায্যেই সে গোরুর সহিত মহিষেরও যে একটা সম্পর্ক আছে তাহা আবিষ্কার করিল।

এইভাবে বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে কোনও বস্তু হইতে বস্তুনিরপেক্ষ বিশেষত্বগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া এবং সেই বিচ্ছিন্ন গুণসমষ্টির দ্বারা এক একটি 'ধারণা' বা 'নমুনা' (schema or pattern) তৈয়ারী করা এবং পরে এই ধারণাগুলি একত্র করিয়া নূতন নূতন ধারণার সৃষ্টি করা, ইহাই হইতেছে চিন্তা ও সিদ্ধান্ত শক্তির মূল কথা।

একজাতীয় অনেকগুলি জিনিস দেখিয়া তাহাদের সাধারণ গুণগুলি গ্রহণ করিয়া এবং বিশেষ গুণগুলি বর্জন করিয়া সেই জাতি সম্বন্ধে যে একটা "নমুনা" আমরা মনের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখি, সেই নমুনার সঞ্চয়ই আবার আমাদের নূতন নূতন ব্যঞ্জনা দান করে। এইজন্যই একই জিনিসের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন অর্থের সঙ্কেত দান করে। একটি ফুল হয়ত সাধারণের কাছে শুধুই ফুল হিসাবে দেখা দেয়, কিন্তু কবির চোখে হয়ত ভগবানের প্রীতি-স্নিগ্ধ সুবাসিত রঙীন প্রেমপত্র হইয়া দেখা দেয়। জগতের শত সহস্র আবেদনের মধ্য হইতে আমরা যে দুই একটি মাত্রই গ্রহণ করি এবং বাকীগুলিকে দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনিনা, তাহারও কারণ হইতেছে মনের মধ্যে এই সঞ্চিত নমুনার তারতম্য। সুরের অনুভূতির নমুনার কোনও সঞ্চয়ই যাহার মনের মধ্যে নাই, সে কাহাকেও গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে শুনিয়া সেই গানটিকে শব্দের

অস্পষ্ট কোলাহল মাত্র মনে করিয়া তাহাতে কোনও মনোযোগ দিবে না, অর্থাৎ এই গানের আবেদনে তাহার মনে কোনও সাড়া জাগিবে না; কিন্তু যাহার সুর জ্ঞান আছে, যাহার মনের মধ্যে বিভিন্ন সুরের নমুনার সঞ্চয় আছে সে গানটি শুনিবামাত্র উৎকর্ণ হইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে এই সুরটা ইমন? না ভূপালী? না গৌরী? না অন্য কিছু?

এই জন্যই জগতের সঙ্গে পরিচয় যত গভীর হইতে থাকে, নূতনের সহিত পরিচয়ের সুবিধা ততই গভীরতর ও ব্যঞ্জনাময় হইতে থাকে এখন প্রশ্ন আসিতে পারে—আমরা জাতির অতীত ইতিহাস হইতে অভিজ্ঞতার এমন কোনও সঞ্চয় লইয়া জন্মগ্রহণ করি কিনা যাহা আমাদের অনুভূতি, মনোযোগ প্রভৃতিকে বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিবে, বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে? ইয়ুং (Jung) বলেন হাঁ, আমরা কতকগুলি জাতিগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় (cognitive disposition or archetype) লইয়া জন্মগ্রহণ করি। জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারাই গঠিত হয় না, আমাদের জাতির অতীত ইতিহাসের সঞ্চয়ও তাহার সহিত কাজ করে এবং আমাদের জীবনের ক্রিয়াকলাপকে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে নিয়ন্ত্রিত করে। সময় ও দূরত্বের (time and space) ধারণা এইরূপ একটা আমাদের জাতিগত সম্পদ। প্রত্যেক প্রাণীই এরূপ একটা সম্পদ লইয়া তাহার জীবনের কারবার আরম্ভ করে। তারপর আসে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও তাহার নব নব ব্যঞ্জনা ও নব নব সিদ্ধান্ত।

তবে এই সিদ্ধান্তের শক্তি একান্তভাবে মানুষের সম্পদ নহে। ইতর প্রাণীরাও মানুষের মতই তাহাদের অনুভূতির ভিতর দিয়া সিদ্ধান্ত করে। গৃহের কর্ত্রীকে রুক্ষমূর্ত্তিতে "ঝাঁটা হস্তেন সংস্থিতা" দেখিয়া গৃহমার্জ্জারী যখন লাঙ্গুল তুলিয়া পলায়ন করে, আবার তাহাকে প্রশান্ত মূর্ত্তিতে দেখিলে কিছু প্রাপ্তিযোগের আশা করিয়া তাহার চারিপাশে ঘুরিতে থাকে, তখন সেই মার্জ্জারীর মধ্যেও মানুষের মতই একটা বুদ্ধি ও সিদ্ধান্তের লীলা চলিতে থাকে।

তাহা হইলে মানুষ ও ইতর প্রাণীর সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্যটা কোন্‌খানে?

পার্থক্য হইতেছে এই যে, ইতর প্রাণীদের সিদ্ধান্তের জন্য প্রত্যক্ষ অনুভূতির (perception) বস্তুর সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং সেই বস্তুটির "খুঁট" ধরিয়া তাহার চিন্তা চলিতে থাকে, বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে তাহারা বিমূর্ত (abstract) চিন্তা করিতে পারে না। বিড়ালটি গৃহিণীর হাতে ঝাঁটা দেখিলে তবে ভয় পাইবে নতুবা ভয় পাইবে না। কিন্তু মানুষের চিন্তা শুধু এইটুকুর উপরই সীমাবদ্ধ নহে। ঝাঁটা দেখিলে ঘরের মেয়েটি হয়ত বিড়ালীর মতই ভয় পাইবে, কিন্তু তাহার চিন্তাশক্তি আরও বস্তুনিরপেক্ষভাবে চলিতে পারে বলিয়া সে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির বিচার করিতেপারে এবংঐবয়সেই হয়ত সিদ্ধান্ত করিতে পারে "এই কাজটি করিতে নাই, মা রাগ করিবেন অথবা ভগবান পাপ দিবেন" ইত্যাদি। দুই আর দুই যোগ করিলে চার হয়, এই সিদ্ধান্ত একটি সার্কাসের শিক্ষিত ঘোড়া বা কুকুরও হয়ত করিতে পারিবে। তবে তাহার জন্য তাহাকে দুইটি এবং আরও দুইটি জিনিসকে পৃথকভাবে দেখাইতে হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও শিশু অবস্থায় তাহার চিন্তাশক্তি প্রত্যক্ষ অনুভূতির খুঁট ধরিয়া চলিতে থাকে বলিয়া তাহার চিন্তাকে সাহায্য করিবার জন্য জড়বস্তুর সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়। চার দ্বিগুণে আট হয়—নামতার এই বস্তু-বিচ্ছিন্ন (abstract) সঙ্কেতটি তাহার কাছে স্পষ্ট হয় না, কিন্তু চারটি মারবেল বা তেঁতুল বীজ দুইবার গ্রহণ করিয়া যে আটটি হয়, ইহা দেখাইয়া দিলে তাহার বুঝিবার সুবিধা হয়। এই জন্য শিশু বয়সে ছবি, নক্সা প্রভৃতিও তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভূতির চেতনা জাগাইয়া দিয়া তাহার চিন্তাকে সাহায্য করে। কিন্তু এই মার্বেল, তেঁতুল বীজ, ছবি, নক্সা প্রভৃতি আমাদের চিন্তার জন্য যতটা সাহায্য করে, তাহার চেয়ে ঢের বেশী সাহায্য করে মানুষের ভাষা। অধ্যাপক স্টাউট (Stout) বলিয়াছেন, ভাষা হইতেছে "essentially an instrument of conceptual analysis and synthesis," এই ভাষাই হইতেছে উচ্চতম চিন্তার শ্রেষ্ঠতম যন্ত্র। আমাদের মনের অস্পষ্ট ধারণাগুলি ভাষার শীলমোহর পাইয়া সর্বসাধারণের কাজের জিনিস হইয়া ভাবের হাটে বিনিময়ের মুদ্রার কাজ করে। মানুষের ভাষা এক একটি বাস্তব জিনিসের প্রতিরূপ (image) হইয়া আমাদের মানসপটে ভাসিয়া উঠে এবং মানসচক্ষে

এই বিভিন্ন প্রতিরূপগুলি পাশাপাশি দেখিয়া ঠিক ছবি বা নক্সার মতই আমরা চিন্তার সাহায্য পাইয়া থাকি। মা যখন ছেলেকে বলিলেন, "যেও না গোরুর কাছে, গুঁতিয়ে দেবে"; তখন দুর্দান্ত গোরু, গোরুর শিংএর গুঁতায় ভুড়ি-ফাঁসা রক্তাক্ত দেহ এবং চারিদিকের ত্রস্তব্যস্ত অবস্থা, এই সমস্ত জিনিসেরই প্রতিচ্ছবি (image) ছেলেটির মানসপটে ভাসিয়া উঠে। কাজেই গোরুর কাছে যে যাওয়া উচিত নয়, এই সিদ্ধান্তটি বালক সহজেই করিতে পারে।

ভাষার এই সুবিধা আছে বলিয়াই মানবশিশুর চিন্তার ক্ষেত্রে যে সুবিধা হয়, ইতর প্রাণীর সে সুবিধা হয় না। এমন কি মানুষের মধ্যেও যাহারা মূক, বধির এবং তাহার ফলে ভাষার অধিকার হইতে বঞ্চিত, তাহাদেরও সে সুবিধা নাই। হয়ত "গোরু গুঁতাইয়া দিবে" এই জিনিসটা গোরুর গুতাইবার মত অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া ভাষায় অধিকারবিহীন মূক-বধিরকেও বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু মানুষের ভাষায় এমন অনেক শব্দই আছে, যাহা অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া দেখান যায় না। গৃহস্বামী প্রবাসে চাকরির-স্থলে যাইতেছেন, তাঁহার চার বছরের কন্যাটি "যেতে নাহি দিব" বলিয়া বাঁকিয়া বসিল। পিতা বলিতে চাহেন "কেঁদো না, মাসখানেক পরে ফিরে আসবো, সেখানে না গেলে আমার চাকরি থাকবে না" প্রভৃতি। এই মনোভাবটি ভাষার সাহায্যে সাধারণ ছেলেমেয়েকে বুঝান যায়, বোবা ছেলেমেয়েদের ইসারার সাহায্যে তাহা বুঝান সম্ভবপর নহে। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, কাল-পরশু, মাস-বৎসর, দূর-নিকট, ভাল-মন্দ, মাঝারী, চলনসই, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি প্রভৃতি হাজার হাজার কথা প্রত্যেক ভাষাতেই আছে, যাহা নিছক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বুঝান যায় না। এই-খানেই ভাষার বাহাদুরী। ভাষা স্থূল বস্তুর সাহায্য না লইয়াও স্থূল বস্তুর মানস প্রতিরূপগুলি (image) মাত্র লইয়া আমাদের চিন্তা করিতে সুবিধা ত দেয়ই, তাহা ছাড়া স্থূলবাচক জিনিসগুলি হইতে তাহাদের গুণধর্ম ক্রিয়াবাচক (abstract) জিনিসগুলির পর্যন্ত প্রতিরূপগুলিকে মানসপটে নূতন সৃষ্টি করিয়া আমাদের চিন্তার সাহায্য করে। ভাষায় বঞ্চিত ইতর প্রাণীরা তাহা পারে না বলিয়াই তাহাদের চিন্তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথ ছাড়িয়া মানুষের মত জটিল সূক্ষ্ম পথে বিচরণ করিতে পারে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সমস্ত চিন্তাশক্তির মূলে আছে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি (perception)। জীবজন্তু এই অনুভূতির সূত্র ধরিয়াই তাহাদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের পথে পরিক্রমণ করে, আর মানুষ প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্য ব্যতিরেকে অনুভূতির প্রতিরূপগুলি লইয়াই কাজ করিতে পারে। এই প্রতিরূপগুলি যে শুধু চক্ষুগ্রাহ্য জিনিসেরই হইবে এমন কোনোও কথা নাই। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে কোনও অনুভূতির প্রতিরূপ লইয়া মানুষের চিন্তার কাজ চলিতে পারে। এই পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়া মানুষের অনুভূতির আরও দিক্ আছে এবং তাহাদের প্রতিরূপও (image) আছে। শরীরের সুস্থতা-অসুস্থতা বোধ (organic image), দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থানবোধ, (kinaesthetic image) প্রভৃতিরও প্রতিরূপ আছে। মানুষ এইগুলিকে অনুভূতির উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পৃথক্‌ভাবে কাজ করিতে পারে অর্থাৎ জিনিসের **ভাবটি** (idea) লইয়া ভাবিতে পারে।

শিক্ষাতত্ত্বে এখানে একটি আবশ্যকীয় তথ্যের কথা রহিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের প্রতিরূপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সমান নহে, একজাতীয়ও নহে। কেহবা হয়ত কানে শোনা জিনিসগুলি ভালভাবে স্মরণ করিতে পারে, কেহবা চোখে-দেখা জিনিসগুলি বেশী মনে রাখিতে পারে, আবার অন্য কেহ হয়ত হাতে করিয়া স্পর্শ করিলে তবে তাহাকে ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারে। প্রথম জাতীয় ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা বা উপদেশেই কাজ হইবে, দ্বিতীয় দলের ছাত্রদের জন্য ছবি বা উপদেশেই কাজ হইবে এবং তৃতীয় দলের জন্য মডেল প্রভৃতির দরকার হইবে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহার আরম্ভ, তাহার পর নব নব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তির ভিতর দিয়া যাহার বিকাশ, সেই জিনিসটিরই চরম অভিব্যক্তি হইতেছে মানুষের জটিল সিদ্ধান্ত আবিষ্ক্রিয়া প্রভৃতি। নান্ দেখাইয়াছেন, পাম্প্ যন্ত্র এবং ট্রামগাড়ীর নমুনা (schema) দুইটির সংশ্লেষণ করিয়া রেলগাড়ীর আবিষ্ক্রিয়া হইল, গ্যাসের ইঞ্জিন, রাস্তার যানবাহনের নমুনার সংশ্লেষণের ফলে মোটর গাড়ীর উৎপত্তি

হইল। এইভাবে মানুষের নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া চলিতেছে। একেবারে নিছক নূতন সৃষ্টি কিছুই নাই। পুরাতন জিনিসের নূতন নূতন মিশ্রণ এবং নূতন নূতন সঙ্কেত গ্রহণের দ্বারাই ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মানুষ বর্তমানে এমন একটা অবস্থায় আসিয়াছে যে, তাহার এই বুদ্ধিবৃত্তি যে ইতর প্রাণীদের মতই সাধারণ দেহযন্ত্র ও তাহার অনুভূতি দিয়াই কাজ আরম্ভ করিয়াছে তাহা যেন আমরা এখন আর ভাবিতেই পারি না।

কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতিদের কল্পনার বাহাদুরীও এই বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তির কারচুপি মাত্র। নান্ দেখাইয়াছেন, ড্যানিয়েল ডেফো (Danial Dafoe) যে রবিন্সন ক্রুশো (Robinson Cruso) লিখিয়াছেন তাহাও একটি কাল্পনিক অবস্থার কথা ভাবিয়া লইয়া এবং তাহার পর সংশ্লেষণ-শক্তির দ্বারা সম্ভাব্য অবস্থাগুলিকে পর পর গ্রথিত করিয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

ইংরাজীতে যাহাকে fancy বলা হয়, তাহাও একপ্রকার কল্পনারই লীলা। তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ শক্তির দ্বারা আমারা শুধু যে সম্ভাব্য জিনিসগুলিকেই গ্রথিত করি তাহা নহে, সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব জিনিসগুলিই তাহাতে পাশাপাশি গাঁথিয়া যাওয়া হয়। ফলে 'কঙ্কাবতীর স্বপ্নে'র মত অথবা 'Alice in wonder land'-এর মত কত অদ্ভুত জিনিসই আমরা দেখি।

সিদ্ধান্তও (reason) এই আবিষ্ক্রিয়ার মতই একই প্রণালীতে করা হয়। কারণ, দুইটি ক্ষেত্রেই সংশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে দুইটি নমুনা (schema) হইতে এমন একটা সম্ভাব্য নমুনা (sehema) তৈয়ারী করা হয়, যাহা বাস্তববিরোধী হইবে না।

প্রাণীদিগের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা হিসাবে জার্মাণীর গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার পণ্ডিতগণের মন্তব্যগুলি অবধারণীয়। তাঁহারা বলেন, পরিবেশ বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলির একটা সক্রিয় দিক্ আছে। একটি আলোকচিত্রের প্লেটের উপর দৃশ্য বস্তুর ছাপটি যে ভাবে কাজ করে, আমাদের পরিবেশগুলি আমাদের উপর সে ভাবে কাজ করে না, অর্থাৎ পরিবেশের প্রতিক্রিয়া আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিব, তাহা পরিবেশের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে আমাদের নিজেদের উপর। সুতরাং

কোন্ আবেদনে আমরা কি ভাবে সাড়া দিব তাহা শুধু দেহযন্ত্রের খুঁটিনাটি জানা থাকিলেই বলা চলিবে না, অথবা আমাদের জন্মগত বৃত্তি প্রভৃতির পরিচয় থাকিলেই বলা সম্ভবপর হইবে না। অর্থাৎ আবেদনের প্রতিক্রিয়াগুলি শুধু যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ামাত্রই নহে; আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অতীত অভিজ্ঞাজনিত যে সমস্ত নমুনার (pattern) সঞ্চয় আছে, তাহার বর্তমান অভিজ্ঞতা খাপ খাওয়াইবার চেষ্টার উপরই আমাদের প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য নির্ভর করে।

কতকগুলি শিম্পাজী লইয়া এই ব্যাপারে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। বারোটি শিম্পাঞ্জীকে একটি জায়গায় ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল। সেখানে কতকগুলি কলা ঝুলান ছিল। বিভিন্ন শিম্পাজী সেই কলাগুলি খাইবার জন্য বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিল; কেহবা একটি লম্বা লাঠি মাটির উপর শূন্যে দাঁড় করাইয়া সেই লাঠিটি মাটিতে পড়িয়া যাইবার পূর্বেই কলাটির কাছ পর্যন্ত লাঠি বহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল, কেহবা কতকগুলি ভাঙ্গা বাক্স সংগ্রহ করিয়া একটির উপর আর একটি বাক্স স্থাপন করিয়া কলাগুলির নাগাল পাইতে চেষ্টা করিল, আবার কেহবা একটি লাঠির দ্বারা কলাগুলি পাড়িবার চেষ্টা করিল এবং লাঠিটি যখন মাপে ছোট বলিয়া মনে হইল, তখন একটি লাঠির খাঁজের মধ্যে আর একটি লাঠি প্রবিষ্ট করিয়া তাহাকে আঁকশীর মত ব্যবহার করিয়া কলাগুলি পাড়িবার চেষ্টা করিল।

এই সব চেষ্টার মধ্যে যে যুক্তি আছে, তাহা বিভিন্ন শিম্পাঞ্জীর অতীত অভিজ্ঞতার বিভিন্নরূপ নমুনার সহিত বর্তমানের অভিজ্ঞতার খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইতরপ্রাণীদের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়ার সহিত মানুষের চিন্তার ও যুক্তির যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই—উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তির কাঁচা মাল যে অভিজ্ঞতার নমুনার সমৃদ্ধি হইতেই আহৃত হইতেছে, গেস্টাল্ট্-মতবাদীর মনস্তাত্ত্বিকগণের এই পরীক্ষাটি তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

চিন্তা ও সিদ্ধান্তের প্রণালী সম্বন্ধে কোনও কিছু আলোচনা করিতে হইলে অধ্যাপক স্পিয়ারম্যান (Spearman)-এর আলোচনাগুলি উল্লেখ না

করিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্পিয়ারম্যান চিন্তার কাজগুলিকে তিনটি সূত্রের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম সূত্রটি হইতেছে "প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই আমাদের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি জ্ঞানের উদ্ভব করে"—আমি যখন একটি কালো রংএর কোনও জিনিস দেখিলাম তখন 'কালো' এই গুণটি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইল। শুধু তাহাই নহে, এই কালো জিনিসটি একটা কর্তৃ-নিরপেক্ষ কালো রঙ্ হিসাবে আমার কাছে আসিল না। আমি যে কর্তৃপুরুষ হিসাবে কালো রঙটি দেখিতেছি এই জ্ঞানটি আমার হইল।

তাঁহার দ্বিতীয় সূত্রটি হইতেছে "এই একাধিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা যখন আমাদের মনে সঞ্চিত হয়, তখন আমরা সেই বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শুধু যে অনন্য-সম্পর্কশূন্য জ্ঞানই সঞ্চয় করি তাহা নহে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটুকুও অনুভব করি।" কালো জিনিসটি দেখিবার পর যখন একটি সাদা জিনিস দেখি, তখন এই দুইটি জিনিসের জ্ঞান পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে মনোভাণ্ডারে স্তূপীকৃত হইয়াই রহিল না, 'কালো'র "সাদা"র যে একটি বিপরীতধর্মী সম্পর্ক আছে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম।

তৃতীয় সূত্রটি দ্বিতীয় সূত্রের অনুপূরক। এই সূত্র অনুসারে একটি অনুভূতির জিনিস এবং তাহার সঙ্গে ঐ জিনিসটির সম্পর্কের কথা (যেমন সমধর্মিতা, বিপরীতধর্মিতা প্রভৃতি) বলা হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্পর্কে সম্পর্কিত দ্বিতীয় জিনিসটির কথাও আমাদের মনে পড়িয়া যাইবে। যেমন 'কালো' এই কথাটি উচ্চারণ করিবার পরই আমরা যদি কালোর বিপরীতধর্মী সম্পর্কের কথা ভাবি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই 'সাদা' এই কথাটি মনে পড়িয়া যাইবে।

আমরা উপমাধর্মী যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করি, তাহা এই সূত্রগুলির অধিকারে পড়ে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর যে সম্পর্ক, পৃথিবীর সহিত কাহার সেই সম্পর্ক ?"—সহজেই উত্তর আসিবে "সূর্যের"।

জ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, অভিজ্ঞতার জ্ঞানগুলি নিষ্ক্রিয় বস্তুভাবের মত আমাদের মনোমধ্যে

সঞ্চিত হইয়া থাকে না। জ্ঞানের অর্থই হইতেছে জ্ঞেয় বস্তুর উপর একটি বুদ্ধি বা শক্তির অধিকার স্থাপন করা।

নবজাত শিশুটি যখন চক্‌চকে চামচটিকে দূর হইতে দেখিয়াছিল, তখন চামচটি সম্বন্ধে তাহার বুদ্ধির অধিকার ছিল না। কিন্তু চামচ সম্বন্ধে যখন তাহার অভিজ্ঞতার পরিচয় হইল, তখন চামচটির উপর তাহার একটা বুদ্ধির অধিকার জন্মিয়াছিল—কারণ চামচটির অর্থ সে তখন বুঝিতে পারিয়াছে।

জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের এই অধিকারটি উদ্দেশ্যমূলক আত্ম-সচেতন ভাবে বর্ধিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ ইহা ব্যবহারিক (practical), কান্ত (aesthetic), নৈতিক (ethical) প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হইতে থাকে।

আমাদের অনেক জ্ঞানেরই যে একটা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পথচারী যখন কাহারও নিকট পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করে কিংবা বাড়ীর ছোট মেয়েটি যখন গৃহিণীর নিকট নূতন জিনিসের রন্ধনপ্রণালীর কৌশল জিজ্ঞাসা করে, তখন তাহার জ্ঞানের উদ্দেশ্য যে ব্যবহারিক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এমন কি স্কুলের ছাত্র যখন চন্দ্রগ্রহণ বা জোয়ার-ভাঁটা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে, তাহার মধ্যেও একটা ব্যবহারিক ব্যঞ্জনা আছে। এই জ্ঞানের দ্বারা সে যখন ইচ্ছা জোয়ার-ভাঁটা সৃষ্টি করিতে পারে না বটে, কিন্তু এই জ্ঞানের দ্বারা যদি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে যে, এই সময়ে চন্দ্রগ্রহণ হইবে অথবা এই সময়ে জোয়ার আসিবে, তাহা হইলেও এই জ্ঞান হইতে একটা ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যে সমস্ত গবেষণাকে একেবারে প্রয়োজননিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক তপশ্চর্যা মাত্র বলিয়া মনে হয়, তাহারও একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে ; তখন সেটা হয়ত বর্তমানে পরিস্ফুট নহে, এই মাত্র।

জন ডিউঈ (John Dewey) তাঁহার গিফোর্ড বক্তৃতামালায় (Gifford lecture) বলিয়াছেন, জ্ঞানের অর্থই হইতেছে বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে লইয়া এমনভাবে কাজ করা যাহাতে মানুষের কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তড়িৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অর্থই হইতেছে তড়িৎকে মানুষের কাজে লাগাইয়া বৈদ্যুতিক

আলোক, পাখা, ট্রাম, বেতার প্রভৃতি সৃষ্টি করা। কোনও জিনিসের সম্বন্ধে জ্ঞান কথাটির ব্যঞ্জনাই এই যে, সেই জিনিসটির উপর ব্যবহারিক প্রভুত্ব স্থাপন।

ডিউঈ বলেন, মানুষের মধ্যবর্তিতায় প্রতিনিয়তই যেহেতু জগতের পরিবর্তন ঘটিতেছে, সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বর্ষার বৃষ্টিতে পুষ্করিণীর জলসম্পদের মত শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে বর্ধিতই হয় না, ক্রমশঃই পরিবর্তিতও হইতে থাকে। নূতন সৃষ্টির শক্তি যদি জ্ঞানের অর্থ হয়, তাহা হইলে অতীতের জ্ঞান বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না। বর্তমানের নব নব সৃষ্টির অভিযানে সাহায্য করিবার জন্যই অতীতের জ্ঞানের প্রয়োজন। অতীতকে লইয়া অথবা অতীত কৃষ্টিকে লইয়া আদিখ্যেতা করিয়া বাহাদুরী করিবার জন্য অতীতের কোনও প্রয়োজন নাই। সুতরাং অতীত সৃষ্টিকে রক্ষা বা সযত্নে পালন না করিয়া তাহার দ্বারা জীবনের অর্থনৈতিক, ধর্ম-নৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক সমস্যাগুলির সম্বন্ধে নূতন নূতন গবেষণামূলক মনোভাব সৃষ্টি করাই জ্ঞানের তথা শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

ডিউঈর এই সূত্রটি সামাজিক নীতি-অনীতি, ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতির বিচারের ব্যাপারে প্রযুক্ত হইলে মনে হয় "এইটি কর্তব্য" এবং "এইটি অকর্তব্য" এইরূপ চিরন্তনী নীতি কিছুই থাকিতে পারে না। আমাদের প্রপিতামহগণের যাহা করণীয় ছিল, আমাদের তাহা করণীয় নাও হইতে পারে, কারণ আমাদের জগৎ তাঁহাদের জগৎ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। গ্রাম-কেন্দ্রিক কৃষি-সভ্যতার যুগে যে জীবনযাত্রা প্রচলিত ছিল, এখন কলকারখানার যন্ত্রসভ্যতার যুগে তাহা নাই, সুতরাং তখন জীবনযাত্রার যাহা আদর্শ ছিল এখন তাহা থাকিতে পারে না, তখন যাহা কর্তব্য ছিল এখন তাহা কর্তব্য নাও থাকিতে পারে।

শিক্ষাতত্ত্ব প্রভৃতির দিক দিয়াও ডিউঈর মতবাদ আমাদের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের দাবী করে। অতীতের ভাবধারাকে, অতীতের কৃষ্টিকে রক্ষা করিবার উপদেশ আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু ডিউঈ বলিবেন, অতীতের কৃষ্টির দিকে চাহিয়া না থাকিয়া বর্তমানের ছাত্রছাত্রীদিগকে পরিবর্তনশীল

বর্তমানের দিকে দৃষ্টি রাখিতে শিখাইতে হইবে এবং বর্তমানের সামাজিক, অর্থনৈতিক, নাগরিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রশ্নের সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক মনোভাব তৈয়ারী করিতে হইবে।

জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটি ছাড়িয়া এইবার তাহার কান্ত (aesthetic) দিকটির আলোচনায় আসা যাক। যাহাকে আমরা শিল্প বা ললিতকলা বলি তাহারও একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে। তবে খাঁটি শিল্পী মনোবৃত্তি যাঁহাদের তাঁহারা দৈনন্দিন প্রয়োজন-নিরপেক্ষভাবেই তাঁহাদের সুন্দরের সাধনা করেন। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অনেকটা প্রয়োজন-নিরপেক্ষ। তবে খাঁটি কান্ত জিনিসের সাধনা হাট-বাজারের প্রতিদিনের চাহিদার অপেক্ষা রাখে না, নিত্য যাহা ঘটে সেই তুচ্ছ 'সত্যে'রও অপেক্ষা রাখে না। আমরা যে সংশ্লেষী-বিশ্লেষণী শক্তির কথা বলিয়াছি তাহারই সাহায্যে বাস্তব জগতে যাহা সচরাচর ঘটে না এমন সমস্ত সম্ভাব্য সত্যের স্বষ্টিই শিল্পীরা করিয়া থাকেন। জগতের ব্যর্থতা অসম্পূর্ণতাকে তাঁহারা কল্পনার আদর্শ দিয়া সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিতে চাহেন, জগতের তুচ্ছতার উপর তাঁহারা চাহেন—

"To add the gleam
The light that never was on sea or land
The consecration and the poet's dream".

ইহারই ফলে তাঁহাদের কল্পনার স্বষ্টিগুলি বাস্তব স্বষ্টির চেয়েও বাস্তবতর হয় এবং কল্পমার আদর্শ সত্যের চেয়েও সত্যতর হয়। এই জন্যই কাব্যকলার সহিত নৈতিক সত্যের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে এবং কবির সত্য ও সুন্দর নীতি শিবের সহিত সম্মিলিত হয়। ভবভূতি বলিয়াছেন—

"লৌকিকানাং হিনা ধুনামর্থং বাগানুবর্ততে।
ঋষিনাং পুনরাদ্যানাম্ বাচমর্থোঽনুধাবতি॥"

লোকপ্রসিদ্ধ সাধু ব্যক্তিরা সত্যকে অনুবর্তন করিয়া কথা বলেন, কিন্তু আদি ঋষিরা যাহা বলেন, সত্যই তাহার অনুবর্তন করে। অর্থাৎ সাধারণ ভদ্রলোকেরা সাবধানে কথা বলেন যাহাতে মিথ্যা বলিতে না হয়, কিন্তু মহাপুরুষেরা যে ভাবেই কথা বলুন না কেন, তাহা সত্য হইবেই, তাঁহাদের

বাক্য যাহাতে মিথ্যা না হয় সেইজন্য সত্য নিজের গরজে তাঁহার বাক্যের সত্যতা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিবে।

ভবভূতির এই উক্তিটি প্রাচীনপন্থী ধর্মান্ধ কবির গোঁড়ামির কথামাত্র নহে, ইহার মধ্যে একটি কান্ত-ব্যঞ্জনা আছে। যে সমস্ত কবি বা মহাপুরুষের পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তি আছে তাঁহারা এমন একটা অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি পান যে, যাহার জন্য সাধারণ লোকেরা সাধারণ দৃষ্টি দিয়া যাহা ভাবিতে পারে না, তাঁহারা সেই সব জিনিসের সন্ধান পান। এই জন্যই কবি ব্রাউনিং বলিয়াছেন—

"There are few
Whom God whispers in the ear
The rest may reason, and welcome
It's we musicians know"—

এই মহাপুরুষেরাই বাক্‌সিদ্ধ, এইজন্য ইঁহাদের সম্বন্ধে বলা যায়—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি
যা ঘটে তা সব সত্য নহে।"

কবির, রামচন্দ্র, সীতা প্রভৃতি কোনও দিন বাস্তব সত্য ছিলেন কিনা জানি না ; আমাদর মত বাস্তব সত্যের ক্ষুদ্র জন্তরা জন্মিতেছে ও মরিতেছে, কিন্তু তাঁহারা এখনও বাঁচিয়া আছেন এবং যুগ যুগ ধরিয়া ভারত মহাদেশের কোটি কোটি নরনারীর জীবনযাত্রাকে আদর্শের পথে পরিচালিত করিতেছেন। বস্তুতঃ ভারতের বাণীই হইতেছে রামায়ণ ও মহাভারতের বাণী। এই বাণীর সাধক-মহাকবিরা তথাকথিত বাস্তবের অপেক্ষা রাখেন না। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলিও এই তুচ্ছ বাস্তবের দৈনন্দিন তুচ্ছ প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না। শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা এবং শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গবেষণা আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রয়োজন-নিরপেক্ষভাবে কাজ করিয়া যায়, অথচ প্রয়োজনের দিক দিয়াও উভয়েই হইতেছে পরিণাম-রমণীয়, এবং উভয়েই হয়ত ভাত-কাপড় তেল-নুন-লকড়ির চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয়।

মানুষের নৈতিক চিন্তাও ব্যবহারিক এবং কান্ত চিন্তার মতই বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ শক্তিকে মূলধন করিয়া বিবর্তিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মানুষের নৈতিক শাস্ত্র স্বার্থপর গোঁড়া পুরোহিতগণের ছলনায় সৃষ্ট উপর-হইতে চাপানো একটা

বিধিনিষেধের বন্ধন মাত্র নহে। নীতিজ্ঞান মানুষের সমাজ-জীবনের একটা অনিবার্য পরিণতি। কি ভাবে এই পরিণতিটি সম্ভব হয়, তাহা একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে।

আমাদের মধ্যে যে সঞ্চয়ী বৃত্তিটি আছে, তাহার প্রেরণায় হয়ত অপরের জিনিস চুরি করিতে আমার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সমাজ-জীবনে পাঁচজনের সঙ্গে বাস করিয়া এই বৃত্তির প্রেরণায় প্রতিদিন চুরি করিয়া যাওয়া সুবিধার ব্যাপার হইবে না। কারণ আমি একাই যদি চালাক হই এবং অপরের চুরি করি তাহা হইলে মন্দ হয় না, কিন্তু সকলেই যদি এইরূপ চালাক হয় এবং সকলে মিলিয়া আমার সর্বস্ব চুরি করিয়া লয়, তাহা হইলে নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করা দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এইভাবে একদিন যখন আমরা চুরি করার অসুবিধা অনুভব করিয়াছি তখনই ঠেকিয়া শিখিয়া আমাদের নীতিজ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে। নীতিজ্ঞান আমাদের বলে, চুরি করার চেয়ে চুরি না করাই সুবিধার ব্যাপার, অতএব চুরি করিও না। এইভাবেই আমরা শিখিয়াছি মিথ্যার চেয়ে সত্য ভাল, ব্যভিচারের চেয়ে সাধুতা ভাল, উচ্ছৃঙ্খলতার চেয়ে সংযম ভাল। এইভাবেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাই স্বাভাবিক বিবর্তনে আমাদের মধ্যে নীতিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছে। এই নীতিজ্ঞানই আমাদের পশুত্বের মুখে লাগাম পরাইয়া আমাদের অসামাজিক কামনা বাসনাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কাজেই এই নীতি-জ্ঞানটি তুচ্ছ করিবার জিনিস নহে। এইজন্যই আমাদের নিজের সৃষ্ট বন্ধন হইলেও, নীতির বন্ধনকে আমাদের মহাপুরুষেরা সর্ব নির্যাতন সহ্য করিয়াও আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া থাকেন এবং সমাজের বিধিনিষেধের বেদীতে নিজেদের বলি দিয়া থাকেন, "ইউটিলিটি"র বিচারে অথবা ব্যক্তিগত দাবীর যুক্তিতে সমাজ-আদর্শকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেন না। নিজের লালসাকে তৃপ্ত করিবার জন্য যাহারা এই আদর্শের বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য ওকালতি করিয়া "সবার উপরে মানুষ সত্য" (অর্থাৎ বিধিনিষেধ নহে) এই কবি-বাক্যের অপ্রয়োগ করিয়া একটা গালভরা স্লোগান্ তুলিতে থাকে তাহাদের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

চরিত্রের পথে

জাতক একটা জটিল দেহযন্ত্র এবং কতকগুলি সহজাত বৃত্তি লইয়া এই "দৃশ্য গন্ধ গানে" ভরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ধীরে ধীরে জগতের সহিত তাহার কারবার আরম্ভ হয়। জগতের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহার পরিচয় ঘটিতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাহার চরিত্রেরও বিকাশ সুরু হয়।

মানুষের চরিত্র বলিতে আমরা মোটামুটি যাহা বুঝি তাহার স্বরূপ কি? ইহা কি দেহ-নিরপেক্ষ কতকগুলি মানসিক গুণের পুঁটুলি মাত্র? অতীতের মনস্তাত্ত্বিকেরা তাহাই মনে করিতেন। বর্তমান জড়বাদী মনস্তাত্ত্বিকেরা, বিশেষভাবে আচরণবাদীরা আবার মন, আত্মা প্রভৃতি দেহ-নিরপেক্ষ কোনও সূক্ষ্ম জিনিসের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না এবং আমাদের সমস্ত ব্যবহারকেই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াটি কি? ইহাকে বুঝিতে হইলে প্রথমে **সরল প্রতিবর্তক ক্রিয়া** (Simple reflex) কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে। হঠাৎ একটি শব্দ শুনিয়া চমকাইয়া উঠা, হঠাৎ একটা আলোক-রশ্মি দেখিয়া চোখের পাতা মুদিয়া ফেলা, এই জাতীয় জিনিসগুলি হইতেছে সরল প্রবর্তক ক্রিয়া।

যখন এই জাতীয় একটি ক্রিয়া আর একটি ক্রিয়ার সঙ্গে একই সময়ে অথবা ঠিক পর পর ঘটে তখন সেই দুইটির অভিজ্ঞতা একত্রে জড়াইয়া যায়, ফলে ইহাদের একটি অনুষ্ঠিত হইলে আর একটি আপনা আপনিই অনুষ্ঠিত হইবে। প্যাব্‌লভ্‌ সাহেবের কুকুর ও ঘণ্টাধ্বনি-পরীক্ষাটি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার বহুল-প্রচলিত উদাহরণ। কুকুরের সম্মুখে একখণ্ড মাংস ধরা হইল, ইহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহার জিহ্বা হইতে লালা নিঃসরণ। এইবার কুকুরটিকে প্রতিবার মাংসখণ্ড দিবার সময় যদি একটি ঘণ্টাধ্বনি করা হয়, তাহা হইলে এই দুইটি জিনিস তাহার মনের মধ্যে জুড়িয়া যাইবে। পরে শুধু ঘণ্টাধ্বনি করিলেই তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইবে। এক্ষেত্রে মাংস দর্শনের

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া লালা-নিঃসরণ কৃত্রিম উপায়ে সংঘটিত হইল বলিয়া ইহার নাম কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া। প্যাব্‌লভ্‌ বলেন, আমাদের যাহা কিছু শিক্ষা, যাহা কিছু আচরণ, সমস্তই হইতেছে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র।

এইভাবে আচরণবাদী পণ্ডিতগণ আমাদের সমস্ত কাজকর্মকেই আমাদের কর্মেন্দ্রিয়ের একটা যান্ত্রিক আচরণ মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই আচরণটি আবার পুনরাবৃত্তি ও অভ্যাসের দ্বারা আমাদের চরিত্রের একটা স্থায়ী বিশেষত্ব রূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে।

যে জিনিসটি লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি তাহা হইতেছে প্রবৃত্তি বা বৃত্তি। পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস না করিলেও, এই বৃত্তিগুলিকে আমরা জাতির অতীত জীবনের অভ্যাসের সহজাত ফল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সুতরাং এইভাবে বিচার করিলে বৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নাই। দুইটিই যান্ত্রিক ব্যাপার—প্রথমটি হইতেছে সহজাত এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অর্জিত।

জড়বাদী পণ্ডিতেরা এই অভ্যাস জিনিসটারও একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, একই ধরণের অবস্থায় একই ধরণের কাজের পুনরাবৃত্তিই হইতেছে অভ্যাস। তাঁহাদের মতে, যখন আমরা একটি বিশিষ্ট কাজ করি, তখন আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের উপর একটা বিশিষ্ট রকম ছাপ পড়িয়া যায়। দ্বিতীয় বারে সেই কাজ করিবার সময় সেই ছাপটির উপর আবার একটা আঁচড় পড়িয়া দাগা বুলাইবার মত কাজ হয়, ক্রমশঃ যেন সেই আঁচড়ের ছাপটি দাগা বুলাইবার ফলে গভীর খাত কাটিয়া ফেলে। অভ্যাসের দ্বারা একটি কাজ যে সহজসাধ্য হইয়া উঠে, তাহার কারণ হইতেছে দাগা বুলান খাঁজ-কাটা পথে স্নায়ুপ্রবাহের গমন-সৌকর্যের জন্য।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, একই কাজ একই ভাবে আবৃত্তি করিবার প্রেরণা আসে কোথা হইতে? এ প্রেরণা আসে দক্ষতা অর্জন এবং তাহার ফলে আত্মবিস্তারের প্রবৃত্তি হইতে। একটি কাজ প্রথমবার করিলাম, ভাল হইল না, আবার করিলাম, একটু ভাল হইল, আবার করিলাম, এবারে ঠিক হইল। এই যে কৃতকার্যতার আনন্দ, এই যে আত্মবিস্তারের আনন্দ, এই যে

নিজেকে "বা রে আমি" বলিয়া বাহাদুরী লাভের আনন্দ, এই আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের মধ্যে পুনরাবৃত্তির প্রেরণা জাগায়।

আমরা জানি আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের মনে কতকগুলি ছাপ (engram) রাখিয়া যায়। এই ছাপগুলি অনেক সময় আবার পরস্পর মিলিত হইয়া বৃহত্তর একক বা ছাপজট (engram complex) সৃষ্টি করে। এইভাবে অতীতের অভিজ্ঞতার স্মৃতিগুলি ভবিষ্যতের কর্মপ্রয়াসকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং অতীতের অভিজ্ঞতার কষ লাগিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসগুলির প্রাথমিক সঙ্কেত (primary meaning) নূতন ব্যঞ্জনা (secondary meaning) লাভ করে। দীপ-শিখা যখন শিশু প্রথম দেখিল, তখন সে ইহাকে একটি উজ্জ্বল সুন্দর খেলিবার জিনিস বলিয়াই হয়ত ভাবিল। কিন্তু ইহাকে লইয়া খেলা করিতে যাইয়া যখন তাহার হাত পুড়িল, তখন দীপ-শিখা সম্বন্ধে সে নূতন ব্যঞ্জনার সঙ্কেত পাইল, ফলে দীপ-শিখাটি এখন আর তাহার নিকট খেলার বস্তুই নহে—ভয়ের বস্তুও বটে। এই ভাবেই অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদের আচরণকে ক্রমশঃ বাঁধাবাঁধি করিয়া দিতে থাকে। ইহার ফলে কতকগুলি অভ্যাস পরিপক্ক হইয়া, কতকগুলি "ভাল-লাগা" "মন্দ-লাগা" এক হইয়া আমাদের মনে আর একটি বৃহত্তর একক-এর সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার নাম দিয়াছেন sentiment. বাংলার কোন কোনও লেখক "সংস্কার" কথাটি এই sentiment-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ঠিক প্রতিশব্দ হয়ত বাংলায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় ইহাকে 'রস' বলা হইয়াছে। রসবোধ, স্বভাব, সংস্কার, ভাব-নিষ্ঠা প্রভৃতি নানা শব্দ দিয়াই আমরা হাল্কাভাবে এই কথাটিকে প্রকাশ করিয়া থাকি। পরিভাষা যাহাই হউক, এই sentiment-এর ফলে আমাদের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা, উৎসাহ-আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্ম-প্রেরণা প্রভৃতি একটি বিশিষ্ট ধারায় চলিতে থাকে। গান-বাজনা লইয়া যাহার sentiment তৈয়ারী হইয়াছে, সে অন্যান্য বিষয়ে হয়ত উদাসীন ; ছেলেপুলে পড়াশুনা করিতেছে না, সে দিকে হয়ত তাহার খেয়াল নাই, রুগ্না স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য হয়ত খেয়াল নাই, নিজের খাওয়া-দাওয়া

ভাল হইতেছে না, সে বিষয়েও হয়ত তাহার খেয়াল নাই, কিন্তু গানের খুঁত সে সহ্য করিতে পারে না; যে ব্যক্তি গান ভাল গাহিতে পারে তাহাকে সে ভালবাসে, যে তাহার চেয়ে গানে বেশী ওস্তাদ, তাহাকে সে শ্রদ্ধা করে, যে তালে ভুল করে তাহার মাথায় তানপুরা আছাড় মারিয়া আঘাত করিতে চায়, যে সুর চিনিতে পারে না, সে অন্য বিষয়ে যত বড় বুদ্ধিমান হউক না কেন, তাহাকে সে নির্বোধ বলিয়াই মনে করে। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরীতে দেখা যায়, বিদূষককে যখন বসন্ত-বর্ণনা করিতে বলা হইল, তখন সে বসন্তের সাদা ফুলগুলিকে একবার কলমা ধানের ভাতের সঙ্গে, আর একবার মহিষের দুধের সঙ্গে তুলনা করিল। তাহার এইরূপ উপমা সংগ্রহের কারণ হইতেছে, সে ছিল ভোজন-রসিক, ভোজন সম্বন্ধেই তাহার sentiment তৈয়ারী হইয়াছে। কাজেই সব জিনিসকে সে ভোজনের উপকরণ দিয়াই বুঝিতে ও বুঝাইতে চায়। এই জাতীয় লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় 'কেমন সিনেমা দেখলে?' সে হয়ত তাহাতে উত্তর দিবে "অখাদ্য"। একটি গোলগাল সৌম্যদর্শন ছেলেকে দেখাইয়া যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "ছেলেটিকে কেমন দেখতে লাগে?" সে হয়ত উত্তর করিবে "বেশ আলুভাতের মত।"

এখন ইহা বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় না যে, ঐ গায়কটি জন্ম হইতেই গায়ক ছিল না এবং বিদূষকটি জন্ম হইতেই ভোজন-রসিক ছিল না। তবে জগতের সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভিজ্ঞতাগুলি তাহার আগ্রহ ও আবেগকে যে বিশেষ বিশেষ খাতে পরিচালিত করিতে থাকে, তাহার ক্রিয়াকলাপগুলি একটি বিশেষ রকম ভঙ্গী লাভ করিতে থাকে। তাহার ফলে ক্রমশঃ সে একটি বিশিষ্ট জিনিসকে ভালবাসিতে অথবা বিশিষ্ট জিনিসকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, একটি বিশিষ্ট পরিবেশে তাহার অভিনিবেশ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকে, একটি বিশিষ্ট প্রেরণার একটি বিশিষ্ট ভাবেই তাহার প্রতিক্রিয়া রূপ নিতে থাকে। এই ভাবেই বিশেষ বিশেষ ভাবে তাহার sentiment তৈয়ারী হইতে থাকে। এই sentimentএর ফলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সকাল বেলা খবরের কাগজ প্রথম খুলিয়াই একজন যুবক হয়ত সিনেমার খবরটা প্রথম দেখিবে, আর একজন হয়ত খেলার খবরটিতে আগে চোখ

বুলাইয়া লইবে, একজন হয়ত সম্পাদকীয় স্তম্ভটি পড়িতে আরম্ভ করিবে, আর একজন হয়ত আদালতের কাহিনীতে মনোনিবেশ করিবে।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে সংযোগ-প্রয়াস (cohesion) বলে, তাহার ফলেই এক অভিজ্ঞতার ছাপ আর একটি অভিজ্ঞতার ছাপের সহিত জড়াইয়া যায়, যাহার জন্ম এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ছাপজটগুলি দানা বাঁধিতে-বাঁধিতে বৃহত্তর এককের সৃষ্টি করে এবং আমাদের এক-একটা বিষয়ে রস বা সংস্কার (sentiment) সৃষ্টি হয়। কিন্তু সংযোগ-প্রয়াসের কাজ এখানেই শেষ হয় না। বিভিন্ন ছাপজট যেমন একত্র হইয়া রসকে সৃষ্টি করে, সেইরূপ বিভিন্ন রস আবার একত্র হইয়া আর একটি বৃহত্তর এককের সৃষ্টি করে। এইভাবে মানুষের মনোরাজ্যে বহু লইয়া একের এবং একের মধ্যে বহুর লীলা চলিতে থাকে। যাহাকে দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব (double personality) বলে, সেই রকম অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বাদ দিলেও আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই মনোরাজ্যে এই বহু এককের সংঘাত সাধারণতঃ হয় না; ফলে একই লোকের একাধিক বিষয়ে রস থাকিতে পারে, অথবা এক জাতীয় রসবিশিষ্ট লোক অন্য জাতীয় রসবিশিষ্ট লোককে ভালবাসিতেও পারে। যাহার গান সম্বন্ধে রস গড়িয়া উঠিয়াছে, সে গায়ককে শ্রদ্ধা করিবে আর সুরজ্ঞানবিহীন লোককে ঘৃণা করিবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, একজন গায়ক হয়ত একজন সুরজ্ঞানহীন গণিতজ্ঞকে শ্রদ্ধা করে, একজন কাঠখোট্টা গণিতজ্ঞ হয়ত একজন কবিকে ভালবাসে ইত্যাদি। ইহার কারণ হইতেছে, রসের বিভিন্ন এককগুলি একটি বৃহত্তর এককের অংশীভূত হইয়া কাজ করে বলিয়াই তাহাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না। এই বৃহত্তর একককে অধিরাজ রস (master sentiment) বলা যাইতে পারে।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, এই অধিরাজ রসটি কি? কি করিয়াই বা তাহার সৃষ্টি হয়? মানুষের মধ্যে যে অস্মিতাবোধ আছে তাহাই বিভিন্ন রসকে একত্র গ্রথিত করিয়া তাহাদিগকে একটি বৃহৎ এককের মধ্যে অঙ্গীভূত করে।

কিন্তু প্রশ্নের সমাধান এখনও হইল না। এই আমিত্ববোধটিই বা জাগ্রত

হয় কি করিয়া? এই আমিত্বই বা কি বস্তু? ইহা কি আমাদের অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র? অথবা অভিজ্ঞতাগুলির অনুভবকারী একটি কর্তৃপুরুষ? অথবা একটি দুর্জ্ঞেয় অব্যক্ত অচিন্তনীয় আত্মার সত্তা মাত্র? এই ব্যাপারটি লইয়া মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে বহু বিতণ্ডা আছে। তবে শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায় সে বিতণ্ডার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি, ইচ্ছা করা, সিদ্ধান্ত করা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি একটি কর্তৃপুরুষের কর্তৃত্ব ছাড়া হইতে পারে না। তাহা হইলে "আমি" জিনিসটি কি অভিজ্ঞতার অনুভবকারী ব্যক্তি মাত্র? কিন্তু এই ব্যক্তিটি কি করিয়া বুঝিতে পারে যে, সে সেই অভিজ্ঞতাকে অনুভব করিতেছে! শিশু বা ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই আমিত্ববোধটি নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট নয়। তাহারা যখন দুঃখ পায়, তখন তাহাদের সমস্ত সত্তাটিই দুঃখময় হইয়া পড়ে, সুখের সময়ও তাই।

অশিক্ষিত বা অর্ধসভ্য মানুষদের মধ্যেও এই 'আমিত্ব'বোধটি সব সময় সুস্পষ্ট নহে। একজন সাঁওতালীর নাম হয়ত সুকদেও। তাহাকে হয়ত জিজ্ঞাসা করা হইল, 'তুমি এ কাজ' করেছ? সে তখন হয়ত উত্তরে বলিবে "না সুকদেও এটা করে নি।" "আমি হয়ত এ কাজ করিনি" এইভাবে উত্তম-পুরুষে কথা কহিবার অভ্যাস তাহার তৈয়ারী হয় নাই; কারণ "আমি" জ্ঞানটাই তাহার দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

তাহা হইলে এই "আমি" জ্ঞানটি ফুটিয়া উঠে কি করিয়া? এই বিষয়ে দেহের দান অনেকখানি। এই দেহ দিয়াই শিশু অনুভব করে তাহার সুখ-দুঃখ, এই দেহ দিয়াই সে কাজ-কর্ম করে, এই দেহের হস্তপদাদি যন্ত্রগুলি তাহার কথা শুনে এবং তাহার হুকুম তামিল করে। কিন্তু দেহের বাহিরের জিনিসগুলি এভাবে তাহার হুকুম তামিল করে না। তখন সে ভাবে যাহারা হুকুম তামিল করিল না, তাহারা হয়ত রাগ বা অভিমান করিয়াছে। তখন সে হয়ত তাহাকে তোষামোদ করে, তাহাতেও যখন কাজ হয় না, সে আড়ি দেয়, অথবা দুঃখের অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝে এই জড় বস্তুগুলি তাহার হুকুম বুঝিতে পারে না। জড় জিনিসকে জড় বলিয়া অনুভব করিতেও তাহার যথেষ্ট সময় লাগে; তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন শিশু হাঁটিতে হাঁটিতে

পড়িয়া গিয়া আছাড় খায়, তখন সে মনে করে, উঠানটিই তাহাকে ফেলিয়া দিল। তখন কেহ যদি উঠানকে মারে বা তিরস্কার করে, তখন সে খুশী হয়।

জড় বস্তুর নিষ্ক্রিয়তা এবং দেহযন্ত্রের সক্রিয়তা—এই দুইটি জিনিসের পার্থক্যের মধ্য দিয়া শিশুর কর্তৃত্বজ্ঞান বিকশিত হইতে থাকে এবং তাহা হইতেই তাহার "আমি" বোধটি বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইহার পূর্ণ বিকাশের জন্য একটা সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়। এই সমাজের মধ্যেই সে দেখে কতকগুলি সক্রিয় সত্তার অস্তিত্ব রহিয়াছে, যাহারা ঘোরা-ফেরা করে, হাসে-কাঁদে, কথাবার্তা বলে, কেহ হয়ত তাহার সহিত বন্ধুতা করে, কেহবা শত্রুতাও করে। ইহাদের সহিত তুলনা করিয়াই সে বুঝিতে পারে যে, ইহারাও এক-একটা 'আমি' এবং সেও একটা 'আমি'। এই সামাজিক পরিবেশ তাহার 'আমি'টিকে বিকশিত করিবার জন্য অন্য ভাবেও সাহায্য করে। সমাজ-মধ্যস্থ বিভিন্ন লোকের ক্রিয়াকলাপের সে অনুকরণ করে, অপরের চরিত্রের ভূমিকা নিজে অভিনয় করিতে চেষ্টা করে। যাহাদের সে বেশী খাতির করে বা ভালবাসে, তাহাদের ভূমিকাটির অভিনয়ই সে বিশেষভাবে করে। এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই সে বিভিন্ন লোকের আকার-ইঙ্গিত, ঘৃণা-বিদ্বেষ-প্রেমজনিত মুখাবয়বের বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষ্য করে এবং আশেপাশের লোকের ব্যবহারের দ্বারা তাহার নিজের কাজ-কর্মের মূল্যও নিরূপণ করিতে শিখে।

এইভাবে অপরের স্তুতি-নিন্দাকে সে একটা বিশেষ রকম মূল্য দেয় বলিয়াই অপরের আচরণ তাহার প্রতি অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। তাহাকে যদি প্রতিনিয়তই বলা হয়, সে ভারী দুষ্ট ছেলে ; তাহা হইলে সে বুঝিয়া লইবে যে, দুষ্টামিটি তাহার চরিত্রের একটা অখণ্ডনীয় বিশেষত্ব। আবার যদি তাহাকে প্রতিনিয়ত প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে মহামানী দুর্যোধন হইয়া উঠিয়া আত্মম্ভরি স্বার্থপরতা লইয়া ভাবিতে শিখিবে দুনিয়ার আদর যত্নের একচেটিয়া অধিকার শুধু তাহারই আছে।

শিশু সমাজ-পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আচরণগুলিকে দেখে এবং তাহাদের কোনটির সহিতবা একাত্মতা অনুভব করে এবং

কোনটির সহিত তাহা করে না। এই ভাবে তাহার নিজের **"আমি"**টি যে কি জিনিস তাহা সে বুঝিতে আরম্ভ করে। ভদ্রপরিবারের একটি শিশু হয়ত পথচারী একজনের মাত্‌লামী লক্ষ্য করিল এবং তাহাতে কৌতুকও বোধ করিল। কিন্তু ইতোমধ্যেই সে ঠিক করিয়া লইয়াছে, তাহার "আমি"টির সহিত এই মাতালের মাত্‌লামির একাত্মতা নাই, সুতরাং অনুকরণীয় নহে।

এই 'আমি'টি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইতে হইতেই তাহার **নীতিবোধ** জাগিতে আরম্ভ করে। এই নীতিবোধের জন্য মানুষ একটি কাজকে ঘৃণা করিতে শিখে, অন্য কাজকে শ্রদ্ধা করিতে শিখে এবং এজন্যই সে বুঝিতে পারে যে, এই কাজটা করা উচিত এবং এই কাজটা করা উচিত নয়; অবশ্য করা-না-করা স্বতন্ত্র কথা। যে সমাজ-পরিবেশ শিশুর 'আমিত্ববোধ'টাকে জাগাইয়া তুলে, তাহাই তাঁহার নীতিবোধ সৃষ্টি করে। এইজন্যই নীতি-বোধের কোনও সার্বজনীন আদর্শ নাই। সমাজ-পরিবেশের বিভিন্ন নরনারীর মধ্যে যাহাদের সে ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে, তাহাদের আচরণ দেখিয়াই শিশু তাহার নীতি ও আদর্শ ঠিক করিয়া লয়। সে হয়ত একজন সত্যবাদী ব্যক্তিকে ভালবাসে। পরে সে এই লোকটির গুণটাকে অর্থাৎ সত্যবাদিতাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে এবং এইভাবে ক্রমশঃ ব্যক্তিনিরপেক্ষ গুণ-দোষগুলি তাহার আদর্শকে গঠন দেয়। এই আদর্শের যেমন একটা ব্যক্তিগত দিক আছে, তেমনি গোষ্ঠীগত এবং জাতিগত রূপও আছে। এই জন্য জাতি হিসাবে কেহ সাহসী, কেহ হয়ত প্রভুভক্ত, কেহ লোভী, কেহবা নিরীহ ও ভদ্র।

শিশুর নাতিবোধের উপর পরিবেশের একটা প্রভাব আছে বলিয়াই তাহাকে মানুষ করিতে হইলে তাহার আশেপাশে একটা শুচিশুভ্র আদর্শ সমাজ-পরিবেশের প্রয়োজন। যে সমাজে চুরি, জুয়াচুরি, কালোবাজার, মিথ্যাচার প্রভৃতি অবাধে পরিভ্রমণ করিতেছে, সে সমাজে ভাল ছেলে তৈয়ারী হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। বর্তমান সময়ে যে ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতি-পরায়ণতা, উচ্ছৃংখলতা প্রভৃতি দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য আমাদের বর্তমান সমাজ-পরিবেশ অনেকটা দায়ী। পূর্বকালে ছাত্রদের মানুষ করিবার জন্য যে তপোবনে গুরুগৃহে আদর্শচরিত্রের অধ্যাপকদের সহিত অবস্থানের ব্যবস্থা

ছিল এবং বর্তমানকালে যে শহরের কোলাহল ও কপটাচার হইতে দূরে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় (Residential university) প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, ইহা এক হিসাবে বাঞ্ছনীয়। এই ব্যবস্থার ও বিশুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে সমাজ-ব্যাধির বীজের সংক্রমণ হইতে বালকেরা খানিকটা রক্ষা পায়। এইভাবে সুরক্ষিত হইয়া অহঃরহ আদর্শ মানুষের কাছাকাছি থাকিয়া তাহাদের রস বা সংস্কারগুলি (sentiments) ক্রমশঃ দানা বাঁধিয়া তাহার চরিত্রকে এমন একটা দৃঢ়তা ও পূর্ণতা দান করে যে, পড়াশুনা শেষ করিয়া যখন সে সমাজে প্রত্যাবর্তন করে, তখন আর তাহার ভয় থাকে না; তখন তাহার ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে—তাহার চরিত্র গঠিত হইয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে অতীতের তপোবনের গুরুগৃহে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমানের আবাসিক বিদ্যালয় প্রভৃতির একটা পার্থক্যের কথা বিচার করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্তমান কালের আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস প্রভৃতিতে একটা বিলাসিতার প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয়। এই বিলাসের প্রতিযোগিতা করিতে করিতে ছাত্ররা ক্রমশঃ স্বার্থপর, ভোগপরায়ণ ও আত্মাভিমানী হইয়া উঠে। যে-সব ছেলেরা গৃহস্থের বাড়িতে অনেক ভাইবোনের সঙ্গে, বহু পরিজনের সঙ্গে মানুষ হয়, তাহারা যেমন দরিদ্রের সংসারে মানাইয়া চলিতে পারে, পরের জন্য খানিকটা ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতে পারে, ইহারা সেরূপ পারে না। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ধর্ম-সংঘ ও মঠ প্রভৃতি পরিচালিত অনেক ছাত্রাবাস, বিশেষভাবে ছাত্রী-আবাস প্রভৃতিতে পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা বাধ্যতামূলক সংযমের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু ইহাতেও রোগের প্রতিকার হয় না। কারণ সংযম জিনিসটা উপর হইতে জোর করিয়া চাপাইলে অতৃপ্ত কামনাজনিত গূঢ়ৈষা বা complex-এর সৃষ্টি হয়, অথবা গীতায় যাহাকে বলা হইয়াছে—"কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য যঃ আস্তে মনসা স্মরণ"—সেই জাতীয় ভণ্ডদলের সৃষ্টি হয়। তবে নীতিবোধ জাগাইবার উপায় কি?

শিশুর চরিত্র-গঠনে পরিবেশের প্রভাবের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিবেশের এই অনতিক্রম্য প্রভাব আছে বলিয়াই সুস্থ ও সবল চরিত্র গঠন করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজন হইতেছে জাতীয় সমাজ-জীবন

হইতে আদর্শচরিত্রের সন্ধান করিয়া, সেই সমস্ত আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং নিজের 'আমি'টির সহিত সেই আদর্শের একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত করা। ছাত্রদের বাল্য ও কৈশোর যুগে তাহাদের চোখের সমুখে ভাল আদর্শ না থাকিলে তাহারা সিনেমার তারকা, খেলার মাঠের জনপ্রিয় খেলোয়াড় প্রভৃতি সুলভ আদর্শকেই বাছিয়া লইয়া তাহাদের বিচিত্র সম্ভাবনাকে নষ্ট করিবে।

যাহাকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় personality, অস্মিতা বা **চরিত্র** বলে, তাহা সৃষ্টি করাই হইতেছে শিক্ষার চরমতম উদ্দেশ্য। এই চরিত্রটি কি জিনিস? চরিত্র হইতেছে কাজে-কর্মে, আদর্শে, নীতিবোধে 'আমি' সম্বন্ধে একটা সংহত ধারণার সৃষ্টি। এই সংহত আমিত্ববোধটি সৃষ্টি হইলে, মানুষ কোন্‌টি গ্রাহ্য আর কোন্‌টি ত্যাজ্য তাহা ঠিক করিতে পারে। বিশিষ্ট সংস্কার (sentiment) ও আদর্শের সহিত নিজের 'আমি'র অচ্ছেদ্য একাত্মতা স্থাপন করাই হইতেছে চরিত্রের লক্ষণ। যাহার চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সংস্কারগুলি একটি নির্দিষ্ট স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুর্বল চরিত্রের লোকের মধ্যে এই জিনিসটি দৃষ্ট হয় না। তাই সে কর্ণধারহীন তরণীর মত ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া চলে, ফলে তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না যে, লোকটি লোভের ক্ষেত্রে সংযত হইয়া চলিতে পারিবে কিনা, চুরি করিবে কিনা ইত্যাদি।

অবশ্য এই চরিত্রের সবটুকুই মানসিক অনুশীলনের ফল নহে। ইহার মধ্যে মন ছাড়া একটা দেহের লীলাও আছে এবং কে যে কিরূপ চরিত্রের লোক হইবে, তাহার শরীর ও স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুসারে তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা ঠিক হইয়া যায়। মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষের শরীরের মধ্যে চার জাতীয় রস (humours) ক্ষরিত হয় এবং তাহার প্রভাবেই মানুষ ক্রোধশীল (choleric), জড় প্রকৃতির (phlegmatic), বিষাদশীল (melancholic) এবং আশাবাদী (sanguine) প্রকৃতির হয়। বর্তমান শরীরতত্ত্বও এই জাতীয় মতবাদে খানিকটা বিশ্বাস করে। এ কথা বর্তমানে অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শরীরের মধ্যে পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া, পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া প্রভৃতি আমাদের মনোরাজ্যের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে এবং এই সমস্ত জিনিস আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক

হইয়া যায়। ইহা ছাড়া থাইরয়েড (thyroid), এ্যাড্রিনাল (Adrenal), পিটুইটারি (pituitury) প্রভৃতি অচ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলির (ductless glands) কার্যও আমাদের চরিত্রকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। থাইরয়েডের কার্য ঠিকমত না হইলে শিশু জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়, আবার ইহা বেশী ভাবে ক্রিয়াশীল হইলে সে অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাববিশিষ্ট হইয়া পড়ে, পিটুইটারি গ্রন্থির কাজ ভাল না হইলে শিশু অকর্মণ্য, মোটা ও কাঁদুনে ইত্যাদি হয়। সুতরাং দেহতত্ত্বের বিচারে মনে হয় আমাদের জন্ম হইতেই আমাদের চরিত্র আমাদের পিতৃপুরুষাগত দেহযন্ত্রের বিশেষত্বের উপরই অনেকটা নির্ভর করে।

তাহা হইলে কি এই কথাই বুঝিতে হইবে যে, জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত দেহগত বিশেষত্ব লইয়া জগতে আসিয়াছি, তাহাই অপরিবর্তনীয় এবং অপ্রতিবিধেয় ভাবেই আমাদের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবে? দেহবাদীরা বলেন, "হাঁ, প্রায় তাই, তবে উপযুক্ত ঔষধ, চিকিৎসা ও খাদ্য-ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলিকে খানিকটা পরিবর্তন করিতে পারি।"

যে সমস্ত পণ্ডিতগণ নিছক দেহবাদে বিশ্বাস করেন না এবং দেহাতিরিক্ত ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বে যাঁহারা আস্থাবান তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষই অনুশীলনের দ্বারা উচ্চ কোটির চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারে। এই অনুশীলনটুকু না থাকিলেই জাতক তাহার জন্মগত বৈশিষ্ট্যের পথেই চলিতে থাকিবে; কিন্তু যথাযথ অনুশীলন থাকিলে সে জন্মগত তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ মহৎ ও চরিত্রবান হইয়া উঠিতে পারে। মনস্তত্ত্বের পুস্তক না হইলেও, ভগবদ্গীতাতেও এই কথা বলা হইয়াছে। অর্জুন যখন মনের সংযমকে "বায়োরিব সুদুষ্করম্" বলিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, মন যে দুর্নিগ্রহ এবং চঞ্চল তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে "অভ্যাসেন হি কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।"৩৫।৬

ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) প্ররোচনাকে অগ্রাহ্য করিয়া, পিতৃপুরুষাগত দেহযন্ত্রের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া, কোনও কোনও মানুষ যে চরিত্রবান্ হইয়া উঠে, তাহা কি করিয়া সম্ভব হয়? নীতিশাস্ত্র এবং মনস্তত্ত্বের আলোচনায় এই প্রশ্নটি হইতেছে একটি জটিলতম প্রশ্ন। প্রকৃতিপরিপুষ্ট সহজাত প্রবৃত্তিগুলি শক্তিশালিনী, কিন্তু শক্তিমত্তর কে?

নীতিবোধ না প্রবৃত্তি? সহজাত প্রবৃত্তি যখন আমাদের কোনও কোনও কার্যে প্ররোচিত করে, তখন নাতিবোধের ক্ষীণ প্রতিবাদ তো প্রায়ই ভাসিয়া যায়। তাহা হইলে কোন কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি যে মাঝে মাঝে নীতির পথে চলিতে সমর্থ হয়, তাহা কি করিয়া সম্ভবপর? জেম্‌স্ (W. James) ইহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, নিছক নীতিবোধ প্রবৃত্তি হইতে দুর্বলতর। কিন্তু, নিছক নীতিবোধ+E প্রবৃত্তি হইতে প্রবলতর।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই E-টি কি জিনিস? ইহা কি দেহাতিরিক্ত ইচ্ছাশক্তি, না অন্য কিছু? কিন্তু "বাইওলজি" (যাহার সহিত বর্তমান মনস্তত্ত্ব অনেকখানি সম্পর্কিত) এই দেহাতিরিক্ত ইচ্ছাশক্তিকে মানিতে চাহে না। তাহা হইলে ইহাকে বুঝিব কিরূপে? ইহাকে বুঝিতে হইলে ম্যাক্‌ড্যুগল্ সাহেবের রস বা সংস্কার (Sentiment) প্রভৃতির ব্যাখ্যাটি অনেকখানি কার্যকরী হইবে। যে সমস্ত সংস্কার লইয়া আমার আমিত্ববোধটি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই আমিত্ববোধটিই সক্রিয় হইয়া আমাদের এমন একটি শক্তি দান করে যে, তাহার বলে আমরা সহজাত প্রবৃত্তিগুলির অনীতিমূলক দাবীকে দাবাইয়া নীতির পথে চলিতে সমর্থ হই। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, যাহাকে ইচ্ছাশক্তি বলা হইতেছে তাহা আমিত্ববোধ জিনিসটির সক্রিয় অভিব্যক্তি মাত্র। ইহা আমাদের প্রবৃত্তি, আবেগ, সংস্কার, আমিত্ববোধ প্রভৃতির ক্রমিক পরিণতির পরিপক্ক সুসম্পূর্ণ ফল মাত্র। মনের অন্তর্দ্বন্দ্ববিহীন সুসংহত চরিত্রের ক্রিয়মান অবস্থাটিই হইতেছে তথাকথিত ইচ্ছাশক্তি। আমার "আমি" বলিতে যতখানি বুঝায়, তাহাই আমার ইচ্ছাশক্তি হইয়া আমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে। একজন সাহিত্যরসিক হয়ত নূতন সিনেমার ছবি আসিলে তাহা দেখিতে যান না, কিন্তু একটা সাহিত্য সভা থাকিলে রৌদ্র-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়াও সেখানে যান। তাঁহার Sentimentটি সাহিত্য-রসকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য সিনেমা দেখার লোভ সংবরণ করিবার মত ইচ্ছাশক্তি তাঁহার পক্ষে যতটা সহজ, অপরের পক্ষে ততটা নহে। এইরূপ ধর্মের আচারগত Sentiment বা ভাবনিষ্ঠার জন্য মুসলমানগণ দিনের পর দিন 'রোজার' উপবাস করিবার মত মনের জোর

পাইয়া থাকেন, গাজনের সময় হিন্দু সন্ন্যাসীরাও একমাস ধরিয়া উপবাস করেন। অন্য সময় হয়ত এই মনের জোরের প্রয়োগ তাঁহারা করিতে পারেন না। সংস্কারের নিষ্ঠা যাহার যত দৃঢ় ও সুসংহত, তাহার ইচ্ছাশক্তিও ততই দৃঢ় হইবে। এইজন্যই যাহাদের নিষ্ঠা নাই, যাহারা লঘুচিত্ত, যাহাদের সংস্কার কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাদের কোন বিষয়েই মনের জোর থাকে না। তাহারা কোনও বিষয়েই মন স্থির করিয়া চলিতে পারে না বলিয়া তাহারা "লাগে তুক না লাগে তাক্" এইভাবে একবার ফিল্ম ষ্টার, একবার ব্যবসাদার, একবার কেরানী প্রভৃতি নানা পথে ভাসিয়া বেড়ায় এবং হয়ত কোন কার্যেই কৃতকার্য হইতে পারে না। এই জাতীয় লোকেরা তাহাদের নিজেদের "আমি"টির ঠিক পরিচয় পর্যন্ত জানে না। ভাবনিষ্ঠা না থাকার জন্য কোনও সংস্কারই তাহাদের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, ফলে কোনও বিষয়েই তাহাদের মনের জোর নাই।

সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, দৃঢ়চেতা বলিয়া যাঁহাদের সুখ্যাতি করা হয়, তাঁহাদের রস আদর্শের সহিত একমুখী হইয়া আমিত্ববোধের সহিত সংহত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের 'আমিত্ব'বোধটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং আত্মসম্মান বোধটি সুতীব্র। সেইজন্য ছোট কাজের সহিত অথবা আদর্শভ্রষ্টতার সহিত তাঁহারা নিজের 'আমি'কে বিজড়িত হইতে দেন না।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, চরিত্র প্রভৃতির আলোচনার জন্য অতীন্দ্রিয় বিষয় বস্তুর অবতারণার প্রয়োজন নাই। মানুষ যে আদিম প্রবৃত্তিগুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকেই মূলধন করিয়া মানুষ তাহার জীবনের জটিল যাত্রাপথে চলিতে চলিতে স্বাভাবিক পরিণতির বশেই সংস্কার, আমিত্ববোধ, নীতিবোধ, চরিত্র প্রভৃতিকে অর্জন করিয়াছে। তবে এই স্বাভাবিক পরিণতিটি নানা কারণেই খানিকটা অনিশ্চিত। উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টির দ্বারা, উপযুক্ত চিকিৎসা প্রভৃতি দ্বারা, উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারিক প্রণালীর দ্বারা এই স্বাভাবিক পরিণতিটিকে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা ছেলেদের চরিত্র যে ভাবে গড়িয়া তুলিতে চাই, তাহার অনেকখানিই সম্ভবপর হইতে পারে।

শিক্ষার তত্ত্ব-কথা

অতীতের মনস্তত্ত্বে শিক্ষার তত্ত্ব-কথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা হইত না। উড্‌ওয়ার্থ দেখাইয়াছেন, জেমস্-এর বিরাট পুস্তকের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও পরিচ্ছেদই নাই, এমন কি ঐ পুস্তকে বিষয়-নির্ঘণ্টের মধ্যে 'শিক্ষা' শব্দটির পর্যন্ত উল্লেখ নাই।

কিন্তু বর্তমান মনোবিদ্‌গণের গ্রন্থে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা দৃষ্ট হয়। শুধু তাহাই নহে, ইতোমধ্যেই শিক্ষার তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হইয়া ব্যাপারটা বেশ একটা তর্কের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শিক্ষার মূল তত্ত্বটি হইতেছে বন্ধনীর সৃষ্টি (bond formation)। কি সম্বন্ধে বন্ধনী ? এই প্রশ্ন লইয়াও মতানৈক্য আছে। কেহ বলেন, এই বন্ধনীটি হইতেছে সাইন্যাপ্স (synapse)-এর বাধা ভাঙ্গিয়া অভ্যাসজাত স্নায়ুপথ সৃষ্টির বন্ধনী; আবার কেহ বলেন, এই বন্ধনী হইতেছে ভাবগত অনুষঙ্গের বন্ধনী। চেষ্টিতবাদী (behaviorist)-গণ বলেন, শিক্ষার মূল কথাটি হইতেছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজাত কৃত্রিম-প্রতিক্রিয়া, আবার গেস্‌টাল্ট্‌ সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ বলেন, "সমগ্রের" অভিজ্ঞতাপ্রসূত "অন্তর্দৃষ্টি"র প্রভাবে নূতন নূতন সংস্থান ও সমস্যার সমাধানের মধ্যেই আছে শিক্ষার আদি রহস্য। থর্ণডাইক বলেন, চেষ্টা, ভ্রান্তি ও সফল চেষ্টার মধ্যেই আছে মূল কথা, আবার গেট্‌স্ (A. I. Gates) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, সমস্ত শিক্ষার মূলে আছে প্রতিক্রিয়া। তাঁহারা বলেন, আমরা প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই সমস্ত শিক্ষা অর্জন করি (we learn by reacting)। শিক্ষা জিনিসটা অলস নিষ্ক্রিয় পাত্রের ঘাড়ে আসিয়া-পড়া অভিজ্ঞতার সঞ্চয়মাত্র নহে, ইহা একটা সক্রিয় প্রতিক্রিয়া, যাহা অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির দ্বারা ক্রমশঃ দৃঢ়তর নিপুণতর হইয়া উঠে।

প্রাচীন মনোবিদ্যায় শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা নাই বটে, তবে স্মৃতি সম্বন্ধে আলোচনাকেই শিক্ষা-তত্ত্বের সূত্রপাত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

আরিষ্টটল্ তাঁহার 'স্মৃতি' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, একটি জিনিস যদি অন্য

একটি জিনিসকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ দুইটি জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য (similarity), বৈসাদৃশ্য (contrast) অথবা নৈকট্য (contiguity)-গত একটা সম্পর্ক আছে।

পরবর্তী যুগে বৃটিশ অনুষঙ্গবাদিগণ এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে খানিকটা স্বীকার করিয়া লইয়া বিশেষভাবে নৈকট্যকেই তাঁহাদের অনুষঙ্গের মূল কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। একটি ঘটনা যদি অন্য একটি ঘটনার কাছাকাছি ঘটে, তাহা হইলে ঐ দুইটি ঘটনার স্মৃতি পরস্পরের সহিত জুড়িয়া গিয়া এক হইয়া যায়। এইভাবে দুইটি ভাব সম্মিলিত হইয়া একটি এককের সৃষ্টি করে। এইরূপ ব্যাপারটাকেই অনুষঙ্গ বলে।

এই অনুষঙ্গবাদকে হব্‌স্‌, হিউম, টমাস, ব্রাউন, মিল, বেইন, হার্বার্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছেন এবং ইঁহাদের অনেকেই এমন সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যে, পরবর্তী যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে তাঁহাদেরই তত্ত্বগুলিকে সমৃদ্ধতর ভাবে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ অনুষঙ্গের যাহা মূল কথা, অর্থাৎ একটি ভাব (idea) অন্য একটি ভাবের সহিত জুড়িয়া গিয়া নূতন একটি এককের সৃষ্টি করা, তাহাই যেন থর্ণডাইকের বন্ধনীবাদ হিসাবে নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শিক্ষা-তত্ত্বে গেস্‌টাল্ট্‌ মতবাদ টমাস ব্রাউন-এর "mental chemistry" এবং হার্বার্ট-এর "apperception mass" স্বগোত্রীয়।

বর্তমানে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ শিক্ষা-তত্ত্বে যে সমস্ত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যে (১) থর্ণডাইক প্রভৃতির বন্ধনীবাদ (connectionism) অথবা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াবাদ (stimulus-respons psychology), (২) প্যাভলভ্‌ ওয়াট্‌সন্‌ প্রভৃতির কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদ এবং (৩) ওয়ার্দাইমার, কুহ্‌লার, হার্টম্যান, ম্যাক্‌ কোনেল্‌ প্রভৃতির গেস্‌টাল্ট্‌ মতবাদই প্রধান। প্রথমে থর্ণডাইকের কথাই আলোচ্য। শিক্ষা-তত্ত্বে তাঁহার সূত্রগুলি খুবই প্রয়োজনীয়।

থর্ণডাইকের মতবাদ ঃ

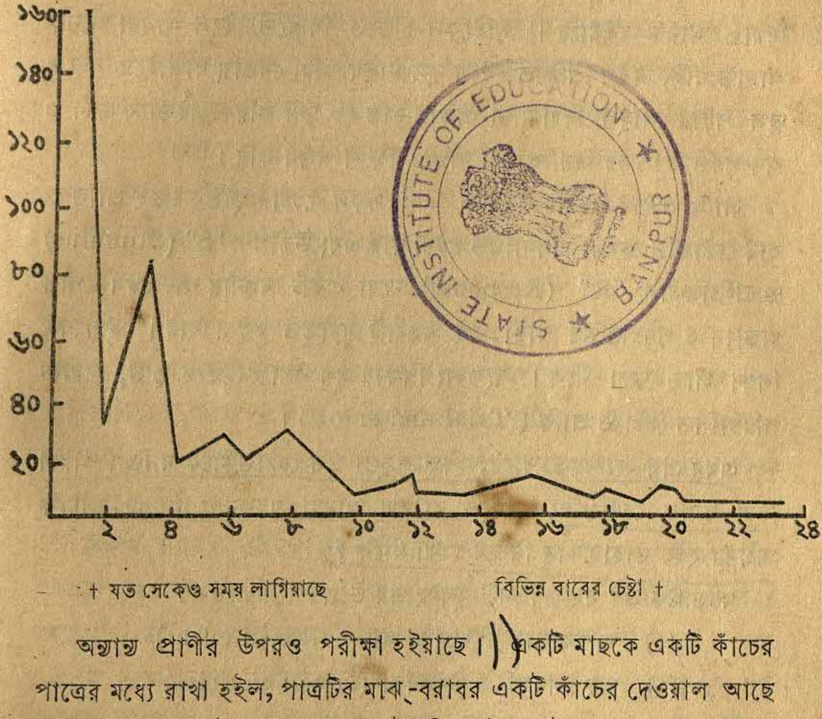
ডারউইনের বিবর্তনবাদ (evolution) স্বীকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ও ইতর প্রাণীদের একটা স্বগোত্রীয়তা স্বীকৃত হইল। ফলে অনেকেরই

ধারণা হইতে লাগিল যে, মানুষের আচরণের জটিল তত্ত্ব জানিতে হইলে ইতর-প্রাণীদের সরলতর আচরণগুলি খানিকটা পথ নির্দেশ করিতে পারে। কাজেই মানুষের মনস্তত্ত্বকে সাহায্য করিবার জন্য পশু-মনস্তত্ত্ব লইয়া গবেষণা খুবই সার্থক হইবে।) ফলে জার্মাণীতে হ্-বুন্, বৃটেনে মর্গ্যান প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাণী-মনস্তত্ত্ব লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ মনস্তত্ত্ব দর্শন-শাস্ত্রের ছত্রছায়া পরিত্যাগ করিয়া জীববিদ্যা ও শরীরতত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করিল এবং মনস্তত্ত্বের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকার হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, ক্লার্ক, চিকাগো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণী-আচরণ গবেষণা করিবার জন্য বহু প্রয়োগশালা স্থাপিত হইল। ফলে সৃষ্টি হইল থর্ণডাইক প্রভৃতি মনোবিদদের বন্ধনীবাদ এবং ওয়াটসন্ প্রভৃতি মনীষিদের কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদ।

থর্ণডাইক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস্ ও কলম্বিয়ার ক্যাটেল-এর ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি হ্-বুন ও মর্গ্যান-এর প্রদর্শিত পথেই পরিচালিত হইয়া প্রাণীদিগের আচরণ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। খাঁচা, গোলকধাঁধা প্রভৃতির সাহায্যে বিড়াল, কুকুর, মাছ প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইল। (একটি বিড়ালকে একটি খাঁচার মধ্যে রাখিয়া খাঁচার পাশে একটি মাছ ঝুলাইয়া রাখা হইল। এই মাছটির নিকট যাইতে হইলে একটি দরজার সাহায্যে যাইতে হয়। ঐ দরজাটির সহিত একটি দড়ি উপরের একটি কপিকলের সহিত বাঁধা আছে। ঐ দরজাটিকে টানিলে দরজাটি উঠিয়া পড়িবে এবং মাছের নিকট যাওয়া সম্ভবপর হইবে। বিড়ালটি ক্ষুধার তাড়নায় এবং মাছের লোভে নানা প্রকার লম্ফঝম্ফ করিল, খাঁচার শিকগুলিকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহার ভিতর দিয়া থাবা চালাইয়া মাথা ঢুকাইবার চেষ্টা করিয়া চিৎকার করিয়া মাতামাতি করিল; পরে হঠাৎ দরজার দড়িটি কামড়াইয়া টান দিতেই দেখিল দরজাটি উপরে উঠিতেছে। বিড়ালটি এইবার দরজাটি খুলিয়া ফেলিল। বন্দীত্ব হইতে মুক্তির আনন্দ এবং মৎস্যের আস্বাদন-অভিজ্ঞতা তাহাকে দরজা খুলিবার কৌশলটি আয়ত্ত করিবার জন্য একটি প্রেরণা দিয়া রাখিল। পরে যখন বিড়ালটিকে আবার খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখা হয়, সে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক চেষ্টাতেই বাহির হইতে সমর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাহার

আর ভুলই হয় না—পলায়নের শিক্ষাটি সম্পূর্ণরূপেই আয়ত্ত হইয়া যায়।

বিড়ালের শিক্ষার লৈখিক চিত্র



+ যত সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছে বিভিন্ন বারের চেষ্টা +

অন্যান্য প্রাণীর উপরও পরীক্ষা হইয়াছে। একটি মাছকে একটি কাঁচের পাত্রের মধ্যে রাখা হইল, পাত্রটির মাঝ-বরাবর একটি কাঁচের দেওয়াল আছে এবং ঐ দেওয়ালটির মধ্যস্থলে একটু নীচু খাঁচ-কাটা আছে। যেদিকে মাছটি রাখা হইল, সেইদিকে অত্যন্ত রৌদ্র এবং দেওয়ালের অপর দিকটিতে বেশ ছায়া আছে। মাছটি রৌদ্র এড়াইয়া ছায়ার দিকে যাইতে চায়, কিন্তু যতই সে চেষ্টা করে, ততবারই সে নাক ঠুকিয়া আঘাত পায়। তাহার পর হঠাৎ একবার দেওয়ালের খাঁজ-কাটা নীচু অংশটি দিয়া লাফ দিয়া পলাইতে সক্ষম হয়। ইহার পর যতবারই তাহাকে রৌদ্রের দিকে রাখা হয় ততবারই সে ঐ একইভাবে পলায়ন করে এবং প্রতিবারই তাহার ভুলের সংখ্যা কমিতে থাকে। এইভাবে প্রচেষ্টা ও ভুল, ভুল ও প্রচেষ্টা করিতে-করিতে সার্থক

প্রচেষ্টাটিকে মনে রাখিয়াই (Learning by selection of the successful variant) মাছটির শিক্ষা আরম্ভ হয়।

থর্ণডাইক বলেন, মানুষের শিক্ষাও এইভাবেই প্রচেষ্টা এবং ভুলের মধ্য দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। সাইকেল চড়িতে শিখিতে হইলে আমরা অনেক আছাড় খাই, টাইপ শিখিতে হইলে ভুল টাইপ করি, সেতার বাজাইতে হইলে ভুল পর্দায় আঙুল দিয়া নানা প্রকার হাস্যকর ভুল করি—এইভাবে ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়া আমরা শিক্ষার দক্ষতা অর্জন করি।

ভ্রান্তি ও ব্যর্থ চেষ্টার বিরক্তি এবং সফল চেষ্টার তৃপ্তির জন্যই ভ্রান্তি ও ব্যর্থ চেষ্টাগুলি ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যায় এবং উদ্দীপক "S" (Stimulus) ও প্রতিক্রিয়ার "R" (Response) মধ্যে একটি বন্ধনীর সৃষ্টি হয়। পরে অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির দ্বারা এই বন্ধনীটি দৃঢ়ীভূত হইয়া যায়। ইহাকেই শিক্ষা লাভ করা বলে। সুতরাং শিক্ষার মূল কথা হইতেছে তৃপ্তি, বিরক্তি পরিচালিত চেষ্টা ও ভ্রান্তি (Trial and error)।

এখন প্রশ্ন থাকিতে পারে, শিক্ষার যুগে ভুল চেষ্টাগুলিকে বাতিল করিয়া দিয়া সার্থক চেষ্টাগুলিকে স্মরণ রাখিয়া আমরা যে ক্রমশঃ নিপুণতার দিকে অগ্রসর হই, তাহা কোন্ নিয়মে হইয়া থাকে ?

থর্ণডাইক এই সম্বন্ধে তিনটি মূল সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন :

(১) অভিজ্ঞতার মধুরতা ও আনন্দ (law of effect)*

(২) অনুশীলনজনিত উৎকর্ষতা (law of exercise)

(৩) মনের প্রস্তুতি (law of readiness)

(১) **অভিজ্ঞতার আনন্দ**ঃ আমাদের উদ্দীপক প্রতিক্রিয়াজনিত অভিজ্ঞতার সবগুলিই আনন্দময় নহে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মধুর, কতকগুলি তিক্ত। কতকগুলি তৃপ্তিদায়ক, কতকগুলি বিরক্তিদায়ক। যেগুলি তিক্ত সেগুলি আমরা ভুলিতে চেষ্টা করি ; আর যে প্রচেষ্টাগুলি মধুর অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে, সেগুলি স্মরণ করিয়া রাখি ও তাহাদের

* থর্ণডাইকের law of effect ও law of readiness-এর সহিত প্যাভ্লভ্-এর law of reinforcement ও mind-set-এর সাদৃশ্য আছে।

পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করি। ক্ষুধার সময় কিছু খাইলে আনন্দ হয় ; অতএব এই আনন্দের স্মৃতি আমাদের শিক্ষা দিল যে ক্ষুধার সময় খাইতে হয়। অবশ্য অনেক সময় আপাতঃমধুর অভিজ্ঞতা আমাদের ভবিষ্যতের দুঃখ ও অকল্যাণের হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও আমরা অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আমাদের কল্যাণকর প্রচেষ্টাকে বাছিয়া লইয়া তাহাকেই স্মৃতির কোঠায় সঞ্চয় করিয়া রাখি।

আচরণবাদী ওয়াট্‌সন্ সাহেব এখানে আপত্তি তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষার পথে অভিজ্ঞতার তৃপ্তি-বিরক্তির কোনও দাম নাই ; পুনরাবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার নবীনতাই হইতেছে তাঁহার মতে শিক্ষার মূল কথা।

তিনি ইঁদুর, সজারু প্রভৃতি জন্তুকে গোলকধাঁধার মধ্যে পুরিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। গোলকধাঁধার মধ্যে অসংখ্য বদ্ধ গলি ছিল এবং একটি মাত্র পথ দিয়া তাহারা খাবারের সন্ধান পাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরিতে ঘুরিতে শেষ পর্যন্ত তাহারা আসল পথটির সন্ধান করিল এবং বারংবার এই কাজ করিতে করিতে তাহারা ঠিক পথটি চিনিয়া লইতে শিক্ষা করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই পুনরাবৃত্তিই হইতেছে শিক্ষার মূল তত্ত্ব।

টম্‌সন্ সাহেব এই যুক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, মন ব্যতীত শিক্ষার সম্ভাবনা নাই, মনের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা এগুলির বিচারই আমাদের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলিকে সঞ্চয় করিতে অথবা পরিত্যাগ করিতে প্রেরণা দেয়, নতুবা নিছক যান্ত্রিক অনুবর্তনই আমাদের শিক্ষার মূল কথা হইতে পারে না। বিড়ালটি যে দরজা খুলিতে শিখিল, তাহার কারণ—দরজা খোলার প্রক্রিয়াটির মধ্যে একটু আনন্দানুভূতির অনুষঙ্গ (association) ছিল ; মুক্তির আনন্দ, মৎস্যাস্বাদের আনন্দ প্রভৃতিই বিড়ালটিকে ভুল প্রক্রিয়া বন্ধ করিয়া ঠিক প্রক্রিয়াটিকে মনে রাখিবার প্রেরণা দিয়াছিল। মাছটি যে বার বার কাঁচের দেওয়ালে নাক ঠুকিয়া ভুল করে নাই, তাহার কারণ নাক ঠোকাটা তাহার কাছে আনন্দের অনুভূতি দেয় নাই। সেতার শিখিবার সময় আমরা যে ভুল তারে বার বার ঝঙ্কার তুলি না, তাহার কারণ—এই ভুলটি আমাদের কানে বেসুরা বাজিয়া আমাদের সৌন্দর্যানুভূতিকে পীড়া দেয়।

(২) **অনুশীলনজনিত উৎকর্ষতাবাদ**ঃ এই সূত্রে বলা হইয়াছে—অভ্যাসই আমাদের শিক্ষা ব্যাপারে পূর্ণতা দান করে। কোনরূপ কাজের অভিজ্ঞতা যদি পীড়াদায়ক না হয় তাহা হইলে এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তিই আমাদের শিক্ষাকে পূর্ণ করিয়া তুলে।

এই পুনরাবৃত্তির সহিত অভিজ্ঞতার তীব্রতা ও আধুনিকতার একটি নিকট সম্পর্ক আছে। যে জিনিসটি আমরা তীব্রভাবে অনুভব করি, তাহা সহজে ভুলি না; যাহা এইমাত্র শিখিলাম এখনই তাহা ভুলি না, সামান্যভাবে অনুভূত জিনিসটি পুরাতন হইলেই ভুলিয়া যাই, তীব্রভাবে অনুভূত জিনিসটি দীর্ঘতর দিন স্মরণ রাখি, ইত্যাদি। এই পুনরাবৃত্তির সহিত মনের আনন্দের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। সার্থক প্রচেষ্টাটি আমাদের মনে আনন্দ দেয়, অতএব সেই চেষ্টাটি পুনরায় করিতে ইচ্ছা হয় এবং যতবার চেষ্টা করা হয় ততই শিক্ষাও পূর্ণাঙ্গ হয়; এইভাবেই আমরা শিক্ষার পথে অগ্রসর হই।

(৩) **মনের প্রস্তুতি**ঃ অভিজ্ঞতার মধুরতা এবং পুনরাবৃত্তি ছাড়াও আর একটি শর্তের উপর আমাদের শিক্ষার পূর্ণতা নির্ভর করে। শিক্ষাকে গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের মনের তরফ হইতে একটা প্রস্তুতি ও আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি ও আগ্রহের অভাব যখন থাকে, তখন জোর করিয়া কিছু শিখাইতে হইলে মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশতঃ মন তাহাকে গ্রহণ করে না; এমন কি সদুদ্দেশ্যেও যদি তাহাকে অযাচিত সাহায্য করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে ফল খারাপ হয়। শিক্ষার ব্যাপারে মনের তরফ হইতে এই প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে বলিয়াই অনিচ্ছুক শিষ্যের কানে ধর্মোপদেশের কোনও ফল হয় না। অনিচ্ছুক ছাত্রের নিকট শিক্ষকের অধ্যাপনাও ব্যর্থ হয়। হার্বার্টের পঞ্চাঙ্গ শিক্ষা-পদ্ধতিতে "প্রস্তুতি"র উপযোগিতা এই জন্যই অনস্বীকার্য।

অভিজ্ঞতার মধুরতা, অভ্যাস এবং প্রস্তুতি—এই তিনটি মূল কারণ ব্যতীত শিক্ষার আরও কয়েকটি গৌণ কারণ আছে:

(৪) **বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া** (multiple response) : খাঁচার বিড়ালটি যখন শিকের ভিতর দিয়া মাথা গলাইতে পারিল না তখন থাবা বাড়াইল, থাবা বাড়াইয়াও যখন মাছটি ধরিতে পারিল না তখন হয়ত

আঁচড়াইতে লাগিল। এইভাবে একটির পর একটি প্রতিক্রিয়া আমাদিগকে শিক্ষার পথে পরিচালিত করে।

(৫) **মনের অবস্থা** (attitude, set or disposition): বিড়ালটি কোনও চেষ্টাই হয়ত করিত না যদি তাহার মনের তরফ হইতে ক্ষুধাজনিত প্রেরণা বা মৎস্যদর্শনজনিত লোভ না থাকিত। এইজন্যই বিদ্যালয়ে শেষের দিকের পিরিয়ড্গুলিতে ভাল ভাবে পড়ানো যায় না। তখন ছাত্রদের মন খেলার আকর্ষণে, ক্ষুধার তাড়না প্রভৃতিতে চঞ্চল হইয়া উঠে।

(৬) **আংশিক সাধনা** (law of partial activity): আমাদের অসম্পূর্ণ সাধনা প্রায়ই পূর্ণতর সিদ্ধির দিকে টানিয়া লইয়া যায়; যে বিড়ালটি দড়ির ফাঁস টানিয়া আগল খুলিতে সমর্থ হইয়াছিল—সে একটি অনভিজ্ঞ বিড়ালের চেয়ে পলাইবার ফিকির সহজে বুঝিবে; যে ছেলে গণমাপকের বা সংঘাভিক্ষণের (Group test) পরীক্ষা একবার দিয়াছে, সে পরের বারে অন্য ছেলে অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য হইবে, ইত্যাদি।

(৭) **অভিজ্ঞতার সাদৃশ্যজনিত সুবিধা** (law of assimilation or analogy): একটি প্রক্রিয়ায় কৃতকার্য হইলে অন্য প্রক্রিয়ায় কৃতকার্য হওয়া সহজতর হয়। এইজন্য আদালতের উকিলরা একজাতীয় মকদ্দমায় কৃতকার্য হইলে সেই জাতীয় অন্য মকদ্দমাতেও কৃতকার্য হইতে আশা করে।

(৮) **আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া** (law of associative shifting): এক হিসাবে এই জিনিসটিকে কৃত্রিম প্রক্রিয়া বলা যাইতে পারে। এই নিয়মটিকে এইভাবে বুঝাইতে পারা যায়: যদি একই সঙ্গে ক ও খ দুইটি কাজ হয়, তাহা হইলে হয়ত ক-এর প্রতিক্রিয়া অনুষঙ্গের দ্বারা খ-এর সহিত জড়িত হইয়া যাইতে পারে।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদ

প্যাভ্লভ্ প্রভৃতি আচরণবাদী পণ্ডিতগণ থর্ণডাইক-এর এই সমস্ত শিক্ষাতত্ত্বকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা সমস্ত শিক্ষার পদ্ধতিগুলিকেই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া (Conditioned reflex) বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন।

প্যাভ্‌লভের পরীক্ষাগুলির মধ্যে কুকুর লইয়া পরীক্ষাটির কথা অনেকের নিকট পরিচিত। সম্মুখে একখণ্ড মাংস রাখা হইল। এই উত্তেজনার সাধারণ প্রতিক্রিয়া হইবে তাহার জিহ্বা হইতে লালা-নিঃসরণ। এখন তাহাকে প্রতিবারই মাংস খাইতে দিবার পূর্বে যদি একটি করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, মাংসখণ্ড না দিয়াও শুধু ঘণ্টাধ্বনি করিলেই কুকুরের মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইবে। মাংস দর্শনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইতেছে লালা নিঃসরণ, এই প্রতিক্রিয়াকে ঘণ্টাধ্বনির কৃত্রিম উপায়ে পুনরাবৃত্তি করাকে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া বলে।

দেখা যাইতেছে, এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও একটা বন্ধনীবাদের মত ব্যাপার আছে। এখানেও একটা বিশেষ প্রণালীর সাহায্যে উদ্দীপক "S" ও কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার (C. R.) মধ্যে একটা সংযোগ-সেতু নির্মিত হয়। এই জন্যই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া বা শর্তাধীন প্রতিক্রিয়া শব্দটির পরিবর্তে অনুষঙ্গমূলক প্রতিক্রিয়া বা সঞ্চারিত (transferred) প্রতিক্রিয়া শব্দটিও ব্যবহার করা চলে।

প্যাভ্‌লভ্‌ বলেন, আমাদের সমস্ত শিক্ষাই হইতেছে এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফল। কৃত্রিম প্রতিক্রয়ার ফলেই কুকুরটি শিখিয়াছে, ঘণ্টা বাজিলেই খাদ্য পাওয়া যায় এবং এই তত্ত্বটি শিখিয়াছে বলিয়াই ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই তাহার লালা নিঃসরণ হয়।

ওয়াট্‌সন, ল্যাশ্‌লী প্রভৃতি বিভিন্ন আচরণবাদী পণ্ডিতগণ বিভিন্নভাবে প্যাভ্‌লভের কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সকলেই ইহাকে শিক্ষার মূল কথা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এই প্রতিক্রিয়ার কতকগুলি মোটামুটি শর্ত আছে। যথা—

১। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলগুলি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফল হইতে স্বল্পস্থায়ী, সুতরাং ইহার ফলকে স্থায়ী করিতে হইলে অভিজ্ঞতার ঘন ঘন ও নিয়মিত পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। এই পুনরাবৃত্তি না থাকিলে স্বাভাবিক বিস্মৃতি ও অনভ্যাসের ফলে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ালব্ধ শিক্ষা মুছিয়া যাইবে। তবে এই লব্ধ শিক্ষা অপব্যবহারে একেবারে নষ্ট হয় না ; তার একটা রেশ থাকিয়া যায়। ফলে প্রাথমিক প্রচেষ্টায় শিক্ষার চেয়ে পরবর্তী প্রচেষ্টায়

শিক্ষাটা সহজতর (Relearning is easier than learning) হয়।

২। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট উদ্দীপকে সীমায়িত। ইহা specific; ঠিক যে উদ্দীপকে একটি বিশিষ্ট কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, পরবর্তী পরীক্ষায় ঠিক সেই উদ্দীপকটিরই প্রয়োজন হইবে। একটি বিশিষ্ট ঘণ্টাধ্বনি দিয়া যদি কুকুরের লালা নিঃসরণ হয়, তাহা হইলে, দ্বিতীয়বারেও ঐ ঘণ্টা-ধ্বনিটিই করিতে হইবে। ঘণ্টার বদলে কাঁসর বাজাইলে কি ঢাক বাজাইলে পূর্বনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াটি হইবে না।

৩। ইহা "law of summation" মানিয়া চলে; অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্দীপকে বিভিন্ন সময়ে যদি এক জাতীয় একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সেই বিভিন্ন উদ্দীপকগুলি একত্র যুগপৎ কাজ করিলে প্রতিক্রিয়াটা আরও তীব্রতর হইবে। ধরা যাইল কুকুরকে মাংসখণ্ড দিবার পূর্বে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা হইল; আবার অন্য সময় হয়ত তাহার গায়ে সুড়সুড়ি দিয়া ঐ জাতীয় একটা কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা হইল। এইবার ঐ দুইটি উদ্দীপক যদি এক যোগে ও যুপপৎ কাজ করে, তাহা হইলে লালা নিঃসরণ আরও ভালভাবে হইবে।

৪। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলগুলিকে নানা ভাবেই বিনষ্ট করা যায়। ইহার ফলগুলি অব্যবহারেও যেমন নষ্ট হয়, তেমনি অতি ব্যবহারে বা ব্যর্থ ব্যবহারেও নষ্ট হয়। কুকুরকে মাংস না দিয়া শুধু-শুধু ঘণ্টাধ্বনি করিয়াই তাহার মুখে লালা নিঃসরণ করান হইল। কিন্তু বার বার যদি শুধু ঘণ্টাধ্বনিই করা হয় আর ক্ষুধার খাদ্য মাংসখণ্ড দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তাহার আর লালা নিঃসরণ হইবে না। বার বার তাহাকে ঠকান যাইবে না। (শিক্ষা-তত্ত্বে এই সূত্রটি স্মরণীয়। শাস্তি বা তিরস্কারে অনেক সময় ছাত্রদের অপরাধ সংশোধিত হয়। কিন্তু মাত্রা ছাড়াইয়া যাইলে তাহা ছাত্রদের অপরাধ-প্রবৃত্তিকে আর সংশোধন করিতে পারে না। এইজন্যই অতিরিক্ত শাস্তির ফল প্রায়ই ব্যর্থ হয়, খিটখিটে পিতার সন্তান অবাধ্য হয়, আবার অতিরিক্ত উপদেশ শুনিয়া-শুনিয়া ছেলেরা "উপদেশ ঘেঁচড়া" হইয়া উঠে।)

৫। অনেকগুলি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইলে তাহাদের মধ্যে একটি যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে অপরগুলিও যে নষ্ট হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময় এমনও হয় যে, তীব্র উদ্দীপকজাত প্রতিক্রিয়াটি নষ্ট হইয়া যাইল, কিন্তু তাহার চেয়ে দুর্বল একটা উদ্দীপক সমান ভাবেই কার্যকরী রহিয়া যাইল।

৬। একটি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবার ঠিক পূর্বেই যদি একটি বাধা সৃষ্টিকারী উদ্দীপক (distracting stimulus) প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া ফলটি খানিকটা ব্যাহত (inhibited) হয়। এই বাধা সৃষ্টিকারী বা চিত্তবিক্ষোভকারী উদ্দীপকটি যতই শক্তিশালী হইবে, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াজাত শিক্ষা ততই ব্যাহত হইবে। অবশ্য এই ব্যাঘাত জিনিসটা ক্রমশঃই গা-সওয়া হইয়া যায় এবং পরে চিত্তবিক্ষেপের কারণ বর্তমান থাকিলেও, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসে।

৭। ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী উদ্দীপককে অন্য উদ্দীপকের দ্বারা ব্যাহত (Inhibitions may be inhibited) করা যায়।

৮। এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া বয়স্কদিগের চেয়ে শিশুদের উপর অধিকতর কার্যকরী হয়।

দৃঢ়ীকরণ সূত্র (Law of re-inforcement): আমরা দেখিয়াছি, কুকুরের পক্ষে স্বাভাবিক উদ্দীপক হইতেছে মাংসখণ্ড এবং কৃত্রিম উদ্দীপক হইতেছে ঘণ্টাধ্বনি। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, শুধু কৃত্রিম উদ্দীপক দিয়াই (অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনি দিয়াই এবং মংসখণ্ড না দিয়াই আমরা কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারি। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার পর স্বাভাবিক উদ্দীপক অর্থাৎ মাংসখণ্ড যদি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার বন্ধনীটি দুর্বল হইয়া যায়। বিপরীত পক্ষে স্বাভাবিক উদ্দীপকটি দিলে বন্ধনীটি দৃঢ়ীভূত (re-inforce) হয়। এইজন্যই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার অনুগামী স্বাভাবিক উদ্দীপককে "re-inforcement"-ও বলা হয়। অভ্যাস তৈয়ারী করিবার দিক দিয়া (তথা শিক্ষা-তত্ত্বের দিক দিয়া) এই re-inforcement-এর খুবই প্রয়োজন। থর্ণডাইক তাঁহার 'Law of effect' এবং গেস্টাল্টবাদিগণ তাঁহাদের

'Factors of pregnance and good figure' মতবাদের মধ্য দিয়া "re-inforcement" বা দৃঢ়ীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

মানুষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার প্রয়োগ ঃ মানুষের শিক্ষার ব্যাপারে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া কতটা প্রযোজ্য? আচরণবাদীরা বলিবেন, মানুষের শিক্ষার শেষ কথা যাহাই হউক না কেন, তাহার প্রথম কথা যে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া, ইহা অনস্বীকার্য। স্যাণ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, একটি শিশু যে তাহার আশেপাশের জিনিসপত্রের নামের সহিত পরিচিতি হয়, তাহাও এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ারই ফল। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, তাহা কি ভাবে সম্ভব? ধরা যাইতে পারে, একটি 'বল' লইয়া এইভাবে শিশুর অভিজ্ঞতা আরম্ভ হইল :

প্রথম অভিজ্ঞতা : মাতা 'বল' কথাটি উচ্চারণ করিলেন এবং মাতাকে অনুকরণ করিয়া শিশু ঐ শব্দটি উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিল।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা ঃ মাতা আবার বলটি লক্ষ্য করিয়া 'বল' শব্দটি উচ্চারণ করিলেন এবং শিশুও তাঁহার অনুকরণ করিল।

তৃতীয় অভিজ্ঞতা ঃ শিশু মাতাকে অনুকরণ করিয়া পুনশ্চ 'বল' বলিল।

চতুর্থ অভিজ্ঞতা ঃ শিশুটি এখন মাতার সাহায্য ব্যতিরেকে বলটিকে দেখিয়াই বল বলিয়া অভিহিত করিল; এখন জিনিসের সহিত জিনিসেরনামটি জুড়িয়া গেল। শিশু নাম শিক্ষার কার্য শেষ করিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আচরণবাদীদের মতে শিক্ষা-তত্ত্বের মধ্যে মনস্তত্ত্বের কোনও কথাই নাই। শুধু তাই না, আচরণবাদীরা মনস্তত্ত্বের মধ্যে দেহতত্ত্ব ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান না এবং মনের সমস্ত প্রতিক্রিয়ারই একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। হারমোনিয়ামে একটি বিশিষ্ট পর্দা টিপিলে যেমন তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি বিশিষ্ট ধ্বনিই উত্থিত হয়—ইঁহাদের মতে মানুষের সব কাজগুলিই ঐ একই ভাবে হয়। গাছের ডালে কাঁচা আমটি ঝুলিতেছে, বালক তখনই ঢিল কুড়াইয়া লইল ও তাহাকে ভূপাতিত করিল; আম্রটি যেমনই ভূপাতিত হইল, অমনই তাহার হাতের ছুরিটি খুলিয়া গেল; আমটি ছাড়ান হইল। অমনই নুন-লঙ্কা-কলাপাতার ব্যবস্থা হইল এবং ঐ অপূর্ব পদার্থটি পত্রপুটে সঞ্চিত হইয়া তাহার

মুখে উঠিল—এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলিই আচরণবাদীদের মতে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র, ইহার মধ্যে বুদ্ধির খেলা কিছুই নাই।

প্রতিপক্ষ হয়ত বলিতে পারেন, বুদ্ধির ব্যাপার যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে বালকটির কাজে পারম্পর্য আসিল কিরূপে? বালকটি আম দেখিয়াই প্রথমেই নুন-লঙ্কার সন্ধানে ছুটিল না কেন? প্রথমে যে আমটিকে ঢিল মারিয়া হস্তগত করিতে হইবে, ইহা সে বুঝিল কিরূপে? ইতর প্রাণী বা শিশুদের সম্বন্ধে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার কথা আসিতে পারে, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে।

অতএব দেখা গেল, শিক্ষা-তত্ত্বের সমাধানের ব্যাপারে প্যাভ্‌লভ্‌ প্রভৃতি আচরণবাদীদের সিদ্ধান্তই শেষ কথা হইতে পারে না। এখন দেখা যাক, অন্য কোনও দল ইহার সম্বন্ধে অন্য কিছু সুষ্ঠু সমাধান দিয়াছেন কিনা।

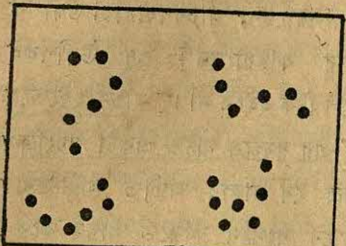
গেস্টাল্ট মতবাদ

জার্মাণ ভাষায় গেস্টাল্ট্‌ শব্দটির অর্থ হইতেছে আকৃতি (shape)। দৃশ্যপটের দৃশ্য বস্তুগুলির গতি ও সংস্থান লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতেই এই মতবাদটির সৃষ্টি হইয়াছে। সিনেমায় পৃথক পৃথক স্থির ছবিগুলি কি ভাবে জুড়িয়া গিয়া মসৃণ একটানা গতির বিভ্রম সৃষ্টি করে, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বস্তুপুঞ্জ (আকাশের তারা, কাগজে আঁকা কালির ফোঁটা প্রভৃতি) কি ভাবে জোট পাকাইয়া সংহত হইয়া এক একটি আকৃতি বা ছবির বিভ্রম সৃষ্টি করে, এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া ইঁহারা গবেষণা করেন। এই গবেষণা দ্বারা তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, "সমগ্র" জিনিসটা "খণ্ডের" সমবায় মাত্র নহে, তাহা একটা নূতন সৃষ্টি; এই "সমগ্র"ই প্রভাবিত করে খণ্ডের অনুভূতিকে, পূর্বতর অভিজ্ঞতার নমুনার (pattern) সঞ্চয়গুলির প্রভাবেই নূতন অভিজ্ঞতার খণ্ড বস্তুগুলির মধ্য হইতে নূতন নূতন এককের সৃষ্টি হয়; সুতরাং অংশ পূর্ণকে তৈয়ারী করে না, পূর্ণই অংশকে বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা দান করে।

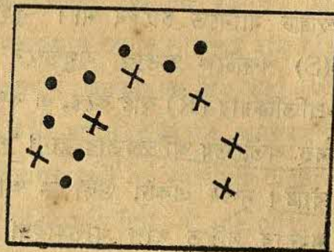
সংগঠন (Organization) কথাটি গেস্টাল্ট মতবাদে খুবই প্রচলিত। গেস্টল্টবাদীগণ বলেন, সংবেদনগুলি (sensation) অভিজ্ঞতার নিষ্ক্রিয়

পুঞ্জ মাত্র নহে, তাহারা স্বয়ংক্রিয় সংগঠনকারী জিনিস ; তাহারা প্রতিনিয়তই পরস্পরের সহিত জুড়িয়া-জুড়িয়া নূতন-নূতন একক সৃষ্টি করিতেছে, পুরানো অভিজ্ঞতার আদর্শেই (pattern) এই নূতন এককগুলি তৈয়ারী হইতেছে।

সংগঠনের শর্ত ঃ ওয়াদাইমার-এর সূত্রাবলী ঃ কি ভাবে এই সংগঠন কাজটি চলিতে থাকে? ওয়ার্দাইমার (Wertheimer) দেখাইয়াছেন,



নৈকট্য



সাদৃশ্য

(১) একটা কাগজের পাতায় যদি অনেকগুলি কালির ফোঁটা আঁকা থাকে, তাহা হইলে যে ফোঁটাগুলির মধ্যে আকৃতি বা বর্ণগত **সাদৃশ্য** থাকে তাহারাই পরস্পর জুড়িয়া যাইয়া একটা কিছু ছবির বিভ্রম সৃষ্টি করিবে। (২) এই ছবির তৈয়ারীর ব্যাপারে ফোঁটাগুলির সংস্থানগত **নৈকট্য** এবং অবিচ্ছিন্নতাও একটা বড় সহায়। ফোঁটাগুলির মধ্যে অনেকখানি করিয়া ছেদ থাকিলে এই ছবিটি তৈয়ারী হয় না। (৩) সংগঠনের আর একটি শর্ত হইতেছে, পূর্ব **অভিজ্ঞতাজনিত পরিচিতি** (familiarity) ও **মানসিক অবস্থা** (set)। আকাশের বিচ্ছিন্ন তারকাগুলি হইতে অথবা চলমান মেঘপুঞ্জের মধ্য হইতে আমি হয়ত একটা হাতী দেখিলাম। কিন্তু হাতীর সঙ্গে যাহার পরিচয় নাই, যে হাতী দেখে নাই শুধু শূকর দেখিয়াছে, তাহার কাছে ঐ ছবিটিই হয়ত একটা শূকর বলিয়া প্রতিভাত হইবে। (৪) সংগঠনের আর একটি শর্ত হইতেছে **pregnance**



অবিচ্ছিন্নতা

and good figure ; এই বিচ্ছিন্ন ফোঁটাগুলি হইতে যে ছবিটির বিভ্রম সৃষ্টি হইল, তাহা যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ বা অর্থপূর্ণ হয়, তাহা হইলেই ঐ ছবিটির স্মৃতি স্থায়ী ভাবে মনের মধ্যে থাকিয়া যাইবে—বারান্তরে ঐ ফোঁটাগুলি হইতে ঐ বিশিষ্ট ছবিটিরই অনুভূতি হইবে।

গেস্টাল্টবাদিগণ আচরণবাদিদিগের "উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া" (S—R) সূত্রটি মানিতে চাহেন না। কুহ্লার বলিয়াছেন, আচরণবাদীরা উদ্দীপক (S) শব্দটিকে অত্যন্ত লঘুভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। শুধু উদ্দীপকই প্রতিক্রিয়ার (R) সৃষ্টি করে, এ কথা বলিলে ঠিক হইবে না। মানুষ হইতেছে বহু অতীতের অভিজ্ঞতার নানা "প্যাটার্ণ"-এর সমন্বয়ে গঠিত একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যষ্টি। নূতন একটা উদ্দীপক আসিবামাত্র সে তাহার অতীত অভিজ্ঞতার নমুনার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নূতনভাবে সংগঠন করিতে আরম্ভ করে; ফলে প্রতিক্রিয়া হিসাবে তৈয়ারী হয় নূতন নূতন প্যাটার্ণ। কাজেই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সূত্রটিকে বাতিল করিয়া আমাদের নূতন সূত্র করা উচিত "উদ্দীপক প্যাটার্ণ" → নূতন গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া (pattern of stimulaton) → সংগঠন → নূতন গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া (response to the product of organisation)।

এই সংগঠনের ফলে বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে যে জিনিসটি তৈয়ারী হয়, তাহা যে একটা সম্পূর্ণ "নূতন সৃষ্টি", একটা সমবায় মাত্র নহে, এই কথাটাই গেস্টাল্ট মতবাদে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্পীয়ারম্যান্ সাহেব তাঁহার "noegenesis" তত্ত্বে এই "নূতন সৃষ্টির" কথাটাই অন্যভাবে বুঝাইয়াছেন। অনুষঙ্গবাদিগণ দেখাইয়াছিলেন, একটি ভাব (idea) আর একটি ভাবের সহিত জুড়িয়া যায়, ঠিক কথা কিন্তু তাহার ভাবটি জুড়িয়া গিয়া যে এককটি সৃষ্টি করে, তাহা যে নিছক "সমবায়" মাত্র নহে, তাহা যে একেবারে একটা নূতন জিনিস হইয়া উঠে, এই তত্ত্বটি পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন নাই।

কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, শুধু সংগঠন, সংস্থান ও আকৃতির ভিন্নতায় এমন কতকগুলি নূতন গুণের সমষ্টি হয়, যাহা উপাদানীভূত বস্তুগুলির

কোনটির মধ্যেই থাকে না। তাজমহলের বিচ্ছিন্ন উপাদানের মধ্যে তাজমহলের সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য নাই, ভৈরবী রাগিণীর মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে, টোড়ীর মধ্যে তাহা নাই, অথচ দুইটি রাগিণীর মধ্যেই সাতটি স্বর আছে এবং 'রে' 'গা' 'ধা' 'নি'র কোমল পর্দা ব্যবহৃত হয়।

বস্তুতঃ উপাদান-সংগঠনে গঠিত নূতন এককটি একটি সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি, ইহা নিছক সমবায় মাত্র নহে। এই নূতন এককটি বন্ধনীবদ্ধ মুক্তাখণ্ড মাত্র নহে, ইহা একটি মণি-মালিকা ; ইহা কতকগুলি স্বরের পারম্পর্য মাত্র নহে, ইহা একটি মধু রাগিণী ; ইহা দলবদ্ধ চলমান জনতামাত্র নহে, ইহা একটি সাড়ম্বর শোভাযাত্রা। এই তত্ত্বটি আর একজন মনোবিদ্ তাঁহার অনমুকরণীয় ভাষায় বলিয়াছেন, "It is not beads connected by various clasps, but a necklace, it is not a series of tones but a melody, it is not men walking in columns, but a procession".

অন্তর্দৃষ্টি ঃ গেস্টাল্ট মনোবিদ্‌গণের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান হইতেছে অন্তর্দৃষ্টির মতবাদ। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কুহলার ব্যানারি-দ্বীপপুঞ্জের একটি পশুশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ইতর প্রাণীদের অন্তর্দৃষ্টি পরিচালিত বুদ্ধি আছে কিনা, এই ব্যাপারে তিনি শিম্পাঞ্জী লইয়া পরীক্ষা (১৯১৪) করেন। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে শিম্পাঞ্জীদের বুদ্ধিই সর্বাধিক।

বারোটি শিম্পাঞ্জীকে একটি স্থানে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল—সেই স্থানটিতে লম্বা লাঠি, দড়ি, বাক্স প্রভৃতি ছড়ানো ছিল এবং উচ্চে ক্যাম্বিসের একটি ত্রিপল হইতে কতকগুলি কলা ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। দেখা গেল, কতকগুলি শিম্পাঞ্জী দশ হাত লাঠিটিকে মাটির উপর শূন্যে দাঁড় করাইয়া লাঠিটি মাটিতে পড়িয়া যাইবার পূর্বেই যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র লাঠি বাহিয়া উঁচুতে উঠিয়া কলাগুলি পাড়িয়া আনিল। অন্য কতকগুলি শিম্পাঞ্জী বাক্সগুলিকে একটির উপরে একটি স্থাপন করিয়া তাহার উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু স্তূপ সাজাইবার কৌশলটি অনেকেরই ঠিক হয় নাই। তাড়াতাড়ি ছোট বাক্সের উপর বড় বাক্স, তাহার উপর আর একটি এমন ভাবে সাজাইল যে, তাহাদের ভারকেন্দ্র ঠিক রহিল না; ফলে

বাক্সগুলির উপর উঠিতে যাইয়াই হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। অন্য কতকগুলি শিম্পাঞ্জী হেলিয়া দুলিয়া টান খাইয়া বাক্সগুলি পড়িবার পূর্বেই কলাগুলি ছিনাইয়া লইল এবং শেষ পর্যন্ত মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আবার কতকগুলি শিম্পাঞ্জী এ সমস্ত কিছুই করিল না। তাহারা লাঠিগুলিকে আঁকশীর মত ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; যখন দেখিল যে একটি লাঠি দিয়া ঠিক নাগাল পাইতেছে না, তখন একটি লাঠিকে অন্য একটি লাঠির খাঁজের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ফলের নাগাল পাইল এবং ইপ্সিত বস্তুটি আহরণ করিল। পরের দিন এই কার্যগুলি আরও ক্ষিপ্র ও নির্ভুলভাবে হইয়াছিল।

শিম্পাঞ্জীদের এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থর্নডাইকের চেষ্টা ও ভ্রান্তি অথবা প্যাভ্‌লভ্‌-এর কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার রীতিগুলি কাজ করে নাই। লাঠি বাহিয়া উপরে উঠিয়া অথবা বাক্সের উপর বাক্স সাজাইয়া অথবা লাঠি-গুলিকে আঁকশীর মত ব্যবহার করিয়া যে ফলগুলির নাগাল পাওয়া যাইবে, ফলগুলির সহিত তাহাদের ফাঁকটুকু ভরাট হইয়া যাইবে এবং একটা সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন ছবি তৈয়ারী হইবে, এই জাতীয় একটা ধারণার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহাকেই অন্তর্দৃষ্টির লীলা বলা যাইতে পারে।

এই অন্তর্দৃষ্টিটি কি জিনিস? যে অন্তর্ভেদী "X Ray দৃষ্টি" দ্বারা দৃশ্যবস্তুর উপর হইতে একেবারে ভিতরের মর্মের সন্ধান পাওয়া যায়, এই জাতীয় কোনও অন্তর্দৃষ্টির দাবী গেস্টাস্টবাদিগণ করেন না। অথবা সাধু-সন্ত ব্যক্তিরা যে একটা অতীন্দ্রিয় অলৌকিক শক্তির দ্বারা কোনও জিনিসের গোপন রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হন, সেই জাতীয় অন্তর্দৃষ্টিও গেস্টাল্ট-মনোবিদ্‌গণের আলোচ্য নহে। তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি অন্য জাতীয় জিনিস। সমগ্রের অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে-দৃষ্টি সমগ্রের অংশীভূত একটা জিনিসকে সমগ্রের অংশ হিসাবে বুঝিতে পারে, যে-দৃষ্টি অতীতের অভিজ্ঞতার দ্বারা নূতন জীবন সংস্থানের একটা সমাধান করিতে পারে, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য, সম্পর্ক ও "প্যাটার্ন" আবিষ্কার করিতে পারে, তাহাকেই গেস্টাল্টবাদিগণ অন্তর্দৃষ্টি নাম দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই অন্তর্দৃষ্টি হইতেছে সমস্ত শিক্ষার মূল কথা।

গেস্টাল্ট মনোবিদ্‌গণ বলেন, চেষ্টা ও ভ্রান্তির (trial and error) পথ হইতেছে একটা অন্ধ অভিযানের পথ। ইহার মধ্যে পরিকল্পনা নাই, পর্যবেক্ষণ নাই, ঘটনা-সংস্থানকে সমগ্রভাবে দেখিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য একটা অনুসন্ধানী চেষ্টা নাই, কাজেই ইহার মধ্যে বহু ব্যর্থ পদক্ষেপ আছে, মূর্খ শক্তি-ক্ষয় আছে, তাই চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়া যে সফলতা আসে, তাহা একটা আকস্মিক সৌভাগ্য মাত্র, সুচিন্তিত আবিষ্কার নহে।

কুহ্‌লার দেখাইয়াছেন, থর্ণডাইকের গোলক-ধাঁধা, খাঁচা, বাক্স প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষার সময় প্রাণীদিগকে লক্ষ্যবস্তুটি সম্বন্ধে সমগ্র ও অখণ্ড দৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হয় নাই। সেইজন্যই তাহাদিগকে চেষ্টা ও ভ্রান্তির বহু ব্যর্থ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাহারা যদি লক্ষ্যবস্তুকে অনুভব করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে সোজাসুজি সেই স্থলে চলিয়া যাইত, অনর্থক শক্তিক্ষয় করিত না। তিনি একটি কুকুরকে একটা বেড়া-দেওয়া অপরিচিত বাগানের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। বেড়ার ওপারে কিছু খাদ্য দেওয়া ছিল। কুকুরটি বেড়ার প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া গিয়া ফাঁকা পথ ধরিয়া সোজা এক প্রচেষ্টাতেই খাবারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে ব্যর্থ পরিশ্রম করে নাই। কারণ পথ সম্বন্ধে সমগ্র ক্ষেত্রটিই তাহার দৃষ্টিপথের মধ্যে ছিল। তাই সে থর্ণডাইকের বিড়ালের মত থাবা দিয়া আঁচ্‌ড়াইয়া, বেড়ার তলা দিয়া নাক ঢুকাইয়া ব্যর্থ লাফঝাঁফ করিয়া খাবারটি লইবার চেষ্টা করে নাই।

গেস্টাল্টবাদিগণ বলেন, শিক্ষার্থী যখন একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন যদি তাহাকে সমগ্র সংস্থানের ছবিটি দেখিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে শিক্ষার্থী নিজেই সমাধানটি খুঁজিয়া পাইবে। তাঁহাদের মতে, আমাদের সমস্ত সমস্যাগুলিই হইতেছে এই জাতীয় একটা ফাঁক (gap) সম্বন্ধে অনুভূতি এবং এই ফাঁকটুকু ভরাইবার মধ্যেই (principle of closure) আছে ঐ সমস্যার সমাধান।

কিন্তু সমস্যার সমাধানই শিক্ষার শেষ কথা নহে। একটা সমাধানের পর সমাধানের প্রক্রিয়াটিকে মনে রাখিতে হয়, সমাধানের প্রণালীটি অভ্যস্ত করিয়া লইতে হয়। তাহা কি ভাবে সম্ভব? এ সম্বন্ধে গেস্টাল্ট-মতবাদীদের

নির্দেশ কি? থর্ণডাইক এই সম্বন্ধে 'Law of effect or law of reward' মতবাদে, অথবা প্যাভ্‌লভ্‌ তাঁহার 'Law of re-inforcement' মতবাদে যাহা বলিয়াছেন, গেস্টাল্টবাদিগণও সেই জাতীয় কথাই বলিয়াছেন। আমরা জানি সমস্ত সমস্যাই হইতেছে একটা "ফাঁক" সম্বন্ধে অনুভূতি এবং সমস্যার সমাধান হইতেছে সেই ফাঁকটি ভর্তি করা। এই ফাঁক ভর্তি করার ব্যাপারে যদি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সার্থক ছবি তৈয়ারী হয়, তাহা হইলেই উহা আমাদের মনে তৃপ্তি দিবে এবং সমাধানের প্রণালীটি আমাদের মনে দৃঢ়ীভূত হইবে। গেস্টাল্ট মতে, 'pregnance and good figure' হইতেছে ইহার জন্য প্রয়োজন।

বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা ও সমন্বয়

শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচিত হইল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, প্রকৃত সত্যটি কোন্ সম্প্রদায়ের মতবাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে? ওয়াশ্‌বার্ণ (Washburn) দেখাইয়াছেন, এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে একটা একদেশদর্শিতা আছে, ইহা যেন অনেকটা অন্ধের হাতী দেখার মতো। তাই আমরা বলিতে পারি, প্রত্যেক মতবাদের মধ্যেই খানিকটা সত্য আছে এবং সমগ্র সত্যটি হয়ত আছে এই সমস্ত মতবাদের সমন্বয়ের মধ্যে।

এই সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন মতবাদের বিরোধগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় "চেষ্টা ও ভ্রান্তি" মতবাদ ও 'অন্তর্দৃষ্টি' মতবাদের মধ্যেই বিরোধটা সর্বাধিক। এই বিরোধটির একটা মীমাংসা হইলে সমন্বয়টি সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে।

আমরা দেখিয়াছি, গেস্টাল্টবাদিগণ বলিয়াছেন, চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথ হইতেছে একটা অন্ধ অভিযানের পথ, সুতরাং এই অন্ধ প্রচেষ্টা শিক্ষার তত্ত্বকথা হইতে পারে না। কিন্তু স্যাণ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, আমরা যখন সাঁতার কাটিতে শিখি অথবা অনেকগুলি 'বল' লইয়া লোফালুফি (jugling) করিতে শিখি, তখন অন্তর্দৃষ্টি আমাদের কোনও সাহায্য করে না, নিছক চেষ্টা ও

ভ্রান্তির মধ্য দিয়াই আমরা ক্রমশঃ সফলতার দিকে অগ্রসর হই। শুধু আঙ্গিক গতি বা অঙ্গ সঞ্চালনের ব্যাপারেই যে এই চেষ্টা ও ভ্রান্তি কাজ করে তাহা নহে, মানসিক অভ্যাসের দিক দিয়াও চেষ্টা ও ভ্রান্তির অবদান সামান্য নহে। আমরা যখন দীর্ঘ পরিশ্রমের পর গণিত বা জ্যামিতির একটা সমাধান খুঁজিয়া পাই তাহাও অন্তর্দৃষ্টির চকিত চমকে হয় না, বহু চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথ বহিয়া চলিতে চলিতে সমাধানটি চক্ষুর দৃশ্যক্ষেত্রের উপর ফুটিয়া উঠে। ইহা চেষ্টা ও ভ্রান্তি প্রণালীরই একটা শেষ পর্যায় মাত্র। বস্তুতঃ (স্যাণ্ডিফোর্ড-এর মতে) অন্তর্দৃষ্টি হইতেছে একটা অবিশ্লেষিত (unanalysed) শিক্ষাপদ্ধতি ; ইহাদের মধ্যে চেষ্টা ও ভ্রান্তিই গোপনে গোপনে কাজ করিয়া যায়।

এই জাতীয় যুক্তি শুনিয়া আমরা যেন দিশেহারা হইয়া পড়ি। কিছু পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, অন্তর্দৃষ্টির ফলেই কুহ্লার-পরীক্ষিত কুকুর অথবা শিম্পাঞ্জীগুলি কত সহজেই তাহাদের সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছিল। এখন আবার দেখিতেছি, শিক্ষার ব্যাপারে চেষ্টা ও ভ্রান্তির অবদানও সামান্য নহে। তাহা হইলে শিক্ষার তত্ত্বটি কোথায় ?

আমাদের মনে হয়, দৈহিক অভ্যাস-গঠন প্রভৃতির ক্ষেত্রে চেষ্টা ও ভ্রান্তির কাজ খুব বেশী হইলেও, প্রকৃত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গেস্টাল্টদিগের মতবাদ অনস্বীকার্য। ভাষাগত একটা বিমূর্ত চিন্তাশক্তির দ্বারা ব্যাপক অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে আমরা একটা ফাঁক (gap) বুঝিতে পারি, পরে যখন অন্তর্দৃষ্টি-চালিত পথে পরিচালিত হইয়া এই ফাঁকটি ভরাট করি, তখনই হয় সমস্যার সমাধান। উড্ওয়ার্থ বলিয়াছেন : "A problem amounts to a "gap in the present situation, insight amounts to perceiving the gap and insightful behaviour closes the gap."

এই ফাঁক ভর্তি করার ব্যাপারটাই হইতেছে শিক্ষার সমাপ্তি। কিন্তু এই সমাপ্তির পথটি হইতেছে চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথ।

গেস্টাল্টবাদিগণ চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথকে অন্ধ অভিযানের পথ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক অন্ধ অভিযান নহে। ইহা হইতেছে আবিষ্কারের

(exploration) পথ। লক্ষ্য যখন অনাবিষ্কৃত থাকে, তখন এই আবিষ্কারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সমস্যার ইহাই হইত মূল তত্ত্ব। নতুবা লক্ষ্যবস্তুটি যদি দৃশ্যমানই হইল, তাহা হইলে আর সমস্যাটি কোথায় থাকে? আর তাহার সমাধানেরইবা বাকী থাকে কতটুকু? আইনষ্টাইন্ (Einstein) যখন ম্যাক্সওয়েল্-সমীকরণ (Maxwell equation) হইতে "অপেক্ষবাদে"র (relativity) দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি ঠিক থর্ণডাইকের বিড়ালের মত অন্ধ প্রচেষ্টা করেন নাই বটে, তবে তিনিও খানিকটা অন্ধ ছিলেন, কারণ লক্ষ্যবস্তুর সহিত তাঁহার তখনও প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয় নাই; তবে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বিমূর্ত-চিন্তা লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিল এইমাত্র। এই ইঙ্গিতের ফলে তিনি আবিষ্কারের অভিযান চালাইয়া ছিলেন। জীবন সংস্থান যখন অন্ধ ও অজ্ঞাত হইবে, তখন আবিষ্কারের প্রণালীটিও খানিকটা অন্ধ হইতে বাধ্য। ইহা ইতরপ্রাণীর পক্ষেও যতটা সত্য মানুষের পক্ষেও ততটাই সত্য।

এইভাবে বিচার করিলে অন্তর্দৃষ্টি এবং চেষ্টা ও ভ্রান্তির বিরোধটি অনেকখানি কমিয়া যায়। এই হিসাবেই ম্যাক্ কোনেল (Mc. Connell) বলিয়াছেন: "Trial and error method is not a senseless process—it is a process of approximation and correction. It is consequently the essence of reasoning."

যতই দিন যাইতেছে শিক্ষা সম্বন্ধে বিরোধী মতবাদগুলি ততই যেন কাছাকাছি আসিয়া একটা সমন্বয়ের পথ খুঁজিতেছে। কাজেই, কোনও একটি বিশিষ্ট মতবাদের গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত মতবাদ হইতেই শিক্ষা সম্বন্ধে একটা ব্যবহারিক পথ নির্দেশের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য।

বিভিন্ন শিক্ষাতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ

(ক) **বন্ধনীবাদ:** বন্ধনীবাদের মূল কথাটি এই যে, আমরা তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতাগুলির পুনরাবৃত্তি করি এবং বিরক্তিকর জিনিসগুলি এড়াইয়া চলি।

"S" এবং "R"-ঘটিত বন্ধনীগুলি তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই তৃপ্তি বিরক্তির তত্ত্বটি শিক্ষা-বিজ্ঞানে খুবই প্রয়োজনীয়।

শিক্ষার ব্যাপারে আমরা ছাত্রদিগকে তিরস্কার করি বা শাস্তি দিই। আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে, শাস্তি বা তিরস্কার পাইলে ছাত্রগণ আর অন্যায় করিবে না, শাস্তি বা তিরস্কারের অতৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা এড়াইয়া চলিবার জন্যই তাহারা অন্যায় আচরণ হইতে বিরত থাকিবে। কথাটা খানিকটা সত্য হইলেও, সর্বতোভাবে সত্য নহে। মৃদু তিরস্কারে খানিকটা ইপ্সিত ফল পাওয়া যাইলেও, তীব্র তিরস্কার বা শাস্তিতে প্রায়ই ফল বিপরীত হয়। অমনোযোগী বা অপরিচ্ছন্ন হইবার জন্য কোনও বালক যদি কঠোরভাবে তিরস্কৃত হয়, তাহা হইলে সে সংশোধিত হয় না, বরং অপরিচ্ছন্ন বা অমনোযোগী হইবার জন্য তাহার জেদ যেন বাড়িয়াই যায়।

শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে যে, তিরস্কারের চেয়ে পুরস্কারই হইতেছে শিক্ষার শক্তিশালী প্রেরণা*। এই পুরস্কারের অর্থ ছাত্রতোষণ নহে; সফলতার আনন্দই সারস্বত সাধকের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। শিক্ষকের সর্বপ্রধান কাজ হইতেছে, শিক্ষার সফলতার পথ সুগম করিয়া দেওয়া।

ইহার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হইতেছে নির্ভুল আরম্ভ ও নির্ভুল উপস্থাপন। শিক্ষার জিনিসগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া এমনভাবে উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং এমনভাবে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রদের প্রথম চেষ্টাগুলি সফল হয়। পাটীগণিত, বিজ্ঞান, অনুবাদ প্রভৃতির অনুশীলনের সময় ছাত্রদের অর্জিত বিদ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া খুব সহজ সহজ প্রশ্ন প্রচুরভাবে দিতে হইবে, যাহাতে ছাত্ররা বহুবার সঠিক উত্তর দিতে পারে। এই সফলতার আনন্দই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবে এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় দান করিবে। এইভাবে কাজ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাদের অভ্যাস দৃঢ়তর হইবে। তখন তাহারা ক্রমশঃ কঠিনতর প্রশ্নসমাধান করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপ

* Learning seem to be best explained as a process of reward (Skinner: 'Educational Psychology'.)

ব্যবস্থা না করিয়া হঠাৎ কঠোর প্রশ্ন তাহাদের কাছে উপস্থাপিত করিলে তাহারা মুখতাড়া খাইয়া শিক্ষা সম্বন্ধে একেবারে বিমুখ হইয়া উঠিবে।

(খ) শিক্ষাতত্ত্বে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ : শিক্ষার ব্যাপারে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াকে ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য স্যাণ্ডিফোর্ড সাহেব ২৩টি সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (Sandiford : Educational Psychology, pp. 202-204)। এই সমস্ত সূত্রগুলির স্মরণীয় সারার্থ এই :

১। কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াকে দৃঢ় করিবার জন্য পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন (থর্ণডাইকের পুনরাবৃত্তিবাদের সহিত তুলনীয়)।

২। অত্যন্ত তীব্র প্রতিক্রিয়া অনেক সময় বন্ধনী সৃষ্টিতে ব্যাঘাত করে। এইজন্যই তীব্র তিরস্কার প্রভৃতি শিক্ষার ব্যাঘাত সৃষ্টিকর।

৩। একটানা কাজের চেয়ে সবিশ্রাম কাজ অধিকতর ফলপ্রসূ হয়।

৪। বহুদিন অনভ্যাসে বন্ধনীর শক্তি শিথিল হইয়া যায় এবং কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াজনিত শিক্ষা আমরা ভুলিয়া যাই।

৫। প্রাচীন অভ্যস্ত বিদ্যা ভুলিয়া যাইলেও পুনরায়ত্ত করিতে অল্পতর সময় লাগে।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার একটা প্রাথমিক শর্তই হইতেছে পূর্বাস্বাদজনিত ঔৎসুক্য ও প্রস্তুতি (anticipatory adjustment)। কুকুরের মুখে লালা নিঃসরণ হইবার কারণ মাংসপ্রাপ্তির পূর্বাস্বাদজনিত প্রস্তুতি ও ঔৎসুক্য।

শিক্ষার ব্যাপারে এই পূর্বাশা ও পূর্বাস্বাদজনিত প্রস্তুতি না থাকিলে কোনও শিক্ষা-ব্যবস্থাই ফলবতী হয় না। ক্লাসের ঘণ্টা পড়িল, ছেলেরা বুঝিল পড়িবার সময় হইয়াছে ; শিক্ষক আসিলেন, ছাত্ররা তাঁহাকে শিক্ষকের বিধি-নির্দিষ্ট ভূমিকায় গ্রহণ করিল, পড়াশুনার জন্য একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল। এই মানসিক প্রস্তুতি না থাকিলে অর্থাৎ ছাত্র যদি বিষয়ান্তরের চিন্তায় মগ্ন থাকে তাহা হইলে তাহাকে কোনও পাঠই দেওয়া যায় না।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ঠিক পূর্বেই যে উদ্দীপকটি (যেমন ঘণ্টাধ্বনি) দেওয়া হয়, তাহাকে 'ইঙ্গিত উদ্দীপক' (Cue Stimulus) বলা যাইতে পারে। আমরা জানি এই ইঙ্গিত উদ্দীপকটি ঠিক সময়ে প্রযুক্ত না হইলে S-CR

বন্ধনীটি সৃষ্টি হয় না। শিক্ষাতত্ত্বে ইহা একটি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য। ক্লাশে পড়াইবার সময় ঠিক যখন ছাত্রের প্রয়োজন হইবে সেই সময়টিতেই যদি সে শিক্ষকের সাহায্য পায়, তাহা হইলেই তাহার শিক্ষাটি ভাল হইবে।) এইজন্য রচনা প্রভৃতি সমাপ্ত হইবার অনেক পরে তাহার রচনার "post mortem" সংশোধনের ফল ভাল হয় না। (এইজন্যই একটি ভাষা ভাল করিয়া শিখিতে হইলে সেই ভাষাভাষী পরিবেশে শেখানো ভাল হয়।)

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াটি কতকগুলি পর্ব বহিয়া একটা পারম্পরিক ক্রম অনুসারে চলে এবং ক্রমশঃ S ও CR-এর মধ্যবর্তী প্রক্রিয়াগুলি বাদ যায়। একটি ভেড়াকে প্রয়োগশালায় লইয়া আসা হইল, একটি টেবিলের উপর তাহাকে রাখা হইল, উপযুক্ত সাজসজ্জা পরানো হইল, ঘণ্টাধ্বনি করা হইল এবং পরে একটা বৈদ্যুতিক "শক্" লাগানো হইল। ইহার ফল হইল টেবিল হইতে ভেড়াটির লম্ফ প্রদান। পরে বার বার এই প্রক্রিয়ার ফলে দেখা যাইল, ঐ ভেড়াটি প্রথমত "শক্" খাইলে তবে লাফ দিত, পরে ঘণ্টা ধ্বনিতে, পরে পোশাক পরাইতে এবং আরও পরে শুধু টেবিলের উপর রাখিতে না রাখিতেই সে লাফ মারিত। এইভাবে মধ্যবর্তী পর্বগুলি উঠিয়া যায়। হলিঙ্ওয়ার্থ (Hollingworth) এই ব্যাপারটিকে "telescoping" আখ্যা দিয়াছেন।

এই "telescoping out" হওয়ার ব্যবপারটি শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব। একজন ছাত্র হয়ত পড়াশুনা তৈয়ারী করে নাই বলিয়া তাহাকে ছুটির পর আধ ঘণ্টার জন্য আটকাইয়া রাখিয়া পড়া তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করা হইল। এখন তাহার প্রাথমিক 'S' হইল পাঠে অমনোযোগ; শেষ 'R' হইল আধঘণ্টা (৪॥টা পর্যন্ত) বাড়তি থাকা, আর মাঝের জিনিসগুলি হইল পড়াটি তৈয়ারী করিয়া দেওয়া, সংশোধিত হওয়া, শিক্ষকের নির্দেশ পালন করা। এখন ছাত্রটিকে যদি প্রায়ই আধ ঘণ্টা রাখা হয়, তাহা হইলে শুধু প্রাথমিক "S" ও শেষ "R" অর্থাৎ ৪॥টা বাজা, এই দুইটির মধ্যেই সংযোগ স্থাপিত হইবে। মাঝের কাজগুলি অর্থাৎ সংশোধনী চেষ্টা, পড়শুনা করা,—এইগুলি বাদ যাইবে; সে শুধুই ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করিয়া কালক্ষেপ করিবে। ইহাতে তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

শিক্ষককে এই তত্ত্বটি মনে রাখিতে হইবে। শাস্তির সহিত শাস্তির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তুটি সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে, নতুবা অপরাধী তাহার শাস্তিকে কৃত অপরাধের একটা অখণ্ডনীয় ফল মাত্র মনে করিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইবে, তাহার আত্ম-সংশোধনের মাঝের প্রক্রিয়াগুলি বাদ যাইবে।

(গ) শিক্ষাতত্ত্বে গেস্টাল্ট মতবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ ঃ এই মতের দৃশ্য বস্তুর সংগঠন ও অন্তর্দৃষ্টির কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। শুধু দর্শন-ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই যে এই নিয়মগুলি প্রযুজ্য তাহা নহে, সমস্ত অভিজ্ঞতার ব্যাপারেই ইহা সমানভাবে প্রযুজ্য। কাজেই শিক্ষা ব্যাপারেও এই নিয়মগুলি কার্যকরী হইবে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিনিয়তই নূতন নূতন জীবন পরিবেশে নূতনভাবে জোট পাকাইয়া, নূতন ভাবে সংগঠিত হইয়া নূতন নূতন এককের সৃষ্টি করে। এইজন্যই কুহ্লার (Kohler) বলিয়াছেন, শিক্ষা হইতেছে একটা সক্রিয় সংগঠনকারী (Learning may be described as an organising process. Kohler—Gestalt Psychology P. 267) প্রণালী মাত্র।

নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইবামাত্র শিক্ষার্থীর কাজ হইতেছে নূতন পরিবেশে তাহার অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে নূতন করিয়া সাজাইয়া ঠিক ভাবে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া। পুরাতনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নূতনকে গ্রহণ এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে অভিজ্ঞতাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ণয় করিতে পারিলেই সমস্যার সমাধান হয়। "All problems are solved as soon as the learner has achieved insight into their essential relationship" : Hartman)।

একটি ধূসর বর্ণের বাক্সের মধ্যে খাদ্য রাখিয়া একটি জন্তুকে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে শিক্ষা দেওয়া হইল। পরে 'ক' ও 'খ' দুইটি বাক্স রাখিয়া তাহাকে খাদ্য খুঁজিয়া লইতে দেওয়া লইল। "খ" বাক্সটি ধূসরতর বর্ণের এবং প্রত্যেক বারেই "খ" বাক্সের মধ্যেই খাদ্য রাখা হইল। প্রাণীটি প্রত্যেক-বারেই খাদ্য নির্ভুলভাবে খুঁজিয়া বাহির করিল। এইবার বাক্স দুইটির সংস্থান পরিবর্তন করা হইল। তাহাতেও ঠিক বাক্সটিকেই (খ) খুলিয়া সে খাদ্য

সংগ্রহ করিত। এইবার "ক" বাক্সটি সরাইয়া একটি তৃতীয় বাক্স "গ" দেওয়া হইল। এই বাক্সটি "খ" অপেক্ষা আরও ধূসরতর। এইবার প্রাণীটি কোন্ বাক্সটি খুলিবে? মাঝারি ধূসর বর্ণের বাক্সের সেই নির্দিষ্ট (specific) উদ্দীপকেই কি সে সাড়া দিবে? না, সে "গ" বাক্সটিই খুলিবে। "খ"-এর সহিত "গ"-এর সম্পর্ক হইতেছে 'অধিকতর ধূসরতা'; এই অধিকতর ধূসরতার সম্পর্কবোধটাই তাহাকে "গ" বাক্সটি খুলিতে শিক্ষা দিবে—বিধি-নির্দিষ্ট (specific) উদ্দীপক তাহা দিবে না।

এই পারস্পরিক 'সম্পর্কবোধটি' সৃষ্টি করিবার জন্য কি কি নিয়ম কাজ করে তাহা পূর্বেই কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। সেই নিয়মগুলি ছাড়া আরও দুইটি নিয়ম আছে—generalisation ও differentiation.

কাঁচা আম সবুজ এবং টক্। এই জাতীয় দু'চারটি অভিজ্ঞতা হইতে আমরা generalise করি সবুজ আম মাত্রই টক্। পরে যখন দেখি, নেংড়া, বোম্বাই প্রভৃতি আম সবুজ হইলেও বেশ মিষ্ট, তখন আমরা আবার differentiate করি—"সবুজ আম মাত্রই টক্ নহে।" এইভাবেই আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞান অগ্রসর হইতে থাকে। ৪×২, ৮×৪, ১৫×৩ প্রভৃতি গুণ করিয়া দেখি গুণফলটি ভারী সংখ্যা হইতেছে। তখন সিদ্ধান্ত করিলাম, "গুণ করিলে সংখ্যা ভারী হয়।" কিন্তু যখন ৪×½, ৮×¼, ১৫×⅓ জাতীয় গুণগুলি করিলাম তখন অভিজ্ঞতার ধাক্কা লইয়া বুঝিলাম, গুণ করিলেই যে সংখ্যাগুলি ভারী হইবে, ইহা সর্বত্র ঠিক নহে। এই generalise করিয়া যে নিয়মটি খাড়া করিয়াছিলাম, differentiate করিয়া তাহার ব্যতিক্রমটি আবিষ্কার করিয়া শিক্ষাকে পূর্ণতর করিলাম, অতীত অভিজ্ঞতাকে নূতনের আলোকে ঢালিয়া সাজাইলাম। গাড়ীর যেমন গতি ও 'ব্রেক্',—অভিজ্ঞতারও তেমনি generalisation ও differentiation; এই দুইটি প্রণালীর কোনটিরও বাড়াবাড়ি বাঞ্ছনীয় নয়। প্রতিনিয়তই যদি আমরা generalise করিয়া নিয়ম তৈয়ারী করি, তাহা প্রায়ই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের সৃষ্টি করে। কলিকাতার একজন বা দুইজন লোক আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিল। আমি অমনি generalise করিয়া বসিলাম

"কলিকাতার লোকগুলি বড় দুষ্ট"—এ সিদ্ধান্ত ঠিক হইবে না। অপর পক্ষে প্রতিনিয়তই যদি আমরা differentiate করিয়া ব্যতিক্রমই সন্ধান করি, তাহা হইলে অভিজ্ঞতার বস্তুপুঞ্জের মধ্যেও মূর্খ থাকিব, কোনও সমাধানই স্থির করিতে পারিব না, অভিজ্ঞতার 'বাঁশবনে ডোম কানা' হইয়া জড়ধীর মত আচরণ করিব।

এই generalisation ও differentiation-এর দুইটি নিয়ম ছাড়াও, গেস্টাল্ট্-মনোবিদ্যার কতকগুলি ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক আছে। যথা—

(১) যে কোনও সমস্যা শিক্ষার্থীর কাছে সমগ্রভাবে উপস্থাপিত করিতে হইবে। শিক্ষক হয়ত তাঁহার ছাত্রকে বীজগণিতের 'factor' বুঝাইতে অথবা পাটীগণিতের ভগ্নাংশ বুঝাইতে চাহেন। এখন তাঁহার কাজ হইবে খণ্ড হইতে পূর্ণের দিকে না যাইয়া পূর্ণ হইতে তাহার অংশীভূত খণ্ডের সম্পর্ক বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা এবং সেই প্রসঙ্গেই factor বা ভগ্নাংশের উপস্থাপন করা।

(২) শিক্ষার্থীকে তাহার কাজের গতি ও যতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সময়মত তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। তাঁহার কাজ হইবে ছাত্রদের অগ্রগতিকে শুধু সাহায্য করা, জোর করিয়া ঠেলিয়া (assisting and not pushing the student's rate of progress.) দেওয়া নয়।

(৩) শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও emotional অবস্থার সংবেগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে তাহার সমস্যার সমাধানের জন্য ইঙ্গিত দিতে হইবে।

(৪) ছাত্রের প্রয়োজন হইলেই তাহাকে প্রচুর সাহায্য দিতে হইবে। এই সাহায্যটি এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে ছাত্রদের আত্মপ্রচেষ্টা (self activity) বিশেষভাবে প্রেরণাযুক্ত হয়।

(৫) ধর্মতত্ত্বে একটা কথা আছে "আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।" এই কথাটি শিক্ষাতত্ত্বেও প্রায়ই প্রযুক্ত হয়। অভ্যাস সৃষ্টির দিক দিয়া, নিরর্থক শব্দ মুখস্থ করিবার দিক দিয়া এই আবৃত্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যাঁহারা অনুষঙ্গবাদ ও বন্ধনীবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারাও এই

পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনকে খুব বড় একটা স্থান দিয়াছেন, কারণ পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়াই স্নায়ুগত (বা ভাব-সম্বন্ধগত) বন্ধনীগুলির সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়। কাজেই অভ্যাস তৈয়ারীর দিক দিয়া অনুশীলন (drill), পুনরাবৃত্তি, এমনকি যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিরও যথেষ্ট প্রয়োজন। কিন্তু ওয়ার্দাইমার প্রভৃতি গেস্টাল্ট্-বাদিগণ যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির চেয়ে অন্তর্দৃষ্টিমূলক উপলব্ধির (understading) উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা বলেন, অন্ধ অনুশীলন আমাদের বুদ্ধিকে "নিয়মের" দাস করিয়া ফেলে, ফলে আমাদের স্বাধীন চিন্তার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কাজেই গণিত প্রভৃতিতে বিশেষ একজাতীয় অঙ্ক শিখাইতে হইলে সেই জাতীয় বহু কঠিন কঠিন অঙ্ক না কষাইয়া বাছা-বাছা ছোট অঙ্কের ভিতর দিয়া সমাধানের তত্ত্বটি সম্বন্ধে উপলব্ধির সৃষ্টি করিলেই সমাধানটি বেশী আয়ত্ত হইবে। তবে ক্ষিপ্রকারিতার জন্য অভ্যাসের ও অনুশীলনের প্রয়োজন বরাবরই থাকিবে।

(৬) গেস্টাল্ট্ মতে ভাল শিক্ষকের কাজ হইতেছে ছাত্রদের অন্তর্দৃষ্টিকে উৎসাহিত করিয়া নূতন নূতন সমস্যাকে বুদ্ধিমানের মত আক্রমণ ও আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত মনোভাব তৈয়ারী করা।

মোট কথা, উপসংহারে বলা যায়, সমস্ত মতবাদেই কিছু না কিছু সত্য আছেই। শিক্ষকের কর্তব্য এই পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত সত্যগুলিকে সমন্বিত করিয়া সতর্কতা ও নিষ্ঠার সহিত পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষণের পথে অগ্রসর হওয়া।

শিক্ষার পথে সাধনা ও বিশ্রাম

কবি বলিয়াছেন—"অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং।
স্বল্পং তথায়োর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ॥"

সুতরাং শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েরই প্রশ্ন হইতেছে, আমাদের হাতে যেটুকু সময় আছে, সেইটুকুর সদ্ব্যবহার করিয়া কিভাবে ন্যূনতম সময়ে সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করা যায়।

মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে নানা প্রকার নির্দেশ দিয়াছেন—কিভাবে একাগ্রভাবে মনকে কেন্দ্রীভূত করা যায়, কিভাবে 'ভাব-সম্বন্ধ' বা 'অনুষঙ্গ' দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলিকে একত্র গাঁথিয়া রাখা যায়, ইত্যাদি। বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদে আমরা সেগুলি আলোচনা করিব না। আমরা ধরিয়া লইতেছি, একই মানুষ একই রকম বুদ্ধির যন্ত্র লইয়া কাজ করিতেছে। এই অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিভাবে কাজ করিলে অর্থাৎ কাজ ও বিশ্রামের সময়গুলি কিভাবে সাজাইলে তাহার সফলতা সর্বাধিক হইবে?

ধরা যাইতে পারে, একজন ছাত্রের হাতে একটি বিষয় অধ্যয়ন করিবার জন্য সর্বশুদ্ধ ১২০ ঘণ্টা সময় আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, পড়িবার সময়গুলি কিভাবে ভাগ করিলে, প্রত্যেক বারে কতক্ষণ করিয়া কাজ করিলে এবং কতখানি সময় বিশ্রামের জন্য অবসর রাখিলে তার ফল শ্রেষ্ঠ হইবে।

এই ১২০ ঘণ্টা সময়কে আমরা হয়ত এইভাবে ভাগ করিতে পারি—

১ বারে—	একটানা	১২০ ঘণ্টা
২ "	"	৬০ ঘণ্টা করিয়া
১০ "	"	১২ " "
৬০ "	"	২ " "
১২০ "	"	১ " "
২৪০ "	"	½ " "

প্রথম তিনটি ব্যবস্থার ফল ভাল হইবে না, ইহা নির্বিচারে বলা চলে। তবে শেষের তিনটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ হইবে তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ।

এখন পর্যন্ত ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া এই জাতীয় পরীক্ষা খুব বেশী হয় নাই, তবে পাটীগণিত, টাইপ্-রাইটিং প্রভৃতির দক্ষতা লইয়া কিছু কিছু পরীক্ষা হইয়াছে।

থর্ণডাইক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ১৯২টি ছাত্র লইয়া তাহাদের যোগ করিবার ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পড়িবার সময়গুলিকে ৫, ৭½, ১০, ১১¼, ১৫ এবং ২২½ মিনিট এইভাবে ভাগ করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, শেষোক্ত সময়গুলি অধিকতর কার্যকরী হইয়াছে।

কিন্তু পাইল্ (Pyle), স্টার্চ (Strach), এবিঙ্গহোস (Ebbinghaus), জোস্ট (Jost) প্রভৃতি পণ্ডিতের পরীক্ষার ফল অন্যরূপ দেখা গিয়াছে। ইঁহাদের পরীক্ষার ফলে ৩০ মিনিটের বিভাগগুলি সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হইয়াছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যাহা আলোচনা করা হইল, ইহাতে কতখানি সময় এক সঙ্গে একাসনে বসিয়া কাজ করিলে ভাল হয় তাহারই বিচার হইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়াও, আর একটি ভাবিবার কথা আছে। কতক্ষণ ধরিয়া একটি কাজ অভ্যাস করিতে হইবে তাহা না হয় স্থির হইল, কিন্তু প্রথম অভ্যাসের পর কতখানি বিশ্রাম করিয়া অথবা কতখানি সময় বাদ দিয়া দ্বিতীয় বার অভ্যাস আরম্ভ করিতে হইবে, ইহাও অবশ্য ভাবিবার কথা।

এই সম্বন্ধে ডিয়ারবোর্ণ (Dearborn) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ছাত্রদের দুইটি দলে ভাগ করিলেন, উভয় দলই দিনে দশ মিনিট করিয়া অভ্যাস করিল; তবে প্রথম দলটি অভ্যাস করিল দিনে একবার মাত্র, আর দ্বিতীয় দলটি অভ্যাস করিল দিনে দুইবার করিয়া। এই পরীক্ষায় দেখা গেল, প্রথম দলটি ঐ কাজটি ১৬ দিনে এবং দ্বিতীয় দলটি ১৮ দিনে করিয়াছিল।

লিওন্ (Lyon) সাহেব কবিতা মুখস্থ করার ব্যাপার লইয়া পরীক্ষা চালান। পরীক্ষাটি ছিল একাসনে বসিয়া মুখস্থ করা, অর্থাৎ দিনে একবার মাত্র আবৃত্তি করা। অর্থযুক্ত কবিতা বা গদ্যের অনুচ্ছেদ মুখস্থ করার ব্যাপারে দেখা গিয়াছিল যে, এই দুইটি প্রক্রিয়াতেই প্রায় একই রকম ফল হইয়াছিল। কিন্তু

এই সংখ্যা সংক্রান্ত বিষয় অথবা অর্থহীন বাক্য মুখস্থ করিবার ব্যাপারে দেখা গিয়াছিল, দিনে একবার করিয়া অভ্যাস করিলেই সময়ের সদ্ব্যবহার বেশী হয়।

অর্থহীন শব্দসমষ্টি মুখস্থ করিবার ব্যাপারটি জোস্ট সাহেব অন্য একভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একটি অনুচ্ছেদকে দিনে দশবার আবৃত্তি করাইয়া—তিনদিন ধরিয়া আবৃত্তি করা এবং সেই অনুচ্ছেদটিকেই একদিনে ত্রিশবার আবৃত্তি করা, এই দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রথম ব্যবস্থায় শতকরা ১৫ ভাগ সুবিধা বেশী হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা অপেক্ষা খণ্ড খণ্ড ভাবে সবিশ্রাম কাজ করিলে কাজ ভাল হয় কেন?

গ্রাহাম ওয়ালার (Graham Wallar) বলেন, অবিশ্রাম অভ্যাসের মধ্যে মন এমন একটি অবসর পায় না, যাহাতে অভ্যাসলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া ভবিষ্যৎ দক্ষতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু সবিশ্রাম অভ্যাসের মধ্যে সেই অবসরটুকু মনের জুটিয়া থাকে। সেইজন্যই সবিশ্রাম অভ্যাসে শক্তি ও সময়ের অপচয় কম হয়।

জার্মানদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে, "আমরা শীতকালে সাঁতার কাটিতে শিখি এবং গ্রীষ্মকালে স্কেট খেলিতে শিখি।" অথচ মজার কথা হইতেছে, তাহাদের দেশে শীতকালে সাঁতার কাটিবার মত জলের অবস্থা থাকে না এবং গ্রীষ্মকালে স্কেট খেলিবার মত জমাট বরফও রাস্তাঘাটে থাকে না। অধ্যাপক জেম্‌স এই প্রবাদটির উপর খুব বেশী একটা মনস্তাত্ত্বিক মূল্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে আমরা সাঁতার কাটিতে অভ্যাস করি বটে, কিন্তু সেই অভ্যাসের ফলগুলি দানা বাঁধিতে বা পরিপক্ক হইতে আরম্ভ করে শীতের বিশ্রামের নিরিবিলি সময়টিতেই।

এইজন্যই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, হয়ত একটি অঙ্ক লইয়া আমরা মাথা ঘামাইয়া কূল-কিনারা পাইতেছি না। তাহার পর ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরে ঘুমের মধ্যেই অথবা ঘুমের বিশ্রামের পরই অঙ্কটির সমাধান ঠিক হইয়া গেল।

কেন এরূপ হয়? অধ্যাপক জেম্‌স বলেন, জাগ্রত ভাবে অভ্যাসনিরত

থাকার সময় অনুষঙ্গের (association) গোলমাল, একাগ্রতার ব্যাঘাত, মনের একগুঁয়েমি প্রভৃতি কারণে সফলতায় বিঘ্ন আসে, কিন্তু নিদ্রার সময় বিশ্রামের নিরিবিলি অবসরে সেই বিঘ্নগুলি থাকে না বলিয়া সমাধানটি সহজসাধ্য হইয়া উঠে। এই ব্যাখ্যায় অধ্যাপক স্যাণ্ডিফোর্ড আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, অভ্যাসের অভাব আমাদের দক্ষতাকে নিপুণতর করিয়া তুলিবে, ইহা ভাবিতে পারা যায় না এবং সবিশ্রাম অভ্যাসে নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস অপেক্ষা ফল ভাল হইলেও, এ কথাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, বিশ্রামের মেয়াদ বেশী দীর্ঘ হইলেও ফল ভাল হয় না।

অধ্যাপক থর্ণডাইক বলেন, অনভ্যাস যে পটুতা বৃদ্ধি করে তাহা ঠিক নয়। তবে অনভ্যাসের সময় যে পটুতা বৃদ্ধি হয় তাহার কারণ এই :

(১) অনভ্যাসের সময় পরিশ্রমজনিত অবসাদটি কাটিয়া গিয়া আমাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলি সবল হয়।

(২) একটানা অভ্যাসের সময় মনের মধ্যে যে একটা বিরক্তি ও অমনোযোগিতার ভাব আসে, অনভ্যাসের সময় তাহা কাটিয়া যায়।

(৩) উৎসাহের আতিশয্যে অভ্যাসের সময় অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে ভুল পথে ছুটাছুটি করি, বিশ্রামের স্থৈর্যের সময় তাহা সংযত ও সংশোধিত হইয়া যায়।

সুতরাং থর্ণডাইক-এর মতে অনভ্যাসের সময় যে পটুতা লাভ হয়, তাহা জেম্‌স্‌-বর্ণিত অভ্যাসের অন্তঃপুতির (Consolidation) জন্য ততটা নহে, যতটা হইতেছে বিশ্রামজনিত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য।

শিক্ষা-তত্ত্বে আর একটি প্রশ্ন প্রায়ই অনেকের মনে উদিত হয়। প্রশ্নটি হইতেছে—আমাকে যদি একটি দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করিতে হয়, তাহা হইলে কবিতাটিকে সমগ্রভাবে আবৃত্তি করিলে ফল ভাল হইবে, না, অংশতঃ খুচরা-খুচরা ভাবে আবৃত্তি করিলে ফল ভাল হইবে? এই বিষয়টিও পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, অর্থযুক্ত কবিতা হইলে, ৫ হইতে ২৪০ পংক্তি পর্যন্ত দীর্ঘ কবিতাগুলি সমগ্রভাবে পাঠ করিলে বেশী শীঘ্র মুখস্থ হয়।

শারীরিক দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, অংশতঃ কাজ

করিলে অল্প সময়ের মধ্যে কার্য সিদ্ধি হয়। পেক্‌স্টাইন (Pechstin) প্রভৃতি এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শুধু শারীরিক দক্ষতা বিষয়ে নয়, অর্থহীন শব্দসমষ্টি মুখস্থ করিবার সময়ও অংশতঃ কাজ করিলে কম সময়ে বেশী কাজ হয়। তিনি বলিয়াছেন, সমগ্রভাবে পাঠ করিলে সব সময়েই যে সময়ের মিতব্যয় হয় তাহা নহে। যদি একাসনে বসিয়া একটানা ভাবে পাঠ করিতে হয়, তাহা হইলে সমগ্র কবিতাটি প্রত্যেক বারে আবৃত্তি করার চেয়ে একটু একটু করিয়া মুখস্থ করিয়া অগ্রসর হইলেই পাঠ ভাল হয়, সবিশ্রাম কাজ করিলে অর্থাৎ কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুই একদিন বিশ্রাম করিলে, সমগ্রভাবে কাজটি বেশী ফলপ্রস্থ হয়।

বিশ্রামের মেয়াদটি কতখানি প্রলম্বিত করিলে দক্ষতা অর্জনে সুবিধা হয়, সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা হইয়াছে। ধরা যাক, এইমাত্র আমি একটি কবিতা মুখস্থ করিলাম। মুখস্থ করিবার পর যদি পুনরাবৃত্তি না করা হয়, অর্থাৎ মুখস্থ করার পর সঙ্গে সঙ্গেই যদি পড়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এক ঘণ্টার পর দেখিব, প্রায় $\frac{1}{2}$ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি, তৃতীয় দিনে $\frac{2}{3}$ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি এবং ১ মাস পরে $\frac{3}{4}$ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি। অবশ্য মুখস্থ হইবার পর যদি আরও অনেকবার আবৃত্তি করা হয়, তাহা হইলে এই বিস্মৃতির হারটি আরও অনেক কম হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও কিছু শিখিবার অপেক্ষা তাহা ভুলিয়া যাওয়াটা কঠিনতর। আমরা অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণমালা ইচ্ছা করিলেও ভুলিতে পারি না, কিন্তু একটা ভাষার বর্ণমালা শিখিতে খুব বেশী সময় লাগে না।

অর্থহীন শব্দসমষ্টি শিক্ষা শেষ হইবার পর কতটুকু সময় অতীত হইলে কতটুকু অংশ মনে থাকে তাহা লইয়া এবিঙ্গহৌস সাহেব পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, শিক্ষা-সমাপ্তির পর ৫ মিনিট সময় গত হইলে ৯৮% ভাগ মনে থাকে, ১০ মিনিট পরে ৮৯% ভাগ, ৭ ঘণ্টা পরে ৭১% ভাগ, ৮ ঘণ্টা পরে ৪৭% ভাগ এবং ২৫ ঘণ্টা পরে ৬৮% ভাগ মনে থাকে। কিন্তু বিবেচ্য এই যে, ৪৮ ঘণ্টা পরে ৬৮% স্থলে ৬৯% ভাগ মনে থাকে, অর্থাৎ একদিন গত হইলে যতটা মনে থাকে, দুইদিন গত হইলে তাহার চেয়ে বেশী মনে থাকে।

ব্যালার্ডও এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি গড়ে বারো বৎসর দশ মাস বয়স্ক ছাত্রদের লইয়া কাউপার-এর 'Loss of Royal George' নামক কবিতাটি পড়িতে দেন। তের মিনিটকাল পড়া হইবার পর তাহাদের নিকট হইতে বইগুলি কাড়িয়া লওয়া হইল এবং ছাত্রদের বলা হইল কবিতাটি মুখস্থ লিখিতে। পূর্ব হইতে যে সমস্ত ছাত্রদের এই কবিতাটি সম্বন্ধে কিছুমাত্র পরিচয় ছিল, তাহাদের বাদ দিয়া মাত্র ১৯জন ছাত্রকে পরীক্ষা করা হইল। দেখা গেল, এই ১৯ জন ছাত্রের মধ্যে একজন মাত্র ছাত্র ৩৬ লাইনের সমগ্র কবিতাটি লিখিতে সমর্থ হইয়াছে, আর অবশিষ্ট ছাত্রদের কৃতকার্যতার গড় হইল ২৭'৬ লাইন।

এই ঘটনার দুইদিন পরে তিনি ঐ বালকদের আকস্মিকভাবে আবার পরীক্ষা করিলেন। শিক্ষক বা ছাত্র কেহই ঐ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল না; সুতরাং এই সময়টির মধ্যে অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি হয় নাই। এবারের পরীক্ষায় দেখা গেল যে, গতবারের একজনের জায়গায় ৮ জন ছেলে পুরা কবিতাটি লিখিতে সমর্থ হইয়াছে এবং সাধারণ ছাত্রদের কৃতকার্যতার গড় হইয়াছে ৩০'৬ লাইন। আরও দেখা গেল যে, এই ১৯ জন ছাত্রের মধ্যে অবনতি একজনেরও হয় নাই, আর উন্নতি হইয়াছে ১৬ জনের।

এই অদ্ভুত ফল দেখিয়া তিনি বিভিন্ন স্কুলে প্রায় ৫১৯২ জন ছাত্রের উপর তাঁহার পরীক্ষা চালাইলেন এবং বিভিন্ন দিনের ব্যবধানে কাহার কতটা মনে থাকে তাহাও লক্ষ্য করিলেন। তিনি দেখিলেন, একদিনের ব্যবধানে শতকরা ১'৬ ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু দুইদিনের ব্যবধানে শতকরা ৯'৪ এবং তিন দিনের ব্যবধানে ৬'১ লাভ হইয়াছিল। আবার চারদিনের ব্যবধানে শতকরা ২ ভাগ, পাঁচদিনে ৫'৮ ভাগ, এবং সাতদিনে ১২'১ ভাগ ক্ষতি হইয়াছিল।

এইসব পরীক্ষার মোটামুটি সিদ্ধান্ত এইরূপ:

(১) একটানা পড়ার চেয়ে সবিশ্রাম পড়া ভাল।

(২) অর্থযুক্ত অনুচ্ছেদ বা কবিতা মুখস্থ করিতে হইলে (এবং কবিতাটির দৈর্ঘ্য ২৪০ লাইনের বেশী না হইলে) কবিতাটি প্রত্যেক বারেই সমগ্রভাবে দুইবার করিয়া প্রতিদিন পড়িলে কাজ ভাল হয়।

(৩) নিরর্থক শব্দসমষ্টি বা টুকিটাকি জ্ঞানের বিষয় মুখস্থ করিতে হইলে দশ-পনেরো হইতে ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত সময় প্রতিদিন বা একদিন অন্তর পাঠ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৪) শারীরিক দক্ষতার ব্যাপারে অংশতঃ অগ্রসর হইয়া কাজ করিলে সময়ের অপচয় কম হয়।

(৪) মুখস্থ হইবার পর আরও খানিকক্ষণ আবৃত্তি করিলে বেশীদিন মনে থাকার সুবিধা হয়।

(৬) সবিশ্রাম সাধনার পথে দুইদিনের বিশ্রামটিতে অপচয় সর্বাপেক্ষা কম হয়।

সাধনার পথে চলিতে এই সমস্ত তথ্যগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। তাহা হইলেও, এইগুলি লইয়া বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। একটা কাজ একসঙ্গে দশ মিনিট করিব, কি আধ ঘণ্টা করিব, ঘড়ি ধরিয়া তাহা লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। কাজের মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ এবং কৌতূহল বর্তমান থাকিলে ঘড়ির কাঁটার গতি দেখিয়া মাঝপথে জোর করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিবারও প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ কাজে আনন্দ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী মনোযোগকে দুর্বল বা বিক্ষুব্ধ করিয়া না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত একটানাভাবে কাজ করিলে শক্তির অপচয়ের কোনও আশঙ্কা নাই। তবে মনোযোগ যখন ব্যাহত হয়, মন যখন ক্লান্ত হইয়া উঠে, তখন খানিকটা সময় বিশ্রাম করা ভাল, কিন্তু এই বিশ্রামের সময়টি এমন দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়, যাহাতে একটানা অনভ্যাসে ভাব-সম্বন্ধের বা অনুষঙ্গের (association) গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া প্রথম অভ্যাসের ফলটুকু নষ্ট হইয়া যায়।

ইহা ছাড়াও আর একটি কথা আছে। একটানা কাজ করিবার ক্ষমতা সকলের সমান নাই। কাজেই সকলের জন্য বাঁধাধরা নিয়ম করিয়া দিলে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সম্ভাবনা অনেকটা নষ্ট করিয়াই দেওয়া হয়। প্রতিভার একটা লক্ষণই হইতেছে, একটানা ভাবে অধিকতর সময় কাজ করিবার ক্ষমতা। সুতরাং প্রতিভাশালী বালকদের প্রতি যদি সব সময়ই উপদেশ দেওয়া হয়, "সাবধান, আধ ঘণ্টার বেশী পড়িও না, এইভাবে বিশ্রাম করিবে,

এইভাবে পড়াশুনা করিবে", তাহা হইলে তাহার কাজে স্ফূর্তির উপর জোর করিয়া লাগাম পরাইয়া তাহার শক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলা হয়।

বিজ্ঞানের তথ্যগুলি না-জানার মধ্যে বাহাদুরী কিছু নাই, তাহা একপ্রকার অন্ধতারই নামান্তর মাত্র ; আবার বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সম্বন্ধে গোঁড়ামিও অন্য এক জাতীয় অন্ধতা আনয়ন করে। সাধনার পথে চলিতে হইলে এই উভয় জাতীয় অন্ধতা পরিত্যাগ করিয়াই চলা বাঞ্ছনীয়।

ধরিয়া লইলাম যে, শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সম্যক্ প্রয়োগ করিয়া আমরা শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষার পথে পরিচালিত করিলাম। তাহা হইলেই তাহাদিগের শিক্ষার গতিটি কি একটানা উর্ধ্বমুখী হইবে ? না, কারণ শিক্ষার পথটি কখন কুব্জ হইয়া, কখনও ন্যুব্জ হইয়া, উপরে উঠিয়া, নীচে নামিয়া, তাল ভঙ্গ করিয়া, খানা-ডোবা-খাত সৃষ্টি করিয়া, ছন্দোহীন অসম তালে চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাহার একটা চরম শৃঙ্গ সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার পরেও সমতল অধিত্যকা কোনও সময়েই দৃষ্ট হয় না, প্রতিনিয়তই নিম্ন গতিকে সংযত করিয়া রাখিবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

আগ্রহ, অভিনিবেশ, শিক্ষার প্রণালী, পূর্বার্জিত অভ্যাস, বয়স, ক্লান্তি, বিরক্তি, বিশ্রাম-বিন্যাস প্রভৃতি শত শত জিনিসই শিক্ষার পথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অন্তরায়ের সৃষ্টি করে এবং তাহাদের অনেকগুলিকেই আমরা ঠিক নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না। তাহা হইলেও, সন্ধানী শিক্ষকের উচিত শিক্ষার পথের গতি, যতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ব্যবহারিক জ্ঞান রাখা, যাহাতে শিক্ষার হঠাৎ অবনতিতে তিনি নিরাশ হইয়া না পড়েন অথবা খানিকটা উন্নতি দেখিলেই ছাত্রের ভাবী সম্ভাবনা সম্বন্ধে একেবারে শেষ সিদ্ধান্ত না করিয়া বসেন। এই সাধনার সিদ্ধির পথে অর্থাৎ শিক্ষা ও সফলতার ক্রমটি নদী-স্রোতের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া, কখন কখনও ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। যদি 'ক' অক্ষরেখার দ্বারা সময় এবং 'খ' অক্ষরেখার দ্বারা দক্ষতা বা সফলতা ধরা বায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই শিক্ষা বা সফলতার রেখাটি একটানা উর্ধ্বগতিতে চলে না। মূল বিন্দু অর্থাৎ শিক্ষীর সুরু হইতে প্রথমেই একটা উন্নতি সূচিত হয়, পরে রেখাটি বহু উপত্যকা, অধিত্যকা ও খাতের

সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে-উঠিতে একটা শৃঙ্গের সৃষ্টি করে। আবার ইহার ঊর্ধ্বগতি মন্থর হইয়া যায়, আবার অবনতি আসে, আবার সামান্য উন্নতি আসে এবং চরম সফলতার পর আর উন্নতি হয় না। তখন সাধনার চরম প্রচেষ্টা দ্বারা এই উন্নতির মানটি বজায় রাখাই একটি দুঃসাধ্য সমস্যা হইয়া উঠে। সমগ্র শক্তিকে সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত রাখিতে হয়।

এই জন্যই ব্যালার্ড বলিয়াছেন, দক্ষতার পথটি হইতেছে একটি গোল স্প্রীংকে টানিয়া সোজা করিবার মত ব্যাপার। ইহা প্রথমটা খুব সহজ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন স্প্রীংটি সোজা করা হয় ব্যাপারটা তখনই শেষ হয় না। ঐ সোজাভাবে রাখাটাও কম কষ্টসাধ্য নয়। শিক্ষার সফলতা বিষয়েও এ কথা খাটে।

শিক্ষার গতিপথে অধিত্যকা (Plateaus in learning) :

শিক্ষার পথে উন্নতিটা যে মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া শিক্ষার মানচিত্রে (grap) একটা অধিত্যকা সৃষ্টি করে তাহা ব্রায়ান এবং হার্টার (Bryan and Harter) প্রথম টেলিগ্রাফের ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে আবিষ্কার করেন।

যখন এই অধিত্যকা দৃষ্ট হয় তখন উন্নতির ঊর্ধ্বগতিটি বন্ধ হয় বটে, তবে তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে না যে, উন্নতির প্রণালীটি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উপরের দিকে বৃদ্ধি যখন বন্ধ হইবে, তখন অন্যান্য দিকের কাজগুলি ভিতরের দিক হইতে অন্তঃপূর্তির দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে থাকে, অথবা নিম্নতর স্তরের অভ্যাসগুলি যান্ত্রিক (automatic) ও সরলতর হইতে থাকে।

অবশ্য অন্য কারণেও এই অধিত্যকার (plateau) সৃষ্টি হইতে পারে। ক্লান্তি, বিরক্তি, আগ্রহের অভাব, একঘেয়েত্ব প্রভৃতিও এই অধিত্যকা সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা দেখিয়াই শিক্ষকের হতাশ হইবার কিছু নাই।

উন্নতির চরমসীমা ঃ

অধিত্যকা দেখিয়া হতাশ হইবার কারণ হয়ত নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাই কি মনে করিতে হইবে যে, এই অধিত্যকার পর আবার উন্নততর শৃঙ্গের

সৃষ্টি হইবে? শিক্ষার চরমোন্নতির শৃঙ্গটি কোথায় অবস্থিত? শিক্ষারও একটা সীমা আছে। স্যাণ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, কোনও লোকই মিনিটে ৩০০ শব্দ টাইপ করিতে পারে না ও সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়াইতে পারে না, মানুষের শক্তিতে তাহা অসম্ভব। দক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতির দিক দিয়াও যেমন মানুয়ের চরম সফলতার একটা সীমা আছে, জ্ঞানের সঞ্চয়ের দিক দিয়াও তেমনই একটা সীমা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক পণ্ডিত বিদ্যা বা জ্ঞানের সম্ভাবনার যে একটা সীমা আছে, তাহা মানিতে চাহেন না। কিন্তু এ যুক্তি ঠিক নহে। আমরা জানি, উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পাইলেও সকলেই সব বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে না। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের মধ্যেই তাহার যে একটা সম্ভাব্য উৎকর্ষ আছে, তাহাও ব্যবহারিক জীবনে ফুটিয়া উঠে না; তাহার "যথাসাধ্য ভাল" কখনই "সম্ভাব্য ভালোর" খুব কাছাকাছি যাইতে পারে না; তবে চেষ্টা করিলে প্রায় সকলেরই "বর্তমান ভালটা" আরও ভাল হইতে পারে। এই তত্ত্বটিও পরীক্ষালব্ধ গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে।

টরেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেণিং স্কুলের পরিণত বয়স্কের শিক্ষকগণের (ইঁহাদের সকলেই আট বা ততোধিক বৎসরের অভিজ্ঞতাযুক্ত) মধ্যেও প্রতিদিন পাঁচ মিনিট করিয়া দশ দিনের অভ্যাসেই গণিতে অধিকতর দক্ষতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইহার কারণ হইতেছে, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহাদের অধিকাংশ বিষয়ের নৈপুণ্যকে "যথাসাধ্য ভালো"র পর্যায়ে ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ পায় না। লক্ষ লক্ষ স্নায়ুকোষের কোটি কোটি স্নায়ু-কেশ-পরিচালিত পথে যত প্রকার প্রতিক্রিয়া সম্ভব, তাহার সামান্য একটা ভগ্নাংশ মাত্রকেই আমরা ফুটাইয়া তুলিবার অবসর পাই। বংশগতির ধারা বহিয়াও আমরা যে লক্ষ লক্ষ সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহারও সামান্য অংশই বাস্তব কৃতিত্বে ফুটিয়া উঠে। আমরা অনেকেই চীনা বা রুশীয়ান্ ভাষা অভ্যাস করি নাই ও শিখি নাই—কিন্তু অভ্যাস করিলে হয়ত শিখিতে পারিতাম। অভ্যাস করিলে নাচিতে, গাহিতে, ছবি আঁকিতে, সেতার বাজাইতে, এমন কত কি করিতে পারিতাম। কাজেই অভ্যাস করিলে প্রায় সব জিনিসই খানিকটা

আয়ত্ত করা যায়। অবশ্য সব জিনিসই চরমভাবে আয়ত্ত করা হয়ত সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

চরম প্রতিভা যাঁহারা দেখাইয়াছেন, তাঁহারাও সাধারণ জিনিসগুলিকে অসাধারণ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এই পর্যন্ত। কিন্তু এই অসাধারণত্বটা সাধারণত্বের চেয়ে বহুগুণ বেশী নহে। সাধারণ খেলোয়াড় হয়ত ১১।১২ সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়াইতে পারেন, আর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দৌড়বাজ হয়ত ৯½ সেকেণ্ডে সেই কাজটি করিতে পারেন।

কিন্তু শেষের দিকের এই বাড়্তি নৈপুণ্যটুকু আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ইহার জন্য প্রচুর সময় ও অভ্যাসের প্রয়োজন। অর্থশাস্ত্রে যাহাকে "law of diminishing returns" বলে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহা প্রযুজ্য। যতই উন্নতিলাভ করিব, অধিকতর উন্নতিটা ততই কঠিনতর হইয়া উঠিবে। শুধু তাহাই নহে, চরম উন্নতি লব্ধ হইলেও তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখাও একটা কঠিন সমস্যা। প্রচুর সাধনা দ্বারা সিদ্ধিকে ধরিয়া রাখিতে হয়। অতীত কৃতিত্বের সুদ খাটাইয়া বিলাসী মহাজনের মত আরামে গৌরবের পদে অধিষ্ঠিত থাকা যায় না। শ্রেষ্ঠত্বের বিজয়লক্ষ্মী অত্যন্ত চঞ্চলা, চরম কৃতিত্বের শিখরটি যেমন সূক্ষ্ম তেমনই পিচ্ছিল। সেইজন্যই কৃতিত্বের শাস্তি হইতেছে অধিকতর সাধনা। দুরূহ সাফল্যকে অতন্দ্র সাধনায় প্রাণপণ যত্নে ধরিয়া রাখিতে হয়।

শিক্ষার সঞ্চারণ

দেহের মতো মনের দক্ষতা এবং কর্মশক্তির জন্যও অনেকে মনের কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যায়াম, সংযম প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁহারা বলেন, নিয়মিত অভ্যাস প্রভৃতির দ্বারা যদি আমরা মনের একটি বিশিষ্ট সাধনা করি, তাহা হইলে সেই বিশিষ্ট বিষয়ের দক্ষতা অন্যান্য বিষয়েও সঞ্চারিত হইয়া আমাদের জীবন-সংগ্রামে সাহায্য করিবে। মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের মধ্যে ধারণা ছিল ল্যাটিন, গ্রামার এবং গণিত অভ্যাস করিলে মনের শক্তি বর্ধিত হয় এবং বুদ্ধির বিকাশ হয়, যাহার ফলে মানুষের কর্ম-জীবনে প্রভূত উপকার হইতে পারে। বর্তমান যুগেও বহু লোক অর্থ খরচ করিয়া পেশাদার মনস্তাত্ত্বিকদিগের নিকট হইতে মনঃশক্তি, বুদ্ধি বা স্মৃতি বাড়াইবার জন্য নানাবিধ ব্যায়াম প্রক্রিয়ার "প্রেস্‌ক্রিপশন্" ক্রয় করেন।

কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই আজকাল বিশ্বাস করিতে চাহেন না যে, এক বিষয়ের দক্ষতা অন্য বিষয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে।

গ্রীক্ মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে, মনের সমস্ত কাজের পিছনে এক "আত্মা" জাতীয় কিছুর লীলা আছে। এই আত্মা হইতেছে সম্পূর্ণ এবং অবিভাজ্য ; সুতরাং আত্মার অংশবিশেষের উন্নতি হইলে সমগ্রভাবে আত্মারই উন্নতি হইল। কাজেই গণিতের অভ্যাসের দ্বারা মনের যে ধার দেওয়া হয়, সেই ধারাল মন দিয়া হয়ত কাব্যালোচনাও সহজসাধ্য হইবে। প্লেটো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই জাতীয় ধারণা পোষণ করিতেন। তবে তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, জ্যামিতি পাঠের দ্বারাই মনের তীক্ষ্ণতা সর্বাধিক হয়।

শক্তিবাদ (Faculty theory) ও সঞ্চারণ

পরবর্তী যুগে মনোবিদ্যায় "শক্তিবাদে"র (Faculty theory) উদ্ভব হইল। এই মতবাদের মূল বক্তব্যটা হইতেছে, মন জিনিসটা আগ্রহ, স্মৃতি, কল্পনা, যুক্তি, আয়ান (temperament), সঙ্কল্প (will) প্রভৃতি কয়েকটি

শক্তি দ্বারা গঠিত। এই শক্তিগুলি স্বাধীন ও পরস্পর সম্পর্ক-নিরপেক্ষ। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বই এই শক্তিগুলির বিভিন্ন মাত্রার সমবায়ে গঠিত। এখন যেহেতু এই শক্তিগুলি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুতরাং একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া দ্বারা যদি একটি বিশিষ্ট শক্তির ব্যায়াম করা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যায়ামের ফলে সেই বিশিষ্ট শক্তিটিই সমৃদ্ধ হইবে। ফলে জীবনের সব ক্ষেত্রেই সেই বিশিষ্ট শক্তিটি কার্যকরী হইয়া উঠিবে। দাবাবড়ে খেলিয়া আমরা যদি চিন্তা বা অভিনিবেশ শক্তির ব্যায়াম করি, তাহা হইলে ঐ ব্যায়ামের ফলে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেও সমর্থ হইব, বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও কৃতকার্য হইব এবং দার্শনিক চিন্তাতেও কৃতিত্ব দেখাইব।

এই জাতীয় বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া 'শক্তিবাদী' মনোবিদ্যার নির্দেশে সে-যুগে পাঠ্যসূচী ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হইত, ইহার উদ্দেশ্য ছিল "Formal discipline"; এ ক্ষেত্রে "formal" কথাটির অর্থ আনুষ্ঠানিক নহে, form সংক্রান্ত (অর্থাৎ matter বা বিষয়-বস্তু সংক্রান্ত নহে); Formal discipline-এর যুক্তি হইতেছে, ল্যাটিন্ ব্যাকরণের বিষয়বস্তুর জন্যই যে ল্যাটিন ব্যাকরণ পড়াইতে হইবে, তাহা নহে, বুদ্ধিতে ধার দিবার জন্য এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিচারশক্তি বাড়াইবার জন্য তাহা পড়াইতে হইবে। গণিতের বিষয়বস্তুর জন্যই যে গণিত পড়াইতে হইবে তাহা নহে, গণিতের মাধ্যমে অভিনিবেশ, যুক্তি ও চিন্তাশক্তি বাড়াইবার জন্যও তাহা পড়াইতে হইবে। সেইজন্যই সে যুগে ১৫ হাজার শব্দবিশিষ্ট spelling book মুখস্থ করান হইত। ১৫ হাজার শব্দের মধ্যে হয়ত ৯।১০ হাজার শব্দ এত কঠিন ও দুর্বোধ্য ছিল যে, হয়ত সারা জীবনেই তাহাদের কোনও প্রয়োজন হইত না। তবুও এই সমস্ত শব্দ মুখস্থ করান হইত—উদ্দেশ্য স্মৃতির ব্যায়াম। এই স্মৃতির ব্যায়ামের জন্যই ভূগোলের শত শত গিরিশৃঙ্গের নাম, অন্তরীপের নাম মুখস্থ করান হইত, কোনও দিনই এই সমস্ত নামগুলি জীবনের প্রয়োজনে লাগুক বা নাই লাগুক! এই মনোভাবের জন্যই ছাত্রদের ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির অনুশীলনের জন্য খেলাধূলা আর যুক্তির জন্য গণিত অভ্যাস করিতেই হইত।

শিক্ষার সঞ্চারণ সম্পর্কিত বিশ্বাসের মূলে আছে এই 'Formal discipline' মতবাদ ও শক্তিবাদ সম্বন্ধে বিশ্বাস। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাতত্ত্বে এই বিশ্বাসটি বহুদিন ধরিয়া কাজ করিয়া আসিতেছিল। পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষাপদ্ধতি এই দুইটির উপরই ইহার প্রভাব ছিল। এই মতবাদটি প্রথম একটা ধাক্কা খাইল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জেম্‌সের (W. James) গবেষণার ফলে।

সঞ্চারণ সম্বন্ধে জেম্‌স ও অন্যান্য পণ্ডিতদের পরীক্ষার তথ্যাবলী

জেমস্-এর বিশ্বাস ছিল যে, একটি কবিতার উপর দিয়া যদি স্মৃতিশক্তির ব্যায়াম করা হয়, তাহা হইলে সেই শক্তি দিয়া অন্য কবিতাও মুখস্থ করা সহজসাধ্য হইবে। তিনি ভিক্টর হুগোর Satyr নামক কবিতাটি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। আট দিনে সর্বশুদ্ধ ১৩১$\frac{5}{6}$ মিনিটে তিনি ১৫৮ পংক্তি মুখস্থ করিলেন। ইহার পর, দিনে ২০ মিনিট করিয়া সময় লইয়া ৩৮ দিনে Paradise Lost-এর প্রথম সর্গ মুখস্থ করিলেন। এইভাবে খানিকটা স্মৃতির ব্যায়াম সাধন করিয়া তিনি আবার ভিক্টর হুগোর Satyr পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এবারে দেখিলেন, নূতন করিয়া ১৫৮ পংক্তি মুখস্থ করিতে তাঁহার সময় লাগিয়াছে ১৫১$\frac{1}{2}$ মিনিট। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ইহাকেই negative (নঞর্থক) সঞ্চারণ বলা যাইতে পারে।

সাধনার এই বিপরীত ফল দেখিয়া তিনি আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং এই বিষয়টি লইয়া বিভিন্ন লোককে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, তিনজনের কিছু উন্নতি হইয়াছিল, একজনের অবনতি হইয়াছিল এবং অপর সকলের উন্নতি-অবনতি প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না।

অধ্যাপক জেম্‌স্-এর পর বহু পণ্ডিত এই বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, সঞ্চারণের ফল খুব সন্তোষজনক নহে—অন্ততঃ সাধারণ লোক সঞ্চারণের ফলটা যতটা সুদূরপ্রসারী বলিয়া মনে করেন, ততটা নহে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরীক্ষার ফলগুলি এইরূপ:

উড্‌ওয়ার্থ সাহেব তাঁহার বাম হস্ত দ্বারা পেন্সিল দিয়া একটি বিন্দুতে বার বার আঘাত করিয়া ঐ বিষয়ে দক্ষতা ডান হাতে কতখানি সঞ্চারিত হয়

তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, বাম হস্তের দক্ষতার শতকরা ৫০ ভাগ দক্ষিণ হস্তে সংক্রমিত হয়।

বিচার বুদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা লইয়া জাড্, থর্ণডাইক, উড্-ওয়ার্থ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এই বিষয়ে অভ্যস্ত লোকদের শতকরা ১·৮ এবং অনভ্যস্তদের শতকরা ৩·৩ ভাগ দক্ষতা সঞ্চারিত হইয়াছে।

অঙ্ক কষিবার সময়ে পরিচ্ছন্নতার উপর কোনও প্রতিক্রিয়া করে কিনা, এই সম্বন্ধে পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে—প্রতিক্রিয়া কিছুই নাই বলিলেই চলে; অর্থাৎ যে বালককে অঙ্ক সম্বন্ধে খুব পরিচ্ছন্ন হইতে শিখান হইয়াছে সে হয়ত একটি চিঠি লিখিতে যাইয়া কাটাকুটি করিয়া, কালি ফেলিয়া, পাতা নোংরা করিয়া অত্যন্ত অপরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিয়াছে।

ব্যাকরণ পাঠজনিত মনের সংযম ভাষা শিক্ষায় কতটুকু সাহায্য করে, এ বিষয়েও পরীক্ষা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা মাতৃভাষার ব্যাকরণ শিক্ষাকে সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণ শিক্ষা সাহিত্য বিষয়ে অথবা নির্ভুল রচনা লিখিতে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে নাই। তেমনি ল্যাটিন শিক্ষা করিয়া ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয় নাই; বরং প্রতিক্রিয়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই শতকরা ২০-এরও বেশী হইয়াছে।

কক্সে (W. W. Coxe) ইংরাজী বানান শিক্ষার ব্যাপারে ল্যাটিন শিক্ষার প্রভাব লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ল্যাটিন না-জানা ছাত্রদের চেয়ে ল্যাটিন-জানা ছাত্ররা বেশী ভুল করিয়াছিল; অর্থাৎ ল্যাটিন শিক্ষার নঞর্থক (negative) সঞ্চারণ হইয়াছিল।

গোলক-ধাঁধা লইয়া পরীক্ষার ব্যাপারে একটা নূতন জিনিস দেখা গেল। একই জাতীয় ধাঁধার ক্ষেত্রে সঞ্চারণটি হইয়াছিল শতকরা ৭৭; কিন্তু গোলক-ধাঁধার ভিতরের অলিগলির সংস্থান একটু বদলাইয়া দিতেই দেখা গেল, সঞ্চারণটি শতকরা ১৯এ নামিয়া আসিল। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে, ধাঁধাগুলি একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির হইলে এই সঞ্চারণটি নঞর্থকও হইতে পারিত।

পাটীগণিতের সমস্যা সমাধানের অভ্যাস তর্কশাস্ত্রের যুক্তির ব্যাপারে

কতখানি দক্ষতা সঞ্চারিত করিতে পারে, এই লইয়া উইঞ্চ (Winch) সাহেব পরীক্ষা করেন। তিনি দেখিয়াছেন, এই ব্যাপারে দক্ষতাটি প্রায় শতকরা ২৬ ভাগ সঞ্চারিত হয়। জ্যামিতির দক্ষতা পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে—এক তৃতীয়াংশ ছাত্রের মধ্যে জ্যামিতিগত দক্ষতা অন্য বিষয়ে আদৌ সংক্রমিত হয় নাই (Rugg)। বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে যে পর্যবেক্ষণ শক্তি ও ধৈর্য প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, সেই পর্যবেক্ষণ শক্তি জীবনের অন্য ক্ষেত্রে কতটা সঞ্চারিত হয় তাহা লইয়া হেউইন্‌স্ (Miss Hewins) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সঞ্চারণ-মান হইতেছে শতকরা ৫.৪ মাত্র।

শিক্ষার সঞ্চারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ২০০টি পরীক্ষা হইয়াছে। এই জাতীয় পরীক্ষার মোটামুটি সিদ্ধান্ত এইরূপ:

(ক) শিক্ষার সঞ্চারণ সমর্থকও (positive) হইতে পারে, নঞর্থকও (negative) হইতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সঞ্চারণ প্রায় নগণ্য।

(খ) সঞ্চারণের অনুপাত যেখানে একটু বেশী, সেখানে নিশ্চয়ই শিক্ষণীয় বিষয়টির সমজাতীয়তা আছে।

(গ) এমন কোনও মনের ব্যায়াম নাই যাহাতে একটা বিশিষ্ট শক্তির (faculty) সর্বাঙ্গীন দক্ষতা হইতে পারে।

এই জাতীয় সিদ্ধান্তে আমাদের মন খানিকটা খারাপই হইয়া যায়। কিন্তু উপায় কি? সত্যকে অস্বীকার করিলে যেখানে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী সেখানে তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল। আমাদের অনেকেরই মধ্যে ধারণা আছে যে, শিক্ষিত ব্যক্তি (শুধু শিক্ষিত বলিয়াই) অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা facultyগুলির উন্নতি সাধন করিয়াছেন বলিয়াই যে কোনও কাজে তাঁহারা হাত দিবেন তাহাই অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা ভালভাবে করিতে পারিবেন। কিন্তু আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, অনেক কৃতী ছাত্র ব্যবসাক্ষেত্রে, হাতের কাজে, জীবনের অনেক বিষয়েই অশিক্ষিত প্রতিযোগীর নিকট পরাজিত হয়। বিদ্যার অহঙ্কারের সঙ্গে এই হীন পরাজয়ের অপমান তাহাদের একযোগে অভিভূত করিয়া ফেলে। অনেক সময় ইহাও দেখিতে

পাওয়া যায় যে, এম.এ., বি.এ. পাশ করিয়া অনেকে হয়ত কেরানীগিরি আরম্ভ করিলেন। শিক্ষার দম্ভ তাঁহাদের মনে একটা স্বয়ংসিদ্ধভাব আনিয়া দেয় বলিয়া তাঁহারা কাজের খুঁটিনাটিগুলিও শিখিতে তত যত্ন দেখান না এবং অল্প শিক্ষিত সহকর্মীদের সঙ্গেও ভালভাবে মেশেন না। পরে হয়ত তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, এই অল্পশিক্ষিত সহকর্মীদের দলই তাঁহাদের পরাজিত করিয়া অধিকতর উন্নতি করিতে লাগিল। তখন তাঁহারা হয় কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতের উপর অথবা নিজেদের দুর্ভাগ্যের অলঙ্ঘ্যনীয় বিধানের উপর দোষ চাপাইয়া নৈরাশ্যবাদে জীবনকে পঙ্গু করিয়া শুধু যে নিজেদেরই ক্ষতি করেন তাহা নহে, সমাজের মধ্যে নৈরাশ্যবাদ ও অকর্মণ্যতার বিষ ছড়াইয়া থাকেন। শিক্ষার সঞ্চারণবাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা না থাকিলে অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারাই যে মানসিক শক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয় না, এই ধারণাটি থাকিলে, অর্থাৎ পুঁথিগত শিক্ষাই যে জীবন-সংগ্রামের চরম অস্ত্র নহে, প্রত্যেক কাজের জন্যই যে বিশেষ প্রকার ব্যবহারিক সাধনার প্রয়োজন আছে, এই তত্ত্বটি জানা থাকিলে তাঁহারা হয়ত জীবনে অধিকতর উন্নতি করিতে পারিতেন।

অনুসিদ্ধান্ত

শিক্ষার সঞ্চারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি আমাদের এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, একটা বিশেষ শিক্ষা সেই জাতীয় বা সমজাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইতে পারে এবং এই সঞ্চারণটি সমর্থক (positive) সঞ্চারণই হইয়া থাকে। ফলে সেতারের শিক্ষাটা সুরবাহার, স্বরোদ বা বীণাবাদনে সঞ্চারিত হইতে পারে, বেহালার দক্ষতা সারেঙ্গী-এসরাজে সঞ্চারিত হইতে পারে, তবলার দক্ষতা খোল-ঢোল-মাদল-পাখোয়াজে সঞ্চারিত হইতে পারে।

তাহা হইলে সন্ধানী শিক্ষকের উচিত "সঞ্চারণের" তথ্যগুলি হইতে এমন সব তত্ত্বের আবিষ্কার করা যাহাতে শিক্ষার একটি অভিজ্ঞতা হইতে অন্য অভিজ্ঞতায়, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সংক্রমিত হইয়া আমাদের সাধনাকে সমৃদ্ধতর ও পরস্পরের সহযোগী করিয়া তুলিতে পারে।

শিক্ষা-সঞ্চারণের কৌশল

এই ব্যাপারে গীতার একটা স্ত্রকে আমরা শিক্ষা-তত্ত্বেরও স্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি—"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।" অর্থাৎ অন্ধ যান্ত্রিক অভ্যাসের চেয়ে অন্তর্দৃষ্টি (ধ্যান)-যুক্ত অভ্যাস আরও বেশী সঞ্চারিত হয়। এই তত্ত্বটি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত।

উড্রো হার্বার্ট (Woodrow Herbert) তিনটি দলের ছাত্র লইয়া মুখস্থ করিবার শক্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একদল ছাত্রকে মুখস্থ করার ব্যাপারে কোনও অভ্যাসই করান হইল না, আর একটি দলকে শুধু অন্ধ যান্ত্রিক অভ্যাসের দ্বারা মুখস্থ করান হইল এবং তৃতীয় দলটিকে মুখস্থ করিবার কৌশল সম্বন্ধে অনেকটা উপদেশ দিয়া নির্দিষ্ট সময়ের শতকরা ৪৩% ভাগ সময় শুধু উপদেশেই কাটাইয়া দিয়া অবশিষ্ট ৫৭% ভাগ সময় মুখস্থ করিতে দেওয়া হইল। কিছুদিন পরে আবার এই তিনটি দলকে মুখস্থ করিতে দেওয়া হইল। দেখা যাইল, প্রথম দলটির চেয়ে দ্বিতীয় দলটি বিশেষ কিছু উন্নতির সঞ্চারণ দেখাইতে পারে নাই, তবে তৃতীয় দলটি বেশ উন্নতি দেখাইয়াছিল অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞানমূলক অভ্যাসটী সহায়ক হইয়াছিল।

মেরেডিথ (G. P. Meredith) নামে আর একজন মনোবিদ্ বৈজ্ঞানিক শব্দের সংজ্ঞা তৈয়ারী করিবার ব্যাপার লইয়া অনুরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যে-দলটিকে তিনি সংজ্ঞা-নির্ধারণের কৌশল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাদের ক্ষেত্রেই শিক্ষার সঞ্চারণটী সমধিক হইয়াছিল। যাহারা শুধু অন্ধভাবে অভ্যাস করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের সঞ্চারণ তেমন হয় নাই।

শোলচাউ এবং জাড্ (Scholchow and Judd)-এর বন্দুক লইয়া লক্ষ্যভেদ পরীক্ষাটি হইতেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়।

দুই দল বালক লইয়া ১২ ইঞ্চি জলের ভিতর লক্ষ্যভেদ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। একটি দলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিভাবে আলোক-রশ্মির দিক পরিবর্তন (Refraction) হয়, আর অন্য দলটিকে এ সম্বন্ধে কোনও উপদেশ দেওয়া হয় নাই। দেখা গেল, উপদেশপ্রাপ্ত দলটির

সফলতা অনেক বেশী হইয়াছিল। আরও কিছুদিন পরে এই দুইটি দলকেই জলের ২ ইঞ্চি ও ৬ ইঞ্চি নীচের লক্ষ্যবস্তু ভেদ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এবারেও দেখা যাইল যে, যে-দলটিকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদেরই শিক্ষাটা বিশেষভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে, জ্ঞানমূলক অভ্যাসটাই নিছক অভ্যাসের চেয়ে বেশী সঞ্চারিত হয়।

এই জাতীয় পরীক্ষা হইতে মনে হয়, একটা বিশিষ্ট শিক্ষা কতখানি পরিমাণে সঞ্চারিত হইবে তাহা অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করে শিক্ষকের উপস্থাপন ও শিক্ষাপ্রণালীর উপর। ইহা ছাড়া ছাত্রের তরফ হইতে তাহাদের মনের অবস্থা, শিক্ষাকে আত্মস্থ করিবার ক্ষমতা, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতির উপরও তাহা অনেকখানি নির্ভর করে। একটা বিশিষ্ট শিক্ষা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কিভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে, খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা হইতে কিভাবে একটা সাধারণ তত্ত্বের সন্ধান করা যাইতে পারে, কিভাবে অভিজ্ঞতাকে generalise করিতে পারা যায়, এই সমস্ত জিনিস যদি শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক ভালভাবে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে 'positive transfer'টা খুবই বেশা হয়।

সঞ্চারণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

এই ব্যাপারে থর্ণডাইকের "theory of identical element" বা "উপাদানের ঐক্য" মতবাদটি সর্বাধিক পরিচিত। তিনি বলেন, একটি বিষয়ের অভ্যাস তখনই বিষয়ান্তরে সংক্রমিত হইতে পারে যখন এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে উপাদানগত ঐক্য আছে। কোন্ বিষয়ে উপাদানগত ঐক্য? থর্ণডাইক বিষয়বস্তুগত ঐক্য এবং শিক্ষা-প্রণালীগত ঐক্য—এই দুইটি ঐক্যকেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে স্যাণ্ডিফোর্ড দেখাইয়াছেন, ভূগোল ইতিহাসকে সাহায্য করে, কারণ উভয়ের মধ্যেই ম্যাপএর প্রয়োজন হয়; যোগের প্রক্রিয়া গুণের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে, কারণ গুণ জিনিসটাতে যোগের কাজও যথেষ্ট আছে; ফরাসী ভাষা জার্মান ভাষাকে সাহায্য করে, কারণ উভয়ের শিক্ষার প্রণালীর মধ্যেই একটা

ঐক্য আছে ইত্যাদি। ব্যাগ্‌লি (Bagley) অবশ্য এই উপাদানগত ঐক্যের মধ্যে আদর্শগত ঐক্যকেই বড় স্থান দিয়াছেন।

স্যাণ্ডিফোর্ড মন্তব্য করিয়াছেন, থর্ণডাইকের এই "উপাদানগত ঐক্যে"র মতবাদ খুবই যুক্তিযুক্ত। আমাদের লক্ষ লক্ষ স্নায়ুকেশ ও স্নায়ুশাখা-বাহিত স্নায়ু-তরঙ্গের লক্ষ লক্ষ গতি-পথের মধ্যে কতকগুলি পথ এমনই সাধারণ হইয়া যাইতে পারে যে, অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেই সাধারণ অলিগলি পথ দিয়াই স্নায়ু-তরঙ্গের স্রোত আবার প্রবাহিত হয়। কাজেই সাধারণ উপাদান যতই বেশী থাকিবে, শিক্ষার সঞ্চারণ ততই অধিক হইবে।

শিক্ষার সঞ্চারণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে থর্ণডাইক-মতবাদের প্রতিস্পর্ধী মত হইতেছে জাড্‌-এর "generalisation of experience" মতবাদ। জলের নীচে অবস্থিত বস্তুর লক্ষ্যভেদ করার পরীক্ষাটির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছিলেন, আলোকের গতি পরিবর্তনের (refraction) তত্ত্বটি যে দলটিকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে generalise করার সুযোগ পাইয়াছিল বলিয়াই শিক্ষা অধিকতর সঞ্চারিত হইয়াছিল। সুতরাং এই generalise করিবার ক্ষমতার (একটি অভিজ্ঞতার সহিত অন্য অভিজ্ঞতার ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝিতে পারিবার ক্ষমতা) উপরই শিক্ষার সঞ্চারণের মূল তত্ত্বটি নিহিত আছে।

সঞ্চারণবাদ ও শিক্ষাতত্ত্ব

শিক্ষা সঞ্চারণ সম্বন্ধে তথ্যগুলির ব্যঞ্জনা শিক্ষা-তত্ত্বে সামান্য নহে। ইহা শিক্ষার পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষাদান-পদ্ধতি উভয়কেই প্রচুরভাবে প্রভাবিত করে।

আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, শুধু মানসিক ব্যায়ামের (formal discipline) জন্যই ল্যাটিন, ব্যাকরণ, গণিত প্রভৃতির প্রয়োজন নাই এবং কোনও মানসিক ব্যায়ামই মনের শক্তিকে সমৃদ্ধ করে না, তাহা হইলে শুধু মানসিক উৎকর্ষের জন্যই ল্যাটিন, ব্যাকরণ, বানানের বই প্রভৃতিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিব না। ব্যাকরণের যতটুকু প্রয়োজন, শুধু সেইটুকু

প্রয়োজনের জন্যই ব্যাকরণ পড়াইব, জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই গণিত, ভূগোল প্রভৃতি পড়াইব। এই ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কিছু কিছু জিনিস আমরা পাঠ্যতালিকা হইতে পরিত্যাগ করিব। যদি দেখি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে একজনেরও সারা জীবনেই cube rootএর প্রয়োজন হইবে না, তখন নির্বিচারেই ঐ জিনিসটিকে পাটীগণিত হইতে বাদ দিয়া দিব।

তবে এই মনোভাবটির বাড়াবাড়িও ভাল নয়। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতি দিবসের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র প্রয়োজনের দাবীর মধ্যেই যদি সীমায়িত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষার উচ্চ আদর্শ অনেক সময়েই ব্যাহত হয়।

বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র জগৎটি ছাড়িয়া প্রত্যেক বালককেই একদিন বাস্তব জগতের বৃহত্তর জীবনের সমস্যার সম্মুখীন হইতেই হইবে। সমস্ত জীবন ধরিয়া এই সমস্যা সমাধানই হইল মানুষের চিরন্তন কর্তব্য। কাজেই যে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বাস্তব-জীবন-পরিবেশে এই সমস্যা সমাধানের কাজ করিতে হয়, সেই জাতীয় আয়োজন প্রত্যেক স্কুল-কলেজে প্রচুর পরিমাণে থাকা উচিত। এইজন্য স্কুলের পাঠ্যসূচীর মধ্যেই তথাকথিত "Project method"-এর একটা ব্যাপক পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।

আমরা দেখিয়াছি, শিক্ষার সঞ্চারণটা "generalisation of experiences"এর উপর অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করে। আমরা আরও জানি, এই generalise করার ব্যাপারে ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানটা একটা খুবই বড় সহায়। কাজেই প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাপক আয়োজন থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ভাষার সাহায্যেই আমরা বিমূর্ত (abstract) বিষয় লইয়া মনের প্রয়োগশালায় গবেষণা করি এবং নূতন-নূতন সিদ্ধান্ত নূতন ভাবে generalise করিতে সমর্থ হই। শিক্ষার সঞ্চারণ তত্ত্বটি শিক্ষার পদ্ধতির দিক দিয়াও অনেক সংস্কারের দাবী করিতে পারে।

আমরা যদি বুঝিতে পারি শুধু স্মৃতির ব্যায়াম করিলেই স্মৃতির শক্তি (faculty) বৃদ্ধি পাইবে না, তাহা হইলে শুধু স্মৃতির ব্যায়ামের জন্য ছাত্রদিগকে রাশি রাশি পাঠ মুখস্থ করাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে এই ব্যর্থ পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিতে পারি।

'Formal discipline' যখন একেবারেই নিরর্থক এবং থর্ণডাইক-বর্ণিত অভিজ্ঞতার মধুরতা ও আনন্দই (law of effect) যখন শিক্ষার মূল কথা, তখন অহেতুক পুনরাবৃত্তি (repetition) ও অন্ধ অভ্যাসের প্রয়োজন নাই। আমরা এই কঠোরতা হইতেও ছাত্রদিগকে মুক্তি দিতে পারি।

তাই বলিয়া যে তাহাদিগকে কোনও পরিশ্রমের কাজই করিতে দেওয়া হইবে না, তাহাদিগকে আদুরে গোপাল ও আরাম-বিলাসী করিয়া তুলিতে হইবে, এমনও কথা নহে। তবে শুধু মানসিক অনুশীলনের জন্যই যে তাহা-দিগকে খাটাইতে হইবে, এ যুক্তিও ঠিক নহে। সফলতার আনন্দের মধ্য দিয়া তাহাদের শিক্ষার অভিযানকে পরিচলিত করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে রসবোধ (sentiment) তৈয়ারী করিতে হইবে। তাহা হইলে শিক্ষার-সাধনার পথে কঠিনতম পরিশ্রমও তাহাকে ভীত করিতে পারিবে না, বাধা-বিপত্তি-প্রলোভনও তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না, দুঃখ-দৈন্যের বিক্ষোভও তাহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না। শ্মশান-সাধক প্রেতের নৃত্যের মধ্যেও যেমন অবিচলিত নিষ্ঠায় ইষ্টদেবীর ধ্যান করিতে থাকে, তাহারাও সেইরূপ ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় সারস্বত সাধনা করিয়া যাইবে।

এই রস (sentiment) জিনিসটা হইতেছে একটা পরিণতির অবস্থা, প্রারম্ভের অবস্থা নহে। কাজেই শিক্ষার প্রারম্ভের দিকে ছাত্রদের মানসিক অবস্থা, তৃপ্তি-বিরক্তি-আবেগ-প্রক্ষোভ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সেইগুলিকে সহ্য করিয়া শিক্ষককে অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষকগণ যেন তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত আদর্শগুলি জোর করিয়া ছাত্রদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিতে চেষ্টা না করেন, এমন কি মানসিক ব্যায়ামের উদ্দেশ্যেও নহে। তাহা হইলে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশতঃ একটা বিরোধের ভাবই সৃষ্টি হইবে। আদর্শ যত বড়ই হউক না কেন, প্রত্যেককেই তাহা ভিতরের দিক হইতে তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে—বাহিরের দিক হইতে তাহা আসিবে না, জোর করিয়া দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে, ভক্তিতত্ত্বের মত শিক্ষাতত্ত্বেও অধিকারী ভেদটা একটা বড় সত্য।

স্মৃতি

সাধারণ ছাত্রদের যদি বলা হয় "কোনও একটা জিনিস শিক্ষা করার চেয়ে সেটি ভুলিয়া যাওয়া কঠিনতর কাজ", তাহা হইলে তাহারা হয়ত সে কথা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু তাহাদের যদি বলা হয় "আচ্ছা, তোমরা চেষ্টা করিয়া অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণমালা ভুলিয়া যাও দেখি?" তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে কাজটি কত কঠিন। প্রতিপক্ষ হয়ত বলিবেন, অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণমালার সঙ্গে আমাদের পরিচয় এত গভীর যে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া সত্যই কঠিন, কিন্তু সাধারণতঃ কত কথাই তো আমরা ভুলিয়া যাই।

কথাটা বস্তুতঃ সত্য নয়। অধিকাংশ জিনিসই আমরা সহজে ভুলি না একবার যাহা আমরা অনুভব করি, তাহা বীজের মধ্যে প্রাণশক্তির মত, ওষধির মধ্যে তেজের মত মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। যাহাকে একবার দেখিয়াছি, তাহাকে দ্বিতীয়বার দেখিলে চিনি-চিনি বলিয়া মনে হয়।

(যে শক্তির দ্বারা প্রাচীন অভিজ্ঞতাকে এইভাবে সঞ্চিত করিয়া রাখা যায়, নান্ সাহেব তাহার নাম রাখিয়াছেন "সংরক্ষণ-প্রয়াস" (Mneme)। স্মৃতি এই সংরক্ষণ-প্রয়াসের আত্মসচেতন প্রচেষ্টা।) মনের কোঠায় যাহা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে, তাহার সব কিছু সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না। তবে সব অভিজ্ঞতাই মনের মধ্যে একটা 'ছাপ' (engrams) রাখিয়া যায়। (স্মৃতির কাজ হইতেছে বর্তমানের অনুভূতির ইঙ্গিতে অতীতের অনুভূতিকে নূতন করিয়া পাওয়া।) এই স্মৃতির মধ্যে অনেক জটিল ব্যাপার আছে। (প্রথমতঃ আছে অনুভূতির ছাপ-গ্রহণ ও সঞ্চয়, দ্বিতীয়তঃ আছে এই ছাপগুলির সংরক্ষণ, তৃতীয়তঃ এই ছাপগুলিকে মনের কোঠা হইতে বাহির করিয়া আনা বা স্মরণ (recall) করা, চতুর্থতঃ তাহাদিগকে নূতন করিয়া অনুভব করা বা প্রত্যভিজ্ঞা (recognition)।)

বের্গস (Bergson) এই স্মৃতিকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। একটি হইতেছে **অভ্যাসমূলক স্মৃতি** (habit memory), আর একটি হইতেছে অন্য সাহায্য-নিরপেক্ষ **খাঁটি স্মৃতি**। অর্থবোধ না থাকিলেও নিছক পুনরাবৃত্তি

দ্বারা আমরা অনেক জিনিস মুখস্থ করিতে পারি। ইহা হইতেছে অভ্যাসমূলক স্মৃতির কাজ; কিন্তু খাঁটি স্মৃতির মধ্যে অনুষঙ্গ (association), অতীতের ছবি, অন্য ঘটনার ইঙ্গিত প্রভৃতি মনের কার্য জড়িত থাকে। নান্ বলিয়াছেন, বের্গসঁ-এর শ্রেণীবিভাগটা জাতিগত বিভেদ ততটা নহে যতটা হইতেছে মাত্রাগত। তথাকথিত "অভ্যাস স্মৃতিটি" নিছক দেহযন্ত্রের প্রক্রিয়া নহে এবং দেহ-নিরপেক্ষ "খাঁটি স্মৃতি"টীও দেহ-নিরপেক্ষ নিছক মনের কার্য নহে। "অভ্যাস স্মৃতি"র গোড়ার দিকে মনের মধ্যে অনুষঙ্গজনিত ছবি যে জাগে না তাহা নহে, তবে বহুবার পুনরাবৃত্তিতে সেই ছবির আর প্রায়োজন হয় না এইমাত্র। হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে প্রথম সুর-সাধনা করিবার সময় কোন্ পর্দার পর কোন্ পর্দা টিপিতে হইবে, কোন্ সময় কতটা "বেলো" করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ছবিই মনে রাখার প্রয়োজন হয়, পরে পুনরাবৃত্তিতে অভ্যাস পরিপক্ক হইয়া যাইলে সেই ছবি মনে রাখিবার আর প্রয়োজন হয় না। তখন হাতের পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যেই এমন একটা শিক্ষা হইয়া গিয়াছে যে, শুধু যান্ত্রিক অভ্যাসবশেই পর্দার পর পর্দাগুলিকে ঠিক ঠিক আমরা টিপিয়া যাইতে পারি। মনকে তখন আর হাতে সাহায্য করিবার জন্য অভিভাবকত্ব করিতে হয় না, সাবালক হাত নিজের কাজ নিজেই করিতে পারে, তখন মন যদি মনে নাও রাখে যে হাত একটা কাজ করিয়া যাইতেছে এবং মন যদি অন্য কোনও চিন্তায় ব্যস্তও থাকে, তাহা হইলেও হাত তাহার নিজের কাজ নির্ভুলভাবে করিয়া যাইতে পারে। (এ্যাডামস্ তাই বলিয়াছেন: "যুক্তিযুক্ত ভাবে ভুলিয়া যাওয়াই হইতেছে সত্যকারের শিক্ষা।")

স্মৃতির সংজ্ঞা: অধ্যাপক জেম্‌স (James) স্মৃতির সংজ্ঞা দিয়াছেন: "Memory proper is the knowledge of an event or fact of which we have not been thinking, with the additional consciousness that we have thought or experienced it before." অর্থাৎ, "আমরা বর্তমানে চিন্তা করিতেছি না এমন ঘটনা বা ব্যাপার সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের সঙ্গে উহাকে পূর্বে চিন্তা বা অনুভব করিয়াছি, এই অতিরিক্ত চেতনাটিই হইল প্রকৃত স্মৃতি।"

উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) বলিয়াছেন, "Memory consists in remembering what has previously been learnt. It would be better, however, to say that memory consists in learning, retaining and remembering what has previously been learnt."

স্মৃতির বিভিন্ন পর্যায়ঃ (১) তথ্যের আহরণ (Learning) ও সঞ্চয় (Acquisition), (২) তথ্যের সংরক্ষণ (Retention), (৩) তথ্যের স্মরণ (Recall) বা পুরাতন অভিজ্ঞতাকে নূতন করিয়া পাওয়া এবং (৪) তথ্যের প্রত্যভিজ্ঞা বা পুরাতন অভিজ্ঞতাকে নূতন করিয়া পাইবার পর তাহাকে চিনিতে পারা।

স্মৃতির প্রথম পর্ব—ছাপগ্রহণঃ শিক্ষার ছাপ কিভাবে মনের মধ্যে থাকিয়া যায়, অভিজ্ঞতা কিভাবে আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়, অভ্যাসের ফলে কিভাবে একটা কাজ বা কৌশল আমাদের আয়ত্ত হয়, তাহা শিক্ষার তত্ত্বকথা প্রসঙ্গে পূর্ণতরভাবে আলোচিত হইয়াছে। কবিতা মুখস্থ করা হইতে আরম্ভ করিয়া নৃত্যগীত শিক্ষা করা, সাইকেল চালান হইতে টাইপ-রাইটিং পর্যন্ত সব কিছুই শিক্ষার ব্যাপার।

দেহবাদী মনস্তাত্ত্বিকগণ স্মৃতি, অভ্যাস এবং অনুষঙ্গ প্রভৃতিকে একই পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের মতে এই সবই হইতেছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্র দিয়া প্রবহমান জ্ঞানবহা ও কর্মবহা স্নায়ু-তন্ত্রের প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ মাত্র। যখন আমরা কোনও কিছু অনুভব করি, তখন সেই অনুভূতি ও তাহার প্রতিক্রিয়াটি আমাদের জ্ঞানবহা ও কর্মবহা স্নায়ুর নির্দেশক্রমেই সংগঠিত হয়। তাহার ফলে স্নায়ু-তন্ত্রের গতি-পথের একটা ছাপ বা খাত বা নেমিক্ষত আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া যায়। পরে আবার সমজাতীয় অনুভূতি যখন জাগে এবং তাহার ফলে পূর্বে আমরা যেভাবে সাড়া দিয়াছি দ্বিতীয় বারেও সেইভাবেই সাড়া দিই, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানবহা ও কর্মবহা স্নায়ুস্রোত প্রথম অভিজ্ঞতার নেমিখিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে, স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে স্নায়ুস্রোতের খাতটি আরও গভীরতর ও প্রশস্ততর হইয়া এমন একটা পথ তৈয়ারী করিয়া

দেয় যে, পরবর্তী আবেদনগুলির প্রতিক্রিয়া প্রথম বা দ্বিতীয় বারের মতই একইভাবে অথবা অধিকতর সহজ ও সরলভাবেই সম্পন্ন হয়। এইভাবে বার বার একইভাবে সাড়া দেওয়া এবং পূর্বকৃত কাজগুলিকে সহজতরভাবে করার জন্য যে প্রবণতা তৈয়ারী হয়, তাহাকেই বলে '**অভ্যাস**'। অভ্যাস ব্যাপারটি হইতেছে অতীত কার্যের অন্ধ এবং সরলতর পুনরাবৃত্তিটি মাত্র। আর এই পুনরাবৃত্তিটি যখন আত্মসচেতন ভাবে হয়, অর্থাৎ এই পুনরাবৃত্তি করিবার সময় যখন আমরা মনে রাখি যে, এই আবেদনে আমরা এইভাবে অনুভব করিয়াছি এবং এইভাবে তাহার সাড়া দিয়াছি, তখন যাহা ঘটে তাহা হইতেছে '**স্মৃতি**'। অনুষঙ্গ হইতেছে এই স্নায়ুর গতি-পথেরই আর একটা ব্যাপার মাত্র। যখন একটি অনুভূতি হইতে স্নায়ুপ্রবাহ একই পথে যাত্রা না করিয়া সাইন্যাপ্স (Synapse)-এর শাখা-প্রশাখা বহিয়া অন্য পথে যাত্রা করে, তখন তাহাকে বলে '**অনুষঙ্গ**'। এই অনুষঙ্গই একটা অনুভূতির সঙ্গে আর একটা অনুভূতির গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেয়। ঘর-পোড়া গোরুর আগুন সম্বন্ধে একটা অনুভূতি হইয়াছে ; আবার সিঁদুরে মেঘের লাল রঙের মধ্যে একটা লালের অনুভূতি হয়, অনুষঙ্গ তাই আগুনের সঙ্গে সিঁদুরে মেঘের গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিল, ফলে ঘরপোড়া গোরুর মধ্যে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়াই আগুনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এইভাবে অনুষঙ্গ স্নায়ুজালের পরস্পর সংলগ্ন টানা-পোড়েন জাতীয় খাতের মধ্য দিয়া স্নায়ু-স্রোতের গতির বিভিন্নতা দ্বারা একটি অভিজ্ঞতার সহিত অন্য একটি অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধন করিয়া আমাদের স্মৃতিকে সাহায্য করে। অক্ষরবদ্ধ একটি শব্দ চোখে পড়িলেই যে তাহা উচ্চারণ করিবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে, ইহার মধ্যেও এই অনুষঙ্গের লীলা আছে। অক্ষরবদ্ধ শব্দটি প্রথমে দেখিলে চক্ষুর স্নায়ুর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আসে এবং তাহার পর শব্দটি উচ্চারণ করিলে স্বরোৎপাদনকারী স্নায়ুর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আসে, এই দুইটি প্রতিক্রিয়া তাড়াতাড়ি ঘটিতে ঘটিতে সেই প্রতিক্রিয়া দুইটি পরস্পরের সহিত এমনভাবে জড়াইয়া যায় যে, স্নায়ুপ্রবাহ একটির পথ বাহিয়া চলিতে চলিতে অন্য একটির স্রোত বহিয়া চলিয়া যায়। ইহার ফলে একটি ঘটনা আর একটি

ঘটনাকে সহজেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আলিবাবার গল্পে কাশিমের যে শোকজনক পরিণতি হইয়াছিল, তাহা হইতেছে কাশিমের অনুষঙ্গের নির্দেশগুলি ভুল হইয়া সে "চিচিং ফাঁক" কথাটি ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই। তাহা হইলে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে, স্মৃতির দুইটি প্রধান শর্ত হইতেছে: (১) স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে নূতন অভিজ্ঞতার ছাপ বা 'খাত' গ্রহণ ও সংরক্ষণ (Retentiveness) এবং (২) সেই খাত বহিয়া নূতন অনুভূতি বা কর্মপ্রয়াসের স্নায়ু-স্রোতকে প্রবাহিত রাখা (Recall)।

স্মৃতির দ্বিতীয় পর্ব—সংরক্ষণ : একটা জিনিস শেখা হইবার পর অভ্যাস ছাড়িয়া দিলেও অভ্যস্ত বিদ্যাটা বহুদিন ধরিয়াই থাকিয়া যায়। তবে সে বিষয়ে হয়তো আমরা সচেতন নাও থাকিতে পারি। আমাদের মন সচেতন নহে, অথচ তাহা মনের মধ্যে থাকে, ইহা কিভাবে সম্ভব হয়? (অনেকে মনে করেন, ইহা নির্জ্ঞান মনের রাজ্যে তলাইয়া থাকে।) কিন্তু বহু মনোবিদ্‌ই এই নির্জ্ঞান মনের রহস্যের কথা আমল দেন না। তাঁহারা বলেন, যে ছাত্রটি শৈশবে নামতা মুখস্থ করিয়াছে এবং একাউন্টেন্সি পাশ করিবার পরও তাহা মনে রাখিয়াছে, সে কি নির্জ্ঞান মন দিয়া এতদিন ধরিয়া নামতা আবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে? কথাটা বিশ্বাস্য নহে। তাহা হইলে অভ্যাস ত্যাগের পরও অভ্যস্ত বিদ্যার সংরক্ষণ হয় কিভাবে? অধিকাংশ মনোবিদ্‌ বলেন, দীর্ঘ অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিতে পাওয়া না গেলেও তাহারই ফলে একজন লোক পূর্বে যেভাবে কাজ করিয়াছে, আবার ঠিক সেইভাবেই সেই কাজটি করিতে পারে। এই পরিবর্তনকেও স্মৃতিছাপ (Memory trace) বলে। এই স্মৃতিছাপগুলির প্রকৃতি কি, তাহা সঠিক জানা নাই, তবে এইগুলি মস্তিষ্কের মধ্যে অন্ততঃ কিছুদিন থাকে এবং তাহারই ফলে পূর্বায়ত্ত বিদ্যা আবার স্ফুরিত হয়।

যাহা শিখিলাম তাহার কতটা ভুলিয়া গেলাম আর কতটাই বা মনে রহিল তাহা মাপা যায়। ইহাকে **সংরক্ষণের মাপ** বলে।

উড্‌ওয়ার্থ-এর মতে তিনটি প্রণালীতে সংরক্ষণ মাপিতে পারা যায়:

(১) স্মরণ (Recall) বা অধীত বিদ্যার কতটা মনে আছে তাহা নিরূপণ করা। পরীক্ষার সময় ছাত্রেরা মুখস্থ জিনিসটা খাতায় লিখিয়া এইভাবে তাহাদের সংরক্ষণের পরিচয় দেয়; (২) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) প্রণালী। ইহাতে শেখা-জিনিসের সঙ্গে যে সব জিনিস শেখা হয় নাই এমন সব জিনিস একসঙ্গে মিশাইয়া দিয়া ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করা হয়, আর তাহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে তাহারা পরিচিত জিনিসকে চিনিতে ভুল করিয়াছে কিনা; (৩) পুনরধ্যয়নের সময় দেখিয়া পরীক্ষা (Re-learning method)। একটি কবিতা প্রথমবার মুখস্থ করিতে ১০ মিনিট সময় লাগিল। এবার দ্বিতীয়বার মুখস্থ করিতে চেষ্টা করা হইল। দেখা যাইল, এবার মুখস্থ করিতে ৮ মিনিট সময় লাগিয়াছে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দশ মিনিটের মধ্যে দু' মিনিট সময় বাঁচিয়া গিয়াছে অর্থাৎ শতকরা কুড়ি ভাগ দক্ষতা সংরক্ষিত হইয়াছে।

স্মৃতির তৃতীয় পর্ব—স্মরণ: স্মৃতির এই পর্বটিই বোধহয় সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কারণ মনের গভীরে কোন্ জিনিসের ছাপ গৃহীত হইয়াছে, অথবা কোন্ তত্ত্ব সঞ্চিত হইয়াছে তাহা ততটা বড় নহে যতটা হইতেছে অতীতের আহৃত কোন্ কোন্ তত্ত্বকে আমরা মনে করিতে পারিতেছি ও কাজে লাগাইতে পারিতেছি। কাজেই স্মরণ ক্রিয়াটাই হইতেছে স্মৃতির নৈপুণ্যের একটা বড় পরিচয়। ইহাই হইতেছে চিন্তা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির মৌলিক উপাদান। অভ্যস্ত কাজ বা অধীত বিদ্যা যদি প্রয়োজনের সময় কাজে না আসিল, তাহা হইলে তাহাতে প্রয়োজন কি?

কাজের সময় ঠিকভাবে কাজে লাগাইতে হইলে তত্ত্বের মাল-মসলাকে হিসাব করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। বস্তুপুঞ্জ ভীড় করিয়া স্তূপীকৃত হইলেই কাজ হয় না। ঠিক কাজের জন্য ঠিক জিনিসটিকে ব্যবহার করিতে হয়। স্মরণের ব্যাপারেও তাহাই করিতে হয়। স্মরণ কাজটি তাই নির্বাচনশীল। ইহা কিছু ছাড়ে এবং কিছু গ্রহণ করে, সব জিনিস লয় না।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্মরণের অবদানের কথা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। আমাদের চলাফেরা, কাজকর্ম করা, কথাবার্তা বলা, হাট

বাজারের হিসাব করা, সব কিছুর মূলেই আছে স্মরণের কাজ। (অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়া যখনই আমরা বর্তমানের সমস্যার মীমাংসা করি, তখনই প্রয়োজন হয় স্মরণশক্তির।) যে কোনও পেশা অথবা যে কোনও বিদ্যার দক্ষতা লাভ করিতে হইলে ভাল স্মরণশক্তির প্রয়োজন হয়।

স্মরণের স্নায়ুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা—স্মরণকার্যের মূলে আছে অনুষঙ্গের লীলা। এই অনুষঙ্গের ফলেই স্নায়ুস্রোত-প্রাচীন পথ বহিয়া চলিতে থাকে। ইহার জন্য প্রয়োজন প্রথমতঃ স্নায়ুস্রোত প্রবাহিত হইবার জন্য স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে নেমিক্ষত জাতীয় পথ; দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন একটা উপযুক্ত উত্তেজক (Stimulus)। এই উত্তেজকই একটা শক্তির প্রবাহকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, পরে সেই প্রবাহটি প্রাচীন স্নায়ুপথ দিয়া চলিতে থাকে এবং প্রাচীন অভিজ্ঞতাটি নূতন করিয়া সৃষ্টি হয়।

স্মরণের বৈশিষ্ট্য ও অসম্পূর্ণতা—এই নূতন সৃষ্টিটিই স্মরণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। উড্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন, "Recall memory is also known as reproductive momory, and sometimes the word *reproduce* is more suitable than *recall*."

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, সুকান্তের 'রানার' কবিতাটি মনে পড়ে কি? তাহা হইলে হয়ত উত্তর হবে, "হ্যাঁ পড়ে"। কিন্তু স্মরণের দায়িত্বটুকু ঐখানেই শেষ হইল না। 'রানার' কবিতাটি স্মৃতির সাহায্যে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিলে দেখিব হয়ত ঠিকভাবে স্ফুরিত হইতেছে না। এমনি সুকান্তের 'রানার' কবিতাই হউক অথবা রবি বর্মার গঙ্গাবতরণের ছবিই হউক, কিংবা দিলীপ রায়ের গানের সুরই হউক, তাহাদিগকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা নিছক মনে করার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ।

কোনও একটা জিনিসকে প্রথম অনুভব করা, অথবা প্রথমে শিক্ষা করা, পরে স্মৃতি-প্রতিরূপের (Memory image) সাহায্যে স্মরণ করা বা নূতন সৃষ্টি করা এক জাতীয় ব্যাপার নহে। স্মরণের সময় পূর্বানুভূত পদার্থগুলি অবিকল ভাবে ফুটিয়া উঠে না। তাহার মধ্য হইতে বহু অংশই পরিত্যক্ত হয় এবং ব্যক্তিগত নির্বাচনের ফলে কিছুটা থাকিয়া যায়। উড্‌ওয়ার্থের

মতে, স্মরণের মধ্যে যাহা থাকে, তাহা নিছক After-image বা অনুবেদন নহে, তাহা কর্তার খুশী-খেয়ালে বাছাই করা পরিবর্তিত অংশমাত্র। তাহা আলোকচিত্র জাতীয় জিনিস নহে, সমগ্র ছবির মধ্য হইতে কিছু পরিত্যক্ত হইয়া কর্তার মনের রঙ-এ অনুরঞ্জিত হইয়া তাহা ফুটিয়া উঠে।' কথাটি শুধু স্মরণের পর্বের দিক দিয়াই সত্য নহে, স্মৃতির ছবি আঁকার সম্বন্ধেও খানিকটা সত্য। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"স্মৃতির পটে ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুতঃ তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।...জীবনের স্মৃতি ইতিহাস নহে, তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে রঙ তাহাকে নিজের রঙে গুলিয়া লইতে হইয়াছে; সুতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতের সাক্ষ্যদিগের কাজে লাগিবে না।"

ইহার কারণ হইতেছে স্মৃতির খাতায় যাহা জমা হয়, তাহাতে সত্যের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ ঘটে, ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগের বেপরোয়া মিশ্রণে তথ্য রূপান্তরিত হয়। এইখানেই স্মরণের অসম্পূর্ণতা।

স্মরণের কৌশল—স্মরণের অসম্পূর্ণতা যাহাই হউক, স্মরণশক্তির সাহায্য ছাড়া জীবনের পথে এক পাও চলা যায় না। তাই প্রয়োজন হয় যতটা সম্ভব নির্ভুলভাবে স্মরণের কৌশল আয়ত্ত করা, স্মরণের বাধাকে দূর করা। কিভাবে সেটা সম্ভব?

আমরা জানি আবেগের উত্তেজনা অনেক সময় আমাদের স্মরণের বাধার সৃষ্টি করে। উত্তেজনার তাপে, দুঃখে, শোকে, ভয়ে, ক্রোধে অনেক সময়

আমরা "বাপের নাম" ভুলিয়া যাই, অন্য জিনিসের ত কথাই নাই। তাই মানসিক প্রশান্তিই স্মরণের একটা বড় কৌশল।

অনেক সময় আমরা লোকের নাম ভুলিয়া যাই। প্রয়োজনের সময় নামটি হয়ত স্মরণে আসে না, পরে হয়ত মনে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে নিশ্চয়ই কোথাও একটা বাধা পড়িয়াছিল। এই বাধা নানা কারণে সৃষ্ট হইতে পারে। হয়ত লোকটাকে আমরা পছন্দ করি না, তাই তাহার নাম নির্জ্ঞান মন দিয়া ভুলিয়া যাইতে চাই। হয়ত সেই সময় দুইটি বিপরীতমুখী কাজ একই সময়ে করিতে চাই, তাই তাহারা পরস্পরকে বাধা দেয়।

এ ক্ষেত্রে স্মরণ করিবার কৌশল হইতেছে, যে-জিনিসের সঙ্গে স্মরণের বাধা জড়াইয়া আছে, সেই জিনিসটির সংযোগ হইতে স্মরণের বস্তুটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা।

অনেক সময় পূর্বায়ত্ত কৌশল বা পূর্বাধীত বিদ্যা ঠিক স্মরণ হয় না। পরীক্ষার হলঘরে কিংবা জীবনের জটিল পরিবেশে অনেক সময়েই আমাদের স্মরণশক্তি যেন আমাদের প্রতারিত করে। তখন যতই মনে করিবার চেষ্টা করা হয়, ততই তাহা যেন মন হইতে সরিয়া যায়, ফলে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে আমরা উত্তেজিত ও ক্লান্ত হইয়া উঠি। এক্ষেত্রে স্মরণের কৌশল হইতেছে মনকে শিথিল করিয়া দেওয়া এবং স্মরণ করিবার চেষ্টা না করা। আবেগ-উদ্বেগজনিত চিত্তবিক্ষেপকে প্রশমিত করিয়া মনকে আলগা করিয়া দিলেই বিস্মৃত জিনিসটি আপনি মনের উপরে ভাসিয়া উঠে। কখন কখন পরিবর্তিত কর্মসূচীর মধ্যে মনকে ডুবাইয়া দিয়া এক জাতীয় সাময়িক আত্মবিস্মৃতি আনা যায়। এই আত্মবিস্মৃতির মধ্যে আত্মসচেতন মনের আবেগ বিক্ষোভ থাকে না, তখন "স্টেজ ফ্রাইট" জাতীয় ভয় কাটিয়া যায়, বিস্মৃত বিদ্যা আবার স্ফূর্ত হয়।

স্মরণের শর্ত—প্রথম শর্ত প্রত্যক্ষণ (Perception); যদি কোনও জিনিস প্রত্যক্ষ (Perceived) না হয় এবং মনের মধ্যে কোনও ছবি না রাখিয়া যায়, তাহা হইলে স্মরণের কোনও প্রসঙ্গই আসে না।

দ্বিতীয় শর্ত—উপযুক্ত শারীর-মানসিক অবস্থা। অত্যন্ত ক্লান্তি, বিরক্তি,

ভয় বা উদ্বেগের সময় কিছুই স্মরণ হয় না। তাহার কারণ হইতেছে ঐ জাতীয় সময়ে স্মরণের যন্ত্রপাতিগুলি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কাজেই সে আর কোনও কিছু কাজ করিতে পারে না।

তৃতীয় শর্ত—প্রত্যক্ষের (Perception) সাময়িক নৈকট্য। সদ্য সদ্য গৃহীত অনুভূতি মনের মধ্যে যে ছবি আঁকিয়া রাখে, তাহা টাট্‌কা ও স্পষ্ট থাকে। কালের ব্যবধানে তাহা ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইয়া মুছিয়া যায়। কাজেই সময়ের দিক দিয়া নৈকট্য স্মরণের একটা বড় শর্ত।

চতুর্থ শর্ত—অনুষঙ্গ (Association)-জনিত বন্ধন।

পঞ্চম শর্ত—আগ্রহ। এই আগ্রহের অভাবের জন্যই অবাঞ্ছিত ব্যক্তির নাম বা ঘটনার কথা আমরা ভুলিয়া যাই। বিষয়ান্তরে আগ্রহ থাকার জন্য প্রধান অধ্যাপক হয়ত নূতন-দেখা সিনেমা ছবির গল্প অথবা ফুটবল, ক্রিকেটের নবতম সংবাদটিও মনে করিতে পারেন না। ইহা স্মৃতিশক্তির অভাবের জন্য নহে; আগ্রহের অভাবেই এমনটি হয়।

স্মৃতির চতুর্থ পর্ব—প্রত্যভিজ্ঞা : স্মৃতির আর একটি দিক হইতেছে উপস্থিত জিনিসকে চিনিতে পারা। ট্রামে বা ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছি। ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ কামরার এক কোণে একজন লোকের দিকে দৃষ্টি পড়িল। তাহাকে চিনি-চিনি বলিয়া মনে হইল। এমন সময় তাহার চেনা কণ্ঠস্বরটি শুনিতে পাইলাম। আর ভুল হইল না, বুঝিলাম এ রমেন। ইহা হইল স্মরণের ইশারা (Cue)—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় প্রত্যভিজ্ঞা। এই প্রত্যভিজ্ঞার ফলে পুরানো বন্ধু রমেনকে যখন চিনিতে পারিলাম, তখন সে আর আমার কাছে অপরিচিত অনাত্মীয় রহিল না, তাহাকে কাছে ডাকিলাম, পাশে বসাইলাম, গল্প করিতে লাগিলাম। প্রত্যভিজ্ঞার ফলে অজানা জানা হইল—যাহা ছিল প্রত্যক্ষবস্তুর জনতা মাত্র, তাহাই হইয়া উঠিল আত্মীয়তার রসস্নিগ্ধ অভিজ্ঞতা।

প্রত্যভিজ্ঞার দেহতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনার প্রথমেই আছে একটা সংবেদনমূলক (Sensory) উত্তেজকের প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয়তঃ আছে একটা জ্ঞানমূলক ভূঅনুতি। ইহার ফলে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়া যে জিনিসটি গৃহীত

হইল, তাহা জ্ঞানের দিক দিয়াও অধিকৃত হয় এবং ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা প্রভৃতি মনের রঙে অনুরঞ্জিত হয়। সংবেদনের সঙ্গে এই যে অনুভূতির রং-লাগা, ইহাই হইতেছে প্রত্যভিজ্ঞার মূল কথা।) টিচনার বলিয়াছেন :

"The first is the fact that every sensory stimulus of moderate intensity arouses a widespread reaction. The second is the fact that the organisation not only senses but feels ; sensory stimuli ; do more than arouse the sensation and associative and organic reaction ; they set up feelings as well. These secondary effects of stimulation give us the key to the psychology of recognition."

এই অনুভূতির রং লাগার সঙ্গে থাকে একটা পরিচয়ের তৃপ্তি, যেন একটা আত্মীয়তার আবিষ্কার। ইহারই ফলে ট্রেনের অনাত্মীয় সহযাত্রীটি হইয়া উঠিল নিকট বন্ধু, তাহার সম্বন্ধে সৃষ্ট হইল একটা স্বাধিকারের আনন্দ, পরিচয়ের নিবিড়তা, আত্মীয়তার উষ্ণতা, ঘরোয়া পরিবেশের অনুভূতি, তৃপ্তির আরাম ও আনন্দের উল্লাস। প্রথম সংবেদনের অপরিচিতির মধ্যে থাকে একটা আশঙ্কার উদ্বেগ। প্রত্যভিজ্ঞার ফলে হয় সেই উদ্বেগের উপশম আর মিলে একটা বিশ্বাস ও পরিচিতির আরাম।

বিস্মরণ

বিস্মৃতির হেতুটা কি? পূর্বে আলোচিত স্মৃতির বিভিন্ন পর্ব হইতেই বিস্মৃতির কারণগুলি পাওয়া যাইবে। প্রাথমিক অনুভূতি, অনুভূতির ছাপ গ্রহণ, ছাপ সংরক্ষণ, নূতন উত্তেজকের ইশারায় সেই প্রাচীন ছাপের পুনরঙ্কন এবং প্রত্যভিজ্ঞা—এই পর্বগুলির যে কোনও একটি ছিন্ন বা ব্যাহত হইলেই স্মৃতিও ব্যাহত হয়।

প্রথমতঃ অনুভূতিজনিত স্মৃতি-ছাপগুলি ঠিকভাবে তৈয়ারী না হইলে পুরানো কথা মনে রাখা যায় না।) একটি কবিতা মুখস্থ হইবার পর পড়া ছাড়িয়া দিলাম। কিছুদিন পরে যখন কবিতাটিকে আবৃত্তি করার চেষ্টা করিলাম তখন আর তাহা পারিলাম না। ইহার কারণ হইতেছে, মনের

মানসপটে ছবিটি স্পষ্ট করিয়া আঁকা হয় নাই। বহুবার আবৃত্তির ফলে স্মৃতিরেখাগুলি যদি দাগা বুলান লেখার মত গভীর নেমিক্ষতের সৃষ্টি করিত, তাহা হইলে ভুলিয়া যাওয়া সহজ হইত না। এইজন্যই আমরা বর্ণমালার অ, আ, ক, খ সহজে ভুলিতে পারি না। এইজন্যই হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চাপা প্রভৃতি অভ্যস্ত জিনিসগুলি আর কখনও ভুলিয়া যাই না।

বিস্মৃতির দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, স্মরণের ইশারার জন্য **উপযুক্ত উদ্দীপকের অভাব।** মরগ্যান্ (Morgan) বলিয়াছেন, আমাদের স্নায়ুতন্ত্র অভিজ্ঞতা দ্বারা আহৃত তথ্যগুলির ভাঁড়ারঘরের মত জিনিস নহে, তাহা হইতেছে জটিল পথবিন্যাসের মত ব্যাপার। কাজেই স্মৃতির ব্যাপারে ঘটনার সঞ্চয়ের চেয়ে সংযোগ ব্যবস্থাটা বড় কথা। এই সংযোগ-ব্যবস্থার গুণেই একটি ঘটনা অন্য একটি ঘটনাকে মনে করাইয়া দেয়। উপযুক্ত উদ্দীপক এই সংযোগ-ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ইহার অভাবে পূর্বাহৃত সব ঘটনাই মনের গহনে তলাইয়া থাকে।

বিস্মৃতির তৃতীয় কারণ, **স্মরণের বাধা।** পথের যোগাযোগ-ব্যবস্থা নানা কারণেই ব্যাহত হইতে পারে। পথের অন্তর্বর্তী স্থান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, অথবা মাঝপথে যানবাহনের আধিক্যে "Traffic jam" হইতে পারে। স্নায়ুতন্ত্রেও অনুরূপ অবস্থার জন্য বিস্মৃতি ঘটে।

প্রথম অবস্থাটি হয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতির জন্য। ইহা অবশ্য প্রতিনিয়তই ঘটে না এবং ইহার প্রতিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজ। দ্বিতীয় অবস্থাটি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রায়ই ঘটে। পরীক্ষার হলে অধীত বিদ্যা ভুলিয়া যাওয়া, আত্মীয়-বন্ধুর ছোটখাট ব্যাপারের কাজগুলি করিতে ভুলিয়া যাওয়া ইত্যাদি ভুল অহঃরহই ঘটে। ভুলগুলি কেন হয়? কর্মসূচীর আতিশয্যের জন্য নূতনতর একটি জিনিসের কর্মসূচী হয়ত পূর্বতন কাজের পথ আট্‌কাইয়া দাঁড়ায়। ফলে স্নায়ুস্রোতের যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। মরগ্যান্ (Morgan) একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন: সকালের দিকে এক বন্ধু আমাকে কয়েকখানি বই দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে, আমিও রাজী

হইয়াছি। স্থির করিয়াছি, টিফিনের সময় বাড়ী আসিয়া ফির্তি পথে গাড়ীতে করিয়া বইপত্রগুলি লইয়া যাইব। কিন্তু কাজের সময় ঠিক কাজটি ভুলিয়া যাইলাম। বন্ধুর সঙ্গে যখন দেখা হইল, তখন লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারি না। তাহার কাছে অন্যমনস্কতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ভুলটি হইল কেন? সন্ধ্যাবেলায় আত্মবিশ্লেষণ করিতে যাইয়া কারণটি ধরা পড়িল। টিফিনের সময় যখন বাড়ীতে আসিলাম, তখন দেখি আমার দিদি ঐ গাড়ীটি লইয়া অন্যত্র যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। দিদি বলিলেন—"তোমার স্কুলটি ত কাছেই, আজ হেঁটেই স্কুলে যাও, আমি একটা জরুরী কাজে গাড়ীটা নিয়ে যাবো"—সঙ্গে সঙ্গে দিদির কথায় সায় দিলাম। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় প্রতিনিয়তই মনে হইতে লাগিল কি যেন ফেলিয়া আসিয়াছি; কিন্তু কিছুই মনে আসিল না, পরে যখন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল তখন নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইতে হইল।

কেন ভুলটি হইয়াছিল? পূর্বতন পরিকল্পনার পথে দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি পথরোধ করিয়াছিল। স্নায়ুপথে 'traffic jam' হইয়াছিল। তাই এইরূপ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। স্মৃতির কাজ চলিল না। ভুল হইল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, একটি প্রাক্-পরিকল্পিত কর্মসূচী যদি পরবর্তী কর্মসূচী দ্বারা ব্যাহত হয়, তাহা হইলে প্রায়ই কাজে ভুলভ্রান্তি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তির প্রায়ই একটা পূর্বাভাস পাওয়া যায়, মনের মধ্যে একটা চঞ্চলতার ভাব—কি যেন ভুল করিয়াছি, কি যেন ফেলিয়া আসিয়াছি, এইরূপ একটা ভাব জাগে। একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে একটা Set বা বিন্যাসের সৃষ্টি হয়। পরে ঐ কর্মসূচীর পরিবর্তন হইলেই ঐ Set-এর পরিবর্তন হয়। তাহারই ফলে মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের ভাব আসে। প্রকৃতিরই যেন ইহা সতর্কবাণী।

বিস্মৃতির চতুর্থ কারণ হইতেছে, মানসিক উদ্বেগ, ভয়, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি। অভিনয় করিতে যাইয়া পার্ট ভুলিয়া যাওয়া, বক্তৃতা করিবার সময় কথা না পাওয়া প্রভৃতি এই কারণে ঘটে। অভ্যস্ত বিদ্যাও অনেক সময় উদ্বেগ-উত্তেজনার জন্য ভুলিয়া যাইতে হয়। উদ্বেগ-উত্তেজনার জন্য আমরা যতই

সাবধান হইতে চেষ্টা করি, ততই যেন অভ্যস্ত-নৈপুণ্য শিথিল হইয়া যায়, সামান্য ব্যাপারেও আমাদের আচরণ হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। ইহার প্রতিকারের উপায় হইতেছে মনের আবেগ-উদ্বেগের উপর সংযমের প্রতিষ্ঠা।

বিস্মৃতির ষষ্ঠ কারণ হইতেছে **ব্যভিচার** (Interference)। বিভিন্ন কাজের গোলমালে কাজের স্মৃতিগুলি ঘুলাইয়া যায়। একটা শ্লেটে পুরানো লেখার উপর যদি অনেক জিনিস লেখা হয়, তাহা হইলে নূতন লেখাগুলির জটপাকানো ভীড়ের মধ্যে পুরানো লেখাটার "প্যাটার্ণকে" আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্মৃতির ক্ষেত্রেও তাহাই হয়।

বিস্মৃতির সপ্তম কারণ হইতেছে **অব্যবহারের ক্ষয়ক্ষতি** (Atrophy from disuse)। একটা পেশী যদি বহুদিন কাজকর্ম না করে, তাহা হইলে সেটি অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। স্মৃতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। একটা কিছু শিখিবার পর মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে যে স্মৃতিরেখা (Memory trace) আঁকিয়া যায়, তাহা দীর্ঘদিনের অব্যবহারে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যায়, ফলে আমরা ভুলিয়া যাই।

তবে এই ভুলিয়া যাওয়াটা সবটাই দোষের নহে। আমরা অনেক জিনিস ভুলিয়া যাই বলিয়াই অনেক দরকারী জিনিস মনে রাখিতে পারি। নতুবা বাজে জিনিসের গুদাম ঘর হইয়া আমাদের মাথাটা ভারাক্রান্ত হইয়া থাকিত। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন বহু জিনিসই আছে, যাহার মূল্য অতি সাময়িক। সেগুলিও যদি মনের মধ্যে ভীড় করিয়া থাকে, তাহা হইলে মন আর নূতন জিনিস সহজে গ্রহণ করিতে পারে না।

এই ভুলিয়া যাওয়ার বিষয়বস্তুর মধ্য হইতেই একটি মানুষের চরিত্রের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। একজন দার্শনিক পণ্ডিতকে একটা সিনেমা ছবি দেখাইলে দুইমাস পরে তিনি সেই ছবিটির প্লট বলিতে পারিবেন না, চল্‌তি বছরে কোন্ টিম্‌টা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ান্ হইয়াছে, সে খবরও তিনি বেশীদিন মনে রাখিতে পারিবেন না। কারণ এই সিনেমা বা ফুটবল সম্বন্ধে তাহার কোনও স্থায়ী আগ্রহ নাই।

বিস্মৃতি সম্বন্ধে **ফ্রয়েডের মতবাদ**: ফয়েড বলেন, "আমরা ভুলিয়া

যাইতে চাই বলিয়াই ভুলি”—পাওনাদারের টাকা দিতে ভুলিয়া যাই, যে কাজ করিতে চাই না সেই কাজের কথা যথাসময়ে ভুলিয়া যাই। আমাদের নির্জ্ঞান মন আমাদের অজ্ঞাতসারে এই ভুলগুলি ঘটাইয়া থাকে।

অনেক ক্ষেত্রেই ফ্রয়েডের কথাটি সত্য। কিন্তু এমন ভুল আমরা বহু করি যেগুলিকে নির্জ্ঞান মনের সক্রিয় বিস্মৃতি (Wishful forgetting) বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। পরীক্ষার সময় পঠিত বিদ্যা ভুলিতে না চাহিলেও ভুলিয়া যাই, দরকারী ঘটনা ভুলিয়া যাই, ট্রেনে বাসে দামী জিনিসপত্র ভুলিয়া ফেলিয়া রাখিয়া আসি, ভুলের বশে এমনি কত সর্বনাশই করিয়া বসি।

স্মৃতিশক্তিকে বৃদ্ধি করা যায় কি?

স্মৃতির আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন আসিতে পারে যে, অনুশীলনের দ্বারা স্মৃতিশক্তি বাড়ান যাইতে পারে কিনা?

জেম্‌স বলিয়াছেন, স্মৃতির সংরক্ষণ শক্তির (retention) দিক দিয়া স্মৃতিকে কিছুতেই বাড়ানো সম্ভবপর নহে। এই সংরক্ষণ শক্তি মানুষের স্নায়ুর সমৃদ্ধি ও উপাদানের উপর নির্ভর করে। এই উপাদানগুলি ভাল মন্দ যাহা যাহা হইবার তাহা জাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক হইয়া যায় এবং তাহার আর কোনও পরিবর্তন সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কাহার সংরক্ষণ শক্তি কিরূপ হইবে, তাহা তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই চির জীবনের জন্য ঠিক হইয়া যায়, কোনও রকম কৃষ্টি, কলা বা সারস্বত সাধনা তাহার উৎকর্ষণ করিতে পারে না।

তাহা হইলে কি স্মৃতিশক্তিকে বাড়াইবার আর কোনও উপায়ই নাই? নাই বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে স্মৃতিকে কার্যকরী করিয়া তোলা যায় এইভাবে:

(১) বিভিন্ন অনুষঙ্গের সঙ্গে অনুভব্যকে বিজড়িত করিতে পারিলে সেই অনুষঙ্গের সূত্র ধরিয়া পুরাণো কথা অনেক সময় মনে পড়িয়া যায়।

(২) অনুভূত জিনিসগুলিকে যথাযথভাবে শ্রেণীবিভাগ এবং এক একটি এককের (unit) মধ্যে একীকরণ করিতে পারিলেও ভবিষ্যতে মনে পড়িবার সুবিধা হয়।

(৩) স্মরণীয় জিনিসগুলির অর্থবোধ থাকিলে অনুষঙ্গ গঠনের সুবিধা হয়, সুতরাং যাহা পড়িতে হইবে অথবা মনে রাখিতে হইবে, তাহার অর্থবোধ করিতে পারিলে মনে পড়িবার সুবিধা হয়।

(৪) যেখানে অর্থবোধ সহজ নহে সেখানে নূতন ব্যঞ্জনা দিতে পারিলে অথবা ছন্দে সৌন্দর্য স্থষ্টি করিতে পারিলেও মনে রাখিবার সুবিধা হয়।

(৫) কোনও জিনিস পড়িবার বা শিখিবার সময় শিক্ষার্থীর প্রবল আগ্রহ মনে রাখবার অনুকূল হয়। আগ্রহের নিবিড়তা মনের অন্যান্য বিরুদ্ধ চিন্তাকে অপসারিত করিয়া দেয়, ফলে মনটী মোছা শ্লেটের মত পরিষ্কার হইয়া অনুভূতির ছাপগুলিকে স্পষ্টতমভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ফলে স্মৃতি কাজ করিতে পারে অবাধে।

ম্যাক্‌ডুগল, স্মিথ (Miss W. Smith) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, স্মৃতির মধ্যে সংরক্ষণ-শক্তিকে যে বাড়ানো যায় না বলিয়া জেম্‌স প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে ; কারণ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, সংরক্ষণ-শক্তিও অভ্যাসের দ্বারা বাড়ানো যাইতে পারে।

স্মৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য :

স্মৃতি সম্বন্ধে নানা জাতীয় পরীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, তাৎক্ষণিক স্মৃতি অথবা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিবার বা সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করিবার ক্ষমতার (immediate memory) সহিত সংরক্ষণ শক্তির (retention) বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ যে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিতে পারে সে যে বেশীদিন মনেও রাখিতে পারে, এমন কোনও কথা নাই। **তাৎক্ষণিক স্মৃতি** নির্ভর করে (১) অভ্যাসের সংখ্যা এবং (২) মনোযোগের তীব্রতার উপর।

অতীতের অভিজ্ঞতাগুলি অনেক সময় আত্মসচেতন চেষ্টা ব্যতিরেকেই মনের উপরে ভাসিয়া উঠে। যখন আমরা নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া শয্যা গ্রহণ করি, তখন দিনের অভিজ্ঞতাগুলি অনেক সময় সিনেমার ছবির মত

মনের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতে থাকে। হাসি-হাসি মুখ, টুকরা-টুকরা কথা, পথপ্রান্তে অবস্থিত বেদনাখিন্ন ভিখারীর কাতর দৃষ্টি, ফুটবল মাঠের হাস্যকর ঘটনা প্রভৃতি কত ছবিই হয়ত আমাদের মানস-চক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে। এগুলিকে মনে করিবার জন্য আমাদিগকে সচেতন প্রয়াস কিছুই করিতে হয় না। যে শক্তির দ্বারা অতীতের অভিজ্ঞতাগুলি এই ভাবে স্বতঃই মনের উপর ভাসিয়া উঠে, তাহাকে মনস্তাত্ত্বিকগণ perseveration নাম দিয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি বা তাৎক্ষণিক স্মৃতির সহিত এই perseverationএর একটা বিষমানুপাত সম্পর্ক আছে।

এই তাৎক্ষণিক স্মৃতির সহিত বয়সের সম্পর্কটি কি, ইহা লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, এই বিষয়ে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা বালকের ক্ষমতা অল্প। মিউমান্ (Meumann) দেখাইয়াছেন, তাৎক্ষণিক স্মৃতি ধীরে ধীরে ১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে থাকে, ১৩ হইতে ১৬ বৎসর পর্যন্ত এই শক্তি আরও ক্ষিপ্রভাবে বাড়িতে থাকে এবং ১৬ হইতে ২৫ বৎসর পর্যন্ত এই শক্তি ক্রমাগত বর্ধিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। ২৫-এর পর হইতে অত্যন্ত ধীরে ধীরে এই শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে; তবে খুব প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটি তেমন বুঝিতে পারা যায় না এবং অনেকের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও স্মৃতিশক্তি অটুট থাকে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ক্ষিপ্র স্মৃতির সহিত সংরক্ষণের দীর্ঘত্বের কোনও স্বাভাবিক সম্পর্ক নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া স্মৃতিকে সংরক্ষণ করা নির্ভর করে অনুভূতির ছাপগুলিকে সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিবার দক্ষতা আর মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের উপাদানের সমৃদ্ধির উপর। প্রথমটি অনুষঙ্গ, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা, যথাযথ শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতির দ্বারা বাড়ান যাইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে বাড়াইবার বিশেষ কোনও উপায় নাই।

সংরক্ষণের ব্যাপারে পূর্ণবয়স্কদের অপেক্ষা বালক বালিকাদের ক্ষমতা অধিক এবং এই ক্ষমতা ১১।১২ বৎসর পর্যন্ত বাড়িতে থাকে, তাহার পর হ্রাস পায়। বস্তুতঃ বাল্যকালে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার কাজটি কঠিনতর বলিয়া

মনে হইলেও, এই সময়ে মুখস্থ রাখার শক্তিটি বেশী থাকে। শিক্ষাবিদ্ রাস্ক বলিয়াছেন, "শিশু বয়সে শিখ, ভাল করিয়া শিখিবে।" শিক্ষা অর্থে যদি শিক্ষার সংরক্ষণ ধরা হয়, তাহা হইলে এই উপদেশের সার্থকতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই যে সমস্ত জিনিসগুলি সারা জীবন মনে রাখা প্রয়োজন, তাহা শিশু বয়সেই শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, তাৎক্ষণিক স্মৃতি ও স্থায়ী স্মৃতি ছাড়া অন্যান্য দিক দিয়াও স্মৃতির প্রকারভেদ আছে। কেহ হয়ত কবিতা ভালভাবে মনে রাখিতে পারে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে নাম, সংখ্যা প্রভৃতি মনে রাখিতে পারে না, কেহ হয়ত নাম-সংখ্যা-তারিখ প্রভৃতি মনে রাখিতে পারে, কিন্তু কবিতা বা ঘটনাপারম্পর্য ভালভাবে মনে রাখিতে পারেনা। কেহ হয়ত কান দিয়া শুনিলে ভালভাবে মনে রাখিতে পারে, কিন্তু চুপি-চুপি পাঠ করিলে বা মনে মনে পড়িলে তাহা মনে রাখিতে পারে না। (দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন প্রভৃতি কোন্ অনুভূতি দিয়া কে যে বিশেষভাবে অনুভব করে, অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন্ দ্বারটি দিয়া কাহার অনুভূতিগুলি সহজে প্রবেশ করে, তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই। এইজন্যই শিক্ষকের উচিত ক্লাশের মধ্যে শুধু বক্তৃতা না করিয়া নানাভাবে ছাত্রদের অনুভূতিকে জাগ্রত করা। ছাত্ররা কান দিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনুক, ছবি, মডেল, গ্রাফ, নক্সা প্রভৃতি দেখিয়া সেগুলি অন্যভাবে অনুভব করুক, হাতে-কলমে কাজগুলি করিয়া, ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে অভিনয় প্রভৃতি করিয়া কর্মবহা স্নায়ুর সহিত তাঁহারা পরিচয় লাভ করুক এবং এইভাবে সমগ্র চেতনার সহিত বিষয়কে আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করুক। এই ব্যবস্থা দ্বারা শ্রবণ-কেন্দ্রিক, দর্শন-কেন্দ্রিক, স্পর্শ-কেন্দ্রিক—বিভিন্ন শ্রেণীর স্মৃতিবিশিষ্ট ছাত্রদেরই যে শুধু বুঝিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় তাহা নহে, প্রত্যেক ছাত্রেরই স্মৃতির সংরক্ষণ শক্তিকে বিশেষভাবে সাহায্যও করা হয়।) কান দিয়া শুনিয়া যাহা অনুভব করিলাম, চোখ দিয়া দেখিয়া তাহা দৃঢ়তর হইল, হাতে-কলমে তাহা সম্পাদন করিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা আরও দৃঢ়তর হইল। মোট কথা, স্মৃতিকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করিতে হইলে অনুভূতিকে সমবায়ী করিতে হইবে। বস্তুতঃ

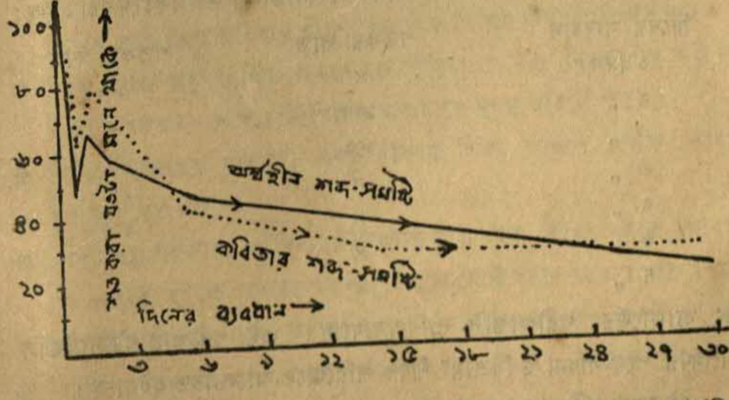
স্মৃতির সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন **আগ্রহ** আর **পুনরাবৃত্তি**। আগ্রহ থাকিলে সমগ্র চেতনা দিয়াই আমরা অনুভূতির জিনিসগুলিকে গ্রহণ করি। ফলে অনুভূতির ছাপটি আমাদের মনে স্পষ্ট এবং গভীরভাবে গৃহীত হয়। বহু আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়া স্নায়ুপ্রবাহের গতিপথটি গভীরতর হইতে থাকে। ফলে খাঁজ-কাটা দাগাবুলানো পথে ছেলেদের অ আ ক খ শেখার যেমন সুবিধা হয়, পঠিত জিনিসগুলি মুখস্থ বলিবার বা অভ্যস্ত ক্রিয়াকলাপের পুনঃপ্রদর্শনী দেখাইবার সেইরূপ সুবিধা হয়। আমাদের দেশে যে একটা পাঠনীতি আছে "আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী", তাহার বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আমরা এই স্নায়ুপ্রবাহ তত্ত্ব দিয়া বুঝিতে পারি। বর্তমান শিক্ষাতত্ত্বে পাঠ দিবার পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা জাতীয় ভূমিকা করিয়া (preparation) এবং পাঠের শেষে যে বার বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার (driling) ব্যবস্থা আছে, তাহা এই আগ্রহ ও পুনরাবৃত্তির সাহায্যে স্মৃতিকে স্থায়ী করারই ব্যবস্থা।

বিস্মৃতির হার ভুলিয়া যাওয়ার সহিত ঘটনার প্রাচীনত্বের সম্পর্কটি অত্যন্ত গভীর। (একটি জিনিস যত বড়ই হউক না কেন, দূরে চলিয়া যাইলে তাহাকে ছোট দেখায় এবং আরও দূরে যাইলে আর দেখাই যায় না। স্মৃতির সম্বন্ধেও তাই নিয়ম। সময়ের দূরত্ব যতই বাড়িবে, ঘটনার স্মৃতিও ততই অস্পষ্ট হইবে।) তবে ইহার সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ধারা আছে।

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, একটি কবিতা এইমাত্র শিক্ষা করা হইল। এখনই অর্থাৎ কবিতাটি কয়েকবার পাঠ করিবার পর যেইমাত্র পুস্তক না দেখিয়াই তাকে আবৃত্তি করিতে সমর্থ হইলাম তখনই কবিতাটি অভ্যাস করা বন্ধ করিলাম। এইবার এক ঘন্টা পরে দেখিব কবিতাটির ১/২ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি, তৃতীয় দিনে ২/৩ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি এবং এক মাস পরে ৩/৪ অংশ ভুলিয়া গিয়াছি। সময়ের অনুপাতে আমরা কি ভাবে ভুলিয়া যাই, সে সম্বন্ধে এবিঙ্গহৌস (Ebbinghaus) একটি তালিকা দিয়াছেন :

শিক্ষা শেষের পর সময়ের দূরত্ব	শতকরা স্মৃতির অনুপাত (অর্থহীন শব্দসমষ্টি)	শতকরা স্মৃতির অনুপাত (অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টি)
৫ মিনিট	৯৮	১০০
২০ "	৮৯	৯৬
১ ঘণ্টা	৭১	৭৮
৮ "	৪৭	৫৮
২৪ "	৬৮	৭৯
২ দিন	৬৯	৬৭
৬ "	৪৯	৪২
১৪ "	৪১	৩০
৩০ "	২০	২৪
১২০ "	৩	০

অন্যান্য পণ্ডিতগণও এই বিষয়ে অনুরূপ ফল পাইয়াছেন। ইঁহাদের সময়ের সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, বিস্মৃতির লৈখিক চিত্রটি (graph) প্রথমে হঠাৎ নামিয়া যায়, তাহার পর ধীরে ধীরে ইহা ভূমির সহিত সমান্তরাল (নিম্নের চার্ট দ্রষ্টব্য) হইয়া চলে।



Radossawliewitsch নামক একজন পণ্ডিত দেখিয়াছেন যে, অর্থহীন শব্দসমষ্টিগুলির স্মৃতি ছয় ঘণ্টার পর শতকরা ৪৭ ভাগ থাকিয়া যায়, কিন্তু ১ দিন ও ২ দিন পরে তাহা যথাক্রমে ৬৮ ও ৬১ ভাগ থাকিয়া যায়। এখন

প্রশ্ন হইতে পারে, সময়ের দূরত্বে স্মৃতির দিক দিয়া উন্নতি হইল কি করিয়া? ছয় ঘণ্টার পরে যতটা মনে রাখা সম্ভব ছিল, ১ দিন পরে তাহা অপেক্ষা বেশী মনে রাখা সম্ভবপর হইল কি করিয়া? ইহার সম্ভাব্য উত্তর, রাত্রের বিশ্রামজনিত ক্লান্তির অপনোদন মনকে আরও কর্মক্ষম করিয়া তুলে বলিয়া দীর্ঘ বিশ্রামের পর বেশী মনে রাখা সম্ভবপর হয়।

কিন্তু এ ব্যাখ্যা হইতেছে আচরণবাদী পণ্ডিতদের। অন্যান্য পণ্ডিতগণ এই ব্যাপারটির অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন, ৬ ঘণ্টার চেয়ে ২৪ ঘণ্টা বিশ্রামের ফলে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় বেশী হয়। তাহার কারণ হইতেছে, বিশ্রামের অবসরে অনুভূতির **দৃঢ়ীকরণ** (consolidation) ; আর সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন একদিক দিয়া কিছু কিছু জিনিস আমাদের স্মৃতি হইতে সরিয়া যায়, অপর দিক দিয়া তেমনিই অতীত অনুভূতির ছাপগুলি ক্রমশঃ সংহত ও সুসজ্জিত হইয়া যথাযথ **ছাপজটের** (engram complex) সৃষ্টি করে বলিয়া স্মৃতির কার্যকারিতা নূতন করিয়া বাড়িয়া যায়।

ডঃ ব্যালার্ড-এর স্মৃতি-পরীক্ষা :

ব্যালার্ডে-এর স্মৃতি সম্পর্কিত পরীক্ষালব্ধ ফলগুলির তালিকা দেওয়া হইল :

দিনের ব্যবধান	শতকরা লাভ	শতকরা ক্ষতি
১ দিন	×	১·৬
২ "	৯·৪	×
৩ "	৬·১	×
৪ "	×	২·০
৫ "	×	৫·৮
৬ "	×	৮·৭
৭ "	×	১২·১

ডঃ ব্যালার্ডের পরীক্ষাগুলি প্রণিধানযোগ্য। এই পরীক্ষার খুঁটিনাটিগুলি "শিক্ষার পথে সাধনা ও বিশ্রাম" শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মনে রাখিবার ব্যাপারে শুধু পড়া বা সাধনাটাই একমাত্র কথা নহে, সাধনা ও বিশ্রামের যথাযথ বিন্যাসও প্রয়োজন। বিশ্রামের যেরূপ ব্যবধানে স্মৃতির লাভের অঙ্ক বেশী

হয়, সেইরূপ ব্যবধান দিয়া পড়াশুনা করিলে অপচয় কম হইবে। এই সম্বন্ধে "শিক্ষার পথে সাধনা ও বিশ্রাম" শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

স্মৃতি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি তথ্য ঃ

- বার তের বৎসরের বালক বালিকাদের অসম্বদ্ধ বিষয়ে স্মরণশক্তি প্রখর কিন্তু সম্বদ্ধ বিষয়ে স্মরণশক্তি তত নহে। এইজন্য যে সকল পাঠ্য বিষয়ে যুক্তি অপেক্ষা তথ্য অধিক সেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।
- সম্বদ্ধ বিষয়ের স্মরণশক্তি বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বর্ধিত হয় ও যৌবনকালে ইহার পরিপুষ্টি হয়। যত্ন ও চেষ্টার সাহায্যে সম্বদ্ধ বিষয়ের স্মরণশক্তি কিঞ্চিৎ বর্ধিত করা যায়। যৌবনকালে বৈষয়িক আসক্তি প্রবল হওয়ায় অসম্বদ্ধ বিষয়ের স্মরণশক্তি বালকবালিকা অপেক্ষা অল্প হয়।
- সাধারণতঃ বালকবালিকারা সাত-আট বৎসর পর্যন্ত পাঠ্যবিষয় শুনিয়া সহজে কণ্ঠস্থ করিতে পারে। চৌদ্দ-পনের বৎসর পর্যন্ত দেখিয়া ও উচ্চস্বরে পাঠ করিয়া তাহাদের মুখস্থ করিবার ক্ষমতা প্রবল থাকে।
- বার তের বৎসরের পূর্বে বালকেরা কেবল দেখিয়া ও শুনিয়া কিংবা দেখিয়া-শুনিয়া ও লিখিয়া পাঠ কণ্ঠস্থ করিতে পারে না। এ বয়সে লিখিয়া-লিখিয়া পাঠ মুখস্থ করিবার রীতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।
- বয়স্ক ব্যক্তি শুধু দেখিয়া ও মনে-মনে পড়িয়া কোনও বিষয় শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারে। আবার লিখিয়াও অনায়াসে মুখস্থ করিতে পারে।
- বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে একই বিষয় শিক্ষা করিলে বালক তাহা সহজে বিস্মৃত হয় না।
- মনোযোগ সহকারে যে বিষয়ের উপলব্ধি করা যায় তাহা সহজে আয়ত্ত হয় ও স্মৃতি হইতে অপসৃত হয় না। অমনোযোগী হইয়া বহুবার পাঠ্য বিষয় আবৃত্তি করিলেও তাহা কণ্ঠস্থ হয় না এবং কণ্ঠস্থ হইলেও স্থায়ী হয় না।
- বালক বালিকা এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য এককালীন পাঠ্য অল্প হওয়া আবশ্যক।
- পাঠ্যবিষয় নির্ভুলভাবে কণ্ঠস্থ করিতে যতবার আবৃত্তি করা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা পাঁচ ছয়বার অধিক আবৃত্তি করা বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে

আয়ত্ত বিষয় অধিকতর বদ্ধমূল হয় ও স্মৃতি হইতে সহজে অপসারিত হয় না।

- কোন বিষয় তালের সাহায্যে শিক্ষা দিলে সহজে আয়ত্ত হয় ও শিক্ষার্থীর মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকে।
- ক্লান্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির ক্ষমতা কমিয়া যায়।
- মনোযোগের বিঘ্নকর জিনিস বিশেষভাবে কর্ণগ্রাহ্য আবেদনজনিত বিঘ্ন মুখস্থ করিবার পক্ষে ক্ষতিকর।
- বালক বালিকাদের স্মৃতিতে রক্ষিত ঘটনা প্রায়ই কল্পনার ঘটনার সহিত মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া যায়। সেইজন্য তাহাদের সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর খুব নির্ভর করা যায় না।
- যাহারা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিতে পারে তাহারা দীর্ঘকাল মনেও রাখিতে পারে।
- জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অথবা উনমানসিকতাযুক্ত বালক-বালিকাদের স্মৃতিশক্তির সাধারণ বালকবালিকাদের চেয়ে অল্প।
- প্রাণীদের বুদ্ধির তারতম্য নির্ভর করে তাহাদের সমৃদ্ধ স্মৃতিশক্তির উপর।

সাধারণ ছাত্রদের যতটা স্মৃতিশক্তি আছে বলিয়া আমাদের ধারণা, তাহাদের স্মৃতিশক্তি তদপেক্ষা অধিক। সাধারণতঃ ৯ হইতে ১৫ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন বৎসরে তিন হাজার লাইন কবিতা বা গদ্য অনায়াসেই শিক্ষা করিতে পারে এবং এইভাবে শিক্ষালব্ধ বিষয়ের এক অষ্টমাংশ হইতে এক চতুর্থাংশ তাহাদের সারা জীবনের সম্পদ হইয়া মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে।

ক্লান্তি

সাধনার পথে চলিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের কর্মশক্তি ধাপে ধাপে একটানা ভাবে বাড়িয়া চলে না, তাহা প্রথমটা দ্রুতভাবে বাড়িয়া চলে, তাহার পর যেন থমকিয়া দাঁড়ায়, আবার ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে, আবার থমকাইয়া দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় আসে যে, তাহা আর চলিতে পারে না। সেই সময় কাজে সম্পূর্ণ বিশ্রাম না দিলে কর্মশক্তি আরও অনেকক্ষণের জন্য পঙ্গু হইয়া থাকে।

কাজেই ক্লান্তি যখন বিশ্রামের দাবী করে, তখন বিশ্রাম না দিলে সিদ্ধি আরও চিরায়িত হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রায়ই ক্লান্তি এবং কাজের একঘেয়েত্বের জন্য বিরক্তিজনিত অনিচ্ছা (boredom), এই দুইটি জিনিসের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। ফলে মন যখন প্রকৃত ক্লান্ত না হইয়াও আদুরে খোকার মত নিছক আলস্যবশতঃ বিশ্রামের দাবী করে, তখন তাহাকে প্রশ্রয় দিলেও সাধনার ক্ষতি হয়।

এই প্রকৃত ক্লান্তির স্বরূপটি জানিয়া না রাখিলে আমাদের দুইদিক দিয়া অসুবিধা হইতে পারে। আদুরে গোপাল মনকে 'নাই' দিয়া তাহার নিকট হইতে যতটা কাজ পাওয়া সম্ভব, তাহা না পাওয়া, অথবা সে যতটা কাজ করিতে পারে তাহার অধিক কাজের বোঝা তাহার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া তাহার কর্মশক্তির ক্ষতি করা। অতএব আমাদের জানিয়া রাখা দরকার ক্লান্তির লক্ষণটি কি ?

দৈহিক বিচারে ক্লান্তি জিনিসটা আসে (১) পেশী, (২) স্নায়ুতন্ত্র ও (৩) প্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়াকে (reflex) কেন্দ্র করিয়া।

পেশীর ক্লান্তি ঃ একজন ব্যায়ামসাধক যখন একটি বারবেল লইয়া বার বার উত্তোলন করিতে থাকে, তখন কয়েকবার উত্তোলন করিবার পর তাহার এমন একটি অবস্থা আসে যখন তার আর বারবেলটি উত্তোলন করিবার শক্তি

থাকে না ; তখন তাহার পেশীগুলি তাহার মনের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারে না। এই জাতীয় অবস্থাটিকেই আমরা পেশীর ক্লান্তি বলিয়া থাকি।

পেশীগত ক্লান্তি সম্পর্কে Mosso তাঁহার আবিষ্কৃত ergograph লইয়া যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাতে এই সিদ্ধান্তগুলি পাওয়া গিয়াছে :

(ক) কার্যারম্ভের প্রথম দিকেই একটা অবসাদের ভাব আসে, কার্য চালাইয়া যাইলে তাহা আবার কমিয়া যায় এবং তাহার পর ক্লান্তি আসে। (খ) পেশীর সঙ্কোচনের ফাঁকে ফাঁকে যদি অন্ততঃ ১০ সেকেণ্ড করিয়া বিশ্রাম দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্লান্তি আসে না। (গ) ক্লান্তির পর খানিকটা বিশ্রাম দিলে স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া আসে ; ergograph যন্ত্রে অঙ্গুলির সঙ্কোচক পেশীর ক্ষেত্রে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম দিলে পেশীর শক্তি স্বাভাবিক হয়। (ঘ) পূর্ণ ক্লান্তির পর যদি আবার পেশী সঙ্কোচনের জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে পেশী এত নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, বিশ্রামের জন্য আরও অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। (ঙ) নির্দিষ্ট সময়ের এককের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি অঙ্গ সঞ্চালন করা হয়, তত তাড়াতাড়ি ক্লান্তি আসে। (চ) খাদ্যের সরবরাহ কম হইলে, অথবা শরীর হইতে পেশীর ক্ষয়জাত দ্রব্যের যথাযথ নিষ্কাশন না হইলে, শীঘ্র শীঘ্র ক্লান্তি আসে ; অপর পক্ষে massage-এর সাহায্য রক্ত সঞ্চালনের দ্বারা, অথবা খাদ্য বা চিনির শরবৎ প্রভৃতি দ্বারা ক্লান্তির অপনোদন হয়। (ছ) শরীরের কতকগুলি পেশী ক্লান্ত হইলে অন্য পেশীগুলিরও কার্যকারিতা শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। (জ) অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি শারীরিক শক্তিকে কমাইয়া দেয়। (ঝ) অ্যাল্কহল্, কফিন্, নিকোটিন প্রভৃতি ক্লান্ত পেশীকে কতখানি সতেজ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই, তবে শরীরের মধ্যে চিনি ইন্‌জেক্‌শান্ করিবার পর ৩০ হইতে ৪০ মিনিটের মধ্যেই দেখা যায় যে, শক্তি অনেকখানি ফিরিয়া আসিয়াছে ; বিপরীত পক্ষে সুস্থ শরীর হইতে কৃত্রিম উপায়ে চিনি বাহির করিয়া লইলেও পেশীর শক্তি কমিয়া যায়।

স্নায়ুপ্রণালীর ক্লান্তি (Nerve Trunk) : পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, পেশীর ক্লান্তি শীঘ্র শীঘ্র আসিলেও স্নায়ুপ্রণালীর ক্লান্তি সহজে আসে না।

মস্তিষ্ক হইতে কোনও একটা প্রেরণা যখন স্নায়ুপ্রণালী বহিয়া পেশীতে চলিতে থাকে, তখন স্নায়ুপ্রণালীতে খানিকটা ক্ষয়ক্ষতি যে হয় না তাহা নহে, তবে তাহা অতি অল্প। স্নায়ুপ্রবাহকে ক্লান্ত করা প্রায় অসম্ভব।

প্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়া (Reflexes) ও ক্লান্তি ঃ ভয়ে কাঁপা, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠা, খাদ্যদ্রব্য দেখিলে জিহ্বায় রসক্ষরণ হওয়া, গরম জিনিসে হাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ হাত সরাইয়া লওয়া প্রভৃতি কাজগুলিকে 'প্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়া' (reflexes) বলা হয়। এই প্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়ার উপর ক্লান্তির প্রভাব কতটুকু তাহা লইয়া শেরিংটন অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, মেরুদণ্ডের স্নায়ুজনিত প্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়াগুলি (spinaler reflexes) বার বার উত্তেজনায় অথবা একটানা উত্তেজনায় ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হইয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এই ক্লান্তিটি পেশীর ক্লান্তির জন্য হয় না। কারণ, দেখা গিয়াছে যে, এই স্নায়ুর পরিশ্রমের জন্য একটি কুকুরের সঙ্কোচক পেশীটি যখন সঙ্কোচন কার্যের জন্য সাড়া দিতে পারে না, তখন এই পেশীটিই হয়ত সুড়সুড়ি বা অন্য জাতীয় আবেদনে সাড়া দেয়। এ ক্ষেত্রে পেশীটি যদি ক্লান্ত বা অবসন্ন হইত তাহা হইলে যে পেশীটি সঙ্কোচন কার্য করিতে পারে নাই সেটি অন্য কার্যও করিতে পারিত না। স্নায়ু-প্রণালীর সহিত সংযোগকারী সাইন্যাপ্সের অবসাদের জন্যই পেশীটি ঐ সাইন্যাপ্সের অধিকারভুক্ত কাজটি করিতে পারিল না, কিন্তু অন্য কাজ করিতে পারিল।

আবার দেখা গিয়াছে, ত্বকের কোনও একটি অংশ যদি সুড়সুড়ির আবেদনে সাড়া না দেয়, তখন তাহার কাছাকাছি অন্য অংশ তাহাতে হয়ত সাড়া দিবে। তবে প্রথম স্নায়ুকেশটির ক্লান্তির পূর্বে যে জাতীয় প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, অন্য ক্ষেত্রে হয়ত প্রতিক্রিয়াটি অন্যভাবে লইবে। স্নায়ুপ্রান্তের কেশগুচ্ছের প্রত্যেকটি কেশ এইভাবে মানুষের প্রতিক্রিয়াকে বিভিন্ন ভঙ্গী দিয়া মানুষের দেহযন্ত্রকে এতখানি সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে হারমোনিয়ামের বিশিষ্ট পর্দা টিপিলে যেমন একটি বিশিষ্ট সুর উঠে, মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপর বিশিষ্ট আবেদনে প্রত্যেকবারেই একটি বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া হয় না।

পেশী, স্নায়ুপ্রণালী (Nerve trunk) এবং সাইন্যাপ্স—এইগুলির মধ্যে সাইন্যাপ্সগুলিই সর্বাপেক্ষা শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই হিসাবে এইগুলি বিদ্যুৎবর্তনী বা সারকিট-এর মধ্যে "ফিউস্"-এর মত ; অতি সহজেই সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আবার অতি সহজেই সেগুলির সংস্কারও করা যায়।

ক্লান্তির কারণ :

তিনটি কারণে ক্লান্তি আসিয়া থাকে ; যথা—(১) শক্তি সঞ্চারণকারী খাদ্যরসের অভাব, (২) শরীরের ক্ষতিজনিত বিষাক্ত আবর্জনার (waste products) অস্তিত্ব, (৩) অক্সিজেনের অভাব।

(১) খাদ্যদ্রব্যের সার ভাগ হইতে যে রস সংগৃহীত হয়, তাহা রক্তের সাহায্যে শরীরের সর্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং শরীরের ক্ষয় পূরণ ও শক্তির ভাণ্ডার রূপে মাংসপেশীস্থ জীবকোষের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। যখন স্নায়ু হইতে কোনও প্রেরণা পেশীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন এই শক্তি-ভাণ্ডারের খানিকটা অংশ ব্যয়িত হয় এবং তাহার ফলে পেশীর সঙ্কোচন সম্ভব হয়। সুতরাং অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সঙ্কোচন কার্য চলিতে থাকিলে এমন একটি অবস্থা আসিবে যখন এই সঞ্চিত শক্তিভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে এবং তখন আর সঙ্কোচন সম্ভব হইবে না। এই অবস্থাটিকেই আমরা ক্লান্তি বলিয়া থাকি। এই সময়ে বিশ্রাম দিলে ধীরে ধীরে আবার শক্তির ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ কর্মক্ষমতা ফিরিয়া আসে।

(২) পেশীগুলি কাজ করিবার সময় যখন সঙ্কুচিত হয় তখন তাহার মধ্যে কিছু কিছু অংশ দগ্ধ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলির মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (toxin) থাকে। এই বিষাক্ত আবর্জনাটি বেশী মাত্রায় সঞ্চিত হইলেও শরীরের মধ্যে ক্লান্তির অবসাদ সৃষ্টি হয়। Mosso পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একটি সুস্থ কুকুরের দেহে ক্লান্ত কুকুরের রক্ত ইন্‌জেক্‌শান্ করিয়া সুস্থ কুকুরটির মধ্যেও ক্লান্তির লক্ষণ আনা যাইতে পারে।

(৩) পেশী সঙ্কোচনের সময় পেশীর মধ্যে যে দহনকার্য চলিতে থাকে, তাহা শোণিতের মধ্যস্থিত রক্ত-কণিকা-বাহিত অক্সিজেন বায়ুর সাহায্যেই হইতে থাকে। কাজেই ক্লান্তির সহিত অক্সিজেনের একটা বিষমানুপাত

সম্পর্ক আছে। শরীরের ক্লান্তির সময় যে lactic acid জমিয়া থাকে, তাহা অক্সিজেনের সাহায্যেই বিদূরিত হইয়া থাকে। কাজেই অক্সিজেনের অভাব হইলে অথবা ফলতঃ lactic acidএর আধিক্য হইলে শরীরের ক্লান্তি আসে।

ক্লান্তির প্রকারভেদ ঃ

সাধারণতঃ (১) শারীরিক, (২) মানসিক এবং (৩) অনুভূতিজ (sensory)—এইভাবে ক্লান্তির শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই শ্রেণী বিভাগ খুব সার্থক নহে। কারণ অনুভূতির যন্ত্রগুলি (sensory organs) স্নায়ুবাহিত প্রেরণার ও পেশীর সাহায্যে কাজ করে। সুতরাং ক্লান্তি জিনিসটা কোন্ স্থানে যে প্রথম সূচিত হয় তাহা বলা শক্ত। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। প্রথমটি পেশী ও দ্বিতীয়টি স্নায়ুতন্ত্রের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু ইহাও ঠিক নহে ; কারণ, এই দুই জাতীয় ক্লান্তিও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এবং অন্য-সম্পর্কশূন্য বিশুদ্ধ শারীরিক বা বিশুদ্ধ মানসিক ক্লান্তির উদাহরণ পাওয়া খুবই কঠিন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে ক্লান্তির কোনও মাপকাঠি আছে কি ? ক্লান্তির বিভিন্ন অবস্থাগুলির মাপ করিবার মত মাপকাঠি পাওয়া শক্ত। কারণ, আগ্রহ, অভিনিবেশ, শারীরিক অবস্থা প্রভৃতি ক্লান্তির অবসাদকে এমনই ভাবে প্রভাবান্বিত করে যে, ক্লান্তিকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

ক্রেপেলিন (Kraepelin) ক্লান্তির নিরিখ লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া যে তথ্যগুলি পাইয়াছেন তাহা এই ঃ (১) কর্মশক্তি প্রথমেই (আগ্রহ ও অভিনিবেশের জন্য) দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে ; (২) তাহার পর আরও খানিকটা সময় ইহা ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে ; (৩) তাহার পর উন্নতি বন্ধ হইয়া রেখাটি সোজাভাবে (horizentally) চলিতে থাকে ; (৪) ইহার পর আগ্রহ কমিয়া যাইবার জন্য কর্মশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে এবং রেখাটি নামিয়া আসিতে থাকে ; (৫) শেষ পর্যন্ত ক্লান্তির অবসাদজনিত কর্মশক্তি নষ্ট হইবার পূর্বে নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত কর্মশক্তি আর একবার বাড়িয়া শেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ক্রেপেলিন-এর সিদ্ধান্তগুলি লইয়া থর্ণডাইক, চ্যাপমান, রীড্ প্রভৃতি

অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এইসব পরীক্ষায় থর্ণডাইক ক্রেপেলিন বর্ণিত বিভিন্ন অবস্থানগুলির সন্ধান পান নাই। চ্যাপমান আদি উত্তেজনা (initial spurt) লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রীড্ নিজের উপর পরীক্ষা চালাইয়া 'আদি উত্তেজনা' অথবা 'অন্তিম উত্তেজনা' (end spurt) কোনও কিছুরই সন্ধান পান নাই।

আজ পর্যন্ত যতগুলি ক্লান্তির মাপকাঠি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কতকগুলি শারীরিক ক্লান্তি, কতকগুলি বা মানসিক ক্লান্তি মাপিবার পক্ষে উপযুক্ত। ক্লান্তি মাপিবার কয়েকটি উপায় এখানে বর্ণিত হইল।

ক্লান্তি মাপিবার উপায় :

Aesthosiometer : কম্পাসের দুইটি কাঁটা লইয়া এই যন্ত্রটি তৈয়ারী। ক্লান্তির সময়ে চর্মের স্পর্শশক্তি কমিয়া যায়। কত কাছাকাছি কাঁটা দুইটি চাপ দিতেছে ইহা বুঝিতে পারার ক্ষমতার উপর ক্লান্তির তারতম্য নির্ভর করে। যন্ত্রটির প্রয়োগ সব সময়েই সার্থক হয় না; কাঁটা দুইটির যুগপৎ প্রয়োগ, চাপের ক্ষমতা সব সময়ে ঠিক রাখা সম্ভব হয় না।

Ergograph : Mosso এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হাতের অঙ্গুলিটি একটি ওজন তুলিবার জন্য কতবার সঙ্কুচিত হইতে পারে, এই যন্ত্রে তাহা দেখা হয়। একটি ঘূর্ণমান ড্রামের উপর স্বয়ংসিদ্ধভাবে রেকর্ড লইবার ব্যবস্থা আছে। একটি টেবিলের উপর কব্জিটি দৃঢভাবে বাঁধা থাকে এবং শুধু আঙ্গুলের সাহায্যে ভারটি তুলিবার ব্যবস্থা থাকে। আঙ্গুলটি ওজন লইয়া কিভাবে পর পর সঙ্কুচিত হইতেছে, তাহা একটি ঘূর্ণমান ড্রামের উপর আপনা আপনিই লিখিত হইয়া যায়। আঙ্গুলের ক্লান্তির সাহায্যে দৈহিক ক্লান্তি মাপা হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তি হইতেছে, শারীরিক ক্লান্তি আসিবার সময় শুধু মনঃশক্তি প্রয়োগ করিয়া অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করা যায় তাহার ফলে ক্লান্তির মাপে বিশেষত্ব ঘটে।

Dynamometer : এই যন্ত্রে কিলোগ্রামের মাপে হাতের মুঠা করিবার শক্তির পরীক্ষা করা হয়। ধরিয়া লওয়া হয় যে, মানসিক ক্লান্তি যতই বেশী হইবে, এই মুঠা করিবার চাপের শক্তি ততই কমিয়া যাইবে।

Algesiometer : এই যন্ত্রে ত্বকের স্পর্শশক্তি মাপা হইয়া থাকে। একটি ভোঁতা মুখবিশিষ্ট সূঁচ দ্বারা ত্বকের উপর চাপ দেওয়া হয় এবং কতখানি চাপ দিলে কষ্ট আরম্ভ হয়, তাহার মাপের উপর ক্লান্তির মাপ ধরা হয়। ধরা হয় যে, ক্লান্তির সহিত এই যন্ত্রণা-বোধটি বর্ধিত হইতে থাকে।

Kinematometer : এই যন্ত্র হাতের কনুইটিকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তচাপ অঙ্কিত করিতে দেওয়া হয়। স্বাভাবিক দোলনে যে চাপের সৃষ্টি হয়, তাহা প্রথমে মাপিয়া লওয়া হয়। পরে আবার চাপ আঁকিতে বলা হয় এবং চাপের দৈর্ঘ্য হইতে যেটুকু কমবেশী হইবে, তাহাকেই ক্লান্তির মাপ ধরা হয়।

Tapping method : ইহাতে ক্লান্তিবিশিষ্ট মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টোকা দিতে বলা হয়। মানুষ যত ক্লান্ত হইবে টোকা দেওয়ার সংখ্যা ততই কমিয়া যাইবে।

Reaction time-test : উত্তেজনা ও তাহার প্রতিক্রিয়ার সময় দেখিয়াও ক্লান্তির মাপ করা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যত ক্লান্ত হইবে, তাহার প্রতিক্রিয়া ততই বিলম্বিত হইবে।

Respiration and pulse variation : ক্লান্তির সময় নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং নাড়ীর গতি মন্দীভূত হইয়া যায়, এই বিশ্বাস লইয়া নিশ্বাসের বা নাড়ীর গতির মাপ দেখিয়া ক্লান্তির পরিমাণ মাপা হইয়া থাকে।

Eye accommodation : অনেকের বিশ্বাস, সাধারণ অবস্থায় চক্ষু দিয়া একসঙ্গে যতটা জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়, ক্লান্তির সময় তাহার তারতম্য হয়। কাজেই এই তারতম্য দেখিয়া ক্লান্তিরও তারতম্য মাপা যাইতে পারে।

Dictation : মানুষ যতই ক্লান্ত হইবে শ্রুতিলিখনে বানান ভুলের সংখ্যাও ততই বেশী হইবে। তাই শ্রুতিলিখনের পরীক্ষা দ্বারাও ক্লান্তি মাপ হইয়া থাকে।

Calculation : ক্লান্তির সময় সংখ্যার যোগের ভুল একটু বেশী হইয়া থাকে। সেইজন্য যোগের অঙ্কের সাহায্যেও ক্লান্তি মাপা হইয়া থাকে।

এই সমস্ত উপায় ছাড়া অনুক্ত পদ-পূরণ, বিভিন্ন শব্দের মধ্যে এক একটি বিশিষ্ট অক্ষরকে কাটিয়া বাদ দেওয়া অথবা অক্ষরের সংখ্যা গণনা করা, কবিতা বা শব্দসমষ্টি মুখস্থ প্রভৃতি নানা উপায়ে ক্লান্তি মাপা হইয়া থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে, শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া মানসিক ক্লান্তি মাপ করিবার চেষ্টা প্রায়ই নির্ভরযোগ্য নহে। এমনকি যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারাও মানসিক ক্লান্তির একটা বিশ্বাসযোগ্য মাপকাঠির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কাজেই মানসিক ক্লান্তির মাপ করিতে হইলে একটানা মানসিক পরিশ্রমের পর মনের কর্মশক্তি যতটা হ্রাস পাইয়া থাকে তাহাই বিচার্য।

মানসিক ক্লান্তিঃ এই বিষয়ে অর্থাৎ নিছক মানসিক পরিশ্রমের পর কতখানি মানসিক ক্লান্তি আসে, এই লইয়া থর্ণডাইক, মিস্ অরাই (Miss Arai) প্রভৃতি অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। থর্ণডাইক ১৬টি ছাত্র লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ছাত্রকেই তিনটি সংখ্যার অঙ্ককে তিনটি সংখ্যার অঙ্ক দিয়া গুণ করিতে বলা হইয়াছিল। প্রথম দিন প্রত্যেক ছাত্রকেই খাইবার জন্য অল্প একটুখানি সময় অবসর দিয়া চার হইতে বারো ঘণ্টা ধরিয়া একটানা ভাবে কাজ করান হয়। পরের দিন ঐ একই কাজ মাত্র আধ ঘণ্টা করান হয়। প্রথম দিন কাজের শেষের দিকে অঙ্কগুলি করিতে যত সময় লাগিয়াছিল এবং যত ভুল হয়, তাহার সহিত দ্বিতীয় দিনের সময় ও ভুলের সংখ্যার অনুপাত দেখিয়া তিনি ক্লান্তির পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু এই পরীক্ষা দ্বারা ক্লান্তির নিরিখ ঠিক করা হয় নাই। কারণ ষোলজনের মধ্যে তিনজনের কাজের শেষের দিকে (অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্লান্তির দিকে) যতটা কাজ হইয়াছিল, কাজের প্রথম দিকেই তাহার অপেক্ষা কম কাজ হইয়াছিল এবং সাতজনের কাজের সময় গড়ে ৫৪% ভাগ বাড়িয়াছিল।

এই সম্বন্ধে মিস্ অরাই-এর (জাপানী মহিলা গ্রাজুয়েট্) পরীক্ষা আরও চমকপ্রদ। তিনি প্রতিদিন বেলা ১-৪৬ হইতে রাত্রি ১০-০৮ পর্যন্ত মনে মনে গুণনের কার্য করিয়া ক্লান্তির পরিমাণ মাপিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল একটানা মানসিক পরিশ্রম করিয়াও তিনি প্রকৃত ক্লান্তির (অর্থাৎ যে ক্লান্তি মানুষের কর্মশক্তিকে সাময়িকভাবে নষ্ট করিয়া দেয়) সন্ধান পান নাই।

ইহার পর তিনি পরীক্ষার প্রক্রিয়া বদ্‌লাইয়া প্রথমবারে অঙ্কের অক্ষরগুলি চক্ষে দেখিয়া মনে মনে গুণের কাজ করেন। এবারে তিনি অঙ্কগুলিকে একবার দেখিয়া লইয়াই শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ৯২৬৩ × ৫৭৪৮

শ্রেণীর গুণগুলি মনে মনে করিতে থাকেন। এবং প্রতিদিন বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত পর পর চারদিন ধরিয়া গুণ করিয়াও ক্লান্তির সন্ধান পাইলেন না, এই কঠোর পরিশ্রমের পরও তাঁহার খুব বেশী সংখ্যক ভুলভ্রান্তি হয় নাই, শুধু কাজের ক্ষিপ্রতা খানিকটা কমিয়া গিয়াছিল এই পর্যন্ত। কিন্তু কাজের ক্ষিপ্রতা কমিয়া যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, কাজের দক্ষতা কমিয়া গিয়াছে বা ক্লান্তি কর্মশক্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই সম্বন্ধে থর্ণডাইক বলিয়াছেন, "এই জাতীয় কঠিন কাজ একটানাভাবে ১০।১২ ঘণ্টা করার পর কাহারও কার্যে যদি ক্ষিপ্রতা কিছু কমিয়া যায় অথবা ভুলভ্রান্তি বেশীও হয়, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, তাহার মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়াছে। সেক্সপীয়ার যতখানি সময় লইয়া তাঁহার Hamlet নাটকটি লিখিয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ সময় লইয়া তাহা লিখিলে এই বুঝিতে হইবে না যে, সেক্সপীয়র-এর প্রতিভা অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে।"

অনেকের ধারণা আছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু চলাচলের অভাব হইলেও মানসিক পঙ্গুতা আসে। এই সম্বন্ধেও থর্ণডাইক, ম্যাককল্, চ্যাপমান প্রভৃতি প্রচুর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ছাত্রদিগকে যথাসাধ্য কাজ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে পারিলে ক্লান্তি সহজে আসে না। মানুষের ইচ্ছা ও আগ্রহ তাহার কর্মশক্তিকে অনেকখানি অটুট রাখিতে পারে।

স্কুলে সারাদিন পরিশ্রমের পর ছাত্রদের মধ্যে কিরূপ মানসিক ক্লান্তি আসে, তাহার পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ছাত্রদের কর্মশক্তি শতকরা ১ হইতে ৫ ভাগ মাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অনেকের ধারণা, শেষের দিকে ছাত্রদের মানসিক শক্তি ৫০% ৬০% ভাগ কমিয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা ক্লান্তি ততটা নহে যতটা হইতেছে একঘেয়েত্বজনিত কাজে অনিচ্ছা। কাজেই স্কুলের শেষের দিকের পিরিয়ডগুলিতে যদি সরস ও মনোমুগ্ধকর বিষয়গুলি পড়ান হয় তবে এই অনিচ্ছা-জনিভ অবসাদ বা কার্যকারিতা-শক্তির হ্রাস কিছুই পরিলক্ষিত হইবে না।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসিতে পারে, স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি নীরস অর্থাৎ সহজে ক্লান্তি আনয়ন করে এবং কোনটিইবা সরস অর্থাৎ বহুক্ষণ ধরিয়া চিত্তাকর্ষক থাকে? এই সম্বন্ধে ওয়েগ্নার (Wegner) প্রভৃতি

aesthesiometer লইয়া পরীক্ষা করিয়া কাঠিন্য হিসাবে বিষয়বস্তুগুলিকে এইভাবে পরপর সাজাইয়াছেন: অঙ্ক ১০০, ল্যাটিন ৯১, জিম্ন্যাষ্টিক্ ৯০, ইতিহাস-ভূগোল ৯০, ফ্রেঞ্চ ৮২, বিজ্ঞান ৮০, ও ধর্ম্ম ৭৭।

Kemsies সাহেব dynamometerএর সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, recreational treat হিসাবে জিম্ন্যাষ্টিকই হইতেছে কঠিনতম বিষয়।

আমাদের মনে হয়, বিভিন্ন বিষয়গুলি অন্য-নিরপেক্ষভাবে শুষ্ক বা নীরস, ক্লান্তিকর বা সুখসাধ্য নহে। ইহা পাঠনভঙ্গী, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির উপরও অনেকখানি নির্ভর করে এবং পাঠনভঙ্গী ভাল না হইলে তথাকথিত সুখপাঠ্য বিষয়গুলিও ছাত্রদের কাছে ক্লান্তিকর হইয়া উঠে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে আমরা কি শিক্ষা করিব? মিস্ অরাই বা থর্ণডাইক-এর পরীক্ষা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, শারীরিক ক্লান্তি যত শীঘ্রই আসুক না কেন, মানসিক পরিশ্রমের ক্লান্তি সহজে আসে না—আমাদের মস্তিষ্ক এমনই যে, তাহাকে কাজ দিয়া সহজে ক্লান্ত বা সাময়িকভাবে অকর্মণ্য করিয়া তোলা প্রায় অসম্ভব। তবে একটানাভাবে অনেকক্ষণ মানসিক পরিশ্রম করিলে দক্ষতা বা ক্ষিপ্রকারিতা খানিকটা কমিয়া যায়।

বিশ্রামের প্রয়োজন ও ক্লান্তি:

অস্বাস্থ্যকর বা চিত্তবিক্ষোভকর পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে যে মানসিক দক্ষতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃত ক্লান্তিই হউক অথবা বিরক্তিই হউক, ইহাদের একটা জীবতাত্ত্বিক (biological) ব্যঞ্জনা আছে যাহা স্মরণ করাইয়া দেয় যে, এইবার কাজে বিশ্রামের প্রয়োজন। এই সতর্কীকরণের আদেশটি না মানিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ক্লান্তি দেহযন্ত্রের সমতা রক্ষার নির্দেশ দেয়। একটা যন্ত্র যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন দেহকে বিশ্রাম দিলে অন্য একটি যন্ত্র কাজ করিবার সুযোগ পায়। ইহাতে সমগ্রভাবে পূর্ণতা ও দক্ষতারই সুযোগ আসে। কাজেই ক্লান্তির নির্দেশটুকু মানিয়া লইয়া ক্লান্ত যন্ত্রটিকে বিশ্রাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বিশ্রামের অর্থ সম্পূর্ণ কর্ম্মবিরতি বা নিদ্রা নয়। অনেক সময় কর্ম্মের 'রুটিন্' পরিবর্তন করিলেই বিশ্রাম লাভ হয়। ফলে সারাদিন অঙ্কের হিসাবের

পর একটু খেলাধূলা বা বিশ্রাম, আবার সারাদিন কল-কারখানায় দৈহিক পরিশ্রমের পর একটু সঙ্গীত-সাধনা বা একটু পড়াশুনা করাও বিশ্রাম। তবে অত্যন্ত ক্লান্তির সময় শুধু কর্মের রুটিন্ পরিবর্তন করিলেই বিশ্রাম লাভ করা যায় না; তখন শরীর-মনকে সম্পূর্ণভাবে এলাইয়া দিয়া অর্থাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পেশীগুলিকে শিথিল করিয়া দিয়া, মনকে সর্বচিন্তামুক্ত করিয়া শুইয়া থাকিলে শীঘ্রই ক্লান্তি অপনোদিত হয়। যৌগিক "শবাসন" প্রভৃতিও ক্লান্তি অপনোদনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

তবে যৌগিক শবাসন বা আত্মসচেতন প্রচেষ্টা দ্বারা যে ক্ষেত্রে দেহ-মনকে শিথিল করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে নিদ্রাই হইতেছে ক্লান্তি অপনোদনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ক্লান্তি আপনোদনের দিক দিয়া, শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের দিক দিয়া নিদ্রার প্রয়োজন খাদ্যের অপেক্ষাও অধিক। এই বিষয়ে দুইটি কুকুরকে লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, একটিকে পর পর সাতদিন কিছু খাইতে দেওয়া হয় নাই এবং আর একটিকে সাতদিন ঘুমাইতে দেওয়া হয় নাই। দেখা গিয়াছিল, যে কুকুরটি খাইতে পায় নাই, সে পরে বাঁচিয়া উঠিল, কিন্তু যে ঘুমাইতে পায় নাই, সেই কুকুরটি বাঁচিতে পারিল না।

অবশ্য এই নিদ্রার প্রয়োজন সকলের জন্য সমান নয়। ক্লান্তির প্রতিষেধক হিসাবে নিদ্রার একটা সার্বজনীন অনুপাত বাহির করা সহজ নয়। ইচ্ছাশক্তি এখানে অনেকখানি কার্য করে। সম্ভবতঃ নিদ্রারও একটা কৌশল আছে। এই কৌশলটি যাহাদের জানা আছে, তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লান্তির অবসাদ কাটাইয়া উঠিয়া আবার কর্মশক্তি ফিরিয়া পায়। জগতের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের সকলেরই বোধ হয় এই কৌশলটি জানা ছিল; নেপোলিয়ান খুব বেশী সময় নিদ্রা যাইতেন না, আকবর তিন ঘণ্টা ঘুমাইতেন, নেতাজীও নাকি আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমাইতেন না, মহাভারতের বীর অর্জুনও "গুড়াকেশ" অর্থাৎ "জিতনিদ্র" ছিলেন। ঘুমের কুম্ভকর্ণরা নিশ্চয়ই উচ্চ শ্রেণীর কর্মযোগী হইতে পারে না, আর ক্লান্তির বিশ্রাম-বিলাসী আরামপ্রিয় আদুরে গোপালরাও খুব কৃতী লোক হইতে পারে না। আসলে 'যুক্ত আহার বিহার' অর্থাৎ জীবনের সব কর্মই সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই।

অভিনিবেশ

শিক্ষার ব্যর্থতার যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে উনমনস্কতা বা অন্যমনস্কতা অন্যতম। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যে শিক্ষক পাঠনের সময় ক্লাশের অভিনিবিষ্টতা রাখিতে সমর্থ হন তাঁহার পাঠন ফলপ্রসূ হয়। কাজেই শিক্ষক, অভিভাবক বা শিক্ষাব্রতীর নিকট অভিনিবেশ তত্ত্বটি খুব প্রয়োজনীয়।

পূর্বে পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, অভিনিবেশ একটি অনন্য-নিরপেক্ষ মানসিক শক্তি এবং অনুশীলন প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে পারা যায়। কিন্তু বর্তমানে মনের "বিবৃতিবাদ" বা "অন্য-নিরপেক্ষ শক্তিবাদ" (faculty psychology) পরিত্যক্ত হইয়াছে। অভিনিবেশ হইতেছে, একজন লোকের একটি বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হওয়া। সুতরাং অভিনিবেশ হইতেছে, আমাদের অভিজ্ঞতার একটি অবস্থা মাত্র—ইহাতে একজন কর্তৃপুরুষ এবং একটি কর্মের দ্যোতনা থাকিবেই। পূর্বতন মনস্তাত্ত্বিকগণ অভিনিবেশের ব্যাপারে বিশেষ একটু জোর দিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, অভিনিবেশ হইতেছে "কোনও একটি বিষয়ের উপর চৈতন্যের কেন্দ্রীকরণ মাত্র।"

অভিনিবেশের কেন্দ্র ও পরিবেশ : অবশ্য অভিনিবেশের এই সংজ্ঞাটি অনেক দিক দিয়াই ব্যঞ্জনাময়। কারণ, আমরা জানি প্রত্যেক অভিনিবেশের ব্যাপারেই একটি কেন্দ্র এবং তাহার পরিবেশ (margin) দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আমরা কোনও জিনিসের উপর দৃষ্টিপাত করি তখন দৃষ্টির কেন্দ্রগত জিনিসটিকেই ভালভাবে দেখিতে পাই, কিন্তু যে জিনিসটি আমরা দেখি তাহার আশেপাশের অনেক জিনিসই কিছু কিছু দেখিতে পাই। তবে এই দৃষ্টির কেন্দ্র হইতে যে জিনিসটি যত দূরে অবস্থিত থাকে, তাহা ততই অস্পষ্ট হইতে থাকে। চোখের দৃষ্টিক্ষেত্রের মতই অভিনিবেশের ক্ষেত্রেও এইরূপ একটা কেন্দ্র এবং তাহার একটি পরিবেশ আছে। অভিনিবেশের কেন্দ্রগত জিনিসটি চৈতন্যের উপর যতটা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, কেন্দ্রের চারিদিকের জিনিসগুলি ততটা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না। আবার অভিনিবেশের চেষ্টায় কেন্দ্র হইতে

দূরস্থ কোনও জিনিসকে যদি কেন্দ্রগত করা যায়, তাহা হইলে তাহাও স্পষ্টতর হইয়া চৈতন্যের রাজ্যে ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য মনীষী টিচেনার বলিয়াছেন, অভিনিবেশের প্রশ্নই হইতেছে অনুভূতিগ্রাহ্য স্পষ্টতা: "The problem of attention centers in the fact of sensible clearness."

অভিনিবেশের কেন্দ্রগত স্পষ্টতা এবং পরিবেশগত অস্পষ্টতা থাকিলেও, পরিবেশস্থ এই আব্ছা জিনিসগুলির প্রভাবও চৈতন্যের উপর কম নহে। কারণ, প্রতি মুহূর্তেই এই পরিবেশগত জিনিসগুলির মধ্য হইতে একটি না একটি জিনিস অভিনিবেশের কেন্দ্রস্থলে ছুটিয়া আসে। পরিবেশস্থ বহু জিনিসের মধ্য হইতে এই যে এক একটি জিনিসকে চৈতন্যের কেন্দ্রস্থলে টানিয়া আনা, এই যে মনের নির্বাচনী শক্তি, ইহাকেই অভিনিবেশ বলা হয়। ইহার মধ্যে কর্মপ্রয়াসের (conation) লীলা আছে। সুতরাং অভিনিবেশ প্রসঙ্গে প্রাচীন মনস্তাত্ত্বিকদের মতো শুধু চৈতন্যের কথা বলিলেই চলিবে না, ইহার মধ্যেকার কর্মপ্রয়াসের দিকটাও আলোচ্য। ম্যাকড্যুগলের মতে অভিনিবেশ হইতেছে "a striving to cognise" কিম্বা "attention is merely conation or striving from the point of view of its affect on cognitive process."

অভিনিবেশের স্বরূপ (Nature of Attention)

(১) **নির্বাচনশীলতা**—অভিনিবেশ সব সময়েই **নির্বাচনশীল** (Selective)। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারে প্রতিনিয়তই লক্ষ লক্ষ জিনিস ভীড় করিয়া আছে; সকলেই আমাদের মনোযোগ পাইবার জন্য দাবী করিতেছে; কেহ চক্ষুর দরজা দিয়া, কেহ কর্ণের দরজা দিয়া, কেহ নাসিকা বা ত্বক্ প্রভৃতির দরজা দিয়া আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য সচেষ্ট। এই সকল আবেদনকে যুগপৎ গ্রহণ করিবার মত ক্ষমতা আমাদের নাই। তাই বর্জন ও নির্বাচন করিতে হয়। অভিনিবেশের প্রধান বিশেষত্ব ইহাই।

(২) **পরিবর্তনশীলতা**—অভিনিবেশ সব সময়েই **পরিবর্তনশীল** (Shifting)। এক হিসাবে বলা যাইতে পারে, অভিনিবেশ হইতেছে কোনও একটি বিষয়ের উপর চৈতন্যের কেন্দ্রীকরণ (Focusing consciousness on an idea or object of thought)। দৃষ্টির ক্ষেত্রের মতোই অভিনিবেশের

ক্ষেত্রেরও একটা কেন্দ্র ও পরিবেশ আছে। কেন্দ্রগত জিনিসগুলি যতটা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে, পরিধিগত জিনিস ততটা স্পষ্ট হয় না। তাহা হইলেও, পরিবেশস্থ আবছা জিনিসগুলির প্রভাবও চৈতন্যের উপর সামান্য নহে। কারণ প্রতি মুহূর্তেই এই পরিবেশগত জিনিসগুলির মধ্যে একটি না একটি জিনিস অভিনিবেশের কেন্দ্রস্থলে ছুটিয়া আসে এবং কেন্দ্রস্থ জিনিসটিকে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়। ফলে, কোনও পদার্থের প্রতিই আমরা অভিনিবেশকে বেশীক্ষণ নিবদ্ধ করিতে পারি না। আমরা কোনও জিনিসের উপর সাধারণতঃ আট সেকেণ্ডের চেয়ে বেশীক্ষণ অভিনিবেশ দিতে পারি না। কখনও কখনও ইহার চেয়েও অল্পতর সময়েই অভিনিবেশ সরিয়া যায়। অভিনিবেশ যে মুহূর্তে-মুহূর্তে সরিয়া যায়, তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। একটা কাগজের উপর পেন্সিলের সরু শিস্ দিয়া একটি বিন্দু আঁকিলাম। তাহার পর সেই কাগজটিকে ক্রমশঃ দূরে-দূরে সরাইয়া লইয়া যাইলে এবং বিন্দুটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে বুঝিতে পরিব, বিন্দুটি একবার দেখা যাইতেছে আর একবার দেখা যাইতেছে না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ হইতেছে, বিন্দুটি একবার অভিনিবেশের মধ্যে আসিতেছে আবার সরিয়া যাইতেছে। মনোযোগের এই উৎকেন্দ্রিকতা অন্যভাবেও প্রমাণ করা যায়। একটা হাতঘড়িকে কানের কাছে রাখিলে তাহার টিক্ টিক্ শব্দটি শুনিতে পাইব। ক্রমশঃ ঘড়িটিকে ধীরে ধীরে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইলে বুঝিব ঐ টিক্ টিক্ শব্দটি একবার হয়ত জোরে শুনা যাইতেছে আর একবার হয়ত শব্দটি অস্পষ্ট হইয়া বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে; অর্থাৎ অভিনিবেশের কেন্দ্র হইতে সরিয়া-সরিয়া যাইতেছে।

প্রশ্ন আসিতে পারে, অভিনিবেশ যদি এত উৎকেন্দ্রিক হয়, তাহা হইলে প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা এক একটা বিষয়ে একটানাভাবে বহুক্ষণ অভিনিবেশ আবদ্ধ করেন কিভাবে? তাঁহারা যখন একটানাভাবে কোনও বিষয়ে মনোযোগ দেন, তখন তাঁহাদের মন একটি বিন্দুতে নিবদ্ধ থাকে না। একটি জিনিসের বিভিন্ন বিষয় বা বিভিন্ন দিকের উপর পর্যায়ক্রমে ঘুরাফিরা করিতে থাকে।

(৩) **সীমাবদ্ধতা**—স্পীয়ারম্যান্ (Spearman) বলেন, অভিনিবেশের

একটা নির্দিষ্ট Span বা মাপ আছে। ফলে, একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেই অন্য বিষয়ে মনোযোগ কমিয়া যাইবে। কোনও লোক একই সঙ্গে দৌড়-এর (race) এবং নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না। অভিনিবেশ নির্বাচনশীল বলিয়াই তাহার প্রসার খানিকটা সীমাবদ্ধ।

কতগুলি জিনিসের উপর একসঙ্গে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে, এই লইয়া Tachistoscope যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, একজন বয়স্ক ব্যক্তি মুহূর্তের যুগপৎ দৃষ্টিতে স্বল্পতম সময়ে যথেচ্ছ ছয়টি বিন্দুর সংস্থান মনে রাখিতে পারে। তবে ঐ বিন্দুগুলি যদি তাসের বিন্দুর মতো একটি "প্যাটার্ণ"-আঁকা থাকে, তাহা হইলে আরও অধিক সংখ্যক বিন্দুকে মন গ্রহণ করিতে পারে।

চক্ষুগ্রাহ্য জিনিসের মত কর্ণগ্রাহ্য জিনিস লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছে। Metronome প্রভৃতি যন্ত্রের দ্বারা পর পর শব্দ সৃষ্টি করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আটটি শব্দকে গ্রহণ করা যায়।

(৪) **উত্তেজকের স্পষ্টতা**—অভিনিবেশের ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদনগুলি স্পষ্টতরভাবে প্রতিভাত হয়। জগতের সমস্ত জিনিসের প্রতিই ত আমরা একসঙ্গে মন দিতে পারি না, যে জিনিসের প্রতি মন দিই, তাহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে, ফলে মনের দিক হইতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটিতে থাকে :

(ক) খুঁটিনাটি জিনিসগুলি স্পষ্টতর হইয়া উঠে, অন্যমনস্ক অবস্থায় যে সব জিনিসগুলি নজরে পড়ে না, অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়,—অন্যমনস্ক অবস্থায় যাহা আব্‌ছা থাকে, অভিনিবিষ্ট অবস্থায় তাহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে।

(খ) অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনিবিষ্ট বস্তুটি আমাদের চৈতন্যের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া সাময়িকভাবে এমনই শক্তিশালী ও মূল্যবান হইয়া উঠে যে, অন্যান্য প্রতিস্পর্ধী জিনিসগুলিকে চৈতন্যের ক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত করিয়া দেয়। কিছুক্ষণ এইভাবে রাজত্ব করিবার পরেই আবার ঐ নির্বাসিত প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃক সে নিজেও স্থানচ্যুত হয়।

(গ) অভিনিবেশের সময় দৃশ্য, গন্ধ, গান প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের বিচার

সূক্ষ্মতর এবং নির্ভুল হইতে থাকে। ফলে, অর্ধমনস্ক অবস্থায় যে পুস্তকের অর্থবোধ হয় না, তাহা বুঝিতে পারা যায়; গানের যে সুরটি চিনিতে পারা যায় না, তাহা চিনিতে পারা যায়; যে রহস্যের সমাধান হয় না, তাহার সমাধান হয়।

উপযুক্ত উপযোজন

অভিনিবেশকালে আমাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলি বিশেষভাবে উপযুক্ত ভঙ্গীতে প্রস্তুত হইয়া উঠে। প্রত্যেক কাজের জন্যই একটা বিশেষ রকম অঙ্গসংস্থান ও উপযোজনের (Adjustment) প্রয়োজন আছে। এই উপযোজনের জন্য নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ঘটে :

(ক) অভিনিবেশের জন্য চোখ, কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে কাজের জন্য তৈয়ারী হইতে হয়। জন্তু-জানোয়ারেরা যখন কোনও জিনিস ভাল করিয়া শুনিতে চায়, তখন তাহারা কান খাড়া করে, ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিলে চক্ষু বিস্ফারিত করে, গন্ধ পাইবার জন্য নাসারন্ধ্র ফুলাইয়া দমকে দমকে নিশ্বাস লইতে থাকে। এই অঙ্গ-সংস্থানের ফলে অভিনিবেশের সুবিধা হয়, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতিকে আমরা ভালভাবে ধরিতে ও বুঝিতে পারি।

(খ) অভিনিবেশের সময় সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়টিই যে শুধু প্রস্তুতির ভঙ্গীতে সংস্থান করে তাহা নহে। সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়টি ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও, এমন কি সমগ্র দেহটিই একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীতে স্থির থাকে, ফলে আলুথালু ভাবটি বন্ধ হয়, চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়, মন সংযত হয় এবং সমগ্র দেহমন একটি বিশেষ জিনিসকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। "রেসে" দৌড় দিবার জন্য "স্টার্ট"-এর লাইনের উপর "স্টার্টার"-এর নির্দেশের জন্য অপেক্ষমান খেলোয়াড়টি শুধু যে, উৎকর্ণ হইয়াই আছে তাহা নহে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গকেই সে এমনভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে যে, একবার 'start' শব্দটি শুনিলেই সে লম্ফ দিয়া দৌড় আরম্ভ করিবে।

(গ) অভিনিবেশের সময় মনোযোগ যাহাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য একটা দৃঢ়তা আসে, ফলে চিত্ত-বিক্ষোভের ছোটখাট কারণগুলির প্রতি

আমাদের লক্ষ্য থাকে না। সেইজন্য শিল্পীরা যখন শিল্প-সাধনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া ডুবিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যান, ফুটবল খেলায় অভিনিবিষ্ট খেলোয়াড় আঘাত-পতনের যন্ত্রণা বুঝিতে পারে না। অভিনিবিষ্ট অবস্থায় এমনই তন্ময়তা আসে যে আর কোনও বিষয়ে খেয়ালই থাকে না। বরং সেই সময়ে কোন বাধা আসিলে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি। শুধু মানুষ নহে, নিম্নতর প্রাণীরা পর্যন্ত অভিনিবিষ্ট অবস্থায় বাধা পাইলে ক্ষেপিয়া ওঠে। একটা কুকুর যখন মাংসখণ্ড লইয়া মাতিয়া আছে, তখন তাহাকে বাধা দিলে সে রাগিয়া গিয়া গর্জন করিতে থাকিবে। শান্তদান্ত ভাল লোকেরাও অভিনিবেশের সময় বাধা পাইলে রাগিয়া উঠেন।

তবে অভিনিবিষ্ট অবস্থায় অভিনিবেশে বাধা পড়িলে ক্ষেপিয়া যাওয়াটাই বড় কথা নহে। বড় কথা হইতেছে, নিবিষ্ট অভিনিবেশ মনের চারপাশে এমন একটা দুর্ভেদ্য গণ্ডী তৈয়ারী করিয়া দেয়, যাহার ফলে তপোবিঘ্নকর গোলমালের মধ্যেও আমাদের মন চঞ্চল হয় না, শ্মশান-সাধকের মত আমরা একাগ্রভাবে কাজ করিয়া যাইতে পারি, চিত্তবিক্ষেপের কারণ থাকিলেও আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না।

অভিনিবেশের শর্ত (conditions of attention)

দেখা যায়, অনেক সময় ইচ্ছা করিলেও হয়ত একটা বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি না, আবার কখনও কখনও নিজেদের অজ্ঞাতসারেই হয়ত একটা বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ি। ইহার কারণ হইতেছে, কতকগুলি ব্যাপারে আমরা বাহিরের বস্তুর প্রভাবে হয়ত নিজেদের অজ্ঞাতসারেই অভিনিবিষ্ট হই, আবার কতকগুলি ব্যাপারে আমাদের ব্যক্তিগত মানসিক কারণে অভিনিবিষ্ট হই, অর্থাৎ মনোযোগের কতকগুলি বস্তুগত কারণ আছে এবং কতকগুলি ব্যক্তিগত কারণ আছে।

মনোযোগের বস্তুগত কারণ ঃ

(১) **পরিবর্তন ও আকস্মিকতা**—হঠাৎ কিছু একটা পরিবর্তন হইলেই সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। একটা বিশ্রী রকমের গোলমাল

চলিতেছে, তাহার প্রথম আরম্ভটার সময় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেটা গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, তাই তাহাতে মনোযোগ আর নূতন করিয়া আকৃষ্ট হয় না। হঠাৎ সেই গোলমালটা থামিয়া যাক, অমনি আমরা চমকাইয়া উঠিয়া সেদিকে আকৃষ্ট হইব। কিন্তু এই পরিবর্তনটা যদি ধীরে ধীরে হয়, তাহা হইলে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে না। একটা বেঙ্‌কে একটি জলপাত্রে রাখিয়া পাত্রটিতে যদি ধীরে ধীরে তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বেঙ্‌টি ফুটন্ত জলের অস্বস্তির কারণটা বুঝিতে না পারিয়া সেইখানেই মরিয়া যাইবে, তবু ঐ পাত্রটি ছাড়িয়া পলাইবে না। কিন্তু হঠাৎ যদি ঐ ঠাণ্ডা জলের পাত্রের মধ্যে খানিকটা গরম জল ঢালিয়া দিয়া তাপের মাত্রাটিকে হঠাৎ বাড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই আকস্মিক পরিবর্তনে বেঙ্‌টির মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে এবং পাত্রটি হইতে লাফাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিবে।

আকস্মিকতা ও পরিবর্তনে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার বৈজ্ঞানিক যুক্তিটি এই যে, একটানা গোলমালে বা একটানা নিস্তব্ধতায় আমাদের মনকে নূতন করিয়া প্রস্তুত হইতে হয় না, তাই মনোযোগেরও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পরিবেশের হঠাৎ পরিবর্তন হইলেই তাহার জন্য দেহমনকে তৈয়ারী (adjust) করিয়া লইতে হয়। তাই তখন মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

(২) **তীব্রতা**—সাধারণতঃ তীব্র উত্তেজকে (Stimulus) মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। বজ্রপাত বা ক্র্যাকারের শব্দে আমরা চমকাইয়া উঠিয়া সেদিকে আকৃষ্ট হই, কিন্তু ছোটখাট শব্দকে আমরা ততটা আমল দিই না। উজ্জ্বল আলোর বিজ্ঞাপনে মনটা যত সহজে আকৃষ্ট হয়, হাল্কা আলোতে ততটা হয় না। অনেক সময় অবশ্য একটা বিশেষ রকম অর্থ বা ইঙ্গিতপূর্ণ জিনিস তীব্র না হইলেও, আমাদের মনোযোগকে আকৃষ্ট করে। অন্ধকার রাত্রে সামান্য হিস্ হিস্ শব্দ কিংবা জঙ্গলের কাছে হাল্কা বোটকা গন্ধ, অথবা অস্পষ্ট আলোয় হাল্কা ছায়ামূর্তি মনোযোগ প্রবলভাবেই আকৃষ্ট করে। সাধারণতঃ উত্তেজকের তীব্রতার সঙ্গে মনোযোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়।

(৩) **পুনরাবৃত্তি**—একবার মাত্র যে জিনিসটা দেখা বা শোনা হইল, সেটা সম্বন্ধে হয়ত মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু সেটা যদি বারবার হয়,

তাহা হইলে সে দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবেই। "এ্যালার্ম" ঘড়ির একটানা শব্দে যদি ঘুম না ভাঙ্গে, তাহা হইলে "ইন্‌টারমিটেন্ট এ্যালার্মে" ঘুম ভাঙ্গিবেই। এই আবৃত্তি আবার বহুদিন স্থায়ী হইলে অভ্যাসের ফলে সেটাতে আর তেমন মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না।

(৪) **স্পষ্টতা**—অস্পষ্ট অনুভূতির চেয়ে একটা স্পষ্ট অনুভূতি মনের উপর বেশী রেখাপাত করে। এইজন্য যে শিক্ষকের স্পষ্ট উচ্চারণ তাঁর পড়ানোতে ছাত্রদের মনোযোগ বেশী আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যে শিক্ষকের বাগ্‌ভঙ্গী অস্পষ্ট, তাঁর পড়ানোতে ছেলেরা তত আকৃষ্ট হয় না।

(৫) **বৈষম্য**—বৈষম্যের অনুভূতিতে মনোযোগ বিশেষভাব আকৃষ্ট হয়। বৈষম্যের ভিতর দিয়া মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্যই কেহ বা পরিধান করে অদ্ভুত রং-এর বা অদ্ভুত কাটিং-এর জামা, কেহ বা রাখে মস্ত বড় গোঁফ।

মনোযোগের ব্যক্তিগত (Subjective) কারণ :

ব্যক্তিগত কারণগুলির মধ্যে প্রথম এবং প্রধান কারণ হইতেছে আগ্রহ (interest)। যাহার যে বিষয়ে আগ্রহ আছে, সে সেই বিষয়ে স্থায়ী মনোযোগ দিতে পারে। এক একটা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে মনোযোগ নানা কারণেই আকৃষ্ট হইতে পারে ; প্রয়োজন বোধ, কৌতূহল, পরিচিতি, পূর্বাশা (Anticipation), উদ্দেশ্য বোধ প্রভৃতি আগ্রহ সৃষ্টি করে।

প্রয়োজন—বাড়ীর গিন্নীর মাছ-রাঁধা আঁশকড়াটা পাতলা হইয়া গিয়াছে ; একটা মাছ-রাঁধা আঁশকড়া কিনিবার প্রয়োজন হইয়াছে। মেলায় বেড়াইতে গিয়া হাজার রকম চক্‌চকে জিনিসে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না, কিন্তু আঁশকড়াটা সম্বন্ধে তাঁর প্রয়োজন বোধ আছে, উপস্থিত কড়া কিনিবার কথা হয়ত তাঁর স্মরণেও নাই, কিন্তু ছোট্ট একটা লোহার দোকানের পাশ দিয়া যাইবার সময় তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। বেকার যুবকের চাকরির প্রয়োজন আছে, খবরের কাগজের বড় বড় হেড লাইনের চেয়ে "কর্মখালির"র স্তম্ভের ছোট ছোট অক্ষরগুলি তার মনোযোগকে অধিকতর আকৃষ্ট করে।

স্বার্থবোধ—ছেলে পড়িতে চায় না, তাহাকে লজেন্স্ বা চকলেট্-টফির

লোভ দেখানো হইল, এই স্বার্থলোভটাই তার আগ্রহ সৃষ্টি করিল, সে মন দিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিল। ফ্যাক্টরীতে কাজ মন্দা চলিতেছে, শ্রমিকদের বোনাস্ দিবার প্রস্তাব হইল। অমনি তাহাদের কাজে আগ্রহ বাড়িয়া চলিল, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল।

কৌতূহল—কৌতূহল সৃষ্টির দ্বারাও আগ্রহের বৃদ্ধি হয়। অনেক কাজেই "কি, কেন" প্রভৃতি প্রশ্ন জাগে। সেই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে উৎসাহ পাইলেও আগ্রহ বাড়িয়া যায়।

পূর্বপরিচিতি—যে জিনিস সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই একটু জানাশোনা আছে, সেই বিষয়ে আমাদের আগ্রহ বেশী হয়। যে লোকটা গান বোঝে না, তার কাছে গান জিনিসটা একটা শব্দের কোলাহল মাত্র; তাহাতে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু যে লোকটা গান বোঝে, সে গান শুনিলেই তাহাতে আকৃষ্ট হইবে। একটা গান তাহার কানে আসিল, অমনি সে উৎকর্ণ হইয়া ভাবিবে—"এটা কি সুর? ভৈরবী? না টোরী? ইমন? না ভূপালী?" গানে তখনই তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই পাশের ভদ্রলোকটি হয়ত আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে অফিসের বড় সাহেবের গল্প জুড়িয়া দিবে।

উদ্দেশ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা—কাজের উদ্দেশ্যটা সুস্পষ্ট না থাকিলে কিছুতেই কাজে আগ্রহ আসে না। যে-সব ছেলেরা অন্ধভাবে জীবনের পথে চলে, ভবিষ্যতে কি হইতে চায়, তাহাও জানে না, তাহারা কোনও কাজেই ভালভাবে মনোযোগ দিতে পারে না, কারণ কোনও কাজেই তাহাদের আগ্রহ নাই। জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে ছাত্রদের তাই সচেতন করার দরকার।

পূর্বাশা (Anticipation)—কোনও কাজের ভবিষ্যৎ সফলতা সম্বন্ধে পূর্বাশা থাকিলে সেই কাজে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এই আগ্রহের ফলেই মানুষ সাময়িক ব্যর্থতা ও ক্ষয়-ক্ষতিগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া শুষ্ক কর্তব্যও করিয়া যাইতে পারে।

স্থায়ী আগ্রহ

আগ্রহ জিনিসটা সাময়িকও হইতে পারে, আবার স্থায়ীও হইতে পারে।

সাময়িক আগ্রহটা দু-চার মিনিট বা দুই- এক ঘণ্টার ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া দু-চার মাস বা বছরের ব্যাপারও হইতে পারে। কিন্তু স্থায়ী আগ্রহটা হইতেছে একটা মানুষের চরিত্রের স্থায়ী পরিচয়। একজন ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করিলে একটা চাকুরী পাইবে ভাবিয়া ছ'-সাত মাস খুব খাটিয়া পড়াশুনা করিল। পরীক্ষাটা পাশ করিবার পর সে হয়তো জীবনেই আর কঠিন পড়াশুনা করিবে না। এক্ষেত্রে ছেলেটির স্থায়ী আগ্রহ হইতেছে চাকরি করিয়া আর্থিক উন্নতি করা, আর পড়াশুনাটা হইতেছে সেই লক্ষ্যবস্তুর উপলক্ষ্য মাত্র। তাই তার পড়াশুনার বর্তমান আগ্রহটা হইতেছে সাময়িক ব্যাপার। কিন্তু স্থায়ী আগ্রহের ব্যাপকতা আরও অনেক বেশী ; সেটা জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে। স্থায়ী আগ্রহটাই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই স্থায়ী আগ্রহের উৎস কি ?

এক একটা বিশিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া যে রসানুভূতি (Sentiment) জাগিয়া উঠে, সেইটাই হইতেছে স্থায়ী আগ্রহের কেন্দ্রীয় শক্তি। "শ্যামের গানে আগ্রহ আছে" কথাটার অর্থ এই নয় যে, শ্যামের হঠাৎ গান ভাল লাগিয়াছে। "গানে আগ্রহ আছে" কথাটার অর্থ হইতেছে গান সম্বন্ধে তাহার রসানুভূতি ও রসবোধ আছে,—তাই গানের জন্য সে বহু চিত্ত-বিপেক্ষের কারণকে উপেক্ষা করিয়া মনকে একাগ্র করাইয়া চালাইতে পারে। এইজন্যই যাহার রসানুভূতি দানা বাঁধে নাই, চরিত্র গঠিত হয় নাই, সে কোনও কাজেই দীর্ঘকাল ধরিয়া মনোযোগ দিতে পারে না। মিনিটে মিনিটে তাহার মন প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যায়। কোনও কৃচ্ছ-সাধনা দীর্ঘকাল ধরিয়া চালাইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

অভিনিবেশের দেহবিন্যাস—আমরা দেখিয়াছি, অভিনিবেশের জন্য একটা বিশেষ ধরণের অঙ্গ-সংস্থানের প্রয়োজন হয়। ইহা খুবই স্বাভাবিক। কোন জিনিসের আলোকচিত্র লইতে ক্যামেরাকে যথাযথভাবে সাজাইতে হয়। দৌড়বাজ খেলোয়াড় "স্টার্টে"র পূর্বে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীতে দেহ-সংস্থান করে। কুস্তিগীর বা মুষ্টিযোদ্ধা আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার জন্য বিশিষ্ট ভঙ্গীতে দেহবিন্যাস করে। হিংস্র পশু তাহার আক্রমণের লক্ষ্যীভূত প্রাণীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার

পূর্বে বিশিষ্টভাবে অঙ্গ-সংস্থান করে। ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্ম-সচেতন-ভাবে ঘটে না বটে, কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যায় অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যথাযথ অঙ্গ-বিন্যাসটি স্বতঃই ঘটিয়া যায়। মনোবিদ্যার তথ্য হিসাবে না হইলেও, এই সত্যটি সহজভাবেই সকলের জানার মধ্যে ছিল। প্রত্যেক কাজেই অভিনিবেশের জন্য এই "প্রস্তুতিমূলক" দেহ-বিন্যাসটির প্রয়োজন আছে। উপযুক্ত দেহ-বিন্যাস না হইলে অভিনিবেশ দৃঢ় হয় না।

আমরা জানি প্রত্যেক কাজের জন্যই একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এই প্রস্তুতি শুধু মনের দিক দিয়াই নহে, দেহের দিক দিয়াও এই প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। সফল কাজের জন্য যন্ত্রপাতিকে যথাযথভাবে adjust করিতে হয়, মনের কাজের জন্যও এই adjustment বা উপযোজনের দরকার। হয়ত একটা অঙ্ক কিছুতেই কষিতে পারিতেছি না, তখন চেয়ারটিকে টেবিলের কাছে টানিয়া আনিয়া শিরদাঁড়া সোজা করিয়া বসিয়া একটা প্রতিজ্ঞার মনোভাব লইয়া অঙ্কটি কষিতে আরম্ভ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কের সমাধানটি মনে আসিয়া গেল। কিন্তু ঐ অঙ্কটিই যদি বালিশে ঠেসান দিয়া অথবা ইজি-চেয়ারে শুইয়া আরামের ভঙ্গীতে থাকিয়া কষিতে চেষ্টা করিতাম তাহা হইলেই কিছুতেই সেটা আয়ত্ত করিতে পারিতাম না। এই জাতীয় ব্যাপার হইতে অভিনিবেশের জন্য অঙ্গ-সংস্থানের প্রয়োজনটি বুঝিতে পারা যায়।

পড়াশুনা বা গভীর চিন্তার জন্যও অঙ্গ-সংস্থানের প্রয়োজন আছে। কোনও প্রকার আলুথালু আরামের ভঙ্গীতে মনোযোগকে গভীরভাবে নিবিষ্ট করা সহজ নহে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মেরুদণ্ড সোজা না রাখিলে কোনও গভীর চিন্তার কাজ করা যায় না। এইজন্যই বোধহয় যোগসাধনার জন্য মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া কতকগুলি বিশিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইতে হয়। বর্তমানে যোগাসন জিনিসটা শারীরিক ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে বহুলভাবে করা হয় বটে, তবে কতকগুলি আসন যে অভিনিবেশের সহায়তার জন্যই পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাহা অনস্বীকার্য।

আমাদের মনে হয়, পড়াশুনা করিবার সময় মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়াই বসা

উচিত। তবে সখের পড়া বা সময় কাটাইবার জন্য সহজ নাটক, নভেল, গল্প সংবাদ পত্র প্রভৃতি পড়িবার সময় ইজিচেয়ারে বসিয়া অথবা বালিশে হেলান দিয়া আরামের ভঙ্গীতে সেটা করা যাইতে পারে।

অভিনিবেশের শ্রেণীবিভাগ

মোটামুটি আমরা অভিনিবেশের এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করিতে পারি:

- অভিনিবেশ
  - স্বতঃস্ফূর্ত অভিনিবেশ Non-volitional
    - প্রবৃত্তিজাত স্বতঃস্ফূর্ত অভিনিবেশ Sustained by instinct
    - সংস্কারজাত স্বতঃস্ফূর্ত অভিনিবেশ Sustained by sentiment.
  - ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশ volitional
    - অস্পষ্ট ইচ্ছাকৃত একক কার্য Implicit : Single act of will
    - স্পষ্ট ইচ্ছাকৃত পুনরাকৃত কার্য Explict : Repeated act of will

শিক্ষাক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশ বনাম স্বতঃস্ফুত অভিনিবেশের (soft Pedagogy) প্রয়োগ

পঠন-পাঠনের ব্যাপারে আগ্রহ ও অভিনিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং অভিনিবেশ সৃষ্টির জন্য বর্তমান শিক্ষাতত্ত্বে নানা জাতীয় উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক সময় এই সমস্ত উপায়গুলিকে ছাত্র-তোষণমূলক শিক্ষাপ্রণালী (Soft Pedagogies) বলিয়া প্রাচীনপন্থী শিক্ষাতত্ত্ববিদ্গণ অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন।

এই সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। আগ্রহ এবং ভাল-লাগাটা এক নহে। আমাদের আগ্রহের জিনিস হইতেছে সেইগুলি, যাহাতে আমাদের স্বার্থ জড়িত আছে এবং স্বার্থের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির সঙ্গেই জড়িত আছে আমাদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার অভিজ্ঞতা। সুতরাং কোন জিনিস ভাল লাগে বলিয়া তাহাতে যে আমাদের আগ্রহ আছে, তাহা নহে; আমাদের আগ্রহের সিদ্ধি হয় বলিয়াই তাহা আমাদের ভাল লাগে। এই আগ্রহ হইতেছে আমাদের রস অথবা রসপুষ্ট চরিত্রের একটা সক্রিয় অবস্থা মাত্র এবং এই আগ্রহেরও উপরে আছে 'ইচ্ছাশক্তি'। এই ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই আপাতঃ তিক্ত অথচ পরিণাম-মধুর অনেক বিষয়েই আমাদের আগ্রহসৃষ্টি হইতে পারে এবং এই আগ্রহ দিয়া অভিনিবেশকেও নিযুক্ত রাখা সম্ভবপর। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য খানিকটা আপাতঃ তিক্ত এবং হয়ত বিরক্তিকর খাটুনির কাজ থাকেই। সেইগুলিকে এড়াইয়া যাইলে চলিবে না। তবে সেইগুলি সম্বন্ধে ছাত্রদিগের আগ্রহ সৃষ্ট করিতে হইবে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বকে সঞ্জীবিত করিয়া, তাহাদের আত্ম-সম্মানকে উৎসাহিত করিয়া। সাধনার পথে অগ্রসর হইবার সময় যে সমস্ত সিদ্ধি আসে তাহার জন্য উৎসাহ দান করিলে সেই উৎসাহের আনন্দ নূতন করিয়া আগ্রহ ও অভিনিবেশ সৃষ্টিতে সহয়তা করিবে।

Soft Poftpedagogy'র প্রয়োজন কি?

নিছক ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আগ্রহ তথা অভিনিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় বলিয়া এবং ভবিষ্যৎ জীবনে বহু বিরক্তিকর পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে বলিয়া তথাকথিত Soft pedagogy বা চিত্তাকর্ষক শিক্ষা-প্রণালীকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু তিক্ত বা বিরক্তিকর সাধনার পথেই যে চলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ইচ্ছা করিয়া বিরক্তির সাধনা করিয়া চিত্ত সংযমের চেষ্টার মধ্যে অনর্থক শক্তি ক্ষয় হয়। আগ্রহ থাকিলে, প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতনতা থাকিলে একটানা ক্লান্তিকর পরিশ্রমও আর বিরক্তিকর বলিয়া মনে হয় না, ভবিষ্যৎ সিদ্ধির আশাই বর্তমানের পরিশ্রমের তিক্ততাকে

মধুরায়িত করিয়া তুলে। তবে এ সম্বন্ধে অধিকারি-ভেদ আছে; অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শিশু বা বালকের দল, যাহাদের মধ্যে কোনও রস বা চরিত্র গঠিত হয় নাই এবং যাহারা এখনও প্রবৃত্তির প্রাথমিক প্রেরণার পথেই চলাফেরা করিতেছে এবং যাহাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সিদ্ধির চেতনা পরিস্ফুট নহে, ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশ (volitional attention) প্রভৃতি তাহাদের অধিগম্য নহে। এইজন্য শিশু বা বালকদের শিক্ষা ব্যাপারে এমনভাবে কাজ করিতে হইবে, যাহাতে সহজাত প্রবৃত্তিগুলিই তাহাদের অভিনিবেশে সাহায্য করে। কাজেই এই বয়সে তথাকথিত soft pedagogy বা চিত্তাকর্ষক শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োজন আছে। তাহার পর তাহার রস বা সংস্কার যতই দানা বাঁধিতে থাকিবে, তাহার ব্যক্তিত্ব যতই পরিস্ফুট হইতে থাকিবে, আত্ম-সম্মান-বোধ যতই তীব্রতর হইতে থাকিবে, ততই ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশে তাহার ক্ষমতা বাড়িতে থাকিবে। সুতরাং বয়স্ক ছাত্রদের পাঠনের সময় তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য খুব বেশী লম্ফঝম্ফ করিয়া রং-চংএ ছবি-ম্যাপ-মডেল প্রভৃতির সাহায্য লইয়া তথাকথিত পাঠন-যন্ত্রাদির ব্যবহার করিয়া পড়াইবার ততটা প্রয়োজন নাই। ইহার চেয়ে যে-সমস্ত ব্যাপারে ছাত্রদের 'রস' তৈয়ারী হইয়াছে, যে-সমস্ত খুসী খেয়াল বা সখকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, যে বিষয়ে দক্ষতার উপর তাহারা তাহাদের আত্মসম্মানকে স্থির করিয়াছে, সেইগুলিকে মূলধন করিয়াই তাহাদের ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশকে উৎসাহিত করিতে হইবে। এইভাবে চেষ্টা করিলে শিক্ষক ছাত্রদের নিকট ভয়ের পাত্র হইবে না। এই ভাবেই সাধনা ও আনন্দ একমুখী হয় এবং শিক্ষক তাঁহার ছাত্রদের আনন্দের সহায়ক ও সখের সঙ্গী হইয়া বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন।

অবশ্য একথা সত্য, যাহা স্বাভাবিক ভাবে চিত্তাকর্ষক মনের উপর তাহার আবেদন বেশী হইবেই এবং সেই জন্যই ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশের চেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনিবেশের আকর্ষণ বেশী হইবেই। কিন্তু স্কুল কলেজে এবং জীবনের সাধনার পথে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে নানা দিক দিয়াই ইচ্ছাকৃত অভি-নিবেশের অনুশীলন করিতেই হইবে। এই ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশের ক্ষমতা

মানুষের একটা অমূল্য সম্পদ। কাজেই তথাকথিত চিত্তাকর্ষক শিক্ষা-প্রণালীর অজুহাতে যে সব ব্যাপারে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে সেইগুলিকে লইয়াই বাড়াবাড়ি না করিয়া স্কুল কলেজে ইচ্ছাকৃত অভি-নিবেশের অনুশীলন করাই বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ হওয়া উচিত। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থার রীতি নীতি অন্যরূপ হইবে।

অভিনিবেশ সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

এখন অভিনিবেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ যে সমস্ত পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাদের কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

কতটা পরিমাণ জিনিসের উপর আমরা একসঙ্গে মনোনিবেশ করিতে পারি এই বিষয়ে স্পিয়ারম্যান সাহেব পরীক্ষা করিয়া তাঁহার বিখ্যাত 'Law of Span' গ্রন্থে বলিয়াছেন, মানুষ যে ভাবেই তাহার অভিনিবেশকে নিযুক্ত করুক না কেন তাহার একটি নির্দিষ্ট মাপ আছে। ফলে একটি বিষয়ে মনোযোগকে নিবিষ্ট করিলে অন্য বিষয়ে মনোযোগ কমিয়া যাইবে।

তাহা হইলে একসঙ্গে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কি সম্ভবপর নহে? এক হিসাবে তাহাই বটে। তাহা হইলে নেপোলিয়ান্ প্রভৃতির যুগপৎ অভিনিবেশের শক্তি সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কি মিথ্যা? না; তবে সেসব ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিভিন্নমুখী মনোযোগ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে একটির পর আর একটি বিষয়ে ক্ষিপ্রভাবে এবং পর্যায়ক্রমে মনের কেন্দ্রীকরণ।

আর একটি ভাবে যুগপৎ মনোযোগ সম্ভবপর হয়। আমরা জানি, যে ব্যক্তি প্রথম সাইকেল চালাইতে অথবা তারের উপর নাচিতে শিক্ষা করে সে তখন তাহার সমগ্র চেতনা দিয়াই তাহা করে এবং সেই সময় অন্য বিষয়ে একটু মনো-যোগ দিলেই সে পড়িয়া যায়। তাহার পর যখন এই কাজটি অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত হইয়া যায়, তখন সাইকেল চালান বা তারে-নাচা জাতীয় কাজগুলি নিম্ন-মস্তিষ্ক দিয়াই যন্ত্রচালিতবৎ করিয়া যায় এবং চিন্তা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কাজ করিবার জন্য তাহার উর্ধ্ব-মস্তিষ্ক খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ

তাঁহার বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেশের প্রসঙ্গে পল্লীগ্রামের মেয়েদের চিড়া কুটিবার যে উদাহরণটি দিয়াছেন, যুগপৎ অভিনিবেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে সেটি প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে শারীরিক কাজগুলি অভ্যাসের মাধ্যমে সরলায়িত হইয়া স্বয়ংচালিত যন্ত্রের আবর্তনের মতো হইয়া যায়।

যুগপৎ অভিনিবেশের প্রসঙ্গে যে সব ক্ষেত্রে মনোযোগ একটি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সরিয়া যায়, সে-ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের আর একটি লীলা আছে। অনেক সময় মন সরিয়া যাইলেও, মনের প্রেরণার যে কর্ম্ম-প্রয়াসের (conation) আরম্ভ হয়, তাহার কার্য চলিতেই থাকে : "conation outlasts the cognition that initiates it" (Mc Dougall)। ফলে অভিনিবেশের প্রেরণায় দেহযন্ত্র যখন একটি কাজ করিয়া চলিতেছে ইতোমধ্যেই অভিনিবেশ বিষয়ান্তরে ব্যবহৃত হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, হয়ত একটি কাজ করিবার জন্য স্থির করিলাম, পরে সেই কাজটি করিবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কোন একটি জিনিস আনিতে যাইলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে হয়ত মনোযোগ সরিয়া গিয়াছে এবং কোন্ জিনিসটি আনিবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছিলাম তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। তখন কি যে করি তাহা বুঝিতে না পারিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারটিতে বসিলাম।

বাহিরের গোলমাল মনোযোগের ক্ষতি করিতে পারে কি না, এই বিষয়ে আলোচনায় দেখা গিয়াছে, গোলমাল অনেক সময়ে মনোযোগের সাহায্যই করে। কারণ গোলমালের সময় জোর করিয়া মনোযোগকে নিয়োগ করিবার জন্য যে ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা আসে, তাহার ফলে শান্তির পরিবেশে মনোযোগ যতটা তীব্র হয়, অনেক সময় গোলমালের পরিবেশে তাহা অপেক্ষা তীব্রতর হইয়া থাকে। শুধু তাই নয়, গোলমালের পরিবেশে যাহাদের মনোযোগ দেওয়া অভ্যাস, এই গোলমালটুকু না থাকিলে ফাঁকা আসরে যাত্রা গানের মতো তাহাদের মনোযোগও যেন ঠিক জমে না। এই তত্ত্বটী বর্ত্তমান শিক্ষাব্রতীদের মনে রাখা উচিত। কারণ, বর্তমানে তপোবনের প্রশান্ত পরিবেশে অধ্যয়নের তপশ্চর্যা করিবার সুযোগ অনেকেরই নাই। বস্তুতঃ, অনেক ক্ষেত্রেই পড়াশুনার অভিনিবেশের জন্য এতটা সাবধানতার

প্রয়োজন হয় না। অভিনিবেশ খানিকটা অভ্যাসের ব্যাপার। কল-কারখানার ঘর্ঘর শব্দের মধ্যেই শিল্পী অনায়াসে নূতন নূতন পাড়ের ডিজাইন তৈয়ারী করিতে পারেন, কলিকাতার ট্রাম বাস প্রভৃতির গোলমালের মধ্যে অনেক ছাত্রই অঙ্কও কষিতে পারে, কবিতাও লিখিতে পারে, গভীর বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারেও মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে পারে।

কি প্রকার অঙ্গসংস্থান করিলে অভিনিবেশ গভীরতর হয়? আমরা জানি, আরাম কেদারায় বসিয়া বা অর্ধশায়িত অবস্থায় তাকিয়া হেলান দিয়া কোনও জটিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সহজ নয়। বস্তুতঃ তীব্র ভাবে মনোযোগ দিতে হইলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। যে সকল ছাত্র অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির, তাহারা যদি খানিকক্ষণ বসিয়া, খানিক বা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়াশুনা করে তাহা হইলে ফল ভাল হয়। যান্ত্রিক ভাবে আবৃত্তিমূলক মুখস্থ প্রভৃতি করিবার সময় চঞ্চল বালকদিগকে এদিক-ওদিক পায়চারী করিতে-করিতেও মুখস্থ করানো যাইতে পারে। তাকিয়া হেলান দিয়া বা টেবিলের উপর পা তুলিয়া পাঠ অভ্যাসের চেয়ে ইহাতে কাজ ভাল হয়।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, মানুষের অভিনিবেশের প্রকারভেদ আছে। কেহ বা একটি বিষয় অনেকক্ষণ একটানা ভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিতে (intensive type), কেহ বা বিভিন্ন বিষয়ের উপরে দমকে-দমকে (by jerks) মনোযোগ দিতে পারে (distributive type)। মনে হইতে পারে, যে ব্যক্তি একসঙ্গে বহু বিষয়ে মনোযোগ দেয়, সে কোন বিষয়েই তেমন তীব্রভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। কিন্তু এ ধারণাটি ঠিক নহে। কারণ মনোযোগ ত যুগপৎ বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়ে না, তাহা তাড়াতাড়ি একটির পর আর একটির উপর দিয়া গড়াইয়া যায়। কাজেই সাময়িকভাবে প্রত্যেক বিষয়েই সমান তীব্রভাবে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব নহে।

বিভিন্ন বালকের অভিনিবেশের ক্ষমতা যে বিভিন্ন প্রকার, এই তত্ত্বটি শিক্ষকদের নিকট খুবই প্রয়োজনীয়। বালকের বিশেষত্ব বুঝিয়া তাহাকে তাহার শক্তির উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

মনোযোগের অন্য জাতীয় প্রকারভেদও আছে। অনুভূতিগ্রাহ্য জিনিস-

গুলিকে অনুভব করিবার সময় কেহ কেহ তাহাদের মনোযোগকে এমনভাবে নিবদ্ধ করে যে, শুদ্ধ অনুভূতির জিনিসটিকেই তাহারা গ্রহণ করে (fixtating type): আবার কেহ কেহ অনুভব করিবার সময় তাহাদের মনোযোগকে এমন ভাবে প্রয়োগ করে যে. অনুভূতির কেন্দ্রগত জিনসটির চারিপাশের জিনিসগুলিকেও তাহারা কিছু কিছু গ্রহণ করে (fluctuating type)। ইহার ফলে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের অভিজ্ঞতার জিনিসগুলিকে ঠিক যথাযথভাবে বর্ণনা করে, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা তাহার সহিত কিছু কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রভৃতিও মিশাইয়া দেয়। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা হয়ত রিপোর্টার, সাংবাদিক, ঐতিহাসিক, রাজদূত প্রভৃতি কার্যে সফলতা লাভ করিবে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা সমালোচক, সাহিত্যিক হিসাবে কৃতী হইবে। ঐতিহাসিক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা নিখুঁত নৈর্ব্যক্তিক সত্য লইয়া কারবার করিবে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত ব্যক্তিগত মন্তব্য মিশাইয়া বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করিবে। বলা বাহুল্য, এই উভয় জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রয়োজন আছে।

অভিনিবেশের স্থির (static type) ও চঞ্চল (Dynamic type)—এই ভাবেও শ্রেণী বিভাগ হইতে পারে। প্রথম জাতীয় ছাত্রেরা যখন কোনও কার্যে মনোযোগ দেয় তখন তাহারা কাজের প্রারম্ভ হইতে পরিণতি পর্যন্ত কাজে মন নিবদ্ধ রাখিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় টাইপের ছাত্রদের মন মাঝে মাঝে দুর্নিগ্রহ অশ্বের মত পথ হইতে সরিয়া যায় এবং তাহাকে আবার বল্গার সাহায্যে পথে ফিরাইয়া আনিতে হয়।

বয়স ভেদেও মনোযোগের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয়ের উপরই তাহাদের মনোযোগ নিয়োগ করিতে পারে। কিন্তু অনুভূতির আবেদনহীন শুদ্ধ তত্ত্ব বা ভাবের উপর সহজে মনোযোগ দিতে পারে না। কাজেই সত্য-মিথ্যা, পাপ পুণ্য, আত্মা-পরমেশ্বর প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের নিকট তথ্য বা তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করিলে তাহাতে তাহারা মনোযোগ দিতে পারে না। বালক বয়সে রস, সংস্কার, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির বিকাশ হয় না, সেই জন্য তাহাদের অভিনিবেশকে নিযুক্ত করিতে হইলে

কৌতূহল, আত্মবিস্তার (self assertion) প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ বালকদের অভিনিবেশ অত্যন্ত চঞ্চল, বহুক্ষণ স্থিরভাবে কাজ করিয়া যাইতে ইহারা সমর্থ নহে।

অভিনিবেশের যথাযথ নিয়োগ শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এইজন্য শিক্ষকদিগকে অভিনিবেশের বিশেষত্ব ও তত্ত্বগুলি জানিয়া রাখা ভাল। শিশুদের অভিনিবেশ ও পূর্ণবয়স্ক লোকদের অভিনিবেশ এক নহে। ইচ্ছাকৃত অভিনিবেশ শিশুদের অধিগম্য নয়। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনিবেশ অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি বিষয়ে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। শিশু একই সময়ে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। কাজেই পড়িবার সময় শব্দের বানানের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে হয়ত তাহার অর্থবোধ হইতে অসুবিধা হইতে পারে, আবার অর্থের দিকে মনোযোগ দিতে হইলে হয়ত উচ্চারণের দিকে তাহার মনোযোগ শিথিল হইবে। তাহা হইলে করণীয় এই যে, নূতন পদ আয়ত্ত করাইবার সময় শিশুকে প্রথমে পদের উচ্চারণ শিখাইতে হইবে, উচ্চারণে অভ্যস্ত হইলে, তাহার অর্থ কণ্ঠস্থ করাইতে হইবে, উচ্চারণ ও অর্থ আয়ত্ত হইলে বানান শিখাইতে হইবে।

সামান্য বিঘ্নতেই শিশুর মনোযোগ নষ্ট হইয়া যায়। অতএব তাহার পাঠনের সময় যাহাতে তাহার মনোযোগের বিঘ্ন না ঘটে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিশু একটানাভাবে এক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। সেইজন্য তিন হইতে পাঁচ বছরের শিশুদের এককালীন পনের হইতে কুড়ি মিনিটের বেশী সময় শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। পনের মিনিট একটানা পড়ানো যাইতে পারে এবং দিনের মধ্যে সকাল, সন্ধ্যা ও দুপুর এই তিনবার পড়ানো যাইতে পারে। শেষের দুইবার পুনরাবৃত্তির জন্য ব্যবস্থা করা ভাল।

ছয় হইতে দশ বৎসরের বালকদের পঁচিশ ত্রিশ মিনিট শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পর দশ মিনিট বিশ্রাম দিয়া আরও দুই তিন বার পড়ানো যাইতে পারে।

কিশোরদিগকে একটানা চল্লিশ মিনিট একটি বিষয় পড়ানো যায়।

একটানাভাবে মনোযোগ দেওয়া পূর্ণ বয়স্ক লোকের পক্ষেও সহজ নহে।

বস্তুতঃ যখন আমরা একটানাভাবে কোনও বিষয়ে মনোযোগ দিই, তখন আমাদের মন একটি বিন্দুতে ঠিক নিবদ্ধ থাকে না। একটি জিনিসের বিভিন্ন বিষয় বা বিভিন্ন দিকের উপর মন পর্যায়ক্রমে ঘুরাফিরা করিতে থাকে। অতএব কোনও বিষয়ের উপর মনোযোগ স্থায়ী করিতে হইলে তাহার উপায় হইতেছে, সেই সম্বন্ধে জ্ঞানভাণ্ডার বর্ধিত করিয়া নানা জাতীয় প্রশ্নের উত্থাপন করতঃ পূর্ব পরিচিত বিষয়ের মধ্যেও নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়া বিষয়টি সম্বন্ধে আগ্রহের সৃষ্টি করা।

আমাদের শৈশবে প্রবৃত্তি এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত সংস্কারের প্রভাব খুব বেশী কাজ করে। কাজেই মনোযোগকে শক্তিশালী করিবার জন্য এইগুলির সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। বাল্যে কৌতূহল প্রবৃত্তিটি অত্যন্ত প্রবল থাকে। কাজেই এই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়া মনোযোগের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। ইহার পর মানুষ যতই চরিত্রের পথে অগ্রসর হইতে থাকে তাহার রসগুলি ততই দানা বাঁধিতে থাকে। তখন যে বিষয়ে রস তৈয়ারী হইয়াছে সে সেই বিষয়ে অধিকক্ষণ ইচ্ছাকৃত মনোযোগ প্রয়োগ করিতে পারে। পরে এই রস যখন পরিপক্ক হইয়া চরিত্রে পরিণত হয় তখন ইচ্ছাশক্তি ও আত্মসম্মান-বোধই তাহার মনোযোগকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার পক্ষে যথেষ্ট হয়।

ক্রীড়াচ্ছল

সাধারণতঃ খেলাকে কাজের বিপরীত বলিয়া মনে করা হয়। অবশ্য কাজ-পালানো বা কাজ-ভোলানো খেলা যে নাই তাহা নহে। কিন্তু খেলার যেটি মূল বিশেষত্ব সেটি খুব উচ্চস্তরের কাজের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। খেলার বিশেষত্ব হইতেছে, স্বাধীনভাবে আত্মবিস্তার (self-assertion)। শ্রেষ্ঠ শিল্প-সাধকদের শিল্প-সাধনার মধ্যে সেই আত্মবিস্তারের লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ সে-ই শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী, যে কঠিনতম কর্মের মধ্যেও খেলার মুক্তি ও খেলার আনন্দের সন্ধান পাইয়া থাকে, আর সেই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হইতে পারে, যে খেলার বন্ধনহীন আনন্দের মধ্যে ব্রতচারীর সংযম ও নিষ্ঠা আনয়ন করিতে পারে। এমনটি হইলে কঠোর কর্তব্যের বোঝা "খেলবার বাঁশী"তে পরিণত হয়। কাজকে যদি আমরা অপরের দ্বারা ধাড়ে-চাপানো বোঝামাত্র মনে না করিয়া স্বেচ্ছাকৃত আনন্দের সাধনা বলিয়া ভাবি অর্থাৎ কাজকে যদি খেলার চোখে দেখিতে পারি, তাহা হইলে কাজ আর ভয়ের বস্তু থাকে না।

শিক্ষাতত্ত্বে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীকেই বলে "ক্রীড়াচ্ছল"। ইহাতে খেলার ছলে পড়ানো হয়, ফলে পড়া জিনিসটাই খেলার আনন্দে মধুর হইয়া উঠে।

বর্তমান শিক্ষা-বিজ্ঞানে যাহারা ক্রীড়াচ্ছলের অবতারণা করিয়া শিক্ষাকে খেলার মতো চিত্তাকর্ষক অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত আনন্দের সাধনা হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মন্টেসরীর (Dr Maria Montessori) নাম অগ্রগণ্য। ইঁহার শিক্ষাতত্ত্বের বিশেষত্ব হইতেছে, শিক্ষার দায়িত্বটি যতদূর সম্ভব ছাত্রদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া এবং শিক্ষকের শাসন ও তত্ত্বাবধানকে যথাসম্ভব পরিহার করা। খেলার মধ্যেকার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা মন্টেসারী শিক্ষার মধ্যেও আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই শিক্ষা-পদ্ধতির একটা বড় বিশেষত্ব হইতেছে, ছাত্রেরা তাঁহার didactic apparatus লইয়া তাহাদের অঙ্গ-চালনার দক্ষতা অর্জন করিবে এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অনুশীলন করিবে এবং পড়া লেখা

ও গণিত অভ্যাস করিবে। এই সব ব্যাপারে শিক্ষকের তত্ত্বাবধান খুব বেশী থাকিবে না, ছাত্রেরা খানিকটা নিজেদের খুশীমত চলিবে এবং খুশীমত কাজ করিবে। মণ্টেসরী বলেন, ছাত্রেদের এইভাবে স্বাধীনতা দিলে তাহারা পড়ার মধ্যে খেলার আনন্দ পাইবে আর তাহা ছাড়া অনুভূতির অনুশীলনের ফলে শুধু যে হাত-পা প্রভৃতির দক্ষতাই বৃদ্ধি পাইবে তাহা নয়, ইহা ছাড়া তাহাদের আত্মনির্ভরতা, সৃজনীশক্তি, অভিনিবেশ বৃদ্ধি পাইবে। এই উপায়ে তাহারা নিজেদের এবং অপরকে সম্মান করিতে শিখিবে।

মণ্টেসরী যে খুব অন্যায় কথা বলেন নাই তাহা খুবই সত্য। তবে এক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মতের পার্থক্য আছে। খেলার মধ্যে যে কল্পনা-প্রবণতা তথা কল্পনা-বিলাস আছে, শিশুদের মধ্যে যে রূপকথার জগতে বিচরণশীলতা আছে, তাহা শিশুর খেলার অনেকখানি অংশ অধিকার করিয়া থাকে। মণ্টেসরী কিন্তু তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতিতে এই জিনিসটির উপযোগিতা স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন, এই কল্পনা-বিলাস ভবিষ্যতে ছাত্রদের অপদার্থ স্বপ্ন-বিলাসী করিয়া তুলে। মনে হয়, ছেলেদের অনুভূতির অনুশীলন হস্তপদাদির দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতির বাড়াবাড়ী করিতে যাইয়া মণ্টেসরী কল্পনার প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া ভুল করিয়াছেন।

মণ্টেসরী-প্রণালীর শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশেষত্ব হইতেছে, ছাত্রদিগকে পড়াশুনার ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হইবার প্রেরণা দেওয়া এবং খেলার ছলে শেখার জিনিসগুলিকে পরিবেশিত করা। তবে এই প্রণালীটির মণ্টেসরিই যে প্রথম বা একমাত্র পথ-প্রদর্শক, তাহা নহে। অনেক দিন হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে 'heuristic method' বলিয়া একটি শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতেও এই প্রকার আত্মনির্ভরতার ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক আর্মষ্ট্রং এই প্রণালীর ব্যাপক প্রচার করেন। প্রথমতঃ এই প্রণালী দ্বারা রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা শিখান হইত। পরে অন্যান্য বিষয় শিখাইবার জন্যও এই প্রণালী অনুসৃত হইত। ইহাতে ছাত্রদিগকে মৌলিক গবেষণার অভিনয় করিতে দেওয়া হইত। ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের হাতে পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করিবে—ইহাই হইল এই প্রণালীর উদ্দেশ্য।

আর একজন শিক্ষাবিদ্ কিটীং (D. M. W. Keatinge) যদিও শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রদের স্বাধীনতা দেওয়ার নীতিকে পছন্দ করিতেন না, তবুও তিনি একদিক দিয়া এই প্রণালীটিই ইতিহাস-পাঠনের ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠনের সময় তিনি সত্যকারের দলিলপত্র. মুদ্রা, তাম্রলিপি প্রভৃতির ব্যবহার করিয়া ইতিহাসের পাঠনটিকে ক্রীড়াচ্ছলের ভিতর দিয়া পড়াইবার পক্ষপাতী ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার 'জর্জ জুনিয়র রিপাবলিক' এবং ইংলণ্ডের হোমস্ লেন-এর 'লিটল্ কমনওয়েলথ'এর কথা উল্লেখযোগ্য। হোমস্ লেনের প্রতিষ্ঠানটী প্রথমতঃ জর্জ জুনিয়র রিপাবলিকের মতো চতুর্দশ ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক অপরাধপ্রবণ বালকদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ইহাতে সাধারণ বালকদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইত। ফলে অসৎ সঙ্গে ভাল ছেলেগুলি নষ্ট হইত না। খারাপ ছেলেগুলি যাহাতে ভাল ছেলেদের আদর্শে ভাল হয়, এই উদ্দেশ্যেই তাহাদের লওয়া হইত। এই স্কুলের বিশেষত্ব ছিল, ইহার আইন শৃঙ্খলা কোনও কিছুই উপরের কর্তৃপক্ষের দ্বারা ঘাড়ে-চাপানো জিনিস ছিল না; এ যেন "আমরা সবাই রাজা মোদের রাজত্বে"র দেশ! তাহারাই নিজেদের আইন নিজেরাই তৈয়ারী করিত বলিয়া সে আইন ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে হইত না।

লেন-এর (Homes Lane) বিশ্বাস ছিল. বালকদের মধ্যে যে অপরাধ প্রবণতা আছে, তাহা জন্মগত পশুভাবের জন্য ততটা নহে, যতটা হইতেছে তাহাদের কৈশোরের উদ্দাম উৎসাহ-স্রোত উপযুক্ত পথ না পাইয়া অসামাজিক পথে রীতিনীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া উপ্‌চাইয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া। সুতরাং এই রোগের প্রতিকার হইতেছে দমন বা রোধনের মধ্যে নহে, পরন্তু প্রবৃত্তির উগ্দতি বা উৎকর্ষণের (Sublimation) মধ্যে। এই উৎকর্ষণ করারও ব্যবস্থা করা হইত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের স্বায়ত্ত শাসনের ভার দিয়া এবং তাহাদের সহজ আত্ম-বিস্তারের (Self assertion) প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করিয়া। এইভাবে এই প্রতিষ্ঠানে তাহাদের বাহাদুরির পথ খুলিয়া দেওয়া হইত বলিয়া অন্যায় কাজ করিয়া বাহাদুরী লাভ করিবার

অতৃপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করিবার চেষ্টা তাহাদের করিতে হইত না। এই ব্যবস্থার ফলে দুর্দান্ত দুষ্ট বালকের দল পরিশ্রমী শৃঙ্খলানিষ্ঠ সুশীল বালকে পরিণত হইত। এইরূপ না হইয়া উপায় নাই, কারণ যে কর্তৃপক্ষকে আমরা বাহিরের শক্তি বলিয়া মনে করি সেই কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার মধ্যে হয়ত একটা নেতাগিরির আস্ফালনের আনন্দ আছে, কিন্তু নিজেদের সম্মতিক্রমে যে আইন তৈয়ারী হইয়াছে, তাহাকে অমান্য করিলে দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় এবং বন্ধুদের ঘৃণার পাত্র হইয়া কোণঠেসা হইয়া পড়িতে হয়।

এই সমস্ত শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণের শিক্ষাপ্রণালী হইতে এইটুকু সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা এমন কি তাহাদের পঠনের ব্যাপারেও কর্তৃত্বের জঙ্গী আইন অথবা পুলিশী শাসনের তীব্রতা কমাইয়া কর্তৃত্বের অংশ এবং দায়িত্ব খানিকটা ছাত্রদের হাতে ছাড়িয়া দিলে ফল ভালই হয়। এই প্রণালীগুলি হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, শিক্ষা-ব্যাপারে বাঁধাধরা রুটিনকে একটু আল্গা করিয়া দিয়া ছাত্রদের প্রয়োজন, রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে কাজ করিবার জন্য একটু স্বাধীনতা দেওয়া ভালই। এই স্বাধীনতা বালকদের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রেরণা জাগাইঁয়া তুলে, তাহা তাহার সৃজনীশক্তি, কল্পনাশক্তি, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি ফুটাইয়া তুলে এবং কাজের রুক্ষতার মধ্যে খেলার আনন্দও আনিয়া দেয়।

প্রশ্ন জাগে, ছেলেদের যদি এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়, যদি নিজেদের পথেই তাহাদের চলিবার সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রচলিত শ্রেণী-বিভাগ (class system) এবং সময়-তালিকা (time table) প্রভৃতির বন্ধনের ভিতর দিয়া সে স্বাধীনতা দেওয়া কি ভাবে সম্ভবপর ? প্রত্যেক ছাত্রই যদি নিজের রুচি অনুযায়ী চলে, তাহা হইলে বাঁধাধরা পাঠ্যসূচীর ভিতর দিয়া তাহা কি ভাবে সম্ভব হইবে ? বর্তমানের যে পাঠন-ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ইহাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বাহিরের নিয়ম অনুযায়ী ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মনোযোগ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিচালিত করিতেই হইবে এবং একটি ক্লাসের ছেলেদের সকলকে একই গতিবেগে একই বিষয়ে জ্ঞানের পথে

চলিতে হইবে। ইহাকে যতই অসম্ভব বলিয়া মনে হউক না কেন, বড় বড় স্কুলে ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

তাহা হইলে ক্রীড়াচ্ছলের এই নব ভাবধারাকে বিদ্যালয়ের পাঠন-ব্যবস্থায় কি ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ? সেক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ক্লাসকে বিভাগে (section) বিভক্ত করিয়া প্রচুর ঐচ্ছিক বিষয় পাঠনের সুযোগ দিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগের ব্যবস্থা করিয়া খানিকটা কাজ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যেও ছাত্রদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা খুসী খেয়ালের চেয়ে শিক্ষকের নির্দেশ বেশী ভাবে কাজ করে, ছেলেরা যে কি বিষয় শিক্ষা করিবে তাহার বিধান-ব্যবস্থা শিক্ষকই করিয়া দেন। মন্টেসরী কিন্তু এই বিষয়ে ব্যক্তিগত ছাত্রকে তাহার খেয়ালের পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী। তবে স্কুল জিনিসটা সমাজ জীবনের একটি ছোট সংস্করণ বলিয়া এবং সমাজ-জীবনে অনেক কাজই একসঙ্গে করিতে হয় বলিয়াও বটে, আর কতকগুলি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শিক্ষাপ্রণালীতে অনেক পরিশ্রম ও সময়ের অপচয় হয় বলিয়াও বটে, কতকগুলি ক্ষেত্রে সংঘগত পাঠন-ব্যবস্থাকে স্বীকার তিনি করিয়াছেন। নৃত্য গীত, শারীরিক ব্যায়াম, হস্ত-সম্পাদ্য কাজ, উদ্যানচর্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট সময়, স্থান ও পাঠন-ব্যবস্থা আছে।

এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান কোথায় ? ছাত্ররা যদি নিজেরাই সাধনার পথে চলিবে তাহা হইলে শিক্ষক কি কাজ করিবেন ? মন্টেসরী বলিয়াছেন, তিনি একজন "দ্রষ্টা" (observer) ; তবে কি তিনি খানিকটা নিষ্ক্রিয় ভগবান হইয়া থাকিবেন ? না ; বিদ্যালয়কে যে আমরা মানব সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিয়াছি, বিদ্যালয়কে সেই সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য যতটাই চেষ্টা করা যাক না কেন, সে সমাজ হইতেছে খানিকটা কৃত্রিম সমাজ, একটা মনোমত আদর্শ বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবাঞ্ছনীয় জিনিসের বর্জন এবং বাঞ্ছনীয় জিনিসের সংযোজনে গঠিত একটা কৃত্রিম সমাজ পরিবেশ। শিক্ষকগণ এই পরিবেশটি গঠন করিয়া দিবেন, তাঁহারা মঞ্চশিল্পী মাত্র ; এই মঞ্চে অভিনয় করিবে বালকেরাই। এ কথা সত্য যে, বালকেরা সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা "হাস্য পেলেই হাস্য

করি, নৃত্য পেলেই নাচি” এ জাতীয় স্বাধীনতা নহে, এ স্বাধীনতা পাঠন-যন্ত্র (didactive apparatus) লইয়া সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ পথেই চলিতে থাকে, তাহাকে রঙিন্ পশম লইয়া রংএ রং মিলাইতেই হইবে, রংবেরংএর খেলার জিনিস লইয়া শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে খেলিতেই হইবে, ইন্দ্রিয় অনুশীলের জন্য নানা জাতীয় জিনিস লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি নাড়ানাড়ি করিয়া জিনিসের ওজন, মাপ, আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিচিত হইতেই হইবে, বিভিন্ন মাপের সমবর্তুল কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে (cylinders) উপযুক্ত গর্তে পরাইবার চেষ্টা করিয়া জিনিসের আকার আয়তন সম্বন্ধে অনুমান শক্তির অনুশীলন করিতেই হইবে। এই জিনিসগুলিকে লইয়া তাহারা যে তাহাদের কল্পনা মতো পুতুল খেলা খেলিবে সে অধিকার সেখানেও নাই। কাজেই এখানেও যে খেলা তাহারা খেলে, তাহা শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারেই খেলিতে হয়।

কাজেই দেখা যাইতেছে, মণ্টেসরী শিক্ষককে যে “দ্রষ্টা” মাত্র বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই দ্রষ্টা নিষ্ক্রিয় নিরীহ সত্তামাত্র নহে, তিনি প্রয়োজন হইলেই সক্রিয় সাহায্য করিবেন, তবে কথায় কথায় উপর-পড়া হইয়া ব্যস্তবাগীশের মত অযাচিত উপদেশ ও অযাচিত সাহায্য দিয়া বালকদের কাজে বাধা দিবেন না, এই পর্যন্ত।

উচ্চতর শ্রেণীগুলিতেও এই প্রণালী অনুসরণ করা উচিত—যথাযথ প্রশ্ন-বিন্যাসের দ্বারা ছাত্রদের এমন একটা অবস্থায় লইয়া যাইতে হইবে, যাহাতে তাহাদের মন জিজ্ঞাসু হইয়া উঠে। এই জিজ্ঞাসার ভাবটি আসিবার পর তখন তাহাদের জ্ঞাতব্য জিনিসটি বলিয়া দিতে হয়, নতুবা অযাচিত অনায়াসলব্ধ জ্ঞানের আদর হয় না এবং তাহা মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে সঞ্চিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ঘাড়ে আসিয়া পড়িলেই তাহাকে পাওয়া বলে না, তাহাকে সাধনার দ্বারা অর্জন করিতে হয়। শিক্ষক ছাত্রদিগকে এই সাধনার পথনির্দেশ ও সাহায্য করিবেন, এইটুকুই হইতেছে তাঁহার কর্তব্য। অনিচ্ছুক ক্রেতার নিকট বিদ্যার “হকারি” করা তাঁহার কর্তব্য নহে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিলে যেমন কালে তাহাতে অঙ্কুর বাহির হয়, শিক্ষক যদি তেমনই ছাত্রদের উপযুক্ত জিজ্ঞাসু অবস্থায় উপযুক্ত চিন্তার

বীজ ছড়াইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা যথাকালে অঙ্কুরিত হইবেই। এই সত্যটি ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রকারান্তরে জানিতেন, সেইজন্য গুরুশুশ্রূষাকেই (শ্রবণ করিবার ইচ্ছা) তাঁহারা বিদ্যালাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন (গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা)।

চিন্তার ক্ষেত্রে গুরুর কার্য বলা হইল। এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, নীতির ক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্তব্য কি হইবে? রুশো প্রভৃতি অনেকের ধারণা আছে যে, মানব শিশু দেবত্বের সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং তাহাদিগকে নিজেদের স্বাভাবিক পথে ছাড়িয়া দিলেই কুঁড়ি হইতে ফুলের মতই তাহারা আপনা-আপনি বর্ণগন্ধে বিকশিত হইয়া উঠিবে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, মানুষ পশুত্বের মূলধন লইয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছে, অনেক সাবধানে অনেক সংগ্রামে তাহাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিলে তবে তাহার মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়।

পশুত্ব হয়ত মানুষের গোড়ার কথা হইতে পারে এবং পাপের অভিজ্ঞতার চাবুক খাইতে খাইতে মানুষ ক্রমশঃ দেবত্বের দিকে চলিতেও পারে; কিন্তু সেই স্বাভাবিক পরিণতি এত দীর্ঘদিনে সিদ্ধ হয় এবং তাহাতে পরিশ্রমের এতটা অপচয় হয় যে, সে বিষয়ে পরীক্ষা করা বিপজ্জনক।

কাজেই নীতির ক্ষেত্রেও উপযুক্ত পরিচালনার প্রয়োজন আছে। তবে এই পরিচালনার জন্য উপদেশ বা নীতির বাণীর চেয়ে শিক্ষকের ব্যক্তিগত আচরণ এবং সমাজ-সঙ্গত প্রভাবই অধিকতর কার্যকরী হয়। "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়" এই উক্তিটি নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই হিসাবে এই ব্যাপারে শিক্ষকের সম্ভাবনা অনেকখানি। তাঁহাদের পরিপক্ক জ্ঞান, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও সুগঠিত চরিত্র লইয়া তাঁহারা ছাত্রদের আশেপাশে নিজেরাই একটা বিশুদ্ধ পরিবেশ, সৎসঙ্গের আবহাওয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন এবং নিজেদের আচরণ দিয়া ছাত্রদের অজ্ঞাতসারেই তাহাদের চরিত্রকে প্রভাবিত করিতে পারেন।

অভ্যাস

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় একটি ট্রেণ দুর্ঘটনায় একটি বাঘের খাঁচার দরজা ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে বাঘটি মুক্তি পাইয়া বাহির হইয়া আসে। কিন্তু বহুকালের বন্দী জীবনে অভ্যস্ত বাঘটি তাহার এই সগুপ্রাপ্ত স্বাধীনতার দায়িত্বে এমনই দিশেহারা হইয়া পড়ে যে, পুনর্বার খাঁচায় ফিরিয়া যাইয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। অভ্যাসের এমনই প্রভাব!

অভ্যাসের প্রভাব সম্বন্ধে আর একটি কাহিনীও খুব প্রচলিত আছে। বহুদিনের পুরাতন অবসরপ্রাপ্ত একটি সৈনিক দুই হাতে মাংসাদি খাদ্যদ্রব্য লইয়া চলিতেছে। হঠাৎ কে একজন সামরিক আদেশের ভঙ্গীতে বলিল "এ্যাটেন্সন্" (প্রস্তুত)! চিরাভ্যস্ত অভ্যাসের প্রভাবে ঐ সৈনিকটি তৎক্ষণাৎ হাতের জিনিসপত্র ফেলিয়া দিয়া সামরিক কায়দায় দাঁড়াইয়া পড়িল।

এই দুইটি কাহিনীই জেম্স-এর 'Principles of psychology' গ্রন্থে আছে। ঐ গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন, এই অভ্যাসের ফলেই দুর্গত মানুষ তাহার ভাগ্যের বিড়ম্বনাকে মানিয়া লইয়া জীবনের গুরুভার টানিয়া চলে, ধনীর দুলালের বিরুদ্ধে তাহারা হিংসা ও বিদ্রোহের অভিযান চালায় না। ইহারই প্রভাবে খনির অন্ধকারের মধ্যে শ্রমিকেরা মুখ বুঁজিয়া কাজ করিয়া যায়, ঝড়-বৃষ্টি-শীতকে অগ্রাহ্য করিয়া জেলেরা মাছধরার কাজ করিয়া যায়, নাবিকেরা নির্বিবাদে জাহাজের "ডেকে" জীবন কাটায়। বিধাতৃ নির্দিষ্ট দুর্ভাগ্যকে আমরা হাসিমুখে বরণ করিয়া চলি এই অভ্যাসের প্রভাবেই।

ইহা অভ্যাসের একটি দিক। ইহার অন্য একটি দিকও আছে। অভ্যাসের ফলেই নৃত্য, কলা, গীত, বাদ্য, শিল্প, কারিগরী—প্রত্যেক বিষয়েই মানুষ অসামান্য দক্ষতা অর্জন করে। ইহারই প্রভাবে মানুষ সহস্র কাজের খুঁটিনাটি পরিকল্পনার পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাইয়া যান্ত্রিক অনুবর্তনে কাজ করিয়া যায়; চলা, হাঁটা, কাপড়-জামা-পরা, হাট-বাজার-করা, লোক-লৌকিকতা করা ইত্যাদি প্রতিদিনের শত সহস্র কাজের ব্যাপারে মানুষকে মাথা ঘামাইতে

হয় না। অভ্যাসবশে সব আপনা-আপনি হইয়া যায়। এইটুকু না হইলে সহস্র প্রকার কাজের গোলমালে মানুষ ক্ষেপিয়া উঠিত।

মানুষের যাহা কিছু শিক্ষা দীক্ষা, তাহা অভ্যাসেরই অবদান। যে শিশু একদিন একটা "ওরাং ওটাং"-এর মত বিকৃত ভঙ্গীতে টলিতে টলিতে পদক্ষেপ করে, অভ্যাসের প্রভাবে সেই হইয়া উঠে উদয়শঙ্করের মত নৃত্য-শিল্পী। যে বালক একদিন হাঁস আঁকিতে যাইয়া হাঁসের ডিম আঁকিয়া বসিত, সে-ই হইয়া উঠে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, র‍্যাফেল, করেজিওর মত চিত্রশিল্পী। অভ্যাসের প্রভাবে তানসেন হইতে বিঠোভেন, ডিমস্থিনিস হইতে বার্ক্-সুরেন্দ্রনাথ, কালিদাস হইতে সেক্সপীয়ার-রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের জীবনে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক প্রতিভা ও প্রবৃত্তি ইঁহাদের সাহায্য করিয়াছে বটে, তবে অভ্যাসই সেই প্রতিভা ও প্রবৃত্তিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

অভ্যাসের ফলে একটা কাজ যন্ত্রে-করা কাজের মত সরল ও সহজ হইয়া উঠে। অভ্যস্ত কাজে মনের তরফ হইতে সচেতন আয়াসের প্রয়োজন হয় না, দেহ মনকেও সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত থাকিতে হয় না। অভ্যস্ত কাজ করিতে করিতে আমরা অন্য আর একটা কাজও করিতে পারি, অন্য চিন্তাও করিতে পারি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পল্লীগ্রামের মেয়েদের ঢেঁকিতে চিঁড়া কুটিবার সময় গাল-গল্প করা, খরিদ্দারদিগের সহিত দরদস্তুর করা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। এ কাজটি সহজ নহে। এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হইলেই ঢেঁকির মুষলের আঘাতে হাত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু অভ্যাসের গুণে ঐরূপ বিপজ্জনক এবং জটিল কাজটুকুও যান্ত্রিকভাবে হইয়া যায়। ঐ কাজ করিবার জন্য উর্ধ্ব-মস্তিষ্ককে আর ব্যস্ত থাকিতে হয় না। ইহা শারীরিক অপচয় নিবারণ করে এবং প্রচেষ্টাকে নির্ভুল, ক্ষিপ্র, নিপুণ ও সুন্দর করিয়া তুলে। প্রথম শিক্ষার্থীর সাঁতারের চেষ্টার মধ্যে হাত পায়ের বহু ব্যর্থ উৎক্ষেপ ও আস্ফালন থাকে, অভ্যস্ত সাঁতারুর সাঁতারের মধ্যে এই ব্যর্থ আস্ফালন নাই, কিন্তু তাহার সংযত ভঙ্গীর মধ্যেই তাহার গতি হয় তীব্রতর এবং ভঙ্গিমা হয় 'সুন্দর'।

এই 'সুন্দর' কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বাস্তবিক অভ্যাস জিনিসটি নব নব সৃষ্টি ও সৌন্দর্যেরও জনক। আমরা "স্থিতিবাদ" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, পুনরাবৃত্তি (বা অভ্যাস) প্রগতির পরীপন্থী নহে, অভ্যাসের বাঁধা পথে চলিতে চলিতেই দক্ষতার সৃষ্টি হয় এবং এই দক্ষতাই নূতন নূতন সৌন্দর্যের, নূতন নূতন style-এর সৃষ্টি করে। দক্ষতা অর্জনের জন্য যেমন অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, দক্ষতা রক্ষা করিবার জন্যও তেমনই প্রয়োজন হয় অভ্যাসের।

অভ্যাস শুধু যে কাজে নৈপুণ্য, ক্ষিপ্রতা, নির্ভুলতা প্রভৃতি দিয়া থাকে তাহা নহে, ইহা আমাদের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকে অসাধারণ মাত্রায় বাড়াইয়া তুলে। গ্রীক-পুরাণের "মিলো" (Milo) জগদ্বিখ্যাত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন শুধু অভ্যাসের গুণে। তিনি প্রতিদিন একটি বাছুরকে কাঁধে করিয়া ষ্টেডিয়ামের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেন। বাছুরটি ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসের গুণে "মিলো"র শক্তিও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পরে যখন বাছুরটি পূর্ণবয়স্ক একটি ষাঁড় হইয়া উঠিল, তখনও "মিলো" পূর্বের মতই তাহাকে তুলিতে পারিত। নিছক অভ্যাসের ফলেই এই অসম্ভব শক্তি অর্জন করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

"মিলো"র ব্যাপারটিকে অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দিলেও, বর্তমানের বাস্তব "মিলো"দের কথা অস্বীকার করা যায় না। এক হাতে ২৭৭½ পাউণ্ড "Bent Press" করা, দুই হাতে ৩৮৫ পাউণ্ড "clean & jark" করা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু Joe Nordquest, John David প্রভৃতি ভারোত্তোলকগণ এসব কাজ অনায়াসেই করিয়াছেন।

অভ্যাস যে কি কাজ করিতে পারে না, তাহা হয়ত আমরা সঠিক জানি না। মানুষের দেহ মনের সাধারণ নিয়মগুলি পর্যন্ত অভ্যাসের দ্বারা বদ্‌লাইয়া যায়। De Quincy প্রতিদিন যতটা আফিং খাইতেন, তাহাতে বহু লোকের মৃত্যু হইতে পারিত। Coleridge-এর মাত্রাটিও কম ছিল না। আমাদের দেশের বিষ-কন্যাদের কথা অনেকেরই জানা আছে। ইহারা অভ্যাসের দ্বারা শরীরের মধ্যে এতটা বিষ আত্মস্থ করিত যে, তাহাদের সংসর্গে আসিলে অপরের মৃত্যু হইত।

আহার নিদ্রা শীতাতপের সাধারণ নিয়মগুলিও অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইহার প্রভাবেই নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবাগণ একবেলা আহার করিয়া সুস্থ শরীরে থাকেন এবং শীতকে অগ্রাহ্য করিয়া সাধু-সন্ন্যাসীরা হিমালয়ের বুকে বসিয়া তপস্যা করিয়া যান। ইহারই প্রভাবে আকবর, নেপোলিয়ান, নেতাজী প্রায় জিতনিদ্র হইয়া কাজ করিয়া যাইতেন। স্বাস্থ্যের জন্য যে ন্যূনতম ছয় ঘন্টা নিদ্রার প্রয়োজন, এই নিয়মটিও তাঁহাদের কাছে খাটিত না।

এই অভ্যাসের প্রভাবেই কলকারখানার গোলমালের মধ্যে কর্মী-শিল্পীদের অভিনিবেশের অসুবিধা হয় না, ইহার ফলেই সহস্র চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও বর্তমানের শহরের ছেলেরা পড়াশুনায় ব্যাঘাত বোধ করে না। ইহার ফলেই আমরা পোলো হইতে জাগ্‌লিং, সূচীশিল্প হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং, গণিত-বিজ্ঞান হইতে ইতিহাস ভূগোল, সেতার হইতে স্বরোদ, ঢোল হইতে পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম হইতে পিয়ানো সব কিছুই শিক্ষা করিতে পারি।

বস্তুতঃ শিক্ষা ও নৈপুণ্যের মূল কথাই হইতেছে অভ্যাস। শিক্ষার তত্ত্বকথা নামক প্রবন্ধে আমরা থর্ণডাইকের 'law of exercise', 'learning by successful variant', প্যাভ্‌লভের 'conditioned reaction' প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছি। এইগুলি এক হিসাবে অভ্যাসেরই নামান্তর। মনোবিদ্ যাহাকে conditioned হইয়া যাওয়া বলেন তাহাকেই সাধারণ লোক "অভ্যাস হইয়া যাওয়া" বলে।

শিক্ষার স্থায়িত্বের একটা বড় শর্ত হইতেছে "Over-learning"; এই Over-learning জিনিসটা অভ্যাসেরই অধিকতর সুযোগ ছাড়া আর কিছুই নহে। একটা প্রক্রিয়ার ফলে যদি কোনও একটা কিছু শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াগুলিকে আরও বহুবার পুনরাবৃত্তি করার নামই Overlearning; এই over-learning-এর আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির ফলেই সদ্যসমাপ্ত শিক্ষাটি স্থায়ী হয়, নতুবা তাহা ধীরে ধীরে মন হইতে মুছিয়া যায় ('স্মৃতি' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চিরাভ্যস্ত শিক্ষা এইভাবে মুছিয়া যায় না। এইজন্যই অনেকদিন ধরিয়া একটা ভাষা শিক্ষার পর

সেই ভাষার বর্ণমালা ভুলিয়া যাওয়া যায় না। এইজন্যই আমরা হাঁটিতে বা সাঁতার কাটিতে শিখিবার পর তাহা আর ভুলিয়া যাইতে পারি না, চির পরিচিত আত্মীয় স্বজনের কণ্ঠস্বর ও চলন-ভঙ্গিমা ভুলিতে পারি না।

অভ্যাসের দেহ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

জেমস্ বলিয়াছেন, অভ্যাসের তত্ত্বটি মনস্তত্ত্বের ব্যাপার ততটা নহে, যতটা হইতেছে পদার্থ বিদ্যার তত্ত্ব। যে জৈবপদার্থ দিয়া আমাদের দেহ নির্মিত, তাহারই মধ্যে ইহার তত্ত্ব নিহিত আছে। M. Leon Dumont দেখাইয়াছেন, একেবারে নূতন পোষাকের চেয়ে যে পোষাকটি একেবার পরা হইয়াছে, তাহা গায়ে ভাল ফিট্ করে, যে চাবিটি কয়েকবার ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা ভালভাবে কাজ করে, যে কাগজটিকে একবার ভাঁজ করা হইয়াছে, সেই ভাঁজ-কাগজটি সহজেই মুড়িয়া যায়। একটি মচ্‌কানো পা আবার মচ্‌কাইয়া যায়, হাড়-সরিয়া-যাওয়া হাতখানি আবার সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, ইহাই হইল সমস্ত পদার্থের নিয়ম। নরদেহটাও যখন জৈবপদার্থে তৈয়ারী ইহার সম্বন্ধেও এই নিয়মটি খাটে। বস্তুতঃ মানুষ হইতেছে কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র; তাহা চলা-ফিরার দিক দিয়াও বটে, প্রক্ষোভের দিক দিয়াও বটে, বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়াও বটে। তাই Dr. Carpenter বলিয়াছেন, আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী ঠিক সেই ভাবেই তৈয়ারী হইয়াছে, যেভাবে অভ্যাস করিয়া আমরা তাহাকে তৈয়ারী করিয়াছি।

পদার্থের নিয়মই হইতেছে এই যে, তাহার উপর একটা কিছু পরিবর্তন আনিতে হইলে তাহাতে সে প্রথমতঃ বাধাই দেয়। কিন্তু পরে আবার সে যেভাবে পরিবর্তিত হইল, সেই ভাবেই থাকিতে চায়; নূতন পরিবর্তন চায় না। অভ্যাসের মূল কথাটি ইহারই মধ্যে নিহিত আছে; প্রথম বারে যেভাবে কাজটি করা হইল, দ্বিতীয়বারে সেইভাবেই সেটি নিষ্পন্ন হইতে চায়, তৃতীয় বারেও তাই; ক্রমশঃ ব্যাপারটা সরল ও যান্ত্রিক হইয়া উঠে। কিভাবে এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা সম্ভব হয়?

আমরা জানি, যখনই আমরা একটা কিছু কাজ করি, তখনই আমাদের স্নায়ুগুলির মধ্য দিয়া একটা কর্মনির্দেশের তরঙ্গ বহিয়া যায়। দ্বিতীয়বার

যখন আবার সেই জাতীয় কাজ করা হয়, তখন প্রথম-তরঙ্গ-খিন্ন-খাত কাটা পথ বহিয়াই দ্বিতীয় তরঙ্গ স্রোতটি চলে; খাতটি তখনও তেমন গভীর হয় নাই বলিয়া তরঙ্গ স্রোতটি হয়ত একটু এদিক ওদিক চলিতে পারে, কিন্তু বহুবার আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির পর খাতটি গভীর হইয়া যায়, তখন আর ভুল প্রক্রিয়া ('শরীর-মানস যন্ত্র' এবং 'স্মৃতি' নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) হয় না। অভ্যাসজনিত দক্ষতা সাইন্যাপস্-এর বাধা ভাঙ্গিয়া এই স্নায়ুতরঙ্গের সরলতর যাত্রাপথের ব্যাপার মাত্র। আমাদের শরীরের মধ্যে প্রায় ১১ শত কোটি স্নায়ুকোষ আছে এবং প্রত্যেকটি স্নায়ুকোষের প্রান্তে বহুসংখ্যক স্নায়ুকেশ (dendron) আছে। যে কোনও একটি স্নায়ুকোষের পথ বহিয়া জ্ঞান-বহা অথবা কর্ম-বহা স্নায়ুনির্দেশের তরঙ্গ বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে কোটি কোটি পথ কাটিয়া চলিতে পারে এবং কোটি কোটি প্রকারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। কাজেই এক একটি উদ্দীপকের অসংখ্য প্রকার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। এই অসংখ্য প্রকারের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার মধ্য হইতে যতই আমরা সঠিক প্রতিক্রিয়াগুলি খুঁজিয়া পাই, ততই নিরর্থক প্রচেষ্টাগুলি বাদ যাইতে থাকে, ব্যর্থ অঙ্গচালনার অপচয় নিবারিত হইতে থাকে এবং আমাদের কাজ ক্ষিপ্র, নির্ভুল ও সুন্দর হইতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে।" স্নায়ুনির্দেশের ক্ষেত্রেও স্নায়ুতরঙ্গের চলার বেগে স্নায়ুর রাজ্যে খাত কাটিয়া যায় এবং অভ্যাস যতই দৃঢ় হয়, ঐ খাতটি ততই গভীর হইয়া উঠে। তখন স্নায়ুতরঙ্গ ঐ খাত-কাটা পথ হইতে ছিট্‌কাইয়া অন্যপথে ছুটিতে পারে না, অর্থাৎ আর ব্যর্থ প্রচেষ্টার ভুলভ্রান্তি হইতে পারে না, প্রতিক্রিয়াটা যান্ত্রিক হইয়া উঠে। এই যান্ত্রিক নির্ভুলতা যখন আয়ত্ত হয়, তখনই একটা অভ্যস্ত কাজ করিবার সময় ঊর্ধ্ব-মস্তিষ্ক অন্য কোনও কাজে মন দিতে পারে।

অভ্যাস ও প্রবৃত্তি

কোন কোন মনোবিদের মতে, অভ্যাস হইতেছে অর্জিত নৈপুণ্য আর প্রবৃত্তি হইতেছে সহজাত নৈপুণ্য। তাঁহারা বলেন, প্রবৃত্তিগুলিই হইতেছে চরিত্র গঠনের কাঁচা মাল, অভ্যাসের দ্বারা এই কাঁচা মাল হইতে চরিত্রকে গঠিত

করিতে হইবে। প্রবৃত্তিগুলি শৈশবেই শক্তিশালী থাকে এবং শৈশবেরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠে। অভ্যাসে এইগুলি দূরীভূত হয় এবং অনভ্যাসে এগুলি নষ্ট হইয়া যায়। এগুলি নষ্ট হইয়া যাইবার পর অভ্যাসের দ্বারাও এগুলিকে সহজে সতেজ করিয়া তোলা যায় না। সুতরাং শিশু বয়সেই সময় থাকিতে-থাকিতে সুঅভ্যাস গঠনের দ্বারা যতগুলি ভাল প্রবৃত্তিকে সুসংস্কৃত করিয়া লওয়া যায়, ততই ভাল। অর্থাৎ "Strike while the iron is hot."

এই সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। আমরা জানি সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকেই সমানভাবে উৎসাহিত করা উচিত নহে। একটি গাড়ীতে যদি দুইটি ঘোড়া থাকে এবং সেই দুইটি ঘোড়ার মধ্যে যদি একটি দুর্বল এবং আর একটি সবল হয়, তাহা হইলে দুইটি ঘোড়াকেই সমানভাবে চাবুক মারিয়া ছুটাইতে চেষ্টা করিলে ফল ভাল হয় না। সবল ঘোড়াটির রাশ টানিয়া রাখিতে হইবে, আর দুর্বলটিকে ছুটিবার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে, তবেই গাড়ী ঠিকমত চলিবে। প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সব প্রবৃত্তিগুলি সমান শক্তিশালী নয়। কাজেই অভ্যাসের দ্বারা কোনও প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে, কোনও প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করিতে হইতে, কোনও প্রবৃত্তির অভিব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে, কোনওটিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

এইখানে একটি কথা আছে। অভ্যাস দিয়া যদি প্রবৃত্তিকে শাসিত ও সংযত করা যায়, তাহা হইলে অভ্যাস কি প্রবৃত্তির চেয়ে শক্তিশালী? অভ্যাসের সহিত প্রবৃত্তির সম্পর্ক কিরূপ? সাধারণ লোকে মনে করে অভ্যাস হইতেছে দ্বিতীয় প্রবৃত্তি অথবা প্রকৃতি (Habit is the second nature)। অধ্যাপক Gates বলেন, দীর্ঘস্থায়ী অভ্যাস ও প্রবৃত্তি কার্যতঃ একই জিনিস (Phychology for students of education), আবার Duke of Wellington বলিয়াছেন, অভ্যাস প্রবৃত্তির দশগুণ শক্তিশালী।

ম্যাকৃডুগাল কিন্তু এতটা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অভ্যাস প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত করিতে পারে বটে, তবে সেটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করিবার শক্তি অভ্যাসের নাই। বুনো হাঁসকে জন্ম হইতেই

ডানা কাটিয়া মুরগীর সহিত একত্র পালিত করিলে সে উড়িবার অভ্যাস করিতে সুযোগ পায় না বটে, কিন্তু যখনই তাহার ডানা গজাইবে তখনই সে সুযোগ পাইলে উড়িয়া যাইবে। এখানে প্রবৃত্তির (instinct) জয়ই ঘোষিত হয়। ম্যাকডুগ্যাল বলেন, প্রবৃত্তির একান্ত বিরোধী ব্যাপারে জোর করিয়া অভ্যাস করাইতে চেষ্টা করিলে প্রাণীরা মনের দুঃখে শুকাইয়া মরিয়া যায়।

আমাদের মনে হয়, চরিত্র গঠন ব্যাপারে অভ্যাস ও প্রবৃত্তির মধ্যে কার শক্তি বেশী, এই বিচারটা বড় কথা নহে। একথা অনাস্বীকার্য যে, অভ্যাস দুর্বলতর হইলেও তাহা দ্বারা প্রবৃত্তিকে শাসিত বা সংযত করা সম্ভবপর। মাটির কলসীর ঘর্ষণে পুকুর-ঘাটের কঠিন শিলাখণ্ডটিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অথচ মাটির কলসী শিলাখণ্ডের চেয়ে নিশ্চয়ই নরম। এই শক্তির তারতম্য ছাড়া অভ্যাসের সহিত প্রবৃত্তির আর একটু পার্থক্য আছে। ম্যাক্‌ডুগাল-বর্ণিত প্রবৃত্তি হইতেছে গোষ্ঠীর মধ্যে সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে ক্রিয়াশীল, কিন্তু অভ্যাস জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর প্রবৃত্তির সহিত প্রক্ষোভের যে একটা সম্পর্ক আছে, অভ্যাসের সহিত তাহা নাই।

অভ্যাস, স্মৃতি ও অনুষঙ্গ

স্নায়ুতরঙ্গের গতিপথ দিয়াই এই তিনটি জিনিসের ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা যখনই কোনও একটা উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া করি, তখনই স্নায়ুগুলীর মধ্য দিয়া একটা তরঙ্গ-স্রোতজনিত "খাত"-এর সৃষ্টি হয়। একই প্রকার উদ্দীপকে বার বার একই প্রকার প্রতিক্রিয়া করিলে স্নায়ুখাতটি গভীরতর হয় এবং পূর্বকৃত কাজগুলি সহজতর হইয়া উঠে। অতীত প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি যখন আরও আত্মচেতনভাবে করা হয় তখনই আসে স্মৃতির কাজ।

স্নায়ু-নির্দেশের তরঙ্গ-স্রোত যখন ঠিক নেমিখিন্ন পথে চলাচল করে, তখন হয় অভ্যাস বা স্মৃতির কাজ। আর এই স্রোতটি যখন সাইন্যাপ্‌স-এর মোড়ের মাথায় আসিয়া সোজা পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটি গলির পথ বহিয়া দক্ষিণে-বামে ছুটিয়া চলে এবং একটি অভিজ্ঞতার সহিত কাছাকাছি অন্য একটি অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধন করিয়া দেয়, তখন হয় অনুষঙ্গের কাজ। এই

অনুষঙ্গের ফলে একটি কথা হইতে অন্য-একটি কথা মনে পড়িয়া যায়, একটি ঘটনার সহিত কাছাকাছি (বা এক জাতীয়) অন্য একটি ঘটনার গাঁট্ছড়া বাঁধিয়া যায়, ফলে একটি ঘটনা ঘটিলেই অন্য ঘটনাটিও মনে পড়িয়া যায়।

অভ্যাস, শিক্ষা ও চরিত্র

শিক্ষার মূল তত্ত্বটি "চেষ্টা ও ভ্রান্তিই" হউক, অথবা "কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াই" হউক, ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে একটা বন্ধনী সৃষ্টির ব্যাপার আছে। থর্ণডাইকের 'Law of exercise' এবং আচরণবাদীদের 'law of reinforcement' সূত্র দ্বারা এই বন্ধনাকে দৃঢ়ীভূত করিবার নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অভ্যাসেরই জয়গান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শিক্ষার স্থায়িত্ব, সফলতা এবং দক্ষতার দিক দিয়া অভ্যাসের অবদান অসামান্য।

চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারেও অভ্যাসের অবদান সামান্য নহে। অধ্যাপক Gates বলিয়াছেন, একটি সুসমঞ্জস এবং সুগঠিত (integrated) চরিত্র হইতেছে দীর্ঘদিনের নিয়মিত অভ্যাসের ফল মাত্র। W. James'ও চরিত্র গঠন সম্পর্কে অভ্যাসের উপর জোর দিয়া বলিয়াছেন, "পরলোকে যে নরক ভোগ করিতে হইবে বলিয়া ধর্মশাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছে, সেই নরকটি আমাদের ইহ জগতের নিজ-হাতে-গড়া নরকের চেয়ে ভীষণতর নহে। অভ্যাসের বশে ভুলভাবে চরিত্র গঠিত করিয়া এই দুঃখের নরক আমরা সৃষ্টি করি। যুবকেরা যদি উপলব্ধি করিতে পারিত যে শীঘ্রই তাহারা কতকগুলি অভ্যসের চলমান 'বাণ্ডিল' (bundles of habit) মাত্র হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে তাহাদের আচরণগুলি দৃঢ়ীভূত হইবার পূর্বে সেইগুলিকে ভালভাবে গঠিত করিবার জন্য তাহারা একটু বেশী যত্ন লইত। আমরা প্রতিদিনই আমাদের যে ভাগ্যকে তৈয়ারী করিতেছি, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক সহজে পরিবর্তিত হইবার নহে। পুণ্য পাপের সামান্য আঁচড়টুকু স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়। Jeffirson-এর নাটকের মাতাল রিপভ্যান্ উইন্কিল্ প্রত্যকটি ত্রুটির পরই হয়ত বলিবে 'যাক্ এবারটা ছাড়িয়া দাও, এবারটা গুণিব না'; ভাল, সে হয়ত গণনা নাও করিতে পারে, এবং হয়ত দয়ালু বিধাতাও গণনা না করিতে পারেন, কিন্তু তবুও ইহাকে ঠিকই গণনা করা হইবে। স্নায়ুকোষের গভীরতম

তলদেশে শরীরের অণুপরমাণুগুলি ইহার গণনা করিতেছে, হিসাব রাখিতেছে এবং পরবর্তী প্রলোভনের সময় তাহার বিরুদ্ধে সেগুলিকে কাজে লাগাইবার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে। আমরা যাহা কিছুই করি না কেন, কঠোর বৈজ্ঞানিক বিধানে তাহা কিছুতেই মুছিয়া যায় না। অবশ্য ইহার ভালমন্দ দুই দিকই আছে। বার বার মদ্যপানের পর যেমন আমরা ক্রমশঃ পাকা মাতাল হইয়া উঠি, তেমনই বিভিন্ন সময়ে কাজের মাধ্যমে নীতির ক্ষেত্রে আমরা সাধুসন্ত হইয়া উঠি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হইয়া উঠি দক্ষ কাজের লোক, আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হইয়া উঠি বিশেষজ্ঞ 'পণ্ডিত'।

অভ্যাসের ফলেই এই পরিণতিটির সম্ভব হয়।

জেমস্‌এর আবির্ভাবের অনেক পূর্বে, যখন মনস্তত্ত্বে স্নায়ুস্রোতের অবদান আদৌ প্রমাণিত হয় নাই, তখনও চরিত্র-গঠনের জন্য অভ্যাসের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছিল। গ্রীক দার্শনিক Aristotle ধর্ম জীবনের জন্য অভ্যাস গঠনের উপরই বিশেষভাবে জোর দিয়াছিলেন। Aristotleএর পূর্ব-সূরী Socrates কিন্তু জ্ঞানকেই ধর্ম জীবনের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। সক্রেটিসও ভুল করেন নাই; কারণ অভ্যাসের নেমি-খিন্ন পথে চলিতে চলিতে আমরা প্রায়ই নিয়মের দাস হইয়া আচার-অনুষ্ঠানকেই বড় বলিয়া মনে করি, আর বিচারের শক্তি হারাইয়া ফেলি। ইহাতে আমাদের চরিত্রের যথাযথ বিকাশ হয় না। বার্গসঁও (Bergson) বলিয়াছেন, অভ্যাসের অন্ধ আবর্তে পড়িয়া মানুষ তাহার সৃজনী শক্তিকে বিনষ্ট করে।

তাহা হইলে চরিত্র গঠনের দিক দিয়া অভ্যাসের উপযোগিতা কতটুকু? জ্ঞান ও অভ্যাসের মীমাংসাই বা কী? অভ্যাসেরই বা স্বরূপটি কি?

Mather বলিয়াছেন, কোনও একটি কাজকে যান্ত্রিকভাবে করিবার জন্য অর্জিত নৈপুণ্যের নামই অভ্যাস (Habit is an acquired aptitude for some particular mode of automatic action)। এইরূপ automatic action-এর একটা বিপদও আছে। যান্ত্রিকভাবে কাজ করিবার ফলে অভ্যস্ত কাজটি যখন একটা অন্ধ পুনরাবৃত্তির সৃষ্টি করে, এবং নিষ্ঠাহীন গতানুগতিক আচারে পর্যবসিত হয়, তখনই তাহার মূল্য কমিয়া যায়।

এই গতানুগতিকতা অনেক সময় আমাদের চিন্তার মধ্যে একটা ঢিলা ভাব লইয়া আসে এবং গতানুগতিকতার পথে চলিতে চলিতে আমরা আর নূতন পথে চলিবার সুযোগও পাই না, নূতন সত্যকেও বুঝিতে পারি না। তখন নীতির ক্ষেত্রে আমরা গোঁড়ামির আবর্তে পড়িয়া স্বাধীন চিন্তা হারাই, আর শিল্পের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত টেক্‌নিকের দলে পড়িয়া সৃজনী শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করি, ফলে আমাদের চরিত্রের যথাযথ বিকাশ হয় না।

'স্থিতিবাদ' নামক পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি, অভ্যাসের বাঁধা পথে চলিতে চলিতেই নূতন নূতন সৃষ্টির উদ্ভব হয়, আবার এখন বলিতেছি অভ্যাস সৃজনী শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই বিরোধী মতবাদের সমন্বয় কি? অভ্যাসের মধ্যে যদি ক্রমাগত উন্নতির অভিযানের মনোভাবটি বজায় থাকে, তাহা হইলেই অভ্যাস নব নব দক্ষতা দান করিয়া নব নব সৃষ্টি কার্যে সহায়তা করে; আর অভ্যাসের অর্থ যদি হয় গতানুগতিক স্রোতে গা-ভাসান দেওয়া তাহা হইলে অভ্যাস সৃজনীশক্তিকে ব্যহত করে।

কাজেই চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়াই হউক, আর সৃজনী শক্তির দিক দিয়াই হউক, অভ্যাসকে সার্থক করিতে হইলে অভ্যাসের লক্ষ্য-বস্তুকে জ্ঞানের দ্বারা স্থির রাখিতে হইবে এবং অভ্যাসের প্রচেষ্টাকে সদা-জাগ্রত ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা প্রতিনিয়তই পরিচালিত করিয়া সাধনার অভিযানটি চালাইয়া যাইতে হইবে। এইভাবে কাজ করিলেই কর্মহীন (বা অভ্যাসহীন) জ্ঞানের ব্যর্থতা, আর জ্ঞানহীন অভ্যাসের ব্যর্থতার সমন্বয় হয়—এরিষ্টোটল এবং সক্রেটিসের বিরোধী মনোভাবের মীমাংসা হয় এবং অভ্যাসের দ্বারা খাঁটি চরিত্র সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। তবে এই চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে আরও দুই একটি কথা জানা দরকার।

মনের সম্মতি (প্রক্ষোভমূলক) না থাকিলে যান্ত্রিক অভ্যাস আমাদের কোনও স্থায়ী উপকার করিতে পারে না। যে বালক বাপের শাসনের ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে অক্ষম ঘৃণা এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের আড়ালে লেখাপড়া করিতে বাধ্য হয়, পড়াশুনা সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও রস (sentiment) তৈয়ারী হয় না। ফলে এই অনিচ্ছুক পড়াশুনাটা তাহাকে পাণ্ডিত্য দিতে পারে না। এইজন্যই A. A Milne-এর "The boy comes home" নাটকের নায়ক Philip

সৈন্য বিভাগে দীর্ঘ চার বৎসর প্রাতরুত্থানে অভ্যস্ত হইয়াও ভোরে উঠাটা অভ্যাস করিতে পারে নাই। এইজন্যই Puritan যুগে ঘাড়ে-চাপানো সংযম-অভ্যাসটা ইংলণ্ডের লোকের চিত্তে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই দেখা যায়, Restoration যুগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা সুদে আসলে তাহাদের অবদমিত কামনার সাধ মিটাইয়া লইয়াছিল।

জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যটাও স্থির না থাকিলে যান্ত্রিক অভ্যাস আমাদের তেমন কোনও উপকার করিতে পারে না। যে বালক না বুঝিয়া "নরঃ নরৌ নরাঃ" মুখস্ত করে, সে অনুবাদ করিবার সময় তাহার অভ্যস্ত বিদ্যাকে বিশেষ কাজে লাগাইতে পারে না। কাজেই অভ্যাসকে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে অভ্যাসের সহিত চির-জাগ্রত ইচ্ছাশক্তি, আবেগ এবং জ্ঞানের সমন্বয় করিতে হইবে। তখন অভ্যাসের অর্থ হইবে গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসান দেওয়া নহে, অর্জিত নৈপুণ্যের সাহায্যে সাধনার অভিযান চালাইয়া যাওয়া। অতীতের অভিজ্ঞতার মধ্যে ইহার আরম্ভ, বর্তমানের নৈপুণ্যর মধ্যে ইহার বিকাশ এবং ভবিষ্যতের নব নব সৃষ্টির দিকে ইহার গতি। বর্তমানের দক্ষতায় এবং যান্ত্রিক অনুবর্তনেই ইহার পরিসমাপ্তি নহে। জন্ ডিউইও অভ্যাসের এই অবিচ্ছিন্নতা (continuity) এবং ভবিষ্যৎ-মুখিতার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "অভ্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হইতেছে এই যে, আমরা (কর্তা বা কর্ম হিসাবে) যাহা কিছু অনুভব করি, তাহার প্রত্যেকটিই অনুভবকারীকে খানিকটা পরিবর্তিত করে এবং ঐ পরিবর্তনটি অনুভবকারীর ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাহার ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাগুলির বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তিত করিয়া দেয়।" সুতরাং সাধারণ লোকে যে মনে করে অভ্যাস জিনিসটা হইতেছে মোটামুটি বাঁধাধরা উপায়ে কাজ করিয়া যাওয়া মাত্র, তাহা ঠিক নহে। অভাসের ব্যঞ্জনাটা আরও সুদূরপ্রসারী।

সুঅভ্যাস গঠনের কৌশল

আমার দেখিয়াছি, অভ্যাস শিক্ষাকে স্থায়ী ও নিপুণ করিয়া তুলে এবং অভ্যাসের দ্বারাই আমরা অধিকাংশ জিনিস শিখি। "শিক্ষার তত্ত্বকথা"

নামক পরিচ্ছেদে শিক্ষার ব্যবহারিক কৌশল সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি আলোচিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অভ্যাস-গঠনেও প্রযুজ্য।

বন্ধনীবাদ ও অভ্যাস: থর্ণডাইকের 'Law of effect, হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, অভ্যাসকে তৃপ্তিকর করিতে হইবে। অভ্যাসের প্রক্রিয়াকে ক্রম-কঠোর করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহা অতি ধীরে ধীরে করিতে হইবে। অভ্যাস গঠনের সময় হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন প্রক্রিয়া দিয়া "মুখতাড়া" দিতে নাই, তাহাতে বন্ধনী শিথিল হইয়া যাইবে। Law of effect হইতে আরও বুঝা যায় যে, অভ্যাসের সময় পুরস্কারের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। শিশুদিগকে যথাযথভাবে উৎসাহ দিয়া এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হয়। শুধু মিষ্টকথা বা দামী জিনিস উপহার দিয়া পুরস্কার দেওয়াই সবখানি নহে। শিক্ষার সফলতা এবং সেই সফলতার স্বীকৃতিটাও খুব বড় পুরস্কার। এই সফলতা সৃষ্টির জন্য পাঠ্যবস্তুকে ক্রম-কঠোর করা এবং ছাত্রের প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত সাহায্য করার প্রয়োজন আছে। ভ্রান্ত বন্ধনীর সৃষ্টি যাহাতে না হয়, সেইজন্য অভ্যাসের প্রক্রিয়াগুলিকে একই ভাবে করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াবাদ ও অভ্যাস: প্রলোভনে পড়িয়া অভ্যস্ত শিক্ষাটি যাহাতে ব্যাহত (inhibited or uuconditioned) না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বালক-বালিকাদিগকে প্রলোভন হইতে দূরে রক্ষা করিতে হইবে। অভ্যাসটি ঠিক অভ্যস্ত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার বন্ধনটি যাহাতে ক্রমশঃই দৃঢ়ীভূত হয় সেইজন্য অভ্যাসের সাধনার সময় সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনভ্যাসে যাহাতে বন্ধনীটি মুছিয়া না যায় সেজন্য অভ্যাসকে নিত্য-প্রতিপাল্য কর্তব্য বোধে করাইতে হইবে। দেখিতে হইবে একদিনের জন্যও যাহাতে ব্রতভঙ্গ না হয়।

অভ্যাস সাধনায় কোনও দিন যদি ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে পরবর্তী দিনে অতিরিক্ত অনুশীলনী দ্বারা ব্যাঘাতকে ব্যাহত করিতে হইবে (inhibitions may be inhibited)। তবে এই অনুশীলনটি "ব্যাগার"

বলিয়া মনে করিলে ফল ভাল্ হইবে না। ইহাকে পবিত্র কর্তব্য অথবা ভালবাসার জিনিস বলিয়া মনে করিয়া যাইতে হইবে।

"Telescoping out"-এর ব্যাপারে আমরা দেখিয়াছি যে একটা যান্ত্রিক অভ্যাসে অনেক সময় শুধু অহেতুক কালক্ষয় হয়। সুতরাং অভ্যাসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধেও ছাত্রদের সজাগ রাখিতে হইবে।

কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার ফলগুলি বয়স্কদিগের চেয়ে শিশুদিগের উপর অধিক কার্যকরী হয়। সুতরাং অল্প বয়সেই যত বেশী সংখ্যক ভাল অভ্যাস করানো যায়, সেই দিকে শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গেস্‌টাল্ট্ মতবাদ ও অভ্যাস: গেস্‌টাল্ট্ মতবাদের একটা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব হইতেছে "অন্তর্দৃষ্টিমূলক উপলব্ধি"। এই মতবাদ অনুসারে নিছক যান্ত্রিক অভ্যাসের চেয়ে অন্তর্দৃষ্টিমূলক উপলব্ধিই শিক্ষার পক্ষে বেশী সহায়ক। সুতরাং অভ্যাসকে কার্যকরী করিতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে—অর্থাৎ অভ্যাসের প্রতিক্রিয়াটা কেন যে করা হইতেছে তাহা বুঝাইয়া দিয়া ছাত্রকে অভ্যাসের ব্যবহারিক নির্দেশটি দিতে হইবে। অন্ধ অনুশীলনে তাহাকে নিয়মের দাস করিবার কোনও সার্থকতা নাই। নিয়মটা কেন হইল, তাহার উপলব্ধিটা জাগাইতে হইবে এবং দেখাইয়া দিতে হইবে, তত্ত্ব দিয়া যাহা বুঝান হইয়াছে, ব্যবহারিক দিক দিয়াও তাহা সত্য।

অভ্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক জেমস্-এর সূত্র

"Talks to teachers" গ্রন্থে অধ্যাপক জেমস্ (Bain-এর 'moral habit' নামক পরিচ্ছেদের প্রদর্শিত পথে) ভালো অভ্যাস গঠন এবং মন্দ অভ্যাস বর্জন সম্বন্ধে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন:

প্রথম সূত্র: "নূতন অভ্যাস গঠনের সময় আমাদের উচিত যতটা সম্ভব মনের জোর (initiative) লইয়া কাজ আরম্ভ করা। যে-সমস্ত ঘটনা এই জোরটিকে আরও দৃঢ়তর করে, সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। কাজের রুটিন এমনভাবে বদলাইয়া দিতে হইবে যাহাতে নূতন অভ্যাস সম্বন্ধে

শিথিলতার অবকাশই না থাকে। প্রয়োজন হইলে জনসাধারণের কাছে শপথ গ্রহণ করা প্রভৃতিও চলিতে পারে।"

দ্বিতীয় সূত্র : "নূতন অভ্যাসটি যতক্ষণ না দৃঢ়ীভূত হয় ততক্ষণ কিছুতেই ব্যতিক্রম হইতে না দেওয়া।" একটি সূতার তাল গুটাইতে-গুটাইতে একবার মাত্রও যদি তাহা হাত-ফস্কাইয়া পড়িয়া যায়, তাহা হইলে অনেক পাক গুটাইবার ফল ব্যর্থ হয়। অভ্যাসের ক্ষেত্রেও তাই। একটি বারের পরাজয় বহুবারের জয়ের সঞ্চিত ফলকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। কাজেই অভ্যাস সৃষ্টির মূল তত্ত্বটি হইতেছে যতক্ষণ না পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলন দ্বারা দক্ষতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত একটানা বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়া অভ্যাসকে চালাইয়া যাইতে হইবে।

তৃতীয় সূত্র : "যে অভ্যাস গঠনের জন্য মনস্থ করিয়াছ তাহা প্রথম সুযোগের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লাগাও।" ব্যবহারিক জীবনে যদি অভ্যাসকে আচরণের মধ্য দিয়া কাজে লাগানো না হয়, তাহা হইলে শুধু নীতিবাক্যে বিশেষ কিছু মঙ্গল হয় না।

চতুর্থ সূত্র : "ছাত্রদের কাছে নিছক উপদেশ বেশী দিও না।" ভাল উপদেশের চেয়ে ভাল অভ্যাসের আচরণটাই মূল্যবান। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের যাহা কিছু কাম্য তাহা প্রতিদিনের অভ্যস্ত আচরণের মূল্য দিয়াই কিনিতে হয়।

পঞ্চম সূত্র : "কাজ করিবার শক্তিটিকে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য প্রতিদিন একটু করিয়া স্বেচ্ছাকৃত অভ্যাস করিয়া যাইও।" ইহার ফল হয়ত সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিতে পারা যায় না। তথাপি এই সন্ন্যাসী-কৃত্যের একটা বিরাট্ মূল্য আছে। ইন্‌সিওরেন্স্-এর প্রিমিয়াম্ যেমন বিপদের সময়েই তাহার উপযোগিতা বুঝাইয়া দেয়, ইহাও অনেকটা সেইরূপভাবে কাজ করে।

মন্দ অভ্যাস বর্জন করিবার কৌশল

চরিত্র গঠনের জন্য সময় মতো অভ্যাস গঠনের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই মন্দ অভ্যাস বর্জনেরও প্রয়োজন আছে। ভ্রান্ত শিক্ষার দোষে আমাদের অনেকের মধ্যেই বহু মন্দ অভ্যাস তৈয়ারী হইয়া যায়। চা, দোক্তা

নস্য, আফিং, মদ প্রভৃতির নেশা, দেরী করিয়া শয্যা ত্যাগ, বাজে আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করা, হাল্কাভাবে ইয়ার্কি করা, হঠাৎ রূঢ় মন্তব্য করা প্রভৃতি অভ্যাস বহু লোকের মধ্যেই আছে। এগুলি বর্জন করিবার নিয়ম কি?

দুইটি উপায় আছে। একটি হইতেছে মন্দ অভ্যাসটিকে ধীরে ধীরে ছাঁটিয়া ফেলা (Tapering off), আর একটি হইতেছে একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া দেওয়া। ধরা যাইল—আমি দিনে দশ কাপ করিয়া চা পান করি এবং এই অভ্যাসটি আমি ছাড়িতে চাই। কি ভাবে তাহা করিব? দশ কাপ হইতে আট কাপ, তাহার পর ছ' কাপ, পরে চার কাপ, শেষে দুই কাপ—এই ভাবে তাহা ছাড়িব? অথবা একেবারেই চা পানটা বন্ধ করিয়া দিব? ধীরে ধীরে ছাঁটিয়া ফেলার মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসার ভাব থাকে, তাহাতে ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হইয়া যায়। এই দুর্বল ইচ্ছা শক্তি দিয়া তেমন লড়াই করা চলে না। ফলে প্রলোভন নূতন করিয়া জয়ী হইতে পারে। তখন শিথিল ইচ্ছাশক্তি শিথিলতর হইয়া যায়, মন্দ অভ্যাসটি আরও চাপিয়া বসে এবং ভবিষ্যতেও তাহাকে জয় করিবার সম্ভবনা থাকে না।

ইহার চেয়ে তীব্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মন্দ অভ্যাসকে একেবারেই হত্যা করা ভালো। আফিং প্রভৃতি নেশার ক্ষেত্রে বহুদিনের অভ্যাসটা হঠাৎ ছাড়িলে তাহার প্রতিক্রিয়াটা খুবই কষ্টকর হয় সত্য। তবু তাহা একেবারেই ছাড়া উচিত, তাহাতে কষ্ট হয় হউক, প্রয়োজন হইলে চিকিৎকের সাহায্য লইতে হয় সেও ভাল, কিন্তু দুর্বল ইচ্ছাশক্তি দিয়া চির-লালিত অভ্যাসের সহিত সংগ্রাম করিতে নাই। এইভাবে মন্দ অভ্যাসকে একেবারেই বর্জন করিলে দুই দিন খুব কষ্ট ভোগের পর অভ্যাসের নাগপাস কাটাইয়া উঠা হয়ত সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু ধীরে ধীরে এই কাজ করিতে হইলে ক্রমশঃ ইচ্ছা-শক্তির উত্তাপ কমিয়া যায় এবং আদিম জড়তার (inertia) প্রভাবে প্রাচীন অভ্যাস মাথা চাড়া দিয়া উঠে। এই জন্যই তীব্র ইচ্ছাশক্তি ব্যতিরেকে মন্দ অভ্যাস কাটানো প্রায় অসম্ভব।

●

শিক্ষা ও প্রেষণা

শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে প্রেষণার (motivation) সঞ্চার অবশ্যই করণীয়। ইঁদুর, গিনিপিগ্, খরগোস, কুকুর প্রভৃতিকে লইয়া গোলক ধাঁধায় দৌড় করানো, খাঁচার গোপন অর্গল খুলিয়া জল বা খাদ্যের সন্ধানে যাওয়া, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতির ক্ষেত্রে লাঠি আঁকুশী প্রভৃতির সাহায্যে নাগালের বাহিরে অবস্থিত খাদ্যবস্তুর সংগ্রহ, এই জাতীয় সমস্ত পরীক্ষাগুলির মধ্যেই একটা প্রেষণার ব্যাপার আছে। এই প্রেষণা হইতেছে ক্ষুধা বা তৃষ্ণার তৃপ্তি। যেখানেই ইহার অভাব সেখানেই বিরাজ করে আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা। সে ক্ষেত্রে জোর করিয়া কাজ করাইলেও তাহা দ্বারা "শিক্ষা"টা সহজে হয় না।

প্রাণীদের ক্ষেত্রে পুরস্কারের অবদান

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, প্রাণীদের শিক্ষার ব্যাপারে পুরস্কারের অবদান খুব বেশী। গোলক ধাঁধার মধ্য হইতে পলায়নের-কৌশল শিক্ষার ব্যাপারে পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, যে সব ইঁদুরগুলি গোলক ধাঁধা হইতে বাহির হইবার পর খাদ্যের সন্ধান পাইয়াছে, অর্থাৎ পরিশ্রমের শেষে পুরস্কৃত হইয়াছে, তাহারা পলায়ানের কৌশলটি খুব তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে। কিন্তু যেসব ইঁদুরকে ঐভাবে খাদ্য দিয়া পুরস্কৃত করা হয় নাই, তাহারা ঐ পলায়নের কৌশলটি তেমন তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করিতে পারে না।

অবশ্য গোলক ধাঁধার মধ্যে বন্দী দশা হইতে মুক্তি পাইবার স্বাভাবিক প্রেরণায় সমস্ত ইঁদুরই পলায়নের চেষ্টা করে, এমনকি খাদ্য দ্বারা পুরস্কৃত না হইলেও চেষ্টা করে। কিন্তু এই জাতীয় অপুরস্কৃত চেষ্টাগুলি বার বার পুনরাবৃত্ত হইলেও, পলায়নের কৌশলটি ঠিক আয়ত্ত হয় না ফলে তাহাদের পলায়নটি হয় "চেষ্টা ও ভ্রান্তির" (trial and error) আকস্মিক সফলতা মাত্র। নিছক অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির মাঝে শিক্ষার বিশেষ কিছু ইতর বিশেষ হয় না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাহারা পুরস্কৃত হয়, অর্থাৎ পলায়নের পর খাদ্যের সন্ধান পায়, তখনই তাহাদের "শিক্ষা" (learning) আরম্ভ হয়, এবং ভুল-ভ্রান্তি দ্রুতভাবে কমিয়া যাইতে থাকে। ইহার অর্থই হইতেছে, গোলক ধাঁধা

সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানের আরম্ভ হইতেছে। অন্ধ পুনরাবৃত্তির পথে এই জ্ঞানের সম্ভব হয় নাই। এইভাবে খাদ্যের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া ইঁদুরগুলি যখন দিনের পর দিন উন্নতি করিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ আবার তাহাদের পুরস্কার বন্ধ করিয়া দেখা গেল, তাহাদের শিক্ষার অবনতি হইতেছে।

নিছক অভিজ্ঞতা বা পুনরাবৃত্তির ফলে অবশ্য এক জাতীয় শিক্ষার সঞ্চয় হইয়া থাকে। ইহাকে "সুপ্তশিক্ষা" (latent learning) বলা যাইতে পারে। দুই দল ইঁদুরকে লইয়া পরীক্ষা হইল। এক দল ইঁদুর গোলক ধাঁধার মধ্য হইতে বাহির হইয়া খাদ্য পাইত, অন্য দলটি কিছুই পাইত না। এইভাবে নয় দিন পরীক্ষা চলিল। বলা বাহুল্য, পুরস্কৃত দলটি শিক্ষার ব্যাপারে সমধিক উন্নতি করিল। দশম দিন হইতে দ্বিতীয় দলটিকেও খাদ্য দিয়া পুরস্কৃত করা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিক্ষাটা এতটা ত্বরান্বিত হইল যে, তাহারা শীঘ্রই প্রথম দলটির প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিল। ইহা কিভাবে সম্ভবপর হইল ? ইহার একমাত্র ব্যাখ্যা হইতেছে এই যে, প্রথম বার পরীক্ষার সময় দ্বিতীয় দলটি এক জাতীয় শিক্ষা আহরণ করিয়াছিল বটে, তবে তাহা "সুপ্ত শিক্ষা" বলিয়া কার্যকরী হয় নাই। যে শিক্ষা কার্যকরী নয়, তাহা এক হিসাবে শিক্ষাই নহে।

মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরস্কারের অবদান

মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রেও পুরস্কারের অবদান সমান্য নহে। তবে মানুষের ক্ষেত্রে এই পুরস্কারটি বিভিন্ন জাতীয় হইতে পারে। আমরা শুনিয়াছি, স্যর আশুতোষের পিতা আশুতোষকে পড়াশুনার ব্যাপারে পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতেন। শুনা যায়, আশুতোষ যে দিন ক্লাশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পড়া দিতে পারিতেন, সেই দিন তাঁহাকে এক টাকা করিয়া এবং যে দিন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন সে দিন আট আনা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতা রচনার জন্য তাঁহার পিতা কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। অবশ্য আশুতোষের শিক্ষার সাফল্য অথবা রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনায় সাফল্য পুরস্কারের দ্বারা কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। পুরস্কার না পাইলেও হয়ত তাঁহারা অত বড়ই হইতে

পারিতেন। তবে বাস্তব পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, পুরস্কার জিনিসটা প্রায়ই শিক্ষাকে ত্বরান্বিত বা সফলতর করিয়া তুলে। Matur তাঁহার 'Child Behaviour' নামক নিবন্ধে এই তথ্যটি পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন। ৬৭টি ছাত্রকে লইয়া পরীক্ষা হয়। তাহাদের "জন্ম বয়স" (chronological age) ও "মনোবয়স" (mental age) একই ছিল। এই ছাত্রগুলিকে তিনটি দলে ভাগ করা হইল এবং প্রত্যেক দলকেই গোলক ধাঁধার কৃতিত্ব লইয়া পরীক্ষা করা হইল। প্রথম দলটিকে কৃতিত্বের জন্য আদৌ পুরস্কার দেওয়া হইল না, দ্বিতীয় দলটিকে প্রত্যেক কৃতিত্বের জন্য এক পেনি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইল এবং তৃতীয় দলটিকে মৌখিক পুরস্কার (যথা "বেশ ভাল" "দেখা যাক কেমন হয়" ইত্যাদি উৎসাহ বাক্য) দিয়া পুরস্কৃত করা হইল। দেখা যাইল যে, অপুরস্কৃত দলটির শিক্ষা খুব ধীরভাবে হইতে লাগিল, মৌখিক পুরস্কার প্রাপ্ত দলটি তাড়াতাড়ি শিখিতে লাগিল এবং আর্থিক পুরস্কার প্রাপ্ত দলটি ক্ষিপ্রতমভাবে শিক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম পাঁচ বারের চেষ্টায় তাহাদের ভুলের গড় ছিল: অপুরস্কৃত দলের=২˙৬; মৌখিক পুরস্কারপ্রাপ্ত দলের=২˙৩; আর্থিক পুরস্কার প্রাপ্ত দলের=১˙৭।

শাস্তির অবদান

শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরস্কারের অবদান খুব বেশী হইলেও, শাস্তির প্রয়োজনও অল্প নহে। ডডেন (Dodden), ঈয়ার্কিস্ (Yearkish) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন যে, পুরস্কারের মত শাস্তির ভয় অথবা সত্যিকারের শাস্তি দিয়াও শিক্ষাকে সফল করা যায়। গোলক ধাঁধায় দৌড়-করানো জাতীয় পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, সহজ-সাধ্য কাজের ব্যাপারে খানিকটা মাত্রা পর্যন্ত শাস্তির তীব্রতা অনুসারে কাজের নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কঠিন ও জটিল কাজগুলির ক্ষেত্রে ঐ নৈপুণ্য শুধু মৃদু শাসনেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কঠোর শাসনে মনের মধ্যে একটা বিফলতা ও বিদ্রোহের ভাব আসে এবং তাহায় ফলে কর্ম-নৈপুণ্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

শাস্তি বনাম পুরস্কার

শিক্ষা ও নৈপুণ্যের ব্যাপারে শাস্তি ও পুরস্কার, নিন্দা ও স্তুতির

পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া Elizabeth Hurbeck গবেষণা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গবেষণা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দুচার দিন কাজ করিলেই যে-সমস্ত কার্যের সিদ্ধি আয়ত্ত হয়, তাহাতে শাস্তি ও পুরস্কারের অথবা স্তুতি বা তিরস্কারের ফল একই প্রকার হয়। কিন্তু যে সব কাজের সিদ্ধির জন্য দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন হয়, তাহাতে শাস্তি বা তিরস্কারের চেয়ে প্রশংসা এবং পুরস্কারের ফল ভাল হয়। তবে কখন কখন এই পুরস্কার বা প্রশংসার আতিশয্যে বালকেরা দাম্ভিক ও লোভী হইয়া উঠে। ফলে তাহারা সাধনার কঠিন মার্গে বিচরণ করিতে চাহে না। ইহা ছাড়া নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করার ফলে তাহাদের কাজের মধ্যে শিথিলতাও আসিতে পারে। ফলে তাহাদের কৃতিত্বের মান অবনত হয়। বিপরীত পক্ষে শাস্তির আতিশয্যেও মনের মধ্যে আসে একটা বিদ্রোহের ভাব এবং কর্মশক্তিতে আসে অবসাদ।

শাস্তি ও পুরস্কারের সংযুক্ত ফল

নিছক শাস্তি অথবা নিছক পুরস্কারে যতটা ফল হয়, শাস্তি ও পুরস্কারের সংযুক্ত প্রভাবে ফলটা তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভাল হয়। ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীদের এই ব্যাপারে বহু পরীক্ষা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, প্রত্যেক ভুল প্রতিক্রিয়ার পর তাহাদিকে হাল্কা বৈদ্যুতিক শক্ লাগাইলে তাহাদের ভুলগুলি খুব তাড়াতাড়ি কমিয়া যায়। ইহার সঙ্গে যদি প্রত্যেক সফল প্রতিক্রিয়ার পর পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহা হইলে শিক্ষাটা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত হয়।

স্তুতি, নন্দ , অবহেলা

শিক্ষার ব্যাপারে স্তুতি, নিন্দা ও অবহেলার ফল কিরূপ হয়, তাহা লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছে। এক জাতীয় "মনোবয়স" (mental age) ও "জন্ম বয়স" (chronological age) যুক্ত ১০৬টি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বালক বালিকা লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল। তাহাদিগকে চারিটি দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলকে ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০টি পাটীগণিতের অঙ্ক কষিতে দেওয়া হইয়াছিল। পাঁচটি করিয়া প্রশ্নস্তবক তৈয়ারী করা হইয়াছিল এবং

একদিন অন্তর এক একটি প্রশ্ন-স্তবক কষিতে দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম দলটির প্রত্যেককে প্রত্যেক সাফল্যের জন্য সুখ্যাতি করা হইত এবং ভুল ভ্রান্তির জন্য কোন প্রকার মন্তব্য করা হইত না। দ্বিতীয় দলটির বেলায় ভুল ভ্রান্তির জন্য নিন্দা করা হইত এবং সাফল্যের জন্য কোনও প্রকার মন্তব্য করা হইত না। তৃতীয় দলটিকে স্তুতি-নিন্দা কিছুই করা হইত না, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় দলের সাফল্যের সংবাদ তাহাদিগকে জানানো হইত। চতুর্থ দলটিকে অন্য একটি ঘরে রাখা হইয়াছিল। তাহাদের কাজের জন্য স্তুতি নিন্দা কিছুই করা হইত না এবং অন্যান্য দলগুলির সফলতা সম্বন্ধেও কোনও সংবাদই দেওয়া হইত না। ইহাদের নিজেদের কাজের মান সম্বন্ধেও ইহাদের কিছুই জানানো হইত না। এই পরীক্ষায় দেখা গেল যে, প্রথম দিনে চারটি দলের সাফল্য প্রায় একই প্রকার হইল ; সকলেই প্রায় ১২টি করিয়া অঙ্ক নির্ভুল করিল। দ্বিতীয় দিনে প্রথম ও দ্বিতীয় দলটি প্রায় ১৬টি করিয়া অঙ্ক নির্ভুল করিল। তৃতীয় দিন হইতে প্রথম দলটি অর্থাৎ স্তুতিপ্রাপ্ত দলটি উন্নতি করিতে লাগিল এবং ভর্ৎসনা প্রাপ্ত দলটির মান অবনত হইতে লাগিল। তৃতীয় ও চতুর্থ দলটির মান আরও নিম্ন স্তরের হইল ; তবে তৃতীয় দলের মান চতুর্থ দলের চেয়ে একটু ভাল হইল। চতুর্থ দলটির মান সর্বাপেক্ষা কম হইল।

ব্যক্তিগত সফলতা সম্বন্ধে জ্ঞান

কাজের সাফল্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে কাজের ভুলত্রুটিগুলি ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকে। মুখ বধির ছাত্রদের যখন কথা কহিতে শিখান হয়, তখন তাহারা অপরের ঠোঁটের গতি দেখিয়া কথা কওয়া শেখে বটে, কিন্তু মুখ-নির্গত কথা শুনিতে পায় না বলিয়া বুঝিতেও পারে না। ফলে তাহাদের কথাবার্তা প্রায়ই অস্বাভাবিক উচু পর্দায় হয়। এই জন্য মূক বধির ছাত্রদের আবৃত্তি বা অভিনয় কখনই স্বাভাবিক হয় না। তারে চাপা হইতে মুগুর ঘুরানো, হারমোনিয়াম হইতে সেতার এসরাজ প্রভৃতি বাজানো, সব জিনিসই চোখবন্ধ করিয়া অথবা অন্ধকারে অভ্যাস করিলে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা বেশী হয়। সফলতা সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে মনকে সজাগ করিয়া

রাখে, ফলে আমাদের কাজ ক্রমশঃই নিখুঁত হইবার সুযোগ পায়। সফলতার সম্বন্ধে জ্ঞানের জন্যই আমরা বুঝিতে পারি অন্যান্য প্রতিযোগীর তুলনায় আমরা কতটা পিছাইয়া আছি, ফলে কাজে আমরা প্রেরণা পাই। সেখানে প্রতিযোগীর সহিত প্রতিস্পর্ধা নাই, সেখানেও সফলতা সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। এই জ্ঞানই আমাদের বুঝাইয়া দেয়, কতটা কাজের যশঃ আহৃত হইয়াছে। ইহার জন্য মনের মধ্যে একটা হিসাব নিকাশের অনুভূতি আসে। ফলে অল্পে আত্মতুষ্টির ভাবটি কাটিয়া যাইয়া অধিকতর সাফল্যের জন্য মন প্রেরণা লাভ করে।

প্রতিযোগিতা ও স্বীকৃতি

প্রতিযোগিতা ও সামাজিক স্বীকৃতি কাজের মধ্যে বিপুল প্রেরণার সৃষ্টি করে। এই ব্যাপারটা লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছে। একই প্রকারের বুদ্ধি-মত্তাযুক্ত দুই দল বালককে লইয়া অঙ্কের যোগ দিবার সফলতা সম্বন্ধে পাঁচ দিন ধরিয়া পরীক্ষা করা হয়। প্রথম দলটির কাজে প্রতিযোগিতা অথবা স্বীকৃতির ব্যবস্থা ছিল না। দ্বিতীয় দলটিতে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল এবং যতগুলি ছাত্র সফল হইয়াছে তাহারা সকলেই হাত তুলিয়া সঙ্গীদের সফলতার কথা জানাইয়া দিত। শুধু তাই নয়, তাহাদের নামগুলি ব্ল্যাক্ বোর্ডে লিখিয়া দেখান হইত। পাঁচ দিন পরে দেখা গেল যে, দুইটি দলের প্রাথমিক প্রচেষ্টার সফলতা একজাতীয় হইলেও, দ্বিতীয় দলটির কষা অঙ্কগুলি শুধু সংখ্যার দিক দিয়াই নহে, নির্ভুলতার দিক দিয়াও কৃতিত্ব বেশী হইয়াছে।

তবে এ ক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, প্রতিযোগিতার আতিশয্য ভাল জিনিস নহে। প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় ছলে বলে কৌশলে সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য একটা নীচতা আসে। ইহা ছাড়া ইহার আরও একটা দিক আছে। প্রতিযোগিতার এক দিকে বিজয়ের অসংযত আনন্দ, অন্যদিকে আছে পরাজয়ের গ্লানিতে মনোভঙ্গ, মনোবৈকল্য প্রভৃতির ভয়।

নিষ্ক্রিয় শিক্ষা বনাম সক্রিয় শিক্ষা

সক্রিয় ইচ্ছার অভাব থাকিলে শিক্ষা অত্যন্ত বিলম্বিত হয়। কোনও জিনিস ঘাড়ে আসিয়া পড়িলেই তাহা পাওয়া হয় না, তাহাকে অর্জন করিয়া

লইতে হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথাটা বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য। কোনও কিছু শিখিতে হইলে ইচ্ছুক এবং সজাগ মন লইয়া তাহাকে আহরণ করিতে হয়। নতুবা মন তাহাকে সহজে গ্রহণ করিতে পারে না। L. Munn তাঁহার 'Fundamentals of Human Adjustment' নামক মনোবিদ্যার পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার ছাত্রের গাড়ী করিয়া বহুবার একই রাস্তা দিয়া একটি প্রতিষ্ঠানে গমন করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি ঐ পথটি চিনিতে পারেন নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তিনি যত বার ভ্রমণ করিয়াছেন তত বারই পথের দিশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাস্তা চিনিতে ইচ্ছা করেন নাই; তাই তাহার পক্ষে শিক্ষাটা সম্ভব হয় নাই। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, কয়েক বছর ধরিয়া তিনি তাঁহার ক্লাশে কতকগুলি শব্দ ৫ বার করিয়া ছাত্রদের কাছে উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং ছাত্রদের ঐ শব্দ তালিকাটি মুখস্থ করিতে আদেশ দিয়া ছিলেন। ঐ তালিকায় ১২টি শব্দ ছিল এবং এই পাঠটি তাঁহাকে প্রতি বছরই তিন হইতে পাঁচ বার দিতে হইত। তিনি দেখিলেন যে, ছাত্রদের কাছে তিন বা চার বার আবৃত্তি করিবার পরই তাহারা নির্ভুল ভাবে এবং পারম্পর্য বজায় রাখিয়া শব্দগুলি মুখস্ত বলিতে পারে, কিন্তু তিনি নিজে এখন পর্যন্ত তাহা পারেন না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ হইতেছে, ঐ শব্দ তালিকাটি মুখস্ত করিবার মত মন বা ইচ্ছা তাঁহার ছিল না, সেই জন্য নিছক পুনরাবৃত্তিতে তাঁহার কিছুই শেখা হয় নাই।

প্রশ্ন আসিতে পারে নিষ্ক্রিয় শিক্ষা কি আদৌ সম্ভবপর নহে? মনের শ্লেটে যদি কিছু লেখা হয়, তাহা কি উদাসীন মনে সঞ্চিত হয় না? হয় বটে; তবে পূর্ব-পুরুষগণের সঞ্চিত অনাবিষ্কৃত গুপ্তধনের মতই তাহা ব্যর্থ হয়। সুপ্ত শিক্ষা (latent learning) সুপ্ত অথবা গুপ্তই থাকিয়া যায়, যদি তাহা মনের সক্রিয় প্রেষণায় প্রেষিত না হয়। শিক্ষার মূল তত্ত্বই হইতেছে প্রেষণা, উদাসীনতা তার চরম শত্রু। শিক্ষাকে আহরণ করিতে হয়, অর্জন করিয়া অধিকার করিতে হয়, তাহা স্বয়মাগতা হইয়া কাহাকেও বরণ করে না, মনের নিষ্ক্রিয় পত্রে সঞ্চিত হয় না।

বুদ্ধির মাপকাঠি

বুদ্ধি মাপকের প্রয়োজন ঃ

সারারাত্রি অন্ধকারে দাঁড় টানা হইল, ভোর বেলা দেখা গেল যে, নৌকাটি ঘাটেই বাঁধা রহিয়াছে। তাড়াতাড়িতে নোঙর তুলিতে ভুল হইয়াছিল! এইরূপ ত্রুটির জন্য এই জাতীয় ব্যর্থতা শিক্ষকের জীবনেও আসিতে পারে, যদি তিনি ছাত্রের বুদ্ধি বা মানসিক শক্তির প্রাথমিক পরীক্ষাটি না করিয়া তাহাকে তাহার অনধিগম্য বিষয়বস্তু পড়াইবার জন্য চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই, কারণ "ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পঠ্যতে বকঃ।"

বিভিন্ন কাজের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের সময়ও তাহার বুদ্ধি বা মানসিক শক্তি সম্বন্ধে একটা পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। ক্লাশের ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতির জন্যও তাহার বুদ্ধির মাপ করিয়া লওয়া দরকার। কারণ অত্যন্ত নির্বোধ ছাত্রের সহিত অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছাত্রকে একত্র শ্রেণীবদ্ধ করিলে বুদ্ধিমান ও নির্বোধ উভয়েরই ক্ষতি হয়। সে ব্যবস্থাটা হয় একই জোয়ালে দুর্বল ও সবল বলদ জুড়িয়া দিবার মতো।

কিন্তু বুদ্ধিকে মাপা যাইবে কি করিয়া? পথের দৈর্ঘ্য, কূপের গভীরতা, বৃক্ষের উচ্চতা, জড় পদার্থের আয়তন বা ভার—এ সমস্তই মাপা যায়; কিন্তু মন বা বুদ্ধির মাপ কি করিয়া সম্ভব হইবে?

দৈহিক গঠন দেখিয়া বুদ্ধি মাপের চেষ্টা ঃ

অনেক সময় আমরা মানুষের আকৃতি দেখিয়াই তাহার বুদ্ধি বা মানস-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করি। একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে এতবড় সাহিত্যিক হইয়াছেন, তাহা নাকি তাঁহার নাকের জোরে। কথাটা শুনিতে অদ্ভুত লাগিলেও এই জাতীয় কথায় বিশ্বাসটা আমাদের কাছে নূতন নহে। বত্রিশটি রাজ-লক্ষণের কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি। সামুদ্রিক শাস্ত্রে আছে ঃ পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।

ত্রিহ্রস্বঃ পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥ বস্তুতঃ "আকার সদৃশপ্রজ্ঞঃ" কথাটি নিছক কবির উচ্ছ্বাসই নহে। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিবাহযোগ্যা পাত্রীর লক্ষণ সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচনা আছে। যে নব কন্যা অতিশয় রোমশ অথবা রুক্ষ, পুরুষোচিত দেহবিশিষ্ট তাহারা নাকি বিবাহের পক্ষে সুলক্ষণা নহে।

পাশ্চাত্য দেশে বুদ্ধি-মাপকের ইতিহাস ঃ

শরীরগত আকৃতি দেখিয়া বুদ্ধি. চরিত্র প্রভৃতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা শুধু এ দেশেই নহে, পাশ্চাত্য দেশেও এই জাতীয় চেষ্টার ইতিহাস আছে।

মুখ সামুদ্রিক ঃ অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে (১৭৭৫) ল্যাভেডর সিদ্ধান্ত করিলেন, এই জাতীয় নাকের গঠন শিল্পকলার সম্ভাবনা জ্ঞাপন করে, এই রকম ঠোঁটের গঠন বুদ্ধির প্রখরতা ইঙ্গিত করে, ইত্যাদি।

শির সামুদ্রিক ঃ অতঃপর গল্ (Gall), স্পার্জিম্ (Spurzhim) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মুখ-সামুদ্রিক ছাড়িয়া শির-সামুদ্রিকের (Phrenology) দিকে বেশী ঝোঁক দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, মানুষের বুদ্ধি প্রভৃতির মাপ করিতে হইলে তাহার মাথার গঠনটি (আয়তন নহে) লক্ষ্য করিতে হইবে। মাথার সুমুখের দিকটি পরিপুষ্ট হইলে হয়ত লোকে বেশী জেদী হয়, পশ্চাৎ দিকটি পরিপুষ্ট হইলে প্রতিভাশালী হয়, ইত্যাদি। পরে এ মতও খণ্ডিত হইল। গ্যাল্‌টন (১৮৮৩) প্রমাণ করিলেন, মুখ বা মাথার গঠনের সঙ্গে বুদ্ধির কোনও সম্পর্ক নাই।

অন্য ভাবে বুদ্ধিমাপের চেষ্টা ঃ তখন ধারণা ছিল যে, মানুষের চক্ষু, কর্ণ, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলির শক্তি প্রায় সকল ব্যক্তিরই এক প্রকার এবং মনই তাহাদের খাটাইয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সমস্ত দেহ-যন্ত্রের ব্যবহার যত সমর্থভাবে করিতে পারিবে, সেই তত বেশী বুদ্ধিমান বলিয়া গণ্য হইবে। ফলে ত্বকের স্পর্শানুভূতি তথা বুদ্ধির তীব্রতা মাপিবার জন্য কম্পাসের কাঁটার মত যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু পরে দেখা যাইল, এই স্পর্শানুভূতি প্রভৃতির দিক দিয়া বুদ্ধিমান ইউরোপীয়গণের সহিত নরখাদক জড়বুদ্ধি বন্যদের বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই, এবং (ব্যালার্ডএর ভাষায়) মোটা চামড়ার

লোকরাই যে মাথা মোটা হইবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। এমন কি দৃশ্যবস্তুর বা উজ্জ্বলতার পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা, গানের সুর বা পর্দার কড়ি কোমল বোধশক্তি প্রভৃতির সহিতও বুদ্ধির সম্পর্ক নাই।

তখন মনস্তাত্ত্বিকগণ বলিলেন, মনের পৃথক অস্তিত্ব কিছু নাই; ইহা ইন্দ্রিয়াদি দেহ-যন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করে। সুতরাং মনের বা বুদ্ধির নিরিখ নির্ণয়ে দেখিতে হইবে, কোন্ লোকটি তাহার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের সাহায্যে কত ক্ষিপ্রভাবে কাজ করিতে পারে। তখন হইতে বুদ্ধির প্রখরতা মাপিবার জন্য প্রতিক্রিয়ার সময়জনিত মাপের (Reaction time) চেষ্টা চলিতে লাগিল। অনুভূতির তীব্রতা মাপের চেষ্টা ছাড়িয়া এইবার অনুভূতির ক্ষিপ্রতা মাপিবার চেষ্টার ভিতর দিয়া বুদ্ধি মাপিবার চেষ্টা হইতে লাগিল এবং এই উদ্দেশ্যে নানা রকম যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইল। ওয়েবার (Waber), ফেক্‌নার (Fechner) প্রভৃতি এই দিক দিয়া নানা রকম পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন।

পরে অন্যান্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, dynamometer (হাতের মুঠার শক্তি মাপক যন্ত্র), Ergograph (হাতের মধ্যের আঙুলের শক্তি মাপক যন্ত্র), Aesthesiometer (স্পর্শ শক্তির তীব্রতা মাপক যন্ত্র), Tapping machine (পেশীর ক্ষিপ্রতা মাপক যন্ত্র) প্রভৃতির দ্বারা মানুষের বুদ্ধির মাপ পাওয়া যায় না।

তখন এবিংহস্ (Ebinghaus), হুইপিল্ (Whipple) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কেহ বা স্মরণশক্তির পরীক্ষা দ্বারা, কেহ বা কল্পনা শক্তির পরীক্ষা দ্বারা, কেহ বা অনুষঙ্গ, অভিনিবেশ প্রভৃতির পরীক্ষা দ্বারা বুদ্ধির প্রখরতা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিক্ষার সঞ্চারণ (Transfer of learning) সম্বন্ধে গবেষণার ফল হইতে দেখা গেল যে, মনের বিভিন্ন শক্তিগুলির (faculty) মধ্যে কোনও প্রকার সম্পর্ক (co-relation) নাই। ফলে কাহারও স্মৃতি শক্তি বেশী থাকিলে যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও বেশী থাকিবে অথবা কল্পনা শক্তি বেশী থাকিলে বিচার শক্তিও যে বেশী থাকিবে, এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। কাজেই তথাকথিত faculty, অনুষঙ্গ, অভিনিবেশ, কল্পনা প্রভৃতি মাপের দ্বারা মনের মাপ পাওয়া যাইবে না।

বিণে এবং মেট্রিক স্কেলের আবিষ্কার : শেষ পর্যন্ত ফরাসী পণ্ডিত বিণে (Binet) এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যে সমস্ত দুর্মেধা বালকদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তাহাদেরই বাছাই করিবার জন্য বিণের কাজ আরম্ভ হয়। তিনিও পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের মতোই অনুভূতি ও মনের প্রতিক্রিয়ার ক্ষিপ্রতাজ্ঞাপক যন্ত্রাদি লইয়াই পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তবে একদিক দিয়া পূর্ব সূরীদিগের সহিত তাঁহার পার্থক্য ছিল। তাঁহার পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণ একটি অথবা অত্যল্প সংখ্যক মানসিক শক্তি (faculty) পরিমাপ করিয়াই বুদ্ধির মাপ করিতে চেষ্টা করিতেন। বিণে কিন্তু বুঝিয়াছিলেন, বুদ্ধি অত্যন্ত জটিল, নানাজাতীয় কাজের মধ্য দিয়া ইহা অভিব্যক্ত হয়। কাজেই নানাজাতীয় প্রশ্নের মধ্য দিয়া বুদ্ধির নমুনা সংগ্রহ করিয়া তবে বুদ্ধিকে মাপিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তাঁহার মনে হইল (১) উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা (purposive direction), (২) পরিবর্তনশীল পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া (active adaptation) এবং (৩) দোষগুণ বিচারের ক্ষমতা —এইগুলির মধ্য দিয়াই বুদ্ধি কাজ করিয়া যায়। তখন তিনি বুদ্ধি মাপের জন্য এই সমস্ত ক্ষমতাগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কতকগুলি প্রশ্ন তৈয়ারী করিলেন। এই প্রশ্নগুলি লইয়া তিনি একটি স্কুলের কতকগুলি বালকের বুদ্ধি মাপিয়া তাহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখা গেল, বিণের এই পরীক্ষায় ভাল, মন্দ, মাঝারি প্রভৃতি যে যেমন নম্বর পাইল, সেই নম্বরের সহিত সেই বালকগুলি সম্বন্ধে শিক্ষকদিগের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা ও পুঁথিগত বিদ্যার সাময়িক পরীক্ষার ফলগুলির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (co-relation) রহিয়াছে।

এইভাবে গবেষণা করিতে-করিতে বিণে বুদ্ধির মাপকাঠির একটা সন্ধান পাইলেন (১৯০৫)। অতঃপর তিনি বিভিন্ন বয়সের উপযোগী বিভিন্ন প্রশ্নস্তবক তৈয়ারী করিয়া তাহাদের একটা মেট্রিক মান (Metric scale) স্থির করিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধির মাপকাঠিতে স্কুলের ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২ বৎসরের ছাত্রদের জন্য তিনি মোট ৫৪টি প্রশ্ন তৈয়ারী করেন। ১১, ১৩ ও ১৪ বৎসরের বালকদিগের জন্য তিনি কোনও প্রশ্ন তৈয়ারী করেন নাই।

মনোবয়স : যে প্রশ্নগুলি একটি নির্দিষ্ট বয়সের শতকরা ৬০।৭০ জন উত্তর করিতে পারে, তাহা সেই বয়সের নির্দিষ্ট মান হইল। এইভাবে তিনি শুধু বুদ্ধির মাপকাঠিই স্থির করিলেন না, বুদ্ধির একটা মনোবয়সও (mental age) স্থির করিলেন। মনোবয়সের অর্থ হইল, একটা বিশেষ মাপের জন্ম বয়সে (chronological age) সাধারণ বালকেরা বিশেষ মাপের বুদ্ধির পরিচয়টুকু দিতে সমর্থ হয়। এই হিসাবে সাধারণ বুদ্ধির ছেলেমেয়েদের মনোবয়স ও জন্মবয়স একই রকম হইবে ; প্রতিভাশালী বালকদের মনোবয়স জন্মবয়সের চেয়ে বেশী হইবে ইত্যাদি। যদি সাত বৎসরের একটি বালক নয় বৎসরের বালকদের নির্দিষ্ট মানের প্রশ্নগুলি উত্তর দিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মনোবয়সের দিক দিয়া সে দুই বৎসর বেশী অগ্রসর আছে। আবার যদি নয় বৎসরেব বালকটি নয় বৎসরের বা আট বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি বলিতে না পারিয়া মাত্র সাত বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে মনোবয়সের দিক দিয়া দুই বৎসর পিছাইয়া (retardation) আছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সহপাঠিদের মধ্যে কতটা মনোবয়সের পার্থক্য থাকিলে তাহাদের আর এক বিভাগে (section) রাখা উচিত নয় ? বিণে বলেন, ৮-এর উর্ধ্ব বয়স্কদের জন্য ৩ বৎসরের পার্থক্য থাকিলে এবং ৮-এর নিম্ন বয়স্কদের জন্য ২ বৎসরের পার্থক্য থাকিলে আর তাহাদের এক বিভাগে (section) রাখিয়া পড়ানো উচিত নয়।

বিণে-এর শিষ্যবর্গ : 'বিণে'র পর ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ 'বিণে'র বুদ্ধি মাপকের সার্থকতা দেখিয়া নানাভাবে বিণে-এর মাপকগুলির সংস্কার করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের সিরিল বার্ট (Cyril Bart), আমেপিকার টারম্যান (Terman), কুলম্যান্ (Kuhlman), গডার্ড (Goddard) এবং জার্ম্মাণীর ষ্টার্ণ (Stern), ববারট্যাগ্ (Bobertag) প্রভৃতি বিখ্যাত।

বিণে-এর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ষ্টার্ণই প্রথম "মনস্বিতাংশ" (I.Q.) আবিষ্কার করেন। তিনি স্থির করিলেন, কোনও ছেলের মনোবয়সকে যদি

তার জন্মবয়সের অঙ্ক দিয়া ভাগ করা হয়, তাহা হইলে যে ভগ্নাংশটি পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে বালকটির মনস্বিতাংশ। যেমন একটি বালকের মনোবয়স ১০ এবং জন্মবয়স ৮ হইলে তাহার মনস্বিতাংশ হইবে $\frac{১০}{৮}$ বা ১·২৫।

বিণের সিদ্ধান্ত লইয়া আমেরিকায় যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে টারম্যান্ বিশেষ প্রসিদ্ধ। Standford বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গবেষণা করেন বলিয়া তাঁহার গবেষগণার ফলটি 'Standford Revision' নামে খ্যাত। ইহাতে ৩ হইতে ১০ বৎসরের ছাত্রদের জন্য প্রত্যেক বয়সের জন্য ৬টি করিয়া ৪৮টি; ১২ বৎসরের জন্য ৮টি, ১৪ বৎসরের জন্য ৭টি, সাধারণ পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ৬টি, প্রতিভাশালী পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ৫টি এবং বৈকল্পিক ১৬টি একুনে ৯০টি প্রশ্ন স্থান পাইয়াছে। বিণে-এর মতো টারম্যান্ও ১১ ও ১৩ বৎসরের বালকদের জন্য কোনও প্রশ্নের ব্যবস্থা করেন নাই, কারণ ঐ বয়সে কৈশোরের আবির্ভাবটি কোন ক্োনও ক্ষেত্রে শীঘ্র শীঘ্র, আবার কোনও ক্ষেত্রে বিলম্বিত হয় বলিয়া বুদ্ধির পরিপক্কতার একটা সার্বজনীন মাপকাঠি পাওয়া যায় না।

টারম্যান্ অনেক নূতন নূতন প্রশ্ন তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে পরীক্ষার্থীদের শব্দ-সম্পদের বিচারমূলক প্রশ্ন এবং সংখ্যাকে পশ্চাদ্দিক হইতে গণনার প্রশ্ন অন্যতম। তবে মনস্বিতাংশের নিরিখটিকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা এবং সেই নিরিখ অনুসারে ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করার জন্যই তিনি বিশেষভাবে খ্যাত। তাহার মনস্বিতাংশের সূত্রটি এইরূপ ঃ

$$\text{মনস্বিতাংশ (I. Q.)} = \frac{\text{মনোবয়স}}{\text{জন্ম বয়স}} \times ১০০$$

এই সূত্রানুসারে একটি ৮ বৎসরের বালকের মনোবয়স ১০ হইলে তাহার মনস্বিতাংশ হইবে $\frac{১০}{৮} \times ১০০ = ১২৫$; সেইরূপ একটি ১০ বৎসরের বালকের মনোবয়স ৮ হইলে তাহার মনস্বিতাংশ হইবে $\frac{৮}{১০} \times ১০০ = ৮০$ ইত্যাদি।

এই মনস্বিতাংশ অনুসারে টারম্যান্ ছাত্রদের নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন ঃ

১৪০এর উর্ধ্ব মনস্বিতাংশ হইলে প্রতিভাশালী (genius)।

১২০	হইতে	১৪০	মনস্বিতাংশ হইলে	তীক্ষ্ণবুদ্ধি	(of very superior intelligence)।
১১০	”	১২০	”	বুদ্ধিমান্	(of superior intelligence)।
৯০	”	১১০	”	সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত	(of Average ”)।
৮০	”	৯০	”	অল্পধী	(Dull)।
৭০	”	৮০	”	জড়বুদ্ধির সীমারেখা	(of Boderline defficiency)।

৭০-এর কম মনস্বিতাংশ হইলে তাহা জড়বুদ্ধির পর্যায়ে পড়ে। এই জড়বুদ্ধিদের মধ্যেও আবার মনস্বিতাংশের তারতম্য অনুসারে টারম্যান্ আরও শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, যথা—

৫০ হইতে ৭০	মনস্বিতাংশ হইলে	নির্বোধ	very dull
২০ বা ২৫ হইতে ৫০	” ”	হীনবুদ্ধি	Imbeciles
২০ বা ২৫-এর কম	” ”	অপদার্থ জড়বুদ্ধি	Idiots

গণমাপক বা সংঘাভিক্ষণ :

বিণে, ষ্টার্ণ, টারম্যান্ প্রভৃতির বুদ্ধি-মাপকগুলি খুব কার্যকরী হইলেও, এই গুলির একটি অসুবিধা হইতেছে যে, এই পরীক্ষাগুলি মৌখিক এবং এইগুলি ব্যক্তিগতভাবে করিতে হয় বলিয়া ইহাতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে যখন অত্যল্প সময়ে বহু লোককে পরীক্ষা করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে তথাকথিত "গণ-মাপক" (Group test) খুব কার্যকরী হয়। এই ব্যাপারে আমেরিকার ওটিস্ (Otis)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনিই সমষ্টিগত বুদ্ধিপরীক্ষা বা গণ-মাপকের প্রবর্তক। এই জাতীয় পরীক্ষার একটি ছাপান পুস্তিকার মধ্যে অনেকগুলি প্রশ্নগুচ্ছ (battery) থাকে এবং প্রত্যেক প্রশ্নগুচ্ছে অনেকগুলি করিয়া ছোট ছোট প্রশ্ন থাকে এবং প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলিও প্রশ্নের পাশেই ছাপান থাকে। পরীক্ষার্থীকে শুধু অনুপযুক্ত পদটি কাটিয়া দেওয়া, কি বিশেষ একটি শব্দের নিম্নে রেখা টানিয়া দেওয়া, অনুক্ত পদটি পূর্ণ করা প্রভৃতি কাজ করিতে হয়।

ইহাতে মোটেই বেশী সময় লাগে না। ফলে ২০০।২২০টি প্রশ্নের উত্তর করিতে হয়ত ২৪।২৫ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া হয় না। গত মহাযুদ্ধের সময় এই-ভাবে অতি অল্প সময়ে ১০০০০০র উপর লোককে নির্বাচিত করিয়া তাহাদের এই পরীক্ষার কৃতিত্ব অনুসারে ছোট বড় কাজ দেওয়া হয়। পরবর্তী অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এই গণ-মাপকের পরীক্ষায় যাহারা বেশী নম্বর পাইয়াছিল, তাহারা বাস্তব কার্যক্ষেত্রেও বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি বিশেষ কৃতকার্যতার সহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই জাতীয় প্রশ্নের সাহায্যে শুধু বুদ্ধির নিরিখই যে নির্ণীত হয় তাহা নহে, অধীত বিদ্যারও পরীক্ষা এইভাবে করা যাইতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার (objective test) সূত্রপাতও এই গণ-মাপকের মধ্য হইতেই। এই পরীক্ষার বিশেষত্ব হইতেছে, ইহাতে পরীক্ষকের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা প্রভৃতির উপর বিচারটি প্রভাবিত হয় না এবং ইহা পরীক্ষা করিতে সময়ও কম লাগে। ইহা ছাড়া পরিচ্ছন্নতা, রচনা-কৌশল প্রভৃতির অভাবের জন্য ইহাতে নম্বর কাটা যায় না। এই জাতীয় পরীক্ষায় বহু সংখ্যক প্রশ্ন থাকে বলিয়া ইহাতে জ্ঞানের সার্বভৌম পরীক্ষা হয়।

আমেরিকার সংঘাভিক্ষণের অনুকরণে ইংলণ্ডে ডাঃ ব্যালার্ড-এর 'chelsea test', 'Crichton test', অধ্যাপক গড্‌ফ্রে টমসন-এর 'Northumberland test প্রভৃতির সৃষ্টি হয়য়াছিল।

কিন্তু বুদ্ধিমাপকের বিবর্তনে ওটিস্, ব্যালার্ড, টমসন প্রভৃতির অবদানই শেষ কথা নহে। ইহাদের সংঘাভিক্ষণ বা গণমাপকগুলি দ্বারা শুধু তাহাদেরই বুদ্ধির মাপ করা সম্ভবপর যাহারা লিখিতে ও পড়িতে জানে। কিন্তু অশিক্ষিতের বুদ্ধি মাপিবারও ত প্রয়োজন আছে। ইহার জন্য আমেরিকায় আর এক জাতীয় মাপক "বিটা টেষ্ট" (B-test) প্রবর্তিত হয়। Porteus-এর গোলক ধাঁধা পরীক্ষা (Maze test), Pinter ও Paterson-এর হস্তসম্পাদ্য পরীক্ষা (Performance test) প্রভৃতির দ্বারা অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও বুদ্ধি পরীক্ষা করা সম্ভবপর হইয়াছে। এবং লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রেও এই সব অশিক্ষিতেরা বুদ্ধির মাপ অনুযায়ী দক্ষতা দেখাইয়াছে।

বুদ্ধিমাপকের আবিষ্কৃত তথ্য ঃ

এই সমস্ত মাপকের সাহায্যে আজকাল মানুষের বুদ্ধির পরিমাণ প্রায় নির্ভুলভাবেই নির্ণয় করা যায় বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। এই সমস্ত বুদ্ধিমাপকগুলির বহুল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বৃদ্ধি ও পরিণতি সম্বন্ধে অনেকগুলি চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ; যথা—

(১) স্বভাবজাত বুদ্ধি শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তিত হয় না—ফলে পূর্ণ বয়সের পর মানুষের পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহার মনস্বিতাংশ প্রায় একই থাকিয়া যায়। (২) বুদ্ধির বিকাশ জাতকের জন্মের পর হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি হয়। (৩) ১২ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বুদ্ধি খুব ধীর গতিতে বিকশিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৪ বৎসরের পর আর বুদ্ধি বাড়ে না। ডাল্ (Doll) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বুদ্ধির পরিণতিটি ১৩ বৎসরেই চরম সীমায় উপস্থিত হয় বলিয়া মনে করেন। আমেরিকার Army test-এ সৈনিকদিগের মনস্বিতাংশের গড় ছিল (বিণে-এর নিরিখ অনুসারে) ১৩·০৮ বৎসরের সমান। (৪) টারম্যান, ব্যালার্ড প্রভৃতির মতে ১৬ বৎসর বয়সের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। তবে ওটিস্, মন্‌রো প্রভৃতির মতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বুদ্ধি বাড়িতে পারে। বর্তমানে যন্ত্রাদির সাহায্যে দেখা গিয়াছে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও নাকি ২৩।২৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত সামান্য মাত্রায় বুদ্ধি বাড়িতে থাকে। মোটের উপর অধিকাংশ পণ্ডিতদের মত হইতেছে, সাধারণতঃ ১৬ বৎসরের পর বুদ্ধি আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

বুদ্ধিমাপকের পরীক্ষা দ্বারা পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে, ১৬ বৎসর বয়সের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। এই তত্ত্বটি অনস্বীকার্য। তবে ইহাতে নিরাশ হইবারও কিছুই নাই এবং পাণ্ডিত্যে অরুচি হইবারও কিছুই নাই। এমন কি বুদ্ধির প্রয়োজনেও জ্ঞানের সম্পদের প্রয়োজন আছে। নির্জলা বুদ্ধি দিয়া সব কাজ করা যায় না,—অর্জিত জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া বুদ্ধিকে সাহায্য করে এবং কর্মনৈপুণ্যকে বাড়াইয়া তুলে। পরিণত বয়সের পণ্ডিতেরা তাঁহাদের ১৪ বা ১৬ বৎসরের বুদ্ধির মূলধন লইয়াই তাঁহাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বৃহত্তর জ্ঞানের সহায়তায় জগতের সহিত দক্ষতর ভাবে কারবার করিতে পারেন।

আরও একটি কথা আছে। মনের সহিত অর্জিত জ্ঞানের সম্পর্কটি ঠিক আধারের সহিত আধেয়ের সম্পর্কের মতো নহে। সুজীর্ণ অন্ন যেমন রক্ত-মাংসে পরিণত হইয়া দেহেরই অংশীভূত হইয়া দেহকে পুষ্ট করে, তেমনই সুসমৃদ্ধ জ্ঞান মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া মনের শক্তি তথা বুদ্ধিকে বাড়াইয়া তুলে। এই জন্যই এডামস্ বলিয়াছেন, "Facts become faculty"। পেটার স্যাণ্ডিফোর্ড এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্যই বুদ্ধির Vertical ও horizental বৃদ্ধির কথা আলোচনা করিয়াছেন।

বুদ্ধি মাপকের ব্যাপক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই একটি প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রতিভাশালী, জড়বুদ্ধি প্রভৃতিদের সংখ্যাগত অনুপাতটি কিরূপ, তাহাও অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। মোটামুটি যাহাকে 'curve of change' বলা হয়, মানুষের বুদ্ধির অনুপাতটি সেই curve-টিই অনুসরণ করিয়া চলে। টারম্যান্ ১০০০ আমেরিকান বালকের বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া কিরূপ মনস্বিতাংশ যুক্ত বালকের শতকরা হার কত, তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। টারম্যান-এর এই পরীক্ষায় শতকরা হার ছিল এইরূপ :

৫৬ হইতে ৬৫ মনস্বিতাংশের হার	০·৩৩	
৬৬ " ৭৫ " "	২·০৩	
৭৬ " ৮৫ " "	৮·০৬	=৯৩·১৭%
৮৬ " ৯৫ " "	২০·০১	
৯৬ " ১০৫ " "	৩৩·০৯	
১০৬ " ১১৫ " "	২৩·০১	
১১৬ " ১২৫ " "	৯·০০	
১২৬ " ১৩৫ " "	৪·৩০	
১৩৬ " ১৪৫ " "	০·১৭	
	১০০·০০	

(৭৬ হইতে ১২৫ পর্যন্ত = ৯৩·১৭%)

শিক্ষাক্ষেত্রে এই গবেষণাগুলি একটা যুগান্তর আনিয়াছে বলা যায়। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে এই তথ্যের আলোকে শিক্ষার মান নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়।

পাশ্চাত্য দেশে অন্যান্য পণ্ডিতদের গবেষণার ফলটিও প্রায় টারম্যানের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। থর্নডাইকের মতে মনস্বিতাংশের হারটি এইরূপ—

১৪০-এর উর্ধ্ব মনস্বিতাংশ	০·২৫	
১২০ হইতে ১৪০ ,,	৬·৭৫	
১১০ ,, ১২০ ,,	১৩·০০	=৮৬%
৯০ ,, ১১০ ,,	৬০·০০	
৮০ ,, ৯০ ,,	১৩·০০	
৭০ ,, ৮০ ,,	৬·০০	
৭০-এর নিম্ন ,,	১·০০	
	১০০·০০	

এই গবেষণাগুলি শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া খুবই আশাপ্রদ। কারণ, অত্যন্ত প্রতিভাশালী এবং একেবারে নির্বোধ, ইহাদের বাদ দিয়া শতকরা ৮০।৯০টি বালকই হইতেছে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে অবশ্য মনস্বিতাংশের তারতম্য আছে, কিন্তু "তোর কিচ্ছু হবে না" বলিয়া সরাসরি বিদায় দেওয়া যায় এমন নির্বোধ খুবই কম। তাহা হইলে, উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিলে জনসাধারণের শিক্ষার মান প্রভূত পরিমাণে উন্নত করা সম্ভব।

বুদ্ধি-মাপকের ব্যাপক ব্যবহারের মধ্য দিয়া আরও কতকগুলি তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর পিণ্টার (R Pinter) তাঁহার 'Intelligence Testing : Methods and results' নামক গ্রন্থে যে-সব চমকপ্রদ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সারাংশ মোটামুটি এই :

(১) অনুভূতিজ বৈকল্য (যেমন অন্ধত্ব, বধিরতা প্রভৃতি) যে জাতির মধ্যে বেশী, তাহাদের মনস্বিতাংশের হার কম ; (২) সাধারণ লোকের চেয়ে অপরাধপ্রবণ লোকের মধ্যে মনস্বিতাংশের হার অনেক কম ; (৩) জাতি হিসাবে কোন কোন জাতির মনস্বিতাংশ কম বা বেশী হয়, যেমন নিগ্রোদের মনস্বিতাংশ অল্প, ইংরাজ-ক্যানাডিয়ান্ প্রভৃতিদের বেশী ; (৪) স্ত্রী পুরুষ ভেদে মনস্বিতাংশের পার্থক্য প্রায় নাই বলিলেই চলে ; (৫) সাধারণ

শ্রমিকদের চেয়ে দক্ষ কারিগরদের মনস্বিতাংশ অধিক এবং (৬) দক্ষ কারিগরদের পুত্রকন্যার মনস্বিতাংশ সাধারণ শ্রমিকদের পুত্রকন্যার মনস্বিতাংশের চেয়ে বেশী ; অর্থাৎ যে বুদ্ধি দিয়া আমরা একটা বিশিষ্ট কাজে দক্ষতা অর্জন করি, তাহা পুত্র পৌত্রাদিতে সংক্রামিত হয় ইত্যাদি।

বুদ্ধিমাপকের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও প্রয়োজন :

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কুইন্টিলিয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া টমাস ফুলার, স্যার জন এডাম্‌স পর্যন্ত সকলেই বলিয়াছেন যে, শিক্ষকের উচিৎ শিক্ষার বিষয়টির মতোই ছাত্রকেও বুঝিবার চেষ্টা করা। ডাঃ ব্যালার্ড তাঁহার 'Group test' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন, প্রত্যেক শিল্পীকেই তাহার শিল্প-সাধনার উপাদানকে চিনিতে ও জানিতে হয়। মৃৎশিল্পীকে মাটি চিনিতে হয়, তন্তুবায়কে স্থতা চিনিতে হয়। তাহা না চিনিলে তাহার শিল্প ব্যর্থ হয়। সাধারণ মাটি দিয়া চিনামাটির অথবা শূকরের লোম দিয়া সিল্কের রুমাল তৈয়ারী করা যায় না। তেমনি শিক্ষকও সব ছাত্রকে দিয়া সব কিছুই করিতে পারেন না। অথচ বর্তমান ব্যবস্থায় অভিভাবক হইতে সরকার পর্যন্ত সকলেই শিক্ষকদিগের নিকট হইতে ঐ জাতীয়ই একটা কিছু আশা করেন। বুদ্ধিমাপকের ব্যবস্থা এই বিষয়ে অনেকখানি প্রতিকার করিতে পারে। বুদ্ধিমাপকের দ্বারা ঠিক করিয়া লওয়া যায় যে, কোন্ ছাত্রটি কি ধরণের কতদূর পড়াশুনা করিবার অধিকারী। নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত হইতে এই দিগ্‌দর্শন মিলিবে।

মনস্বিতাংশ	বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে সম্ভাবনা	পেশা সম্বন্ধে সম্ভাবনা
১৫০-এর উর্ধ্বে	সর্বোচ্চ বিদ্যা	উচ্চতম দায়িত্বের পদের যোগ্য
১৩৫ হইতে ১৫০	উচ্চ বিদ্যা	বড় বড় রাজকার্য
১১৫ ,, ১৩৫	মাধ্যমিক শিক্ষা	কেরাণীগিরি ও উচ্চস্তরের কারিগরী
১০০ ,, ১১৫	মাধ্যমিক শিক্ষা	সাধারণ টেক্‌নিকাল্ কাজ প্রভৃতি
৮৫ ,, ১০০	উচ্চ প্রাথমিক ও কিছু বেশী	সাধারণ কারিগরী, ছোটখাট ব্যবসায় ইত্যাদি
৭০ ,, ৮৫	নিম্ন প্রাথমিক	মজুর
৫০ ,, ৭০	... ...	অতি সাধারণ দিন মজুর
৫০-এর নিম্ন	... ...	বিশেষ তত্ত্বাবধানে পুনরাবৃত্তিমূলক কার্য

সাধারণ ক্লাশের পাঠন-ব্যবস্থার মধ্যেও বুদ্ধি-মাপকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ছাত্রদের মনোবয়স হিসাবে একই শ্রেণীর ছাত্রদের আবার ক খ গ প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিলে ফল খুব ভাল হয়। ইহার চেয়েও উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইতেছে একই মনস্বিতাংশযুক্ত বালকদের মধ্যে আবার জন্মবয়স অনুসারে আর একটি শ্রেণী বিভাগ করিয়া লওয়া। পড়ানোটা তখনই উৎকৃষ্ট হয় যখন (সংঘগত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাটি বজায় রাখিয়াই) ছাত্রদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সামর্থ অনুযায়ী পাঠ দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থ ও সময়ের দিক দিয়া এই ব্যষ্টিগত পাঠন-ব্যবস্থা সম্ভবপর নয় বলিয়াই খানিকটা বাধ্য হইয়া বিভিন্ন ছাত্রকে এক একটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সমষ্টিগত ভাবে পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগটি এমন ভাবেই করা উচিত যাহাতে যথাসম্ভব এক জাতীয় ছাত্রই এক শ্রেণীতে থাকে। এইজন্য মনোবয়স, জন্মবয়স, মনস্বিতাংশ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একই ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে বিভাগ উপ-বিভাগ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

এইরূপ শ্রেণীর বিভাগ সম্বন্ধে অনেক শিক্ষাতত্ত্ববিৎ বলেন যে, ইহাতে প্রতিযোগিতার অভাবে নির্বোধ ছাত্রগণ শুধু পিছাইয়া পড়িবে না, তাহাদের মধ্যে হীনমন্যতাও আসিবে। এই অনুযোগটি সত্য হইলে বলা যায়, নির্বোধ ছাত্রদের সঙ্গে বুদ্ধিমান্ থাকিলে তাহাদেরও সম্ভাবনার অনেকখানি অপচয় ঘটিতে পারে।

আরও একটি কথা আছে। ধরা যাইতে পারে, একটি ক্লাশে একটি ছাত্রের মনস্বিতাংশ ২০, আর একজনের ১০০ এবং তৃতীয় আর একজনের ৫০। এখন এই তিন জনেরই জন্মগত বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তিন জনেরই বিদ্যাবত্তা প্রায় একই রকমের হইবে। কিন্তু যতই ইহাদের বয়স বাড়িতে থাকিবে ইহাদের মনস্বিতাংশ এক থাকিলেও, বিদ্যার তথা মনোবয়সের পার্থক্যটা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তিন জনেরই বয়স যখন ১৬ বৎসর হইবে, তখন ৫০ মনস্বিতাংশযুক্ত বালকটির মনোবয়স হইবে $\frac{১৬ \times ৫০}{১০০}$ = ৮ বৎসর ; ১০০ মনস্বিতাংশযুক্ত বালকটির মনোবয়স হইবে

$\frac{১৬\times১০০}{১০০}=১৬$, এবং ১২০ মনস্বিতাংশযুক্ত বালকটির মনোবয়স হইবে $\frac{১৬\times১২০}{১০০}=\frac{৯৬}{৫}=১৯\frac{১}{৫}$; সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বয়সে প্রতিভাশালী বালকটির সহিত নির্বোধ ছাত্রটির মনোবয়সের পার্থক্য হইবে ১১ বৎসরেরও বেশী। এতখানি পার্থক্যের মধ্যে প্রতিযোগিতার কোনও সম্ভাবনাই নাই এবং প্রতিযোগিতাকে অসম্ভব মনে করিয়াই নির্বোধ ছাত্রটি হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের হীনতা ও ক্ষুদ্রতার অনুভূতিতে অভিভূত হইয়া একপাশে সরিয়া থাকিবে। তাহার চেয়ে তাহাকে যদি তাহারই অনুরূপ মনস্বিতাংশ যুক্ত ছাত্রদের মধ্যে রাখা হইত, তাহা হইলে তাহার হীনমন্যতার অনুভূতিটা অল্পতর হইত এবং সে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটাইতে পারিত।

জন্মবয়স এবং পরীক্ষার ফল দেখিয়া শ্রেণী বিভাগটাই এ দেশে প্রচলিত। এই সঙ্গে ছাত্রদের মনোবয়সের হিসাবটিও ধরা বাঞ্ছনীয়। ডাঃ ব্যালার্ড দেখাইয়াছেন, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের একটি কুখ্যাত পল্লীতে একটি বড় স্কুলে একজন নূতন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াই ছাত্রীদের মনস্বিতাংশ অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করিলেন, তাহার ফলে পরবর্তী বৎসরে তেত্রিশটি ছাত্রী বৃত্তি পাইল। অথচ ঐ বিদ্যালয়ে বিগত দশ বৎসরে একটিও বৃত্তি পায় নাই। ডাঃ ব্যালার্ড আরও বলেন যে, আমাদের স্কুল পাঠশালাতে যে ভাবে পড়ানো হয় তাহাতে দুর্মেধা বা নির্বোধ ছাত্রদের সহজেই চিনিতে পারা যায় বটে, কিন্তু প্রতিভাশালী ছাত্রেরা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। তাহার কারণ, দুই একটি কথা কহিলেই নির্বোধ ছাত্রকে চিনিয়া ফেলা যায়, কিন্তু লাজুক বুদ্ধিমান বালক অনেক সময়েই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে। ফলে বুদ্ধি থাকিলেও, সুযোগ ও উৎসাহের অভাবে নির্বোধ ছাত্রদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের প্রতিভা বিকশিত হবার সুযোগ পায় না।

মান নির্ণয় ঃ

এখন প্রশ্ন—এ দেশের ছাত্রদের জন্য এই জাতীয় গণমাপক তৈয়ারী করিতে হইলে জন্মবয়সের অনুপাতে মনোবয়সের মানগুলি কি ভাবে স্থির করিব ?

ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন, সমাজের সর্বস্তরের মধ্য হইতে বহু সংখ্যক ছাত্র লইয়া কাজ আরম্ভ করা। শুধু শিক্ষিত অথবা শুধুই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছাত্র লইয়া পরীক্ষা চালাইলে সমগ্র দেশের পক্ষে মনোবয়সের মানটি অযথা উচ্চ বা অযথা নিম্ন হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন, যে বয়সের ছাত্র লইয়া গবেষণা করা হইবে সেই ছাত্রগুলির বয়স যেন নিখুঁত ভাবে নির্ভুল হয়। তাহা না হইলে জন্মবয়সের সহিত মনোবয়সের অনুপাতটি ভ্রান্ত হইয়া যাইবে।

এইবার যে-প্রশ্নগুলি যে-বয়সের অধিকাংশ ছাত্রই বলিতে পারিবে তাহা সেই বয়সের মনস্বিতাংশের গড় সূচনা করিবে। তবে "অধিকাংশ ছাত্র" বলিতে কি বুঝিব, এই সম্বন্ধে সব পণ্ডিত একমত নহেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রশ্নগুলি একটি নির্দিষ্ট বয়সের শতকরা ৬০।৭০ জন বলিতে পারে, বিণে-এর মতে তাহাই হইতেছে সেই বয়সের নির্দিষ্ট মান। আমেরিকার অনেক স্থলে যে-প্রশ্নগুলি একটি নির্দিষ্ট বয়সের শতকরা ৭৫ জন বলিতে পারে সেইগুলিকে সেই বয়সের মান বলিয়া ধরা হয়। বার্ট বলেন, যে প্রশ্নগুলি একটি নির্দিষ্ট বয়সের শতকরা ৫০ জন বলিতে পারে, সেই বয়সের এক বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক বালকদের উহাই উপযুক্ত মান হইবে। এইভাবে হয়ত ৫০০টি ছাত্র লইয়া একটি মান (standard) ঠিক করা হইল। এইবার এই মানগুলি ঠিক হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য হয়ত আরও ২০০ জন ছাত্রের উপর একই প্রশ্নগুলি দেওয়া হইল। এখন পূর্ববর্তী ৫০০ জন ছাত্রের এবং বর্তমান ২০০ জন ছাত্রের অর্থাৎ একুনে ৭০০ জন ছাত্রের মনস্বিতাংশের গড়টি যদি প্রথম বারের গড়ের সহিত একই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মানগুলি সার্বজনীন ভাবে শুদ্ধ হইয়াছে।

প্রশ্ন ও প্রশ্নগুচ্ছ :

এইবার বিচার্য, কতকগুলি প্রশ্ন-স্তবক থাকিবে,প্রত্যেক স্তবকে কতকগুলি করিয়া প্রশ্ন থাকিবে এবং সেই জন্য কতখানি সময় দিতে হইবে। এই সম্বন্ধে আমেরিকার গণমাপকগুলি আমাদিগকে খানিকটা পথ-নির্দেশ করিতে পারে।

আমেরিকায় সৈন্যদের গণমাপক—'আল্‌ফা টেষ্ট'

প্রশ্ন-স্তবক সংখ্যা	বিভিন্ন জাতীয় প্রশ্ন	স্তবক পিছু প্রশ্ন সংখ্যা	স্তবক পিছু সময়
১	নির্দেশ পালনের শক্তি (Instruction test)	১২	২ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড
২	গণিত বিষয়ক	২০	৫ „ ×
৩	শ্রেষ্ঠ উত্তর	১৬	১ „ ৩০ „
৪	শব্দের অর্থ	৪০	১ „ ৩০ „
৫	বাক্যের বিন্যাস	২৪	২ „ × „
৬	ক্রমিক সংখ্যা	২০	৩ „ × „
৭	সম্পর্ক নির্দেশ, উপমা প্রভৃতি (analogies)	৪০	৪ „ × „
৮	সাধারণ জ্ঞান	৪০	৪ „ × „
	মোট…	২১২	২৩ „ ১৫ „

টারম্যান্-গণমাপকে এইরূপ ১০টি প্রশ্নস্তবকে সর্বশুদ্ধ ১৮৫টি প্রশ্ন ছিল এবং সময় দেওয়া হইয়াছিল ২৭ মিনিট। প্রশ্নের নমুনা এইরূপ :

Analogies : প্রশ্ন (১)—অনুক্ত পদটি পূর্ণ কর—

রাজপুত্রের সহিত রাজকন্যার যে সম্পর্ক, রাজার সহিত—সেই সম্পর্ক ; অথবা— রাজপুত্র : রাজকন্যা : : রাজা :—

এইরূপ— পেন্সিল্ : ড্রয়িং : : তুলি :—

প্রশ্ন (২) : বন্ধনীর মধ্যে লিখিত পদগুলির মধ্য হইতে উপযুক্ত পদটির নিম্নে একটি রেখা টান—

কর্ণ : শ্রবণ : : চক্ষু : (টেবিল, হাত, দেখে, শুনে)।

অশ্রু : শোক : হাস্য : (আনন্দ, স্মিত,বালিকা, দন্ত-বিকাশ)।

শব্দের অর্থ জানিবার জন্য প্রশ্ন : প্রশ্ন (১)—নিম্নের ব্রাকেটের মধ্যস্থ শব্দগুলির মধ্য হইতে বিপরীতার্থক শব্দটির নিম্নে রেখা টান—

উচ্চ—(নিম্ন, ক্ষুদ্র, যুবক, নীচ)।

উত্তপ্ত—(বরফ, অন্ধকার, শীতল, অগ্নি)।

প্রশ্ন (২) : নিম্নলিখিত শব্দগুলি হয় সমার্থক অথবা বিপরীতার্থক ; যদি সমার্থক হয় তাহা হইলে সমার্থক শব্দটির নীচে এবং যদি বিপরীতার্থক হয়, তাহা হইলে বিপরীতার্থক শব্দটির নিম্নে একটি রেখা টান—

ভাল—মন্দ সমার্থক, বিপরীতার্থক।

ছোট—ক্ষুদ্র সমার্থক, বিপরীতার্থক।

বাক্যের অর্থবোধক প্রশ্ন : প্রশ্ন (১)—ঠিক উত্তরটির নিম্নে একটি রেখা টান—

ছেলেরা খেলা করে কি ? .... হাঁ, না

পাখীর দেহ কি পালকে ঢাকা ?...... হাঁ, না

প্রশ্ন (২) : নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্য হইতে একটি শব্দ বাদ দিয়া তাহার পর শব্দগুলি ঠিকভাবে সাজাইলে একটি অর্থযুক্ত বাক্য হইতে পারে। যে শব্দটি বাদ দেওয়া হইবে সেইটি কাটিয়া দাও—

আছে তাহার একটি ভিতর বই

ছুরি চেয়ার ধারাল হয়

ক্রমিক সংখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন : প্রশ্ন (১)—নিম্নের সংখ্যাগুলি দেখ এবং শূন্য স্থানগুলিতে যে-যে সংখ্যাগুলি থাকা উচিত তাহা বসাও—

২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, — —

৯, ১, ৭, ১, ৬, ১, — —

১৫, ১৬, ১৪, ১৭, ১৩, ১৮, — —

৩, ৪, ৬, ৯, ১৩, ১৮, — —

সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন : প্রশ্ন (১) : অনুপযুক্ত কথাগুলি কাটিয়া দাও—

ডিসেম্বর মাসে অষ্ট্রেলিয়ায়—শীতকাল, বর্ষাকাল, গ্রীষ্মকাল।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম—কাঞ্চনজঙ্ঘা, গৌরীশৃঙ্গ, মণ্ট্ ব্ল্যাঙ্ক্।

প্রশ্ন (২) : যুক্তি প্রদর্শন কর—

আকাশে মেঘ থাকিলে শীত কম হয় কারণ—(ক) মেঘ গরম

(খ) মেঘ পৃথিবীর তাপকে বিকীর্ণ হইতে দেয় না।

(গ) মেঘ শীতকে আকাশ হইতে নামিতে দেয় না।

প্রশ্ন (৩) : ঠিক উত্তরটির নিম্নে একটি রেখা টান—

দুইটি সংখ্যার গুণফল	সব সময়ে সংখ্যা দুইটির ল-সা-গু ও গ-সা-গু-র গুণফলের সমান হয়
	মাঝে মাঝে " " " " " " " " "
	কখনও " " " " " " " হয় না

বুদ্ধির গণমাপকের জন্য নানা জাতীয় প্রশ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। শুধু বুদ্ধিমাপের জন্য নহে, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায়ও এই জাতীয় প্রশ্ন দেওয়া হয়।

প্রশ্নগুলির বৈশিষ্ট্য :

বুদ্ধি-মাপকের প্রশ্নগুলির সহিত সাধারণ স্কুল-কলেজের পরীক্ষার প্রশ্নের উদ্দেশ্যগত একটা বড় পার্থক্য আছে : (১) বুদ্ধি-মাপকের প্রশ্নগুলি ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা জানিবার জন্য এবং (২) স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলি ছাত্রদের অতীতের সাধনার কৃতিত্ব জানিবার জন্য বিশেষভাবে তৈয়ারী হয়। অবশ্য বর্তমানের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাগুলিতেও অধীত বিদ্যার পরীক্ষা লওয়া হয়, তবে বুদ্ধি-মাপকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে অধীত বিদ্যার পরীক্ষা ততটা নয়, যতটা হইতেছে অধীতব্য বিদ্যা সম্বন্ধে ছাত্রের সম্ভাবনা নির্ণয় করা। কাজেই একটি বিদ্যালয়ে বা একটি বিশেষ কাজের জন্য প্রার্থী হইলে তাহার সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য প্রয়োজন হয় এই বুদ্ধি-মাপকের পরীক্ষার।

বুদ্ধি-মাপকের পরবর্তী অধ্যায় :

এই সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য নিছক বুদ্ধি ছাড়াও অন্যান্য পরীক্ষার প্রয়োজন হইতে পারে। এইজন্য কর্মকুশলতা, শব্দানুষঙ্গ, প্রক্ষোভ-প্রবণতা, পেশাগত পরীক্ষা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কর্মকুশলতা পরীক্ষা নানা ভাবে হইতে পারে। একটি ছবিকে হয়ত কয়েকটি টুকরা করিয়া কাটিয়া সেই টুকরাগুলি পরীক্ষার্থীকে দেওয়া হইল। যে যত ক্ষিপ্রভাবে টুকরাগুলিকে যথাযথ বিন্যাস করিয়া পূর্ণাঙ্গ ছবিটি তৈয়ারী করিতে পারিবে, তাহার কৃতিত্ব তত অধিক। অনেকটা মন্টেসরি শিক্ষা-প্রণালীর didactic aparatus জাতীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা কর্মকুশলতা নানা ভাবে পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Hugo Munsterberg **পেশাগত সম্ভাবনা** পরীক্ষার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন। তিনি পেষ্ট বোর্ডের মডেলের উপর কাল্পনিক রেল লাইন, পথচারী মানুষ, গাড়ী-ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া কিভাবে একটি কাল্পনিক গাড়ী চালাইয়া লওয়া যায়, তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যাহারা এই "খেলা ঘরের" গাড়ীটি ভাল ভাবে চালাইতে পারিয়াছিল, তাহারাই বাস্তব গাড়ীগুলিও ভালভাবে চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল। বর্তমানে এই জাতীয় অনেক পরীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে। আজকাল Industrial Psychology প্রায় একটি প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

শব্দানুষঙ্গ পরীক্ষা য়্যুঙ (Jung) সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত। এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সম্মুখে একটি শব্দ দেখান হয় এবং সেই শব্দটির প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রথমেই যাহা মনে আসে সেই কথাটি লিখিতে বলা হয় এবং সেইজন্য যতটা সময় লাগে তাহা Stop watch লইয়া দেখিয়া লওয়া হয়। যে শব্দটিতে প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত হয়, বুঝিতে হইবে সেই শব্দটিকে কেন্দ্র করিয়া পরীক্ষাথীর নির্জ্জন মনে কোন গূঢ়েষণা লুকাইয়া আছে। এই ভাবে বিভিন্ন শব্দের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া পরীক্ষার্থীর মনের কথা, স্বভাব ও সম্ভাবনার সম্বন্ধে অনেকখানি ধারণা করা যাইতে পারে। য়্যুঙ্ সাহেব মনোবিকলন কার্যের জন্য এই ধরণের পরীক্ষার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মূলার (Muller) নামে একজন সুইস্ এঞ্জিনার (Engineer) মানুষের **প্রক্ষোভের** তীব্রতা মাপিবার উপায় আবিষ্কার করেন। প্রক্ষোভের তীব্রতার সময় শরীরের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক স্রোতের গতিপথটিকে বাধা দিবার শক্তিটি হ্রাস পায়। সুতরাং এই হ্রাস পাওয়ার মাপটি দেখিয়া আমরা মানুষের প্রক্ষোভ-প্রবণতা বা প্রক্ষোভের তীব্রতা মাপিতে পারি।

গণ-মাপকের সমালোচনা ঃ

এই ভাবে বুদ্ধিমাপের অভিযানটি আজকাল শুধু ব্যাপকতরই হয় নাই, পরন্তু ইহা লইয়া বড় মাতামাতি ও আদিখ্যেতা দেখা দিয়াছে। বিশেষতঃ বিগত মহাযুদ্ধের সময় "আল্‌ফা টেষ্ট" "বিটা টেষ্ট" প্রভৃতি গণ-মাপকের দ্বারা সৈন্যদের নির্বাচন ব্যাপারে সুফল পাওয়ায় গণ-মাপকগুলিকে আমেরিকা

দেশে মানুষের প্রায় অভ্রান্ত পরিচয়ের মাপকাঠি বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন, এই সমস্ত গণ-মাপকে মানুষের কি পূর্ণ পরিচয়টুকু পাওয়া যায়?

স্বপক্ষে যুক্তি: প্রত্যেক পরীক্ষার মধ্যেই কতকগুলি মৌলিক প্রকল্প আছে। বুদ্ধিমান লোক বলিতে আমরা স্বতঃই যাহা বুঝি তাহা হইতেছে এই যে, নির্বোধ লোকটি যে সমস্ত কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে পারে না, বুদ্ধিমান লোকটি তাহা পারে। দ্বিতীয়তঃ নির্বোধ লোকটি যত বিষয়ে তাহার বুদ্ধি খেলাইতে পারে, বুদ্ধিমান লোকটি তাহার চেয়ে বেশী বিষয়ে বুদ্ধি খেলাইতে পারে এবং তৃতীয়তঃ নির্বোধ লোকটি যত শীঘ্র একটা সমাধান খুঁজিয়া পায়, বুদ্ধিমান লোকটি তাহার চেয়ে তাড়াতাড়ি তাহা খুঁজিয়া পায়। ফলে বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্নের ক্রম-কাঠিন্য (difficulty or level), প্রশ্নের সার্বভৌমতা (width or range) এবং ক্ষিপ্রতা (speed)—এই তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; বলা বাহুল্য, বিণে হইতে ব্যালার্ড পর্যন্ত সমস্ত আধুনিক মনোবিদ্‌গণই তাঁহাদের প্রশ্ন নির্বাচন করিবার সময় এই তিনটি দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

প্রশ্ন তৈয়ারী ছাড়াও পরীক্ষার সার্থক পরিচালনার জন্য প্রয়োজন: (১) সিদ্ধতা (validity), (২) নির্ভরযোগ্যতা (reliability) (৩) পরীক্ষকের রুচি-বিরাগ-নিরপেক্ষতা (objectivity), (৪) পরীক্ষা-পরিচালনা ও মানসাঙ্ক (marks) দেওয়া সম্বন্ধে সহজতা (ease of administration and scoring) এবং (৫) মান সম্বন্ধে (satisfaction of the norm) নিশ্চয়তা। এই দিক দিয়াও গণ-মাপকের পরীক্ষাগুলি যথেষ্ট প্রশস্তি দাবী করিতে পারে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধি-মাপকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। অবশ্য ছাত্রের স্বাস্থ্য, সুযোগ-সুবিধা, উৎসাহ, চরিত্র প্রভৃতির উপর এই সম্ভাবনাটির সাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল। এই নিরিখগুলির নির্ভরযোগ্যতা নিভুর্ল পরীক্ষা-প্রণালী প্রভৃতির উপরও অনেকখানি নির্ভর করে।

রচনা জাতীয় পরীক্ষায় পরীক্ষকের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার উপর উত্তরটির সফলাঙ্ক খানিকটা নির্ভর করে। অপর পক্ষে গণ-মাপকের প্রশ্নের উত্তরগুলি

শুধু রেখা-টানা বা ঢেরা-কাটা প্রকৃতির হওয়ায় ইহা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ পরীক্ষা বলা চলে। পরীক্ষা পরিচালনা ও সফলাঙ্ক নিরূপণ ব্যাপারেও এই জাতীয় পরীক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে। ইহাতে সহস্র সহস্র পরীক্ষার্থীর একসঙ্গে ৩০।৩৫ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষা লওয়া যায় এবং সেই পরীক্ষার খাতাপত্র দেখিবার জন্য পণ্ডিত পরীক্ষক অথবা সময়েরও খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। একটি আদর্শ উত্তরের ছক্ দেখিয়া যে কেহ খাতা দেখার কাজ চালাইতে পারে।

এই জাতীয় পরীক্ষার নির্ণীত মান সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে হইলে পরীক্ষার উপাদানগুলি সম্বন্ধে নিখুঁত ও অভ্রান্ত হইতে হইবে এবং বহু সংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষা চালাইয়া সার্বজনীন গড়টির সন্ধান করিতে হইবে।

বিপক্ষে যুক্তি : এই জাতীয় পরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হইতেছে, ইহার প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যে একটা 'লাগে তুক্ না লাগে তাক্' জাতীয় ব্যাপার ঘটে। কিছু জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, খানিকটা আন্দাজে একটা রেখা টানিয়া বা ঢেরা কাটিয়া কিছুটা নম্বর পাওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অভিযোগ হইতেছে, এই জাতীয় পরীক্ষায় ক্ষিপ্রভাবে চিন্তা করা, ক্ষিপ্রভাবে সিদ্ধান্ত-সমাধান করা প্রভৃতির উপরই অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। ফলে এই জাতীয় পরীক্ষায় চালাক লোকেরা যতটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে, ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করেন এমন সাবধানী দার্শনিক ভাবাপন্ন চিন্তাশীলেরা হয়ত ততটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন না।

অবশ্য একথা সত্য যে, বুদ্ধির সহিত ক্ষিপ্রভাবে সিদ্ধান্ত করিবার শক্তির একটা সমানুপাত সম্পর্ক আছে। ইংরাজীতে slow-witted কথাটি যে নির্বোধ-এর প্রতিশব্দ, তাহা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অনস্বীকার্য। যে লোকটি দেরী করিয়া বুঝে, তাহাকে আমরা নির্বোধ বলিয়াই মনে করি। তবে ইহাও ঠিক যে, যাহারা দেরী করিয়া সিদ্ধান্ত করে তাহাদের সকলেই নির্বোধ নহে। আমেরিকার "আল্ফা" বা "বিটা" পরীক্ষায় যে সমস্ত লোককে বেশী বুদ্ধিমান মনে করিয়া বড় বড় কাজ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা খুব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে সত্যের একটি দিক মাত্র দেখা গিয়াছিল ; প্রমাণ

হইয়াছিল যে, যাহাদের বুদ্ধিমান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহারা সত্যই বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু ঐ পরীক্ষায় এই জিনিসটি প্রমাণিত হয় নাই যে, যাহাদের নির্বোধ বলিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান কেহ অবহেলিত বা উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে নাই।

আমেরিকার সৈনিকদের পরীক্ষায় যে শুধু "স্মার্টনেস্"টাই দেখা হইয়াছিল এবং বুদ্ধির অন্যান্য দিকগুলি (যেমন চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতি) যে খানিকটা উপেক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ডাঃ ব্যালার্ডও স্বীকার করিয়াছেন এবং সেইজন্য তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত 'Columbian Mental Test'-এ 'Common Sense Test' নামে কতকগুলি প্রশ্ন সংযোজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে সময়ের ক্ষিপ্রতার চেয়ে চিন্তা ও বিচার শক্তির দিকটিতেই অধিকতর ভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছিল।

ম্যাক্‌সওয়েল গারনেট (Maxwell Garnett) বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে যে "c' factor" বা রসিকতা চাতুর্য প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন, তাহার পরিচয়ও এই গণমাপকগুলির মধ্যে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না।

বুদ্ধির যে আর একটি দিক আছে, যাহা নিষ্ঠা, একাগ্রতা, অধ্যবসায় প্রভৃতির ভিতর দিয়া আরব্ধ সাধনাকে সিদ্ধির দ্বারদেশে লইয়া যায় এবং যাহার অভাবে প্রতিভার ক্ষণিকস্ফুরণে কোনও তত্ত্বই আলোকিত হয় না এবং যাহাকে ডাঃ ওয়েব (Webb) "w factor" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহার পরিচয়ও এই গণ-মাপকের মধ্যে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না।

গণ-মাপকে অভ্যাসগত যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতাকে অনেক সময় বুদ্ধিগত ক্ষিপ্রতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ইহাতে নির্জলা বুদ্ধির হিসাব পাওয়া যায় না। ডাঃ ব্যালার্ড দেখাইয়াছেন, একজন লোক যদি আর একজনের চেয়ে দ্বিগুণ ক্ষিপ্রতার সহিত একটি বড় যোগের অঙ্ক কষিতে পারে, তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে না যে, সেই লোকটি দ্বিতীয় লোকটির চেয়ে দ্বিগুণ বুদ্ধিমান। কারণ প্রথম লোকটি হয়ত দ্বিতীয় লোকটির চেয়ে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে অধিকতর অভ্যস্ত। অভ্যাসগত যান্ত্রিক সহজসাধ্যতা ও ক্ষিপ্রতা আর স্বাভাবিক বুদ্ধিজনিত ক্ষিপ্রতা এক নহে। আমেরিকার গণ-মাপকগুলি মূলতঃ

সময়গত পরীক্ষা বলিয়াই তাহার মধ্যে অভ্যাসগত ক্ষিপ্রতা বুদ্ধিগত ক্ষিপ্রতার ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া থাকে।

গণ-মাপকের পরীক্ষার দ্বারা মানুষের প্রতিভার বিচিত্র দিকের পরিচয় মিলে না। তথ্যের উপস্থাপন ও গ্রন্থন-নৈপুণ্য, যুক্তির শৃঙ্খলা, চিন্তার পারম্পর্য, সৃজনীশক্তি প্রভৃতির সন্ধান এই গণ-মাপকের দ্বারা পাওয়া যায় না। একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক বলিয়াছেন, প্রতিভাশালী ব্যক্তির হাতে পড়িলে তালিকা মালিকাতে পরিণত হয়। কথাটা সত্য। যে প্রতিভা শুষ্ক ঘটনার তালিকা হইতে কাব্য-উপন্যাসের মালিকা, ইট-কাঠ পাথরের স্তূপ হইতে তাজমহল, অস্ফুট মনোভাবকে স্ফুটতর করিতে পারে, সেই প্রতিভার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা বড় আদর্শ হইতেছে মানুষের মধ্যে যুক্তি-শৃঙ্খলার বিকাশ করা। কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিই অধিনায়কত্ব করিতে পারে যাহার মধ্যে একটা সুসংস্কৃত, সুপরিচ্ছন্ন, সুসমৃদ্ধ যুক্তিশৃঙ্খলা ধরিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা বর্তমান। প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনার মধ্যে এই যুক্তিশৃঙ্খলার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গণ-মাপকের প্রশ্নগুলির উত্তর হিসাবে রেখা টানা, টিক্ দেওয়া, ঢেরা কাটা প্রভৃতির মধ্যে এই যুক্তিশৃঙ্খলার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় হইতেছে সৃজনীশক্তি। যে শক্তি আমাদের দুঃখ-সুখ, হাসি আর অশ্রুকে উজ্জ্বল করিয়া, সুন্দরতর করিয়া চিত্রিত করিতে পারে, সে শক্তিটিও অবহেলার বস্তু নহে। অথচ মনস্বিতার যে দিক দিয়া এই শিল্প বা সৃজনীপ্রতিভা অভিব্যক্ত হয়, তাহার সন্ধানও এই গণ-মাপকের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই সৃজনীশক্তি মানুষের বহু মূল্যবান সম্পদ। ইহা শুধু যে নূতন সৃষ্টিই করে, তাহা নহে, ইহাই আবার আবেগের সহিত মিলিত হইয়া মানুষকে জাগ্রত করিতে, উত্তেজিত করিতে, প্রবুদ্ধ করিতে, ক্ষিপ্ত করিতে সাহায্য করে। বুদ্ধ বা চৈতন্যের গৃহত্যাগ হইতে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত অনেক বড় বড় ব্যাপারই নিছক বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া সংঘটিত হয় নাই। পরন্তু হইয়াছে যে শক্তির দ্বারা তাহার পরিচয় গণ-মাপকের মধ্যে পাওয়া যায় না।

আরও একটি কথা আছে। যে বুদ্ধিকে আমরা মনস্বিতাংশ (I. Q.)

দিয়া চিনিয়া লই, তাহা কি এতই মূল্যবান্? Isabel Newitt তাঁহার 'Curative Education' নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, বর্তমান সময়ে বুদ্ধির গৌরবে বিভ্রান্ত হইয়া মানুষ যেন ক্রমশঃ হৃদয়হীন যন্ত্রে পরিণত হইতেছে। তাই সে আজ তাহার হৃদয়ের দাবী ও অন্তরের সত্যকে ছোট করিয়া স্বার্থ-সর্বস্ব বুদ্ধির নির্দেশটিকেই যেন বেশী করিয়া মানিতে চায়। ফলে মানুষের হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্কের ভারসাম্য ব্যাহত হইতেছে, তাহার বুদ্ধি যত বাড়িতেছে আত্মা ততই সঙ্কুচিত হইতেছে, হৃদয় ততই শুখাইয়া যাইতেছে।

Newitt বলেন, মানুষের মাথার মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, I. Q. দিয়া যে বুদ্ধির পরিচয়, সেই বুদ্ধি ছাড়াও আর এক জাতীয় বুদ্ধি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আসন পাতিয়া অপেক্ষমান আছে। অপরের সুখ ও দুঃখ সহজেই বুঝিতে পারা, সংঘর্ষ বর্জন করিয়া জগতের সঙ্গে চলা-ফেরা করিতে পারা, অন্তর্দৃষ্টি দিয়া জগতকে দেখিতে সমর্থ হওয়া, অপরের স্বার্থ ও সুখ-সুবিধাকে সহানুভূতির সহিত দেখা—এই জাতীয় বুদ্ধির কাজগুলির কেন্দ্র মস্তিষ্কে অবস্থিত নহে, তাহা হৃদয়ের জিনিস। গণ-মাপকে I. Q. নির্ণয় করিবার সময় বুদ্ধির ঐশ্বর্যকে দেখা হয়, কিন্তু হৃদয়ের মাধুর্যকে গণনার মধ্যে আনা হয় না। মানুষের পূর্ণ পরিচয় শুধু তাহার মস্তিষ্ক দিয়া নহে। কারণ বুদ্ধির ভিতর দিয়া যে শক্তি আমাদের আয়ত্ত হয়, তাহা হৃদয়ের নির্দেশে সংযত না হইলে, নীতির নির্দেশে পূত না হইলে, সে বুদ্ধি সমাজের কোন কল্যাণই করিতে পারে না। শুধু I. Q. দিয়া, শুধু "স্মার্টনেস্" দিয়া সব কাজ সিদ্ধ হয় না, মনস্তাত্ত্বিকদিগের এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। তাঁহারা মানুষের যখন বিচার করিবেন, অথবা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করিবেন, তখন তাঁহারা যেন পূর্ণ মানুষটির বিচার করেন। এই পূর্ণ মানুষটির পরিচয়ই হইতেছে মানুষের নির্ভুল পরিচয়। সেই জন্যই গণ-মাপকের বিচারটিকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে প্রার্থীর মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের বিচারও করিতে হইবে। তাহার চরিত্র, নীতিবোধ প্রভৃতি ও দেখিতে হইবে।

বুদ্ধির স্বরূপ ও সংজ্ঞা

"শাস্ত্রাণ্যধিত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ"—শাস্ত্র-জ্ঞান থাকিলেও অনেকের আচরণই মূর্খের মত হয়। এই জন্যই দরকার শাস্ত্রজ্ঞানকে জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে প্রয়োগ। জ্ঞানের অপেক্ষাও বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, প্রতিভা প্রভৃতির প্রয়োজন হয়ত বেশী। নির্বোধ পণ্ডিত-মূর্খের চেয়ে অনেক সময় নিরক্ষর বুদ্ধিমান লোকের দ্বারা বেশী কাজ হয়। মানুষ কিছুতেই নির্বোধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে রাজী হয় না। এমন কি অতি অল্প বয়স্ক ছাত্ররাও বুদ্ধির দৈন্যকে মানিয়া লইতে রাজী নয়। তাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াও অনেকে বড়াই করে, 'পড়লে ভাল ফল করতে পারতুম'। এইরূপ উক্তির মধ্যে বুদ্ধির অনুচ্চারিত জয়ধ্বনিই শুনিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধির এই গৌরবের কারণ বোধহয় বুদ্ধি জিনিসটা মানুষের একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে বলিয়া। এই বুদ্ধির স্বরূপ কি? বুদ্ধি কাহাকে বলে?

এই প্রশ্নের উত্তরটি খুব সহজ নহে। ইহা এমনই যে যাহা আমরা সাধারণভাবে বুঝিতে পারি, কিন্তু বুঝাইতে পারি না। সেই জন্যই বুদ্ধির সম্বন্ধে শত শত সংজ্ঞার সৃষ্টি হইয়াছে এবং আজ পর্যন্ত বুদ্ধির স্বরূপ এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটা সার্বজনীন মতবাদের সৃষ্টি হয় নাই।

বুদ্ধির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য:

বুদ্ধি সম্বন্ধে জটিল বিতর্কগুলি উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া আমরা বলিতে পারি, বুদ্ধি জিনিসটা যে জন্মগত ব্যাপার ইহা প্রায় অবিসংবাদিত। বর্তমান বিজ্ঞানও বুদ্ধির এই জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং অপরিবর্তনীয়তাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে*। বিজ্ঞান বুদ্ধির সহিত বয়সের একটা অনুপাতও স্বীকার করে। সাধারণ বিচারেও আমরা বুদ্ধির সহিত বয়সের সম্পর্কটা মানিয়া লই। "বালকটি খুব বুদ্ধিমান্" এই কথা বলিলে ইহাই বুঝায় যে, বালকটি পাঁচ বা সাত বৎসর বয়সে যাহা বুঝিতে বা করিতে পারে, অন্য বালকেরা হয়ত আট দশ বৎসর বয়সেও তাহা ভালভাবে করিতে পারে না।

---

* বর্তমানে কিন্তু অনেক পণ্ডিতেরাই এই কথাটি মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধ্যঙ্কের (I. Q.) হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে।

জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগাযোগ আছে কি? বাস্তব জগতে জ্ঞান-নিরপেক্ষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া কঠিন। বুদ্ধি কথাটাই আসিয়াছে বুধ্ হইতে, যাহার অর্থ হইতেছে "জানা"। অথচ নিছক জ্ঞান বা অসংবদ্ধ বিদ্যা যে বুদ্ধিকে প্রখরতর করে না, তাহা নানা দেশেরই পণ্ডিত-মূর্খদের গল্প হইতে বুঝিতে পারা যায়। বাস্তব জ্ঞানের সঞ্চয়কে ক্ষিপ্রভাবে কাজে লাগাইয়া জগতের বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে সার্থক সমাধানে পৌঁছাইবার ক্ষমতার মধ্যেই আছে বুদ্ধির পরিচয়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাহাকে I. Q বা মনস্বিতাংশ বলা হয়, তাহাও বয়সের অনুপাতে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রমাণ দেওয়ার মধ্যেই নিহিত।

মনস্বিতাংশের ব্যঞ্জনাটির কথা বাদ দিয়া সাধারণভাবেই যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বুদ্ধি বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি, তাহা হইলে নানা মুনির নানা মতের সন্ধান পাওয়া যাইবে: কেহ বলিবেন, বুদ্ধি হইতেছে নূতন নূতন প্রয়োজনে চিন্তাকে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা (Stern, 1914)[1]। কেহ বলেন, ইহা হইতেছে সূক্ষ্ম চিন্তা করিবার ক্ষমতা (Terman, Plato)[2]। কেহ কেহ বলেন, ইহা হইতেছে নূতন নূতন জীবন-পরিবেশে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা (Pinter)[3]। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা হইতেছে শিক্ষা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা (Colvin, Freeman, 1940)[4]।

এই শিক্ষা-গ্রহণের ক্ষমতা প্রসঙ্গে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের তথা মস্তিষ্কের কথা আসিয়া পড়ে। যে ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্র এমন সমস্ত উপাদানে প্রস্তুত যে তাহাতে অভিজ্ঞতার ছাপগুলি সহজেই অঙ্কিত হইয়া যায় এবং সেই ছাপগুলি স্থায়ীভাবে থাকিয়া যায়, তাহাকেই বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করা যাইতে

(1) "—a general capacity of the individual consciously to adjust his thinking to new requirements"—Stern.

(2) "An individual is intelligent in proportion as he is capable of abstract thinking"—Terman.

(3) "—the ability of the individual to adapt himself adequately to relatively new situations of life'—Pinter.

(4) "—Capacity to learn" Colvin; "—ability to learn actions or to perform new actions that are functionally useful"—Freeman.

পারে। অপরপক্ষে যাহার শরীরে স্নায়ুপথ সহজে তৈয়ারী হয় না এবং যাহার মধ্যে অনুষঙ্গত বন্ধনগুলি সহজে সৃষ্টি হয় না, তাহাকেই নির্বোধ বলা হয়। যাঁহারা এইভাবে বিচার করেন, তাঁহাদের মতে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি হইতেছে উৎকৃষ্ট স্নায়ুতন্ত্রের ফল মাত্র। স্ট্যাণ্ডিফোর্ড প্রভৃতি এই জাতীয় মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে, অন্ততঃ শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়া 'বুদ্ধি' এবং "শিক্ষা-গ্রহণের" ক্ষমতা প্রায় সমার্থবোধক।

বুদ্ধির এই দেহ-তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা ছাড়াও জীবতত্ত্বমূলক (biological), সমাজতত্ত্বমূলক এবং বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যাও আছে।

পেটারসন-এর (Peterson) মতে বুদ্ধি হইতেছে "a biological mechamism by which the effects of a complexity of stimulii are brought together and given a somewhat unified effect in behaviour." (1921, symposium)।

থার্সটন (Thurstone) বলেন, বুদ্ধির তিনটি দিক আছেঃ (১) জন্মগত প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করা, (২) দমিত প্রবৃত্তিগুলিকে সুসংস্কৃত করিয়া কল্পনাশক্তির প্রভাবে সেগুলিকে একটা ব্যবহারিক রূপ দেওয়া এবং (৩) সেই সুসংস্কৃত প্রবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এমনভাবে পরিচালিত করা যাহাতে সামাজিক জীব হিসাবে ব্যক্তির সুবিধা হয় (1921, symposium)। বলা বাহুল্য, থার্সটন-এর এই শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে থর্ণডাইকএর (১) বিমূর্ত্ত বা সূক্ষ্ম (abstract) বুদ্ধি, (২) সামাজিক বুদ্ধি এবং (৩) ব্যবহারিক বুদ্ধি—এইপ্রকার শ্রেণীবিভাগের একটা প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

Boynton তাঁহার 'Encyclopoedia of Educational Research'-এ 'বুদ্ধি ও বুদ্ধির পরীক্ষা' নামক প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, বুদ্ধি হইতেছে মানুষের একটি জন্মগত শক্তি, যাহা দ্বারা সে নিজের এবং সমাজের প্রয়োজনে তাহার জীবন-পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে অথবা সেই পরিবেশের সংস্কার বা পুনর্গঠন করিতে পারে ("ability to adopt to and reconstruct the factors of his environment in accordace with the most fundamental needs of himself and his group" : 1941)।

বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ মতবাদের গহনতা উদ্ভিন্ন করিয়া একটা সর্বজন-স্বীকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এবং আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধির সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে পণ্ডিতসভা (Syposium) আহূত হয়। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হয় নাই এবং বুদ্ধি সম্পর্কে স্মৃতি, অভিনিবেশ, কল্পনা, ভাষাজ্ঞান, যুক্তিশৃঙ্খলা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষিপ্রকারিতা, অনুভূতির তীব্রতা প্রভৃতি গুণগুলির কোন্‌টির প্রভাব কতখানি তাহাও স্থিরীকৃত হয় নাই। অথচ মজা এই যে, যাহার স্বরূপটি এখনও স্থির হইল না, তাহার পরিমাণ ও নিরিখ লইয়া বহু গবেষণা ও সিদ্ধান্তই পণ্ডিতেরা বহুদিন হইতেই করিয়া আসিতেছেন এবং বুদ্ধির মাপকাঠির সন্ধান তাঁহারা যে অভ্রান্তভাবেই পাইয়াছেন, ইহাও যেন বর্তমানে সর্বজন-স্বীকৃত।

কিভাবে ইহা সম্ভব হইল? কাহারও মতে, একটি জিনিস মাপিতে হইলে তাহার স্বরূপটি যে জানিতেই হইবে এমন কথা কি আছে! আমরা বিদ্যুতের স্বরূপ জানি না, অথচ বিদ্যুতের 'ইউনিট্' মাপিয়া থাকি।

স্পায়ারম্যান বলেন, এ যুক্তি ঠিক নহে, কারণ বৈদ্যুতিক শক্তির 'ইউনিট্' মাপিবার সময় জানার দরকার সারকিট্ (circuit)-এর মধ্যে কি কি আছে। বুদ্ধির সারকিটের মধ্যে স্মৃতি, অভিনিবেশ, কল্পনা প্রভৃতি আছে কি? আরও প্রশ্ন আছে। বুদ্ধি কি একটি প্রধান কেন্দ্রীয় শক্তির লীলা? অথবা দু'চারটি প্রধান প্রধান শক্তির লীলা? অথবা পরস্পরনিরপেক্ষ অনেকগুলির শক্তির লীলা?

যে বৎসর বিণে (Binet) তাঁহার বিখ্যাত "মেট্রিক স্কেল" প্রথম আবিষ্কার করেন, তাহার এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান যখন বুদ্ধির স্বরূপ ও নিরিখ লইয়া দীর্ঘ গবেষণা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার মনে এই জাতীয় প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি দেখিলেন, বুদ্ধি সম্বন্ধে যত মতামত প্রচলিত আছে সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) রাজতন্ত্রবাদ (monarchic doctrine);

(২) সামন্ততন্ত্রবাদ (oligarchic doctrine); (৩) অরাজকতাবাদ (anarchic doctrine).

রাজতন্ত্রবাদ: এই মতে বুদ্ধি হইতেছে একটি অধিরাজ্ কেন্দ্রীয় শক্তির লীলা। এই কেন্দ্রীয় শক্তি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়, ফলে যাহার এক বিষয়ে বুদ্ধি বা দক্ষতা আছে, সে অন্য বিষয়েও বুদ্ধি বা দক্ষতা দেখাইতে পারে। এই জাতীয় মতবাদের ফলেই ডাঃ জনসন্ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, নিউটনও মহাকাব্যের রচয়িতা হইতে পারিতেন, যদি তিনি তাঁহার প্রতিভাকে গণিতের দিক হইতে কাব্যের দিকে পরিচালিত করিতেন। সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষার ব্যাপারে যে গণিত, দর্শন বা সাহিত্যের দক্ষতা দেখিয়া লওয়া হয়, তাহার মূলেও এই জাতীয় একটা বিশ্বাস আছে যে, যে-ব্যক্তি গণিত বা দর্শনে বুদ্ধি দেখাইতে পারিবে, সে রাজকার্য পরিচালনাতেও বুদ্ধি দেখাইতে পারিবে। স্টার্ণ, হার্ট, উড্রো, বার্ট, ব্যালার্ড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই জাতীয় মতবাদ পোষণ করেন। এই কেন্দ্রীয় শক্তিকে কেহ বা "General ability", কেহ বা "All rouud efficiency, কেহ বা "General efficiency" প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন।

সামন্ততন্ত্রবাদ: এই মতে বুদ্ধি একটি অধিরাজ কেন্দ্রীয় শক্তির ফল নহে, ইহা দু'চারটি প্রধান প্রধান শক্তির সম্মিলিত ফলমাত্র। বিণে, টারম্যান্, উড্ওয়ার্থ, মাক্সওয়েল্, গারনেট্ প্রভৃতি এই জাতীয় মতবাদে বিশ্বাস করেন। বিণে বলেন, বুদ্ধির তিনটি দিক আছে: (১) উদ্দেশ্য-মূলক ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা, (২) পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা এবং (৩) দোষগুণ বিচারের ক্ষমতা। উড্ওয়ার্থ বলেন, বুদ্ধির মধ্যে সাতটি শক্তির প্রভাব আছে: (১) অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইবার শক্তি, (২) পর্যবেক্ষণ শক্তি, (৩) শিক্ষার প্রয়োগ শক্তি, (৪) পরিবেশকে বুঝিবার শক্তি, (৫) অধ্যবসায়, (৬) সমস্যাকে আয়ত্ত করিবার শক্তি এবং (৭) অনুসন্ধিৎসা। গারনেট্ বলেন, বুদ্ধির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি ('g' factor) এবং আর একটি চতুরতা-রসিকতা (cleaverness)

জাতীয় শক্তি ('c' factor) আছে। গারনেটের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা পরে হইবে।

অতীত যুগের তথাকথিত faculty psychoology-তে এই জাতীয় (oligarchic) মতবাদকে খানিকটা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। অবশ্য অভিনিবেশ, স্মৃতি, বিচার শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য সম্পর্ক-নিরপেক্ষ শক্তির (faculty) অস্তিত্ব স্বীকার করিলে মনের অখণ্ড একত্বকে অস্বীকার করিতে হয়। তাহা সত্বেও, মনের কার্য বিচার করিতে হইলে এগুলিকে না মানিয়াও উপায় নাই। এই জন্যই স্পীয়ারম্যান বলিয়াছেন, এই faculty-গুলি প্রত্যেক খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হইলেও পরিণামে জয়ী হয়; এই মতবাদ মৃদু মলয়ের স্পর্শেই নতশির হইয়া পড়ে, অথচ প্রবলতম ঝটিকাও ইহাকে উৎখাত করিতে পারে না।

অরাজকতাবাদ : এই মতে বুদ্ধি একটি অধিরাজ কেন্দ্রীয় শকির ফল নহে, অথবা দু'চারটি প্রধান প্রধান শক্তির ফলও নহে, ইহা হইতেছে পরস্পর নিরপেক্ষ অনেকগুলি অরাজক শক্তির লীলা। কোনও ব্যক্তি যদি এক বিষয়ে বুদ্ধি দেখায়, তাহা হইলে সে যে অন্যান্য বিষয়েও বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। এই মতের পরিপোষক থর্ণডাইক বলেন, বুদ্ধি হইতেছে পরস্পর নিরপেক্ষ অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তির ("a host of highly particularised and independent faculties") ফলমাত্র। জি. এইচ. টমসনও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। তাঁহার মতে বুদ্ধি হইতেছে "মেণ্ডেলীয় এককের" (Mendelian unit : 'বংশগতি ও উত্তরাধিকার' পঃ দ্রঃ) মতো কতকগুলি পিতৃপুরুষাগত সহজাত বৈশিষ্ট্য, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নাই এবং সেগুলি কোনও কেন্দ্রীয় শক্তির (General Factor) ফলমাত্র নহে। তিনি বলেন, "If there be a 'General Factor' at all, it might be the Power to shake down rapidly into good team work."

স্পীয়ারম্যান-এর মতবাদ :

বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান-এর মতবাদটি এই সমস্ত

মতবাদের সমন্বয়ধর্মী। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বুদ্ধিগত প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা সাধারণ বা কেন্দ্রীয় শক্তির ('g' factor) লীলা আছে এবং এই সাধারণ শক্তিটি ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শক্তির ('s' factor) লীলাও আছে। এই কেন্দ্রীয় শক্তি বা ('g' factorটি বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে একই প্রকারে কাজ করিবে; কিন্তু 's' factor-গুলির মধ্যে পরস্পর কোনও প্রকার সম্পর্ক নাই। ফলে একটি বা দুইটি বিশেষ ব্যাপারে একজন যদি দক্ষতা দেখায়, তাহা হইলে অন্য বিষয়গুলিতেও যে সেই লোকটি দক্ষতা দেখাইতে পারিবে এমনও নিশ্চয়তা নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একজন ব্যক্তির কেন্দ্রীয় শক্তিটি ('g' factor) দুর্বল, ইহার ফলে সে জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকৃতকার্য হইবে। কিন্তু তাহা সত্বেও সে হয়ত ভাল তবলা বাজাইতে ও ছবি আঁকিতে পারে। এই ছবি আঁকা ও তবলা বাজান ব্যাপারটি তাহার বিশেষ শক্তি বা 's' factor-এর ফল। এই বিশেষ বিদ্যাটিতে সে দক্ষতা দেখাইয়াছে বলিয়াই তাহার সাধারণ বুদ্ধিও যে খুব ভাল হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ফলে যে-ব্যক্তি তবলার তাল-জ্ঞানে অদ্ভুত দক্ষতা দেখাইয়াছে, সেই হয়ত সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত কাব্য ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে অতি সাধারণ বুদ্ধির পরিচয়ও দিতে পারিবে না। স্পীয়ারম্যান-এর মতে মানুষের বুদ্ধি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইতেছে এই 'g' factor এবং বহু 's' factor-এর সম্মিলিত ফলমাত্র।

স্পীয়ারম্যান যখন প্রথম এই মতবাদটি প্রচার করেন তখন অনেক মনস্তাত্ত্বিকই তাহার প্রতিবাদ করেন। অধ্যাপক গডফ্রে টমসন (Godfrey Thomson যিনি বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে অরাজকতা মতবাদের পোষক) গণিত শাস্ত্রের জটিল আলোচনার মধ্য দিয়া প্রমাণ করেন যে, স্পীয়ারম্যানের সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্ত। কিন্তু স্পীয়ারম্যান ইহার পর দীর্ঘ ২৫ বৎসরের গবেষণায় প্রমাণ করেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি শুধু গণিত শাস্ত্রের নয়, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার দিক দিয়াও সত্য।

তিনি বলেন, মনের বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক বা অনুবন্ধ

(co-relation) আছে। ফলে a b p q-কে যদিও যথাক্রমে মানুষের বিপরীতার্থক শব্দ বুঝিবার ক্ষমতা (opposites), পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা (discrimination), শূন্যপদ পূরণের ক্ষমতা (completion) এবং অযৌক্তিক পদটি কাটিয়া দিবার ক্ষমতা (cancellation)—এই চারিটি মানসিক ক্ষমতা বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে—

$rap \times rbq - raq \times rbp = 0$ এই সমীকরণটি পাওয়া যায়।

এই সমীকরণটি (tetrad equation) প্রমাণ করা কঠিন নহে। যদি ধরা হয় a এবং pর অনুবন্ধ হয় 0.80, b এবং qএর 0'09, a এবং qএর 0·30, আর b এবং pর 0·24, তাহা হইলে ঐ tetrad equationটির মান বসাইলে $0{\cdot}80 \times 0{\cdot}09 - 0{\cdot}30 \times 0{\cdot}24 = 0$ এই সমীকরণটি সিদ্ধ হয়।

স্পীয়ারম্যান বলেন, মানুষের বিভিন্ন শক্তির এই যে পারস্পরিক সম্পর্ক (co-relation) ইহার কারণ হইতেছে এই যে, এই বিভিন্ন শক্তিগুলি একটি অধিরাজ কেন্দ্রীয় শক্তির ('g' factor) সহিত সম্পর্কিত।

এই কেন্দ্রীয় শক্তিটি কি? শরীরতত্ত্বের বিচারে ইহা হয়ত স্নায়ুতন্ত্রের সমৃদ্ধি; গ্রন্থিতত্ত্বের বিচারে ইহা হয়ত বিভিন্ন নিচ্ছিদ্র গ্রন্থির রসক্ষরণের সমতা; মনস্তত্ত্বের বিচারে ইহা হয়ত তথাকথিত সাধারণ বুদ্ধি বা মানসিক শক্তি। বস্তুতঃ ইহা এমনই একটা শক্তি যাহা কর্ম হইতে কর্মান্তরে মানুষের দক্ষতাকে সঞ্চারিত করিতে পারে, যাহার জন্য মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে সহজেই শিক্ষাগ্রহণ ও দক্ষতা-অর্জন করিতে পারে। ইহার সহিত স্মৃতিশক্তির তেমন কোনও সম্পর্ক নাই, তবে তথাকথিত যুক্তি, পরিচ্ছন্নতা (clearness) ক্ষিপ্রতা, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতির সহিত যেন একটা সম্পর্ক আছে।

এই কেন্দ্রীয় শক্তির ('g' factor) সহিত একটা বিশেষ শক্তির ('s' factor) অনেক ক্ষেত্রেই একটি বিশিষ্ট রকমের অনুপাত আছে এবং এই অনুপাত হইতে মানুষের অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার দক্ষতা কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণীও করা যাইতে পারে। স্পীয়ারম্যান বলেন, 'g' factor-এর সহিত সংস্কৃত, ল্যাটিন্, গ্রীক্ প্রভৃতি ক্লাসিক্স্ ভাষার

দক্ষতার অনুপাতটি হইতেছে ১৫-র সহিত ১-এর অনুপাতের সমান, অপর পক্ষে 'g' factor-এর সহিত সঙ্গীতের অনুপাতটি হইতেছে ১-এর সহিত ৪-এর সমান। এই অনুপাতটি হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা চলে যে, যে-ব্যক্তি ক্লাসিক্স্-এ ভাল, সে অন্যান্য বিষয়েও খানিকটা ভাল হইবে। অপর পক্ষে যে-ব্যক্তি সঙ্গীতে ভাল, সে কেন্দ্রীয় শক্তির ('g' factor) সমৃদ্ধির জন্য অন্যান্য বিষয়েও যে ভাল এমন একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নহে। কারণ, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে "s factor"-টিই বলবত্তর এবং এই "s factor" বুদ্ধির অন্যান্য দিকের প্রতি কোনও ইঙ্গিতই করিতে পারে না।

এই কেন্দ্রীয় অধিরাজ শক্তির সহিত বিশেষ বিশেষ শক্তির ('s' factor) অথবা বিশেষ শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ? স্পীয়ারম্যান বলেন, কেন্দ্রীয় অধিরাজ শক্তিটি হইতেছে যেন একটি মূল উৎস এবং ইহা হইতে বিভিন্ন স্রোতোধারা বহির্গত হইয়া বিভিন্ন মানসিক শক্তিকে ('s' factor) সমৃদ্ধ করিতেছে। ফলে এই বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির মধ্যেও একটা জাতিত্বের সম্পর্কের মত পারস্পরিক অনুবন্ধ থাকে। অপর পক্ষে থর্নডাইকের মতে বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলিই ('s' factor) হইতেছে বুদ্ধির মূলতত্ত্ব, ইহাদের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব বা ভ্রাতৃত্বের কোনও বন্ধন নাই। তবে বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে লক্ষ্য করিলে যেমন কয়েকটি সাধারণ গুণনীয়ক পাওয়া যায়, তেমনই বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যও দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মাত্রা অনুসারেই বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক বা অনুবন্ধ নির্ণীত হয়।

স্পীয়ারম্যান-এর বুদ্ধি সম্বন্ধে মতবাদটিকে সাধারণতঃ "দুইটি গুণনীয়ক মতবাদ" (two factor theory) বলা হয়। এই মতবাদটি বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়ধর্মী। স্পীয়ারম্যান নিজেও তাঁহার মতবাদকে electic বা সমস্ত মতবাদের সংগ্রহমূলক মতবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অভিমতটি নিরর্থক নয়। কারণ রাজতন্ত্রবাদ হিসাবে তিনি বুদ্ধির অধিরাজ একটি কেন্দ্রীয় শক্তিকে ('g' factor) স্বীকার করিয়াছেন, সামন্ততন্ত্রবাদ হিসাবে বিভিন্ন

মানসিক শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন এবং অরাজকতাবাদ হিসাবে পরস্পর নিরপেক্ষ 's' factorকেও স্বীকার করিয়াছেন।

অন্যান্য মতবাদ :

ডঃ ওয়েব বুদ্ধি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া স্পীয়ারম্যান-এর 'g' factor, 's' factor প্রভৃতি ছাড়া আর একটি factor-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতেছে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধ্যবসায় (persistence of motive)। বুদ্ধি সম্বন্ধে কাহার সম্ভাবনা কতটুকু তাহা নির্ণয় করিতে হইলে ব্যক্তি বিশেষের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ক্ষমতা জানিবার প্রয়োজন হয়। বাস্তবিক যে প্রতিভা শুধু "চমকে ঝলকে" ফুটিয়া উঠে, ক্ষণিকের আলোক দেখা দেয়, পলকে মিলাইয়া যায় এবং নিজের পূর্ণ পরিচয় না দিয়াই "চকিত নূপুরে" চলিয়া যায়, তাহাকে দিয়া বিশেষ কোনও কৃচ্ছ সাধ্য সাধনার সিদ্ধি আয়ত্ত হয় না। এইজন্যই কাহারও বুদ্ধির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে হইলে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের শক্তির কথাগুলি চিন্তা করা উচিত। এইজন্যই অনেক পণ্ডিত অধ্যবসায়কেই প্রতিভার মূলতত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। হোগার্থ বলিয়াছেন, "I know no such thing as geninus—genius is nothing but labour and deligence." প্রতিভার মধ্যে যে একটা অলৌকিক শক্তি আছে, তাহার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ ইহাকে দৈব প্রেরণার প্রভাব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু দৈব প্রেরণাকে বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি দিয়া মাপা যায় না এবং যাইলেও সেই প্রেরণাকে সফল করিবার জন্যও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন আছে। এইজন্য বারট্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন, "Genius is one per cent inspiration and ninety nine per cent perspiration." এক্ষেত্রেও অধ্যবসায়েরই জয়গান করা হইয়াছে।

ম্যাক্সওয়েল গারনেট বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে 'g' factor ছাড়া আর একটি factorএর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে 'c' factor ; মানুষের রসিকতা ও রসবোধ, মৌলিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি এই 'c' factorএর পর্যায়ে পড়ে। তিনি বলেন, বুদ্ধি জিনিসটি শুধু অধিরাজ কেন্দ্রীয় শক্তি বা 'g' factorএর ফলও নহে, আবার নিছক 'c' factorএর ফলও

নহে ; ইহা হইতেছে এই দুইটি শক্তির সম্মিলিত ফল। তিনি বলেন, "It is probable that genius, as the word is commonly understood, is more directly measured by $E = \sqrt{g^2c^2}$ than by 'g' (measuring General Ability or capacity to concentrate attention) alone, or even by 'c' (measuring cleverness as we have defined it, or tendency to associate by similarity) alone."

ডঃ ওয়েব-এর আবিষ্কৃত 'w' factor এবং গারনেট-এর 'c' factor এই দুইটির আবিষ্কারের দ্বারা মানুষের প্রতিভার স্বরূপ ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অভ্রান্তভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। যিনি বাস্তবিক প্রতিভাশালী তাঁহার 'g' এবং 'c' দুইটি factorই থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই দুইটির সহিত 'w' factor যদি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভা শুধু "চমক ঝলকে"ই প্রকাশিত হইবে এবং তাহা দ্বারা কোনও একটানা পরিশ্রম বা চিরায়িত আবিষ্কারের কাজ হইবে না।

আবার যে-ব্যক্তির উৎকৃষ্ট 'w' আছে, কিন্তু 'g' বা 'c' ভাল নাই, তিনি শুধু অধ্যবসায়ের জোরেই অনেকখানি কৃতী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কাজের মধ্যে মৌলিকতা বা সৃষ্টির নূতনত্ব থাকিবে না। অপরপক্ষে, কোনও ব্যক্তির যদি 'w' এবং 'g' ভাল হয়, কিন্তু 'c'টি ভাল মাত্রায় না থাকে, তাহা হইলে তিনি অধ্যবসায়ী পণ্ডিত বা গবেষক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার লেখা বা কথা বার্তার মধ্যে রসিকতার দ্যুতি থাকিবে না, কাব্যের সরসতা বা ভাবের ব্যঞ্জনা থাকিবে না। তিনি হয়ত বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক রচনায় কৃতকার্য হইবেন, কিন্তু যাঁহাদের Romantic (সাহিত্য সমালোচনার ভাষায়) শ্রেণীর ঐতিহাসিক বলা হয়, তাঁহাদের মত ঐতিহাসিক উপাদানের শুষ্ক কঙ্কালের উপর কল্পনার রক্তমাংস সংযোজন করিয়া প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করিতে পারিবেন না, অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জিনস্ (Jeans) প্রভৃতির মত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিকে উপন্যাসের মত সরস করিয়া উপস্থাপিত করিতে পারিবেন না। অবশ্য ঐতিহাসিক গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপস্থাপনে কাব্য অলঙ্কারের খাদ মিশাইয়া বিষয়টিকে চমৎকার করিয়া তোলা আদৌ উচিত কিনা, এ প্রশ্নও উঠিতে পারে। তবে সে প্রশ্নের বিচার উপস্থিত অবান্তর।

উপসংহার : বুদ্ধি সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিলে দিশেহারা হইয়া যাইতে হয়। মনীষী ব্যালার্ডের কথায় বলা যায়, এই সমস্ত আপাতঃ প্রতীয়মান বিরোধী মতবাদের মূলে খানিকটা করিয়া একদেশ-দর্শিতা আছে। বুদ্ধির এক একটি দিকের প্রতি এক একজন পণ্ডিত বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়াই এই সমস্ত বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সমস্ত মতবাদের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বুদ্ধি হইতেছে এমন একটি মানসিক শক্তি, যাহা (১) অসংখ্য রূপে অভিব্যক্ত হয়, (২) স্থূল বিষয়ের চেয়ে সূক্ষ্ম, উচ্চ ও বিমূর্ত (abstract) বিষয়ক চিন্তার মধ্যেই যাহার পরিচয় অধিকতর ভাবে পাওয়া যায়, (৩) যাহা মানুষকে নূতন নূতন পরিবেশ ও নূতন নূতন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে সাহায্য করে, (৪) তত্ত্বানুসন্ধানে বা উপায় উদ্ভাবনে যাহার ক্ষমতা আছে এবং (৫) জ্ঞানের আহরণের চেয়ে জ্ঞানলব্ধ তত্ত্বগুলিকে বিন্যাস-বিশ্লেষণ, উপস্থাপন-গ্রন্থন প্রভৃতির মধ্যেই যাহার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

জ্ঞানের সহিত বুদ্ধির যোগাযোগ সম্পর্কে ব্যালার্ডের সিদ্ধান্ত সমীচীন। তিনি বলেন, জ্ঞান-নিরপেক্ষ মহাশূন্যের মধ্যে বুদ্ধিরও কোনও নিরিখই নির্ণীত হয় না। শুধু তাই নয়, জ্ঞানকে যে যত তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করিতে পারে, সাধারণতঃ তাহাকেই তত বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করা হয়।

ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বুদ্ধির সহিত ক্ষিপ্রকারিতার সম্পর্ক অনস্বীকার্য হইলেও, এ কথাটিও না মানিয়া উপায় নাই যে, অভ্যাসগত দক্ষতা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সমাধানের ক্ষিপ্রতাকে বাড়াইয়া দেয়। ইহা ছাড়া শরীর বা মনের অবস্থা, আগ্রহ প্রভৃতিও আমাদের ক্ষিপ্রতাকে প্রভাবিত করে।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নূতন নূতন পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিবার ক্ষমতা, নূতন নূতন প্রশ্নের সম্মুখীন হইবার ও তাহাদের সার্থক ভাবে সমাধান করিবার ক্ষমতার মধ্যেও বুদ্ধির কাজ আছে, তাহাও প্রায় সর্ববাদিসম্মত। বুদ্ধি প্রসঙ্গে 'cleverness' প্রভৃতি গুণগুলিকেও বাদ দেওয়া চলে না। তাহা হইলে বুদ্ধির স্বরূপটি কি ? কোন্ সংজ্ঞা দিয়া তাহাকে বুঝা যাইবে ?

আমাদের মনে হয়, কোনও সংকীর্ণ সংজ্ঞার গণ্ডীর মধ্যে বুদ্ধির স্বরূপটি বুঝা যাইবে না, ইহার এন্য একটা ব্যাপক সংজ্ঞার প্রয়োজন হইবে। "অভিজ্ঞতার সহিত কারবার করিবার উপযুক্ত একটা সার্বভৌম মানসিক-শক্তি"—এই জাতীয় একটা সংজ্ঞা ব্যবহার করিলে হয়ত বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ করিতে পারা যায়।

ইংরাজ মনস্তাত্ত্বিকগণ বুদ্ধির ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়াই বুদ্ধির কোন সংজ্ঞা দিতে স্বীকৃত হন নাই, এমন কি তাঁহারা 'বুদ্ধি' এই কথাটাই ব্যবহার করিতে চাহেন নাই। এই জন্য বার্ট (Burt) বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়াছেন, "একটি সহজাত মানসিক ক্ষমতা" (an inborn mental efficiency) এবং ব্যালার্ড বলিয়াছেন, বুদ্ধি হইতেছে (একই প্রকার জ্ঞানের সমৃদ্ধি, আগ্রহ ও অভ্যাসগত ক্ষিপ্রকারিতার ক্ষেত্রে) 'একটা আপেক্ষিক সার্বভৌম মানস-দক্ষতা' (Intelligence is the relative general efficiency of minds measured under similar conditions of knowledge, interest and habitation)। শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধি সম্বন্ধে এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট।

জড়বুদ্ধি বালক ও তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

উত্তরাম চরিতে আত্রেয়ী বলিয়াছেন :

"বিতরিত গুরুপ্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন চ খলু তয়ো র্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহরন্তি বা।
ভবতি পুনর্ভূয়ান ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্ তথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ ॥"

বাস্তবিকই গুরু সুমেধা দুর্মেধা নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষা দেন; কিন্তু সে শিক্ষা সর্বত্র ফলবতী হয় না। কাজেই শিক্ষককে পড়াইবার সময় নিজের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে যেমন জ্ঞানবান হইতে হয়, তেমনই ছাত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধেও অবহিত থাকিতে হয়। কারণ, ছাত্রের শিক্ষা-গ্রহণের শক্তি কতটুকু তাহা জানা না থাকিলে অনেক প্রচেষ্টাই ব্যর্থশ্রমে পর্যবসতি হইবে। যেহেতু "ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পঠ্যতে বকঃ"—হাজার চেষ্টা করিয়াও বককে শুকপক্ষীর মত পাঠ শিখান যায় না। এই জন্য ছাত্রদের চিনিবার জন্য তাহাদের বুদ্ধির দৌড় কাহার কতটা, সে সম্বন্ধে একটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

বর্তমানে বিণে, টারম্যান্, ব্যালার্ড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মানুষের বুদ্ধির একটি সার্বজনীন মাপকাঠি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বয়সের অনুপাতে বুদ্ধির 'মান' 'মনোবয়স' প্রভৃতিও বাহির করিয়াছেন। এই সমস্ত মাপকের দ্বারা বুঝা যায়, কে প্রতিভাশালী, কে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, কে বা 'জড়বুদ্ধি'।

জড়বুদ্ধি বলিতে মোটামুটি তাহাদেরই বুঝায় যাহারা বাহির হইতে সাহায্য না পাইলে বাল্যে বা যৌবনে কোনও সময়েই নিজের শক্তিতে নিজে দুনিয়ায় চলাফেরা করিয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে না।

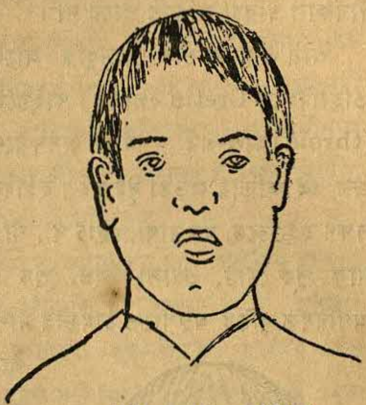
যাহাকে মনোবিজ্ঞানে 'মনস্বিতাংশ' (I. Q.) বলা হয়, তাহার বিচারে এই জড়বুদ্ধিদের শ্রেণীভেদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে করা হয়। ইহার সার্বজনীন নিরিখ নাই বলিয়াই সাধারণতঃ তাহাদিগকে আমরা জড়বুদ্ধি বলি, যাহারা বিদ্যালয়ের সর্বজনপ্রচলিত পঠন-পাঠনের মধ্য হইতে কিছুই

শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না এবং যাহারা বিনা সাহায্যে জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতেও পারে না। ইংলণ্ডে জড়বুদ্ধিদের আইনতঃ সংজ্ঞা হইতেছে (১৯২৭) এইরূপ : "Mental defectiveness means a condition of arrested or incomplete development of mind existing before the age of eighteen years, whether arising from inherent causes induced by desease or injury."

এখন প্রশ্ন—সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা কত জন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। কারণ, মনস্বিতাংশ ৫০ ধরিলে যত জন জড়বুদ্ধি বলিয়া গণ্য হইবে, মনস্বিতাংশ ৭০ ধরিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক জড়বুদ্ধির পর্যায়ে পড়িবে। তাহা হইলেও একটা মোটামুটি ধারণা করা কঠিন নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় পনর লক্ষেরও উপর লোককে বুদ্ধিমাপের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ইহাদের বিভিন্ন ভাবে 'Alpha' এবং 'Beta intelligence test' করিয়া দেখা গিয়াছিল, শতকরা ০.৫ লোককে একেবারে কাজের অনুপযুক্ত বোধে বাদ দিতে হইয়াছিল এবং ০.৬ জনকে নির্বুদ্ধিতার জন্য কুলির কাজ দিতে হইয়াছিল।

জড়বুদ্ধি বালক বালিকাদের মধ্যে যাহারা বয়সে দশ বৎসরেরও কম, তাহাদের মৃত্যুর হার সাধারণ ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশী। কাজেই দেশে কতগুলি করিয়া জড়বুদ্ধি বালক জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হঠাৎ বলিয়া ফেলা সহজ নহে। Haggerty এবং Nash ৬৬৮৮ জন ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জড়বুদ্ধি ছাত্রদের সংখ্যা শতকরা ১.১৫ (যাহাদের মনস্বিতাংশ ৬০-এর কম) এবং যে সমস্ত ছাত্রদের মনস্বিতাংশ ৬০ হইতে ৭০-এর মধ্যে, সেই সমস্ত ছাত্রদের সংখ্যা শতকরা ৫.১; আমেরিকার 'National Commitee for Mental Hygiene' ৫২,৫২৪ জন ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন ; শতকরা ২.২ জন হইতেছে জড়বুদ্ধি এবং শতকরা ৩.৭ জন জড়ত্ব ও বুদ্ধিমত্তার সীমারেখায়। মোটামুটি এই নিরিখটিকে ভারতবর্ষে প্রয়োগ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, কি বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য এ দেশের কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই নাই।

এই জড়বুদ্ধিদের মনস্বিতাংশের মাপ ছাড়া অন্য কোনও ভাবে বুঝিবার উপায় কি ? উত্তরে বলা যাইতে পারে "মোটামুটি আছে", ইহাদের চেহারার মধ্যেই একটা জড়ত্বের ছাপ মাখান থাকে। জড়বুদ্ধিদের সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। একদল জড়বুদ্ধি লোক আছে, তাহাদের দেখিতে অনেকটা মঙ্গোলিয়ানদের মতো, বাদামের মত চোখ, চোখের কোণের দিকটিতে ডবল খাঁজ, ছোট মাথা, কুৎসিৎ কান, ছোট ছোট আঙ্গুল, কনিষ্ঠ অঙ্গুলীটি ভিতরের দিকে বাঁকা ইত্যাদি ; ইহারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গোলিয়ান আকৃতি পাইতে থাকে। মাতাপিতার মুখাবয়বের সহিত ইহাদের যেন সম্পর্ক নাই, একসঙ্গে ইহাদের রাখিলে পরস্পরকে পরস্পরের ভাই বলিয়া মনে হয়।


Mongolian idiot

বড় পরিবারে বৃদ্ধা মাতার গর্ভে অনেক সময় এই জাতীয় মূর্খদের জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায়। তথাপি গর্ভদোষে যে জড়বুদ্ধিদের উদ্ভব, এ কথাও বিশেষ জোর করিয়া বলা যায় না। মাতার বার্ধক্য পুত্রের জড়ত্বের হয়ত একটা পরিপোষক কারণ। এমনও দেখা গিয়াছে যে, পঞ্চদশ বর্ষীয়া মাতার গর্ভেও জড়বুদ্ধিযুক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে মাতার বার্ধক্যের সহিত সন্তানের জড়ত্বের একটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে।

মঙ্গোলিয়ান নির্বোধদের মনোবয়স কখনও সাতের বেশী হয় না, অর্থাৎ সাত বৎসর বয়সের শিশুর চেয়ে বুদ্ধিমান্ ইহারা কোনও বয়সেই হইতে পারে না। ইহারা সাধারণতঃ ভাল মানুষ ; ছট্‌ফটে ও আমোদপ্রিয় হয়, জটিল অঙ্গভঙ্গী করিতে ইহারা সহজে পারে না এবং সাধারণতঃ কুড়ি বৎসরের মধ্যেই মারা যায়।

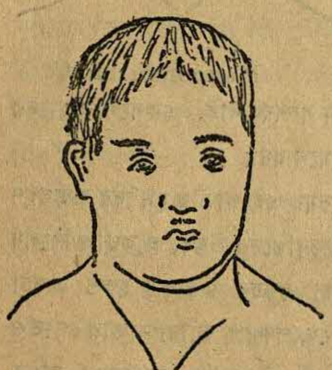
আর একজাতীয় জড়বুদ্ধি লোক হয়—তাহাদিগকে অল্পমস্তিষ্ক (micro-

cephalic) বলা যাইতে পারে। ইহাদের মাথার উপরের দিকটা অত্যন্ত ছোট হয়। ইহারাও চঞ্চল, আমুদে এবং অনুকরণপ্রিয় হয়। কোনও কাজই ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে পারে না।



Microcephalic idiot

আর এক জাতীয় জড়বুদ্ধি আছে, তাহাদিগকে Cretin বলা হয়। থাইরয়েড (throid) গ্লাণ্ড-এর অপর্যাপ্ত রসক্ষরণের জন্য এই জাতীয় জড়তা দৃষ্ট হয়। ইহাদের লক্ষণ হইতেছে. বড় মাথা, ছোট পা, খাঁদা নাক, পুরু ঠোঁট, ঝোলা জিভ, শুষ্ক এবং কুঞ্চিত চামড়া—যেন তাহাদের অপরিণত বুদ্ধির অনুপাতে চামড়ার মাপ একটু বড়। জন্মের সময় ইহাদের সাধারণ বালকের মতই মনে হয়. ছয় মাস বয়সের পর হইতে ইহাদের মধ্যে জড়ত্বের লক্ষণগুলি ফুটিতে থাকে। ইহারা অলস প্রকৃতির, সহজে হাসিতে চায় না, বসিতে ও দাঁড়াইতে শিখিতে দেরী হয়, হয়ত চার বৎসর বয়সে দাঁড়াইতে শিখে, এবং ছয় সাত বৎসর বয়সে কথা কহিতে সমর্থ হয়। ইহাদের যৌবনও খুব দেরীতে আসে, কেহ কেহ চিরদিনই 'বন্ধ্যা' থাকে।



Cretin

এই তিন জাতীয় নির্বোধ ছাড়া আর এক জাতীয় নির্বোধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা একটু অন্য প্রকৃতির; ইহাদিগকে বোকা পণ্ডিত (idiot-savants) বলা যাইতে পারে। ইহারা অন্যান্য সব বিষয়ে সাধারণ জড়বুদ্ধিদেরই মতো, কিন্তু কেহ হয়ত ভাল ছবি আঁকিতে পারে, কেহ হয়ত ভাল বাজনা বাজাইতে পারে, সন তারিখ মনে রাখিতে পারে ইত্যাদি।

এই সমস্ত জড়বুদ্ধিরা সকলেই জন্ম হইতেই জড়ত্ব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

আর এক জাতীয় জড়বুদ্ধি আছে, যাহারা অসুখ, অপালন, আকস্মিক আঘাত প্রভৃতির জন্য সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে বঞ্চিত। জন্মের পর বাহিরের ঘটনাই অনেক সময় এ জন্য দায়ী। উপযুক্ত শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির সুযোগ পাইলে ইহাদের মধ্যে অনেকেই জড়ত্বকে কাটাইয়া উঠিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান অথবা মনোবিজ্ঞান এই জড়বুদ্ধিতার কারণ বাহির করিতে পারিয়াছে কি? এই জড়ত্বের জন্য দায়ী কে? প্রজনন বা উত্তরাধিকার? না বাহিরের পরিবেশ?—স্বাস্থ্যহীনতা না অশিক্ষা? দারিদ্র্য? না, মাতাপিতার বীজপঙ্কের দোষ? অন্ধ নিয়তি, না মাতার গর্ভাবস্থায় মানসিক (complex) গূঢ়ৈষা?

মনোবিদ্ ক্লার্ক (Clark)-এর অভিমতে, আমাদের মনে প্রবৃত্তির দমন ও রোধনজনিত গূঢ়ৈষার মধ্য হইতেই জড়মতিত্বের সূচনা হয়। সুতরাং উপযুক্তভাবে মনোবিকলন প্রভৃতির সাহায্যে জড়মতিত্বের সংস্কার করা সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সত্যিকারের কোনও জড়বুদ্ধিযুক্ত লোকের মনোবিকলনের দ্বারা উন্নতি হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

অনেকে বলেন যে, এই জড়মতিত্ব যেহেতু আমাদের জন্ম হইতেই আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়, সুতরাং এই জড়মতিত্বের সহিত মাতা-পিতার বীজপঙ্কের একটা সম্পর্ক আছে। 'গর্ভের দোষে রাবণ রাক্ষস' বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। এ কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যের একটা গূঢ় ইঙ্গিত আছে। সন্তান যখন গর্ভস্থ থাকে তখন অনেক কারণেই তাহার মধ্যে জড়ত্ব আসিতে পারে। এমনও দেখা গিয়াছে—জরায়ুর উপর অতিমাত্রায় এক্সরে (X-Ray) কিরণ-সম্পাতে অনেক সময় জাতকের অনুমস্তিষ্কতাজনিত (micro-cephaly) জড়মতিত্ব আসে। গর্ভাবস্থায় মাতার অপরিপুষ্টি, ভিটামিনের অভাব, সিফিলিস্ প্রভৃতিও অনেক সময় জাতকের মধ্যে জড়মতিত্বের সঞ্চার করে।

অপরাধপ্রবণতা ও প্রজনন লইয়া Kalikak ও Juke বংশের বংশধারার আলোচনা অনেক হইয়াছে এবং বংশের মধ্যে একজনের অপরাধপ্রবণতা থাকিলে তাহা বংশানুক্রমের ধারা বহিয়া চলিতে থাকিবে—এই জাতীয়

কথার যতটা সত্য আছে তাহার চেয়েও বোধহয় বেশীভাবেই প্রচার হইয়া আসিয়াছে। জড়মতিত্ব লইয়া এই জাতীর পরীক্ষা এখনও তেমন ব্যাপকভাবে হয় নাই। ইহার সুবিধাও তেমন নাই। ইঁদুর, গিনিপিগ্ প্রভৃতিকে লইয়া ১৮।২০ পুরুষ পরীক্ষা করা অসম্ভব নহে, কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে এই জাতীয় পরীক্ষা আরম্ভ হইলেও সিদ্ধান্তে আসিতে অনেকদিন কাটিয়া যাইবে।

শরীর-তত্ত্বের দিক দিয়া দেখা যায়, বেশীর ভাগ জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকই অপরিপুষ্টাঙ্গ ; কিন্তু এই অপরিপুষ্টতার সহিত রক্তের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। মস্তিষ্ক-তত্ত্ব অথবা সাধারণ গঠনের দিক দিয়া সাধারণ বালক এবং জড়বুদ্ধি বালকের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই ; তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, জড়বুদ্ধি বালকদের মস্তিষ্কের কোষের সংস্থান ও neuron-এর গঠনভঙ্গীর মধ্যে অনেকটা এলোমেলো ভাব বিদ্যমান।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ছাত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী মনোযোগে অসমর্থ, কল্পনা-শক্তি তাহাদের কম, বিচার বা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ক্ষমতা, মৌলিকত্ব প্রভৃতি নাই বলিলেই চলে। জন্তু ও ইতর-প্রাণীদের মতোই ইহারা প্রায় অনুভূতির স্তরেই অবস্থান করে ; অনুভূতি হইতে বিচার এবং বিচার হইতে সিদ্ধান্ত ইহারা সহজে করিতে পারে না—অন্তর্দৃষ্টি ইহাদের কোনও সিদ্ধান্তেরই ইঙ্গিত দেয় না। অভিভাবনের (suggestion) প্রভাব সাধারণ বালকদের মধ্যে ততটা শক্তিশালী হয় না, যতটা হয় এই জড়বুদ্ধিদের উপর। ফলে দুষ্ট লোকেরা তাহাদিগকে ভাঙ্গাইয়া নানাভাবে নাচাইতে পারে অথবা নানা প্রকার অকাজ-কুকাজ করাইতে পারে যাহা একজন বুদ্ধিমান বালককে দিয়া করানো হঠাৎ সম্ভব নয়। "তোর কাণটা কাকে নিয়ে গেলো" বলিলে বুদ্ধিমান বালক নিশ্চয়ই কাকের পিছনে পিছনে ছুটিবে না, কিন্তু জড়বুদ্ধি বালক হয়ত তাহা করিতে পারে। সহজাত প্রবৃত্তি ও আগ্রহের দিক দিয়াও এই জড়বুদ্ধি বালকেরা একটু খাটো, যৌন প্রবৃত্তি পর্যন্ত অনেক সময় ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্যানরোজ (Panrose) বলেন, সাধারণ নির্বোধদের মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি মোটামুটি

সাধারণভাবে থাকিলেও, পূর্ণ জড়বুদ্ধি লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি মোটেই থাকে না। তাহারা যে সন্তান উৎপাদন করিয়া পৃথিবীতে জড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, ইহা যেন প্রকৃতিরও অভিপ্রেত নয়। এই জন্যই সাধারণতঃ মনস্বিতাংশের তীব্রতার সহিত যৌন প্রকৃতিরও একটা সমানুপাত তীব্রতা দৃষ্ট হয়।

মোটের উপর, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব, মস্তিষ্ক-তত্ত্ব, প্রজনন-তত্ত্ব প্রভৃতি কোনও তত্ত্ব দিয়াই এমন কোনও কারণের সন্ধান মিলিল না যাহাতে জড়বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদের সৃষ্টি বন্ধ করা সম্ভব অথবা তাহাদের দিয়া সাধারণ বালকদিগের মত কাজকর্ম করাইয়া লওয়া চলে। তাহা হইলে কি এই জড়ত্ব বিধাতার অভিশাপের মত অনিবার্য অতর্কিতভাবেই আপতিত হইয়া থাকে? ইহার কোনও প্রতিকার নাই? দেখা যায়, জড়বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন স্বাভাবিকভাবে জন্ম হইতেই জড় হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে জড়ত্বের কারণ দুর্জ্ঞেয় অথবা অজ্ঞেয়; বাকী ২৫ জনের ক্ষেত্রে অসুখ, অচিকিৎসা, অপুষ্টি, আঘাত প্রভৃতি কারণ থাকিতে পারে। সামাজিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে এই ২৫ জনের জড়ত্বের সম্ভাবনা আমরা কমাইতে পারি, আর বাকী ৭৫ জনের জন্য আমাদের অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। সহৃদয় রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা তাহাদের জীবনের দুঃখকে আমরা খানিকটা প্রশমিত করিতে পারি। তাহাদের নিকট হইতে আশা করিবার কিছুই নাই, তবে যে সব কার্যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না—এইরূপ অল্প পরিশ্রম-সাধ্য এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কার্যাদি দিয়া তাহাদের খানিকটা কাজে লাগানও যাইতে পারে।

প্রতিভা রহস্য ও প্রতিভাশালীদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থা

আমরা ইতোপূর্বেই দেখিয়াছি যে, যাহাদের 'সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত' মানুষ বলা হয়, তাহাদের মনস্বিতাংশ হইতেছে ৯০ হইতে ১১০; ইহার পর ১১০ হইতে ১২০ মনস্বিতাংশযুক্ত লোককে বুদ্ধিমানের পর্যায়ে ফেলা যায়; ১২০ হইতে ১৪০ মনস্বিতাংশযুক্ত মানুষকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং ১৪০-এর অধিক মনস্বিতাংশবিশিষ্ট লোককে প্রতিভাশালী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তবে প্রতিভার এই নিম্নতম সীমারেখা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

আমরা যদি ১৩০ মনস্বিতাংশকে প্রতিভার নিম্নতম সীমারেখা বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে দশ জন বা প্রতি শতে একজন করিয়া প্রতিভাশালী লোকের সন্ধান পাইব। মনস্বিতাংশের সীমা-রেখাটি ১৪০ ধরিলে প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে ৪।৫ জন প্রতিভাশালী লোক দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং এই সীমারেখাটির নিম্নতম মান ১৫০ ধরিলে প্রতি ১০০০-এর মধ্যে ২-৩ জনের চেয়েও কম প্রতিভাশালী লোকের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই সীমারেখাটি আর একটু উপরের দিকে সরাইয়া দিয়া যদি আমরা ১৬০ মনস্বিতাংশকে নিম্নতম স্তর বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে যে কোনও সমাজের প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা প্রতি সহস্রে একজনেরও কম হইবে।

প্রতিভার উৎস

মনীষী গ্যালটন্ (১৮৬৯) এই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে 'প্রতিভা' হইতেছে বংশগতির (heredity) প্রভাবের ফল মাত্র। কন্‌ডোল (condole) নামক সুইস্ পণ্ডিত বলেন যে, ইহা বংশগতির ফল নহে; সমাজ ও পরিবেশ প্রতিভা সৃষ্টি করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

প্রতিভা সম্বন্ধে হ্যাভেলক এলিসও গবেষণা করিয়া (১৯০৪) দেখিয়াছিলেন যে, অধিকাংশ প্রতিভাশালী ব্যক্তিই উদ্ভূত হন শিক্ষক, ডাক্তার, এঞ্জিনার, উকিল, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের বংশ হইতে। ক্যাটেলও

অনুরূপ মতই পোষণ করিতেন। হ্যাভেলক এলিস্ দেখাইয়াছিলেন যে, এই সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের অধিকাংশই মাতা-পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ইহাদের জন্ম-সময়ে মাতা-পিতার বয়সের গড় ৩৭ বৎসর। তাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল, নারীর চেয়ে পুরুষদিকের মধ্যেই প্রতিভার স্ফুরণ সমধিক দৃষ্ট হয়। কিন্তু হেলিঙ্গওয়ার্থ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সকল দেশের সমাজ-ব্যবস্থা পুরুষের চেয়ে নারীকে সুযোগ-সুবিধা কম দিয়াছে বলিয়াই নারী তাহার প্রতিভার পরিচয় তেমন দিতে পারে নাই।

ফ্রয়েড বলেন, মানুষের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূলে আছে একটা কাম-শক্তির প্রেরণা। এই কাম-শক্তির স্রোত যখন প্রতিহত হইয়া অন্য খাতে প্রবাহিত হয়, তখনই প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হয়। সুতরাং এই প্রতিভার সহিত আদিম কাম-শক্তির একটা সমানুপাত সম্পর্ক আছে।

প্রতিভা সম্বন্ধে অ্যাড্‌লার-এর ব্যাখ্যা অন্যরূপ। তিনি বলেন—শৈশবে জন্ম বা পরিবেশগত হীনমন্যতা (inferiority feeling) এবং পরে তাহার ক্ষতিপূরণের প্রচেষ্টার মধ্য হইতেই প্রতিভার স্ফুরণ হয়। বিঠোভেনের সঙ্গীত-প্রতিভার মূলে তাঁহার শৈশবের বধিরতা সম্বন্ধে হীনমন্যতা বোধ এবং পরে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা; ডিমস্থিনিসের বাগ্মিতার মূলে ছিল তাঁহার তোৎলামি ও সেই ত্রুটীটি জয় করিবার চেষ্টা ইত্যাদি। হয়ত জুলিয়াস সীজার বা নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভার মূলেও ছিল তাঁহাদের শারীরিক ত্রুটী সম্বন্ধে তুচ্ছতার অনুভূতি। এর কারণ বোধহয় শৈশবের দারিদ্র্য, পিতৃবিয়োগ প্রভৃতি অনেক সময় প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠালাভের প্রেরণা দান করে। স্যার গুরুদাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি আদরের দুলাল হইয়া মানুষ হইলে হয়ত নিজেদের প্রতিভাকে অনুরূপভাবে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিতেন না।

প্রতিভার শ্রেণী বিভাগ

"বুদ্ধির স্বরূপ ও সংজ্ঞা" পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি প্রতিভার মধ্যে দুইটি শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) অনন্যসাধারণ 'সাধারণ বুদ্ধি' (general intelligence) এবং (২) বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে দক্ষতা

(special abilties)। তবে এই শ্রেণীবিভাগ দুইটি অন্য-সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অনেক সময়েই দেখা যায়, যে-বালকের তীব্র সাধারণ বুদ্ধি আছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও তাহার দক্ষতার উদাহরণ বিরল নহে। তবে এক-আধটি বিশেষ ব্যাপারে যাহার দক্ষতা আছে, সে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। তীব্র সাধারণ বুদ্ধি যেভাবে সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে, একটা বিশেষ ব্যাপারে দক্ষতা সেভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। এই হেতু রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির প্রতিভা যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে, তাহাকেই সজীব করিয়াছে। ইহাই হইতেছে প্রতিভার একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

প্রতিভাশালীদের চিনিয়া লইবার উপায়

নানাভাবে এই কাজটি করা যাইতে পারে, যথা (১) প্রতিভাশালী বালকদিগের সম্বন্ধে সাধারণ লোকদিগের বর্ণনা পাঠ করিয়া, (২) প্রতিভাশালী একটি বিশিষ্ট বালক বা বালকগোষ্ঠীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় বর্ণনা পাঠ করিয়া, (৩) বড় বড় প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের জীবনেতিহাস আলোচনা এবং (৪) বুদ্ধিমাপক ও অন্যান্য মনোবিজ্ঞানগত পরিসংখ্যা সংগ্রহ করিয়া।

প্রথম উপায়ে তেমন নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" গল্পে দেখিতে পাওয়া যায়, ভৃত্য রাইচরণ অনুকূলের পুত্র খোকাবাবুকে ভালবাসিত বলিয়াই তাহার সব-কিছু কাজের মধ্যেই একটা লোকোত্তর প্রতিভার সন্ধান পাইত এবং তাহার ভবিষ্যতে "জজ পদপ্রাপ্তি" সম্বন্ধে একটা অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করিত। এই জাতীয় বিশ্বাস প্রীতি-বিদ্বেষের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। যাঁহারা মনোবিদ্ নহেন, এমন সমস্ত সাধারণ লোকদিকের বর্ণনার উপর খুব বেশী নির্ভর করা যায় না। দ্বিতীয় প্রণালীটিও খুব নির্ভরযোগ্য নহে। কারণ যে বালকটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হইল তাহা একান্ত ভাবেই ব্যক্তিগত ব্যাপার হইতে পারে। একজনের পক্ষে যাহা সত্য, অপরের পক্ষে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। তৃতীয় প্রণালীর মধ্যেও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

কাজেই চতুর্থ প্রণালীটিকে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলা চলে। তবে এই চতুর্থ প্রণালীটি ছাড়া অন্যান্য প্রণালীগুলিও প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে কিছু কিছু সাহায্য করে। তাহারা পরস্পর পরিপূরক এবং ইহাদের সকলের সম্মিলিত অবদানে প্রতিভা সম্বন্ধে অনেকটা অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রতিভা সম্বন্ধে আরও অনেকপ্রকার প্রশ্ন ও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যেমন প্রতিভাশালী বালকদিগের সহিত সাধারণ বালকের পার্থক্য কি? প্রতিভাশালী বালকেরা কি সকলেই দুর্বল ও ক্ষুদ্রাবয়ব? সকলেই কি অসামাজিক? তাহাদের মধ্যে কি একটা পাগ্‌লামীর ভাব আছে?

প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণা

প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্র লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে শিক্ষকদিগের মতামত, এবং বুদ্ধি, গণমাপক (Group test), বিণে-টেষ্ট্ প্রভৃতির দ্বারা ২ হইতে ১১ বৎসরের ১৪০ জন মনস্বিতাংশযুক্ত বালক-বালিকা বাছাই করিয়া লইয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি গবেষণা করিয়া দেখা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ৩৭০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৮—১৯ বৎসরের ছাত্র লইয়াও তাহাদের সম্বন্ধে নানা জাতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ছোট ছেলেগুলিকে বাছাই করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইয়াছিল, যথা—

(১) দুই জাতীয় বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা (Standford Binet-Test and National B Test); (২) দুই ঘণ্টা ব্যাপী অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা (The Standford achievement test); (৩) ৫০ মিনিট ব্যাপী সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা। (৪) ৫০ মিনিট ব্যাপী খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও আগ্রহের সম্বন্ধে পরীক্ষা; (৫) বালকের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ জানিবার জন্য ৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী অনুক্তস্থান পূরণের পরীক্ষা; (৬) দুই মাসের পাঠের সফলতার রেকর্ড; (৭) বালকের পারিবারিক জীবনের ২৫টি বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রশ্ন (অভিভাবকেরা ইহার উত্তর লিখিবেন); (৮) ঐ ২৫ বিষয়েই শিক্ষকদিগর মন্তব্য সম্বন্ধে ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রশ্ন (শিক্ষকগণ উত্তর লিখিবেন); (৯) পারিবারিক স্তরের মান নির্ণয়।

প্রতিভা সম্বন্ধে পরীক্ষায় আবিষ্কৃত তথ্য

এই বিপুল আয়োজনমূলক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, প্রতিভাশালী বালকদিগের ½অংশ আসিয়াছে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর চাকুরীয়া ও ব্যবসাদার শ্রেণী হইতে ; ৭%-এরও কম আসিয়াছে মজুর শ্রেণী হইতে। দেখা গিয়াছে, এই সমস্ত বালকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে বড় বড় পদাধিষ্ঠিত কৃতী আত্মীয়।

প্রতিভার ব্যাপারে বালক ও বালিকাদের সংখ্যার অনুপাত হইতেছে প্রাথমিক বিভাগে ৭ : ৬ এবং মাধ্যমিক বিভাগে ২ : ১ ; মাধ্যমিক বিভাগে প্রতিভাশালিনী বালিকাদের সংখ্যার অনুপাতটি কমিয়া যাইবার কারণ হইতেছে খুব সম্ভবতঃ বালিকাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির পূর্ণতা অল্পতর বয়সেই শেষ হইয়া যায় বলিয়া।

শরীর ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখা গিয়াছে, প্রতিভাশালী বালক বালিকাদের উচ্চতা, দেহের ওজন, ফুসফুসের শক্তি, পেশীগত শক্তি, পরিপাক শক্তি প্রভৃতি সাধারণ বালক বালিকাদিগের তুলনায় উচ্চ স্তরের। অস্থির পুষ্টি (Ossification) এবং যৌন-বোধ ও যৌনশক্তির বিকাশও ইহাদের মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ হয়। শুধু তাহাই নহে, শৈশবে হাঁটিতে শিখা, কথা বলিতে শিখা, দন্তোদ্গম হওয়া প্রভৃতিও ইহাদের শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ হয়।

'Standford Achievment Test'এর দ্বারা দেখা গিয়াছে, পড়াশুনার ব্যাপারেও ইহারা শ্রেষ্ঠতর। প্রতিভাশালী বালকদিগের মধ্যে প্রতি আট-জনের মধ্যে সাতজন বালকই পড়শুনার ব্যাপারে তিন বৎসরের অগ্রগামিতা দেখাইয়াছে। প্রতিভাশালী বালকবালিকাদের দক্ষতা একমুখী নহে, বহুমুখী। ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে, ইহারা গণিত, সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি জটিল বা বিমূর্ত্ত (abstract) বিষয়ে বেশী আগ্রশীল। ইহাদের অধিকাংশই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার বয়সের পূর্বেই পড়িতে শিখে এবং অনেকেই তিন চার বৎসর বয়সের পূর্বেই পুস্তক পাঠ করিতে সমর্থ হয়।

ইহাদের আগ্রহ ও কৌতুহলের মধ্যেও একটা বহুমুখিতা দৃষ্ট হয়। ফলে যাহাকে 'হবি' (hobby) বলা হয়, তাহা সাধারণ বালক বালিকাদিগের চেয়ে ইহাদের মধ্যেই বেশী। খেলাধূলায় ইহারা খুব বেশী সময় নষ্ট করে না।

প্রতিভাশালী বালকেরা 'কুণো' ও 'গ্রন্থকীট', তাহাদের আগ্রহ, কৌতুহল প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ—এই প্রচলিত ধারণা অত্যন্ত ভুল। সামাজিকতা, নেতৃত্ব, সাধারণের সহিত মানাইয়া চলিবার ক্ষমতা, মানসিক স্থৈর্য প্রভৃতি ব্যাপারেও ইহারা শ্রেষ্ঠতর। অসামাজিক আচরণ বা অপরাধপ্রবণতা ইহাদের মধ্যে কম।

অনেকের ধারণা প্রতিভাশালী বালকদিগের নেতৃত্ব, সংঘ ও সংগঠনশক্তি প্রভৃতি কম, তাহাও ঠিক নহে। প্রায়ই দেখা যায়, পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত কার্যকলাপে প্রতিভাশালী বালকেরাই নেতৃত্ব এবং দায়িত্বের পদ গ্রহণ করে। খানিকটা নীতির প্রেরণাতে, পড়াশুনার ক্ষতি হইবে এই বিচারেও বটে তাহাদের তুচ্ছ ব্যাপারে মাতামাতি করিতে দেখা যায় কমই।

বয়োবৃদ্ধির সহিত প্রতিভার সম্পর্ক

যে ব্যাপক গবেষণা দ্বারা এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণীত হইয়াছিল সেই গবেষণার সাত বৎসর পরে শিক্ষাবিদ্ টারম্যান্ পূর্ব-পরীক্ষিত ৬০০টি ছাত্র লইয়া আবার নূতন করিয়া (follow up) পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বালকদের মধ্যে মনস্বিতাংশের কোনও হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। তবে বালিকাদের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছিল। বালিকাদিগের মানসিক বিকাশ ও পরিপূর্ণতা যে বয়সে শেষ হইয়া যায় তাহার পর পর্যন্ত বালকদিগের মানসিক বিকাশ চলিতে থাকে। এইজন্যই বোধহয় পরিণত বয়সে বালকদিগের তুলনায় বালিকাদিগের মনস্বিতাংশের হার কিছু কম বলিয়া মনে হয়। বিদ্যালয়-জীবনের শেষ দিকেও ছেলেমেয়ে উভয়েরই পড়শুনার ফল অদ্ভুত ভাল ছিল; পরীক্ষার অকৃতকার্যতা তাহাদের প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। কলেজ-জীবনেও ইহাদের সফলতার মান সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে উন্নততর ছিল। "ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য"গুলিও ঠিক ছিল। সামাজিক বুদ্ধি, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতিতে ইহারা সাধারণের চেয়ে ভালই ছিল। বালিকাদিগের মধ্যে যাহারা প্রতিভাশালিনী তাহাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা পুরুষোচিত ভাবভঙ্গী দেখা গিয়াছিল, তবে বালকেরা কিন্তু নারীভাবাপন্ন হইয়া পড়ে নাই।

মোটের উপর এই follow-up পরীক্ষাটি ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে, প্রতিভার বৈশিষ্ট্যগুলি বয়োবৃদ্ধির সহিত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

শুধু ছাত্রজীবনেই যে এই সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের বুদ্ধ্যঙ্ক হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহা নহে। টারম্যান সাহেব তাঁহার প্রথম 'follow-up'-এর পর পুনর্বার ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রাথমিক পরীক্ষার ১৮ বৎসর পরে এবং 'follow-up' পরীক্ষার ১১ বৎসর পরে ঐ সমস্ত বালক বালিকাগুলি পূর্ণ বয়সে জীবন সংগ্রামে কিরূপ কৃতী হইয়াছিল ইহা দেখিবার জন্য আর একটি "check up test" করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন—বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণ উত্তরজীবনেও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কৃতী হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে আত্মহত্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতির সংখ্যা সাধারণের চেয়ে অনেক কম। এই সমস্ত প্রতিভাশালী বালকদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন কলেজে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে আবার শতকরা ৯৩ জন স্নাতক হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে উত্তরজীবনে নারীরা পুরুষদের চেয়ে কিছু বেশী সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। রাজনীতি, বিজ্ঞান, এঞ্জিনারিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীর সুযোগ সম্ভাবনা কম বলিয়াই বোধহয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীর প্রতিভা সমধিক প্রকাশ পাইয়াছিল।

প্রতিভা ও বিষয়-বিশেষে দক্ষতা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা তীব্র সাধারণ বুদ্ধির দ্যোতক নহে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, তাড়াতাড়ি যোগ-বিয়োগ করিবার ক্ষমতা, যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করিবার ক্ষমতা, গৎ বাজাইবার ক্ষমতা, কারিগরী, অঙ্কন প্রভৃতির সহিত সাধারণ বুদ্ধির বা প্রতিভার তেমন সম্পর্ক নাই। দিল্লীর সমর দপ্তরের কয়েকটি কেরাণীকে দেখিয়াছি, তাহারা টেলিফোনের "ট্রাঙ্ক কল" হিসাব করিত। তাহারা টাকা-আনা-পাই-এর বিরাট্ বিরাট্ যোগ অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে এবং নির্ভুল ভাবেই করিতে পারিত। অথচ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অতি সাধারণ বুদ্ধির পরিচয়ও তাহারা দিতে পারিত না। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (অধুনা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর) একজন কেরাণী অসংখ্য পুস্তকের

ক্যাটালগ নম্বর বলিয়া দিতে পারিত—অথচ অন্যান্য ব্যাপারে সে প্রায় নির্বোধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। এমন বহু কেরাণী দেখা যায়, যাহারা বিচ্ছিন্ন নাম, সংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখাইতে পারে, অথচ হয়ত তাহারা আদৌ প্রতিভাশালী নহে। নির্বোধ লোকদের মধ্যে অনেকেই খুব ভাল গৎ বাজাইতে বা কারিগরী কাজ করিতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের শিল্পী বলিতে আমরা যাহা বুঝি অর্থাৎ যাহাদের কাজের মধ্যে কল্পনাশক্তি বা সৃষ্টির পরিচয় আছে এইরূপ লোক আমরা নির্বোধ লোকের মধ্য হইতে পাই না। ট্যারম্যান সাহেব ২৫০০০ জন বালকের মধ্যে মাত্র ২৬টি বালকের সন্ধান পাইয়াছিলেন যাহারা মোটামুটি সাধারণ মনস্বিতাংশ লইয়াও শিল্প বিষয়ে সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিয়াছিল। এই হইতে মনে হয়, সত্যিকারের সৃজনী-প্রতিভার জন্য উচ্চ-কোটির সাধারণ বুদ্ধির (general intelligence) বা প্রতিভার প্রয়োজন হয়।

প্রতিভার সহিত সৃজনীশক্তির যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে তাহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমরা মানিয়া আসিয়াছি। বস্তুতঃ "নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি"কেই আমরা প্রতিভা বলিয়া জানি। প্রতিভা সম্বন্ধে যখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাতও হয় নাই, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মী ও বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১২৮০ সালের আষাঢ় মাসের 'বঙ্গদর্শন'-এ তাঁহার 'প্রতিভা' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন।

কারিগরী, চিত্রবিদ্যা, মুখস্ত করার ক্ষমতা প্রভৃতির সহিত সাধারণ বুদ্ধির বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই বটে, তবে জটিল গণিতের সমাধান, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অনন্যসাধারণ দক্ষতার সহিত সাধারণ প্রতিভা বা বুদ্ধির একটা নিকট সম্পর্ক আছে বলিয়াই মনে হয়। সাধারণ কার্য বহুমুখী বলিয়া জীবনের বহুবিধ ক্ষেত্রেই তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে তাই বলিয়া প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে সব বিষয়েই লোকোত্তর দক্ষতা দেখাইতে পারেন তাহা নহে,—একটি দুইটি বিষয়ে হয়ত তাঁহারা অসামান্য দক্ষতা দেখাইতে পারেন এবং অন্যান্য বিষয়েও হয়ত সাধারণের চেয়ে কিছু ভাল ফল দেখাইতে পারেন।

অতীতের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের প্রতিভা

অতীতে যে সমস্ত ব্যক্তি কৃতী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিভা কিরূপ ছিল—এইরূপ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগিতে পারে। এই ব্যাপারটি লইয়া গ্যাল্‌টন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গবেষণা করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি ক্যাটেল কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল।

বহুদিন পূর্বে লোম্‌ব্রোসো (Lombroso) বলিয়াছিলেন, বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তিই বাল্য-শৈশবে তাঁহাদের ভাবী সম্ভাবনার পরিচয় তেমন কিছু দিতে পারেন নাই, বরং তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনকে চিন্তান্বিতই করিয়াছিল। এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিত কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, ঐতিহাসিক বিখ্যাত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই বাল্য-শৈশব হইতেই প্রতিভার প্রাক্‌-প্রৌঢ়ত্বের (precocity) পরিচয় দিয়াছেন। পরে ক্যাথারিন কক্‌স এই ব্যাপারে গবেষণার দ্বারা লোম্‌ব্রোসোর মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত করেন। তিনি ১৪৫০ হইতে যে সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ৩০০ জনের সম্বন্ধে বাল্যজীবনের সহস্র সহস্র তথ্য সংগ্রহ করেন। বংশগতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা-ব্যবস্থা, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, মানসিক পুষ্টি ও পরিণতি, বর্ণ-পরিচয়ের বয়স, রচনা, লেখার কাল প্রভৃতি অসংখ্য তথ্যই সংগৃহীত করিয়া কয়েক সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণী প্রস্তুত করেন।

এইবার কয়েকজন শিশু-মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ সহকারীকে লইয়া কাজ আরম্ভ হইল। ইঁহারা জানিতেন কোন্ বয়সে কিরূপ মনস্বিতাংশযুক্ত বালক কিরূপ কাজ করিতে সমর্থ হয়। এই বিদ্যার আলোকে ইঁহারা এই ৩০০ জন ঐতিহাসিক ব্যক্তির কার্যকলাপের তথা মনস্বিতাংশের মূল্য নিরূপণ করিতে লাগিলেন। তিনজন মনস্তাত্ত্বিক স্বাধীন এবং অন্য সম্পর্ক-নিরপেক্ষভাবে কাজ আরম্ভ করিলেন। একটি বিশিষ্ট বয়সে একটি বিশিষ্ট কাজ করিতে হইলে ন্যূনতম যতটা মনস্বিতাংশের প্রয়োজন হয়, ইঁহারা ইঁহাদের আলোচ্য ব্যক্তিদের জীবনেতিহাসের ঘটনাগুলিকে সেই জাতীয় মনস্বিতাংশের ফল বলিয়া নির্দেশ করিলেন। পরে বিভিন্ন ব্যক্তির মনস্বিতাংশ সম্বন্ধে এই তিনজন মনস্তাত্ত্বিকের সিদ্ধান্তের গড় হইতে তাঁহাদের মনস্বিতাংশ নিরূপিত হইল।

দেখা গিয়াছিল যে, এই তিনজন মনস্তাত্ত্বিক এক একজন লোকের বুদ্ধি সম্বন্ধে যেরূপ মূল্য নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহা তিনজনের ক্ষেত্রেই প্রায় একই প্রকার হইয়াছিল। ফলে এই প্রণালীতে বিভিন্ন ব্যক্তিদিগের যে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণীত হইয়াছিল তাহা অনেকখানি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য বলা চলে।

ক্যাথারিন কক্স-এর এই গবেষণার ফলে দেখা গেল, প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের শৈশব, বাল্য ও উত্তরজীবনের কার্য-কলাপের মধ্যে একটা সমানুপাত সম্পর্ক আছে। শুধু তাহাই নহে, যে সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি বাল্যকালে বুদ্ধির পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া লোমব্রোসো অনুযোগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বুদ্ধ্যঙ্কও বাল্যে বা কৈশোরে অল্প ছিল না, ইহাই প্রমাণিত হয়। এই সমস্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় ছিল ১৬০ এবং কোনও ক্ষেত্রেই ইঁহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০-এর অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।

মিলস্, গ্যায়টে (Goethe), মেকলে, পাসক্যাল, লেবনীজ প্রভৃতির বুদ্ধ্যঙ্ক ১৮০-এর ঊর্ধ্বে ছিল। টারম্যানের মতে গ্যালটন-এর বুদ্ধ্যঙ্ক প্রায় ২০০ ছিল। এই সমস্ত মহামনীষিগণ বাল্যকালে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। মিল্টন ৮ বৎসর বয়সে গ্রীক্ পুস্তক পাঠ করিতেন, গ্যালটন আড়াই বৎসর বয়সে পড়িতে এবং চার বৎসর বয়সে চিঠি লিখিতে শিখিয়াছিলেন।

এইভাবে আমাদের দেশের মহাপুরুষদের লইয়া এই জাতীয় পরীক্ষা করা হয় নাই। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইত, যে-বালকটি বর্ণ-পরিচয়ের সময় "খ বর্ণ-টি পূর্বে না হইয়া ক বর্ণ-টি পূর্বে হইল কেন" জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে-বালকটি পথে চলিতে চলিতে মাইল ষ্টোন দেখিয়া ইংরাজী অঙ্ক শিখিয়াছিল, অথবা যে বালকটি ৭।৮ বৎসর বয়সে প্রথম কবিতা লিখিয়াছিল, ১৩।১৪ বৎসর বয়সে পূর্ণাঙ্গ কাব্য 'বনফুল' রচনা করিয়াছিল এবং ১৮।১৯ বৎসর বয়সে বাঙ্গালী হইয়া ব্রজবুলী ভাষায় 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনস্বিতাংশ মিল্টন্, গ্যালটন্, ম্যাকলের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশী ছিল।

জগতে যাঁহারা প্রতিভার বলে কৃতী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সকলের মনস্বিতাংশই যে ২০০-র কাছাকাছি ছিল, তাহা নহে। ১৮০-র চেয়ে অল্পতর

মনস্বিতাংশযুক্ত বিখ্যাত লোকের সংখ্যাও কম নহে। লর্ড বায়রণ ও সার ওয়াল্টার স্কট্-এর মনস্বিতাংশ ছিল ১৫০, চার্লস্ ডারউইন্-এর ছিল ১৩৫। এ্যাব্রাহাম লিন্কন্, বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্, নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট প্রভৃতির মনস্বিতাংশও খুব বেশী ছিল না। ইঁহারা অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয়, চরিত্রের দৃঢ়তা প্রভৃতি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের গুণে ১২৫ হইতে ১৪০ মনস্বিতাংশ লইয়াই জীবনে প্রভূত কৃতকার্যতা অর্জন করেন। প্রতিভাশালী ছাত্রের প্রতিভার সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে করা হয় না বলিয়াই অনেক প্রতিভা সম্বন্ধেই আমরা আক্ষেপ করিয়া বলিতে পারি "ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে!"

প্রতিভাশালী বালকদের শিক্ষাব্যবস্থা

অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, ভ্রান্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা, পারিবারিক অশান্তি, শাসন বা আদরের আতিশয্য, প্রেমের ব্যর্থতা, রাজনৈতিক উত্তেজনা, অকাল যৌনচেতনা, অসাধু পরিবেশ, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব প্রভৃতি যে কোনও কারণেই একক বা সম্মিলিত ভাবে প্রতিভার সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। বস্তুতঃ আমাদের সমাজের মধ্যে যত প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়, প্রকৃতি নিশ্চয়ই প্রতিভার কাঁচামাল হিসাবে তাহার বহু গুণ আমাদের সরবরাহ করিয়া থাকেন।

এই কাঁচামাল হইতে তাহার সম্ভাবনাগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাঁচা মালগুলি আহৃত হয় প্রকৃতি বা বংশগতির ধারা বহিয়া। এই বংশগতি দিয়াই বুঝিতে হইবে, যে-শিশুটি জন্ম গ্রহণ করিল তাহা শুক-শিশু কি বক-শিশু; সে বক-শিশু হইলে শত চেষ্টাতেও তাহাকে শুকের মত সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া যাইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া শুক-শিশুটিকেও অযত্ন ও অবহেলার মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে সে স্বতঃই পাঠ শিখিবে না, সে জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালী ও পরিবেশের প্রয়োজন আছে।

অনেকের ধারণা, নির্বোধ শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থাটা যতটা সমস্যার ব্যাপার, প্রতিভাশালী বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যাপারটি ততটা জটিল সমস্যার

বিষয় নহে। কথাটা সত্য নহে। তাহার কারণ আছে। প্রতিভাশালী বালক-বালিকারা কোনও একটা বিষয়ে তাড়াতাড়ি দক্ষতা অর্জন করিতে পারে এবং তাড়াতাড়ি একটা বিষয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারে, একথা সত্য। কিন্তু শিক্ষার শেষ সমস্যার ইহাতে সমাধান হয় না। প্রতিভাশালী ব্যক্তির অল্প বয়সেই বুদ্ধির দিক দিয়া পরিপক্কতা আসে। ফলে, তাহারা তাহাদের সহপাঠিদের সহিত জন্ম-বয়সের দিক দিয়া এক হইলেও, মনো-বয়সের দিক দিয়া অনেকখানি বেশী অগ্রসর থাকে। ফলে যৌন-চেতনা ও যৌনবোধ প্রভৃতির দিক দিয়া, মান-অভিমান প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতনতার দিক দিয়া, তাহারা সমবয়সী সঙ্গীদের চেয়ে অনেকখানি বেশী পরিপক্ক হইয়া উঠে। তাহা হইতেই আসে নানা জাতীয় অসুবিধা। একটী ৮ বৎসরের ছেলের যদি ১৪।১৫ বৎসরের ছেলের মত পরিপক্কতা আসে, তাহা হইলে তাহার শিক্ষকেরা তাহাকে "ইচড়ে পাকা" বলিয়া ভৎর্সনা করিবেন, সহপাঠিরা 'অসভ্য' 'বখাটে' প্রভৃতি বলিয়া বদনাম দিবে, আর পাড়ার বৃদ্ধ মাতব্বরেরা তাহার ভাবী চরিত্রহীনতার আশঙ্কা করিয়া হয়ত তাহাকে কোণঠাসা করিতে চেষ্টা করিবেন। সমাজের বিভিন্ন দিক হইতে এইভাবে বিরোধিতা পাইয়া সে সমাজবিদ্রোহী বা অসামাজিক হইয়া উঠে এবং বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালাইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। তখন হয়ত খানিকটা বাধ্য হইয়াই সে স্কুল পলাইতে আরম্ভ করে এবং স্কুলের বাহিরের জগতে শাসন-শৃংখলা বা স্নেহের অভাবে সে হয়ত শেষ পর্যন্ত সত্যই মন্দ হইয়া উঠে।

এই বিরোধিতা ছাড়াও প্রতিভাশালী বালকদিগের খারাপ হইয়া যাইবার অন্য কারণও আছে। তাহারা অল্প বয়সেই বেশী বুঝিতে শিখে বলিয়াই তাহার সঙ্গীরা যখন নিছক ছেলেমানুষী করিয়া দিন কাটাইতে থাকে, তখন ইহারা হয়ত গোপনে রাজনৈতিক মতবাদের গহনতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ও গুপ্ত সমিতির সভ্য অথবা গোপনে প্রেমচর্চায় রত হইতে পারে, ফলে পড়াশুনায় অবহেলা আসিতে পারে।

সাধারণ শিক্ষকগণ এই সমস্ত বালকদিগকে ঠিকভাবে পরিচালিত করিতে

পারেন না এবং ইহাদের পড়াশুনার অবহেলাটির কদর্থ করিয়া পরিস্থিতিকে জটিলতর করিয়া তুলেন। ফলে ইহাদের সম্ভাবনার বিরাট অপচয় হয়।

আমাদের রাষ্ট্রের সমস্ত শিক্ষকই যদি মনস্তাত্ত্বিক হইতেন, অথবা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বিধি-ব্যবস্থায় সকল ছাত্রের মনস্বিতাংশ অভ্রান্ত ভাবে নির্ণীত করিয়া লইয়া যদি প্রতিভাশালী ছাত্রদের জন্য পৃথক এবং বিশেষ বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা করা হইত, তাহা হইলে এই অপচয়টি হইত না। কিন্তু সে ব্যবস্থা আমাদের নাই, আর ব্যাপক বুদ্ধি পরীক্ষার ব্যবস্থা না করিলে প্রতিভাকে অভ্রান্তভাবে চিনিয়া লওয়াও যায় না। (ফলে প্রতিভাশালী বালকেরা পথি-প্রান্তস্থ কস্তুরীখণ্ডের মতই কর্দমখণ্ডের সহিত অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকে।) শুধু ভারতবর্ষেই যে প্রতিভাশালী বালক বালিকাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শিক্ষা-ব্যবস্থা নাই, তাহা নহে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও জড়বুদ্ধি ছাত্রদের জন্য যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা করা হইয়াছে, প্রতিভাশালী ছাত্রদের জন্য আজ পর্যন্ত সেরূপ কিছু করা হয় নাই।

নির্বোধ বালককে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। কিন্তু লাজুক প্রতিভাশালী বালকটি অনেক সময়েই সাধারণ বালকদিগের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে বলিয়াই তাহাকে অনেক সময় চিনিতে পারা যায় না এবং তাহার জন্য বিশেষ প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না। যদি চিনিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহার জন্য কিরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা বিধেয়?

(ক) **ডবল প্রমোশন**: ডবল প্রমোশন জাতীয় ব্যবস্থায় ফল ভাল হয় কি?—না। কারণ সহপাঠি বন্ধুদের সহিত জন্মবয়সের পার্থক্যটা মনোবয়সের পার্থক্যের মতই অত্যন্ত অসুবিধার কারণ হয়। সেইজন্য প্রতিভাশালী বালকদিগকে বৎসরে বৎসরে ডবল প্রমোশন দিলে সহপাঠিদের সহিত তাহাদের বয়সের পার্থক্য অত্যন্ত বেশী হইয়া যায়। ফলে প্রতিভাশালী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে প্রাপ্তবয়স্ক কিশোর বা যুবকদিগের সহিত এক শ্রেণীতে পড়িতে হয়। কিন্তু বালক ও কিশোরের মনোজগৎ এক নহে। তাহাদের অনুরাগ-বিরাগ, আশা-আকাঙ্খা, মনের বহির্মুখিতা, অন্তর্মুখিতা, আগ্রহের বিষয়বস্তু প্রভৃতি অনেক জিনিসেরই পার্থক্য আছে। সুতরাং পড়াশুনার

ব্যাপারে অগ্রসর বলিয়াই অল্পবয়স্ক প্রতিভাশালী বালককে তাহার অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ কিশোরদিগের সহিত এক শ্রেণীতে পড়িতে দেওয়াও ঠিক নহে। ইহাতে সামাজিকতাবোধ ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া মানাইয়া চলিবার ক্ষমতা প্রভৃতি ব্যাহত হয়, অসমবয়স্ক সহপাঠিদিগের সহিত মেলা-মেশা ঠিক ভাবে সম্ভবপর হয় না। ফলে প্রীতি পাওয়া ও প্রীতি দেওয়ার রাজকীয় অধিকার হইতে প্রতিভাশালী বালকেরা বঞ্চিত হয়। ইহার পরিণাম শুভ নহে। কাজেই বাল্য-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে এই জাতীয় ডবল প্রমোশন দেওয়া ভাল ব্যবস্থা নহে।

(খ) একই শ্রেণীতে উপবিভাগ ঃ কাজেই প্রতিভাশালী ছাত্রদিগকে দুই-এক ক্লাশ ডিঙ্গাইয়া বড় বড় ছাত্রদের সঙ্গে পড়িবার ব্যবস্থা না করিয়া সমবয়স্ক ছাত্রদিগকে একই শ্রেণীতে রাখিয়া সেই শ্রেণীর মধ্যেই আবার মনস্বিতাংশের তারতম্য অনুসারে তাহাদিগকে ক, খ, গ প্রভৃতি উপবিভাগে ভাগ করিয়া পড়ানোই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। 'ক' বিভাগে হয়ত ১১৫ হইতে উধ্বর্তর মমস্বিতাংশযুক্ত বালকদিগকে রাখা হইল, 'খ' বিভাগে হয়ত ৮৫ হইতে ১১৫ পর্যন্ত এবং গ বিভাগে থাকিল ৮৫-র নিম্নতর মনস্বিতাংশযুক্ত নির্বোধ বালকেরা।

এই ক, খ, গ বিভাগ ছাড়া অত্যন্ত অধিক প্রতিভাশালী বালকদিগের জন্য একটি উপবিভাগ এবং অত্যন্ত নির্বোধদিগের জন্য আর একটি উপবিভাগ খুলিতে পারিলে আরও ভাল হয়। বর্তমানে আমেরিকায় প্রতিভাশালী বালকদিগের জন্য বিশেষ উপবিভাগের ব্যবস্থাটি খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। পূর্বে এরূপ ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু ১৯২৭—২৮ খৃষ্টাব্দে ২৩টি রাজ্যে ৪০টি শহরে ১৫০টি শ্রেণীতে প্রায় ৪০০০টি ছাত্রের জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফল এত ভাল হইয়াছে যে, যে-সমস্ত বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থার একবার প্রবর্তন হইয়াছে সেখানে আর ইহা পরিত্যক্ত হয় নাই।

(গ) রুচিমত শিক্ষার সুযোগ ঃ প্রতিভাশালী বালকদিগের জন্য বিভাগ ও উপবিভাগের ব্যবস্থা ছাড়া স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রুচিমত পাঠ করিবার সুযোগ দিয়া, গবেষণাজাতীয় কার্যে উৎসাহ ও সুযোগ দিয়া, বিভিন্ন

বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধাদি রচনা করিবার জন্য পথনির্দেশ করিয়া, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার প্রেরণা দিয়া, পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কল্যাণকর কার্যে নিযুক্ত রাখা যাইতে পারে।

এই নিযুক্ত রাখাটি একটি বড় কথা। অথচ বর্তমানে বিদ্যালয় প্রভৃতিতে যেরূপ শ্রেণীকেন্দ্রিক (ব্যক্তিকেন্দ্রিক নহে) ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাতে বুদ্ধিমান ছাত্রদের নিযুক্ত রাখা খুবই কঠিন কাজ। কারণ একটি বিষয় একজন প্রতিভাশালী বালক যত শীঘ্র বুঝিয়া লইতে পারে, সাধারণ ছাত্রেরা তত শীঘ্র বুঝিতে পারে না। কিন্তু ক্লাশের পাঠনের সময় একটি প্রতিভাশালী বালক বুঝিতে পারিল বলিয়া ক্লাশের অবশিষ্ট ছাত্রদের অগ্রাহ্য করিয়া নূতন পাঠ আরম্ভ করাও উচিত নহে, গণতন্ত্রসম্মতও নহে। ফলে, সাধারণ ছাত্রদের জন্য শিক্ষক মহাশয়কে যখন বার বার একটা বিষয় বুঝাইতে হয় তখন হয়ত প্রতিভাশালী বালকটির আগ্রহ শেষ হইয়া যায়। শিক্ষক মহাশয়ের পাঠনের মধ্যে সে তখন আর নূতন কৌতূহলের কিছু পায় না বলিয়াই তাহার মন ক্লাশের পাঠন হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। ফলে সে হয়ত তখন অন্য কিছু কাজ না পাইয়া কবি নবীনচন্দ্রের মত পণ্ডিত মহাশয়ের 'পোর্ট্রেট্' অঙ্কন করিতে চেষ্টা করে অথবা পাশের ছেলের সঙ্গে গল্প বা দুষ্টামি করিয়া সময় কাটাইতে চেষ্টা করে। যাহার দ্রুত-পদবিক্ষেপে চলা অভ্যাস, তাহাকে যদি বৃদ্ধা দিদিমাতা বা ছোট ভগিনীটিকে লইয়া পথে চলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার যেমন অসুবিধা ও অস্বস্তি হয়, সাধারণ বুদ্ধির সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতিভাশালী বালককে পড়াশুনা করিতে হইলে অনেক সময় এই জাতীয় একটা অসুবিধা হয়। ভাল শিক্ষকদিগের তাই উচিত ক্লাশে পড়াইবার সময় এই সমস্ত প্রতিভাশালী বালকদিগের প্রতি সতর্ক ও সহৃদয় দৃষ্টি রাখা এবং প্রতিনিয়ত তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিত্ব

[ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি-বৈচিত্র]

সার জন অ্যাডামস্ বলিয়াছিলেন, শিক্ষা ক্রিয়াটির দুইটি কর্ম : একটি ছাত্র এবং অপরটি ছাত্রের শিক্ষার বিষয়। ইহার ব্যঞ্জনা এই যে, শিক্ষককে যেমন তাঁহার অধ্যাপনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও পণ্ডিত হইতে হইবে, তেমনি ছাত্রদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যগুলিও জানিতে হইবে।

অবশ্য জাতি (species) হিসাবে প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার ফলে একজন মানুষ একটা শিম্পাঞ্জী বা ওরাংওটাং হইতে পৃথক শ্রেণীর জীব বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক মানুষেরই মনুষ্যজাতি হিসাবে কতকগুলি বিশিষ্ট গুণাগুণের উপাদান আছে, এ কথা সত্য। তাহা হইলেও, এই সমস্ত উপাদানের সংস্থান, গ্রন্থন, মাত্রা, পারস্পরিক অনুপাত প্রভৃতির জন্য একটি মানুষ অন্য একটি মানুষ হইতে সম্পূর্ণ একজন পৃথক শ্রেণীর জীব হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। এইগুলি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকিলে মানুষের সহিত সঠিকভাবে কারবার করা যায় না। সামান্য একটি সাইকেল চালাইতে হইলেও আমাদের পূর্ব হইতে জানিয়া রাখিতে হয়, সাইকেলের ব্রেকটি ডানদিকে, না বাঁদিকে, ফর্কটি ঠিক আছে কি না, গাড়ীটি fixed wheel না free wheel জাতীয়। সুতরাং মানুষের সহিত কারবার করিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে আরও ব্যাপকতর পরিচয়ের প্রয়োজন। কাজেই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্ব বা Porsonality শব্দ ল্যাটিন 'Persona' শব্দ হইতে প্রচলিত। 'Persona' শব্দের অর্থ 'মুখোস'। প্রাচীনকালে অভিনেতারা যখন মুখোস পরিয়া অভিনয়ে এক একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন, তখন দর্শকবৃন্দের কাছে এই মুখোস-পরা সামাজিক সত্তাটাই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিত। এই ব্যাপারটাই হইতেছে Personality শব্দের সমাজতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনার

ইতিকথা। সাধারণ ভাবেও আমরা কথাবার্তার মধ্যে বলিয়া থাকি "অমুক লোকটির খুব ব্যক্তিত্ব আছে"—কথাটার ব্যঞ্জনাই হইতেছে যে অমুক লোকটি সমাজের অন্যান্য লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা রাখে।

Personality শব্দের ইতিহাস অথবা লৌকিক ব্যবহার যাহাই হউক না কেন, Personality হইতেছে মানুষের আচরণের বহিঃপ্রকাশ মাত্র নহে, তাহার পরিচয় আরও গভীর ও ব্যাপক। ইহা হইল মানুষের অন্তর-বাহির সমগ্র সত্তার পরিচয়। ইহা মানুষের স্বভাব, শিক্ষা, চর্চা, সামাজিকতা প্রভৃতি সব কিছুর সামগ্রিক পরিচয়। ব্যক্তিত্ব হইতেছে মানুষের স্থায়ী চারিত্রিক সত্তা। "Personality therefore is a compostie phenomenon—the whole individual considered as a whole."—(V. V. Akolkar)। আচরণবাদী পণ্ডিতদের মতে ব্যক্তিত্ব হইতেছে 'Total quality of the behaviour of an individual'.

ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে য়্যুঙ্-এর (Jung) বিশ্লেষণটি অনুধাবনযোগ্য। তাঁর মতে মানুষের 'Persona' হইতেছে তাহার বাহিরের জগতের সহিত মেলমেশার পরিচয়। কিন্তু ইহাই তাহার সবখানি নহে। তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় হইতেছে তাহার নির্জ্ঞান মনের আশা-আকাঙ্খা-প্রবণতা এবং তাহার ব্যবহারিক জীবনের আচরণ—এই উভয়ের সমষ্টিগত ফল। য়্যুঙ্ বলেন, বাহিরের আচরণগুলি হইতেছে আমাদের Persona-র পরিচয়। এই Persona-র অনুপূরক আরও একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের নির্জ্ঞান মনের মধ্যে আছে; তাহা হইতেছে Anima; ইহা Persona-র বিপরীতধর্মী। ফলে, যে ব্যক্তি সজ্ঞানে অত্যন্ত সাহসী, নির্জ্ঞান মনে সে হয়ত খুব ভীরু; সজ্ঞান আচরণে যে খুব সাধু, নির্জ্ঞান মনে সে অসাধু হইতে চায়, ইত্যাদি। এইভাবে সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, অথবা পরস্পরের আতিশয্যের সংশোধক। এই নিয়ম অনুসারে একজন ব্যক্তি যদি সজ্ঞান ভাবে বহির্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে নির্জ্ঞান মনে সে অন্তর্বৃত্ত হইবে, সে যদি বাহিরের আচরণে চিন্তাপরায়ণ হয়, ভিতরের দিকে সে হয়ত অনুভূতিপ্রবণ হইবে। Woodworth-এর সিদ্ধান্ত হইতেছে, 'ব্যবহারিক জীবনে

কৃতকার্যতা আসে এই এক দিকের বৈশিষ্ট্যের অনুশীলনের মধ্য দিয়া। জীবনের প্রথমার্ধে ৪০ বৎসর পর্যন্ত ইহাতে ভালই কাজ হয়। ইহার পর জীবনের উত্তরার্ধে আসে একটা রিক্ততা ও ব্যর্থতার অনুভূতি।' এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে য়ুাঙ্ বলেন, 'রোগীর নির্জ্ঞান মনের সন্ধান করিয়া তাহার 'shadow self'-কে খুঁজিয়া বাহির করা ও তাহার মনের ভারসাম্য ফিরাইয়া আনা।'

য়ুাঙ্ এর এই মনোবিকলন তত্ত্ব আমাদের আলোচ্য নহে। তবে তাঁর Persona এবং Anima-র তত্ত্বটি আমাদের কাছে ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিচয় হিসাবে খুবই মূল্যবান্।

বর্তমান মনোবিদ্‌গণ "চরিত্রের প্রসার" (Dimension of Personality) বিষয়ে যাহা আলোচনা করেন, তাহার মধ্যেও য়ুাঙ-এর Persona ও ও Anima তত্ত্বের মতই গুণের বৈপরীত্যের (Polarity) একটি ইঙ্গিত আছে। কোনও মানুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যদি বলা হয় "লোকটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ" তাহা হইলে ইহাই বুঝায় না যে, লোকটি কখনও দুর্বলতা দেখায় না। একই মানুষ অবস্থা বিশেষে দৃঢ়চিত্ত ও দুর্বলচিত্ত, সাধু ও অসাধু, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ, সাহসী ও ভীরু, স্বার্থপর প্রভৃতি হইতে পারে। তবে যদি দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে জেদী বা সাধু, তাহা হইলে লৌকিক বিচারে আমরা তাহাকে জেদী বা সাধু বলিয়া অভিহিত করি। তবে তাহার আসল পরিচয় হইতেছে দৃঢ়তা ও দুর্বলতা, সাধুতা ও অসাধুতা প্রভৃতির প্রান্তিক বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী সমগ্র পরিচয়টুকু লইয়া। ইহাকেই বলা হয় ব্যক্তিত্বের পরিচয়। বস্তুতঃ দুইটি বিপরীতধর্মী গুণকে প্রান্ত হিসাবে কল্পনা করিয়া সেই প্রান্তিক বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী কাল্পনিক সরলরেখাকেই বলা হয় "ব্যক্তিত্বের প্রসার" (Dimension of Personality)। ইহার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয় এক একটি "ব্যক্তিত্ব গুণ" (Trait of Personality)। এই 'ব্যক্তিত্ব গুণটি' হইতেছে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিত্ব পরিসরের মহাকর্ষ-কেন্দ্র (Centre of gravity)। সামগ্রিক "ব্যক্তিত্ব" হইতেছে আবার এই সমস্ত "ব্যক্তিত্ব গুণের" সমষ্টিগত ফল।

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও বিকাশ : যে 'আমি'কে কেন্দ্র করিয়া আমার যে-ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে তাহার একটা ইতিহাস আছে। আমার জন্মগত শক্তি-প্রবৃত্তি ও রুচি-বিরাগের সহিত আমার প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা, প্রতি মুহূর্তের হাসিকান্না, আঘাত-সংঘাত, ঘটনা-রটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতি মুহূর্তেই গড়িয়া উঠিতেছে আমার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য। ফলে, গতকল্যের "আমি" আর আজিকার "আমি" নহি, আবার দু'দিন পরের "আমি"টাও ঠিক আজিকার "আমি" থাকিব না। কারণ, ইতিমধ্যেই যে সব ঘটনা ঘটিবে, তাহার ফলে আমার ব্যক্তিত্বটা বদলাইয়া যাইবে।

বাড়ীর গিন্নীটি দেব দ্বিজে খুব ভক্তি করিতেন। ছেলের অসুখের সময় তিনি কালীর কাছে জোড়া পাঁঠা মানত করিলেন। তা সত্বেও ছেলেটি মারা গেল। ফলে, গিন্নীটি হইয়া উঠিলেন ঘোর নাস্তিক।

এমনি প্রতিদিনের কত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। আমাদের দেহমনের জন্মগত বিশেষত্বগুলির সঙ্গে আমাদের প্রতিমুহূর্তের এইসব প্রভাবগুলি দিয়া গড়িয়া উঠে আমাদের ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তিত্বের উপাদান (Personality traits) **:** অনেক কিছুর সমবায়ে ব্যক্তিত্বটা গড়িয়া উঠিলেও, সেটা একটা জোড়াতালি দেওয়া সামগ্রী নহে। কারণ, ব্যক্তির সত্তা হইতেছে একক, স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কালিকার 'আমি' আর আজিকার 'আমি' ঠিক এক না হইলেও, সেটা কিন্তু 'আমি' ঠিকই। তাই তাহাকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা চলে না, পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করা যায় না, না যায় সংজ্ঞা দিয়া সীমায়িত করা।

তাহা হইলেও, মানুষের পরিচয় দিবার জন্য তাহার বিশেষত্বগুলি, তার বৈশিষ্ট্যগুলির (Traits) বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। নানা পণ্ডিত নানাভাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মনোবিদ্ এ্যালপোর্ট (Alport) মানুষের ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যের এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন: (১) বুদ্ধি, (২) চলমানতা (Mobility), (৩) স্বভাব (Temperament), (৪) আত্মপ্রকাশ (Self expression) ও (৫) সামাজিকতা (Sociability)।

গেটস্ (Gates) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ব্যক্তিত্বের উপাদান বিশ্লেষণ

করিয়াছেন এইভাবে : (১) শারীরিক বৈশিষ্ট্য, (২) মানসিক বৈশিষ্ট্য, (৩) প্রবণতা ও দক্ষতা (সঙ্গীত, শিল্পকলা, কারিগরী প্রভৃতি বিষয়ে তারতম্য), (৪) অর্জিত জ্ঞান, রসগ্রাহিতা ইত্যাদি. (৫) আয়ান (Temperament), (৬) ইচ্ছাশক্তি ও (৭) নৈতিক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

আবার মনীষী মরগ্যান (Morgan) ও গিলিল্যাণ্ড (Gilliland) ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান দিয়াছেন তাহা এই : (১) বুদ্ধিমত্তা, (২) আবেগ বা প্রক্ষোভপরায়ণতা, (৩) দৈহিক আকৃতি, (৪) সামাজিকতা, (৫) জেদ এবং (৬) চরিত্র। নিম্নে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল।

(১) **বুদ্ধিমত্তা**—বস্তুতঃ বুদ্ধির মাত্রার তারতম্যের ফলেই মানুষে-মানুষে বহু পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। নানা গুণ সত্বেও, বুদ্ধির অভাব হইলেই মানুষ অপদার্থ জীব হইয়া উঠে। অবশ্য শুধু বুদ্ধিটাই সব কিছু করিতে পারে না। ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে প্রবল জেদ থাকিলে মানুষ বিশেষ উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু ঐ জেদটি না থাকিলে বুদ্ধিটাও কার্যকরী হয় না। আবার বুদ্ধির সঙ্গে যদি নৈতিক চরিত্রটা ভাল না হয়, তাহা হইলেও মানুষ সমাজের বিভীষিকা হইয়া উঠে। কাজেই ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে বুদ্ধি, উদ্যম প্রভৃতি এক একটার মাত্রাটাই বড় কথা নহে, তাহার চেয়ে বড় কথা হইতেছে ঐ সবের সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য।

(২) **আবেগপ্রবণতা** (Emotionality) : ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে আবেগ অথবা প্রক্ষোভের একটা বিশেষ স্থান আছে। কেহ হয়ত একটুতেই রাগিয়া উঠে, কেহ বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির, কেহ হয়ত সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে, কেহ হয়ত পান হইতে চুনটি খসিলে কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলে, সামান্য একটু বাতিকের জর হইলে চেঁচাইয়া, গান গাহিয়া পাড়া মাথায় করে। কেহ আবার এমনই আল্‌গা প্রকৃতির যে একটুও হাসি-কান্নার বেগ সামলাইতে পারে না ; পেটে কথা রাখিতে পারে না। কেহ হয়ত ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে পারে না, বিপদ-আপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারে না। কেহবা সামান্যতেই আকাশ-পাতাল ভাবিয়া দিশেহারা হইয়া পড়ে। এই প্রক্ষোভ বা আবেগজনিত বৈচিত্র্যের ফলে ব্যক্তির মোটামুটি প্রকারভেদ

(Type) হইতে পারে : (১) উল্লাসপ্রবণ, (২) বিষাদপ্রবণ, (৩) উত্তেজনা-প্রবণ, (৪) অপ্রতিষ্ঠ (ব্যক্তিত্বের Type প্রসঙ্গে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

(৩) **আকৃতি** (Personal appearance) : সমাজে সুদর্শন আকৃতির বিশেষ প্রভাব আছে। এই আকৃতি বলিতে শুধু চোখ-মুখের গড়ন, গায়ের রঙ প্রভৃতিকেই বোঝায় না, সাজ-পোশাক, চলন-বলনের ভঙ্গী প্রভৃতি সব কিছুকেই বুঝায়। জীবনের বহু কাজের ক্ষেত্রেই ভাল আকৃতির বিশেষ মূল্য আছে। আবার আকৃতিটা শুধু শারীরিক গঠন ও সাজ-পোশাকের উপর নির্ভর করে না ; পরিচ্ছন্নতা, রুচিবোধ, শালীনতা, সংযম প্রভৃতির মূল্য নিছক শারীরিক গঠনের চেয়ে অনেক বেশী। পরিচ্ছন্নতা, রুচিবোধ প্রভৃতি শিক্ষা-সাপেক্ষ। সৎসঙ্গ ও সুশিক্ষায় আয়ত্ত করা যায়।

(৪) **সামাজিকতা** (Sociability) : মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ সম্বন্ধেই মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয় সার্থক হয়। বস্তুতঃ সমাজগত পরিচয়ই তার আসল পরিচয়। সে পাঁচজনের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করে এইটুকুই তাহার বড় পরিচয়। এইদিক দিয়াই য়ুঙ্ (Jung) সাহেব বহির্বৃত্ত আর অন্তর্বৃত্ত মানুষের এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

(৫) **জেদ বা দৃঢ়চিত্ততা** (Forcefulness) : ব্যক্তিত্বের এই বিশেষত্বটি জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়। অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিই এই গুণটির অভাবে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়। অপর পক্ষে ইহারই ফলে বহু দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদেরও জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে দেখা যায়। কাজেই এই গুণটির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। রবার্ট ব্রুস, নেপোলিয়ান, নেতাজী প্রভৃতি ঐতিহাসিক বীরগণ এই গুণটির জোরেই বড় হইয়াছিলেন। বাধার প্রথম স্পর্শ পাইয়াই যাহারা কিঞ্চুলিকার (কেঁচোর) মত পশ্চাৎপদ হয়, তাহারা জীবনে জয়ী বা শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না।

(৬) **নৈতিক চরিত্র** (Moral Character) : নৈতিক চরিত্র প্রসঙ্গে অনেকে সংযম, শম, দম প্রভৃতির কথা ভাবেন। সংযম, শম, দম প্রভৃতির সঙ্গে একটা আত্মত্যাগ ও অস্বীকৃতির ব্যঞ্জনা আছে। কিন্তু অস্বীকৃতিটাই সংযমের মূল কথা নহে। নেতিমূলক গুণ দিয়া কোনও মহৎ সৃষ্টি হয় না।

তাহা হইলে কি অসংযত ভোগ-বাসনার মধ্য দিয়াই তৈয়ারী হইবে নৈতিক চরিত্র ? তাহাও সম্ভবপর নহে। ইহার সমাধান অন্য পথে আছে। ত্যাগের সাধনা কিছুটা চাই-ই। তবে সেটা জোর করিয়া ঘাড়ে-চাপানো হইলে ফল হইবে না। তাহার প্রেরণা আসা চাই ভিতর হইতে রসনাভূতির পথ দিয়া। একটা বিষয়ের রসানুভূতি অন্য বিষয়ের প্রলোভনকে অস্বীকার করিবার মতো মনের জোর দেয়। এই অস্বীকার নেতিমূলক নয়। যে-ছেলে অঙ্ক করিবার জন্য সিনেমা দেখিতে যাইল না, সে নিশ্চয় অঙ্কের মধ্যেই আনন্দ পাইয়াছে। এই আনন্দের মূলে আছে রসানুভূতি। এই 'রসানুভূতি'-সৃষ্টির গোড়ার দিকে একটা "দোটানার" ভাব থাকে, সেই সময়ে খানিকটা দুঃখের সাধনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু রসানন্দ পরিপক্ক হইলে সেই দুঃখটাও আর দুঃখ থাকে না। তখন সাধনা আর আনন্দ একই জিনিস হইয়া পড়ে।

ব্যক্তিত্বের উল্লিখিত উপাদান ছাড়া আরও অনেক উপাদান আছে। ইংরাজী সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের গুণপ্রকাশক শব্দের সংখ্যা ১৮,০০০-এর চেয়েও বেশী। ইহা হইতেই ব্যক্তি-বৈচিত্র্যের বিপুলতা সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করিতে পারা যায়। এই অষ্টাদশ সহস্রাধিক গুণ বা দোষের বিভিন্ন অনুপাতে, বিভিন্ন প্রকার সমাবেশে কোটি কোটি প্রকার ব্যক্তিত্বযুক্ত মানুষের সৃষ্টি হইতে পারে, হইয়াছেও তাহাই ? এইজন্য পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষটিই তাহার বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় ; কোনও মানুষেরই ঠিক জোড়া নাই। তবু মানুষকে বুঝিবার জন্য তাহার শ্রেণীবিভাগ করিতে হয়, ছোট ছোট অমিলগুলি বাদ দিয়া বড় বড় বিষয়ের মিলগুলি একত্র করিয়া মানুষকে বিভিন্ন Type-এ ভাগ করিতে হয়। এইরূপ Type-এ বিভাজনটি ঠিক বৈজ্ঞানিক না হইলেও খানিকটা ব্যবহারিক সুবিধার জন্য প্রয়োজন হয়।

বৈশিষ্ট্য (Trait) হিসাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ

বহু বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠিত হইলেও, ব্যক্তিত্ব ঠিক কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের আল্‌গা পুঁটুলি মাত্র নহে। ব্যক্তিত্ব হইতেছে একটা

সুসংহত একক। ইহার একটা আরম্ভ আছে, পরিণতি আছে এবং একটা স্থায়ী রূপ আছে। একজন যখন আর দশ জন হইতে পৃথকভাবে প্রতিভাত হয়, তখনই আমরা বলি লোকটার ব্যক্তিত্ব আছে। কুকুর-বিড়ালের, ইঁদুর বা গিনিপিগের ব্যক্তিত্বের কথা আমরা ভাবি না এই জন্য যে, ইহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যই ইহাদেরপ্রত্যেকের আচরণকে প্রায় একইভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তিত্বের পরিণত একটা রূপ আছে বলিয়াই একটা শিশুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও কোনও প্রসঙ্গ আসে না, সব শিশুই প্রায় একশ্রেণীর জীব। কিন্তু সব পরিণতবয়স্ক মানুষ একশ্রেণীর জীব নহে, তাহারা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেকেই খানিকটা পৃথক জীব। এইজন্যই ব্যক্তিত্বের ঠিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, তাহার কতকগুলি লক্ষণের প্রতি শুধু ইঙ্গিত করা যায়। নিম্নে ব্যক্তিত্বের সাধারণ লক্ষণ বিষয়ে কিছু বলা হইতেছে।

আত্মসচেতনতা—আত্মসচেতনতা ব্যক্তিত্বের একটা বড় লক্ষণ। আচরণ-জনিত সমাজের স্তুতি-নিন্দা অথবা কাজের সিদ্ধি ও ব্যর্থতা, জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি সচেতন মনোভাব না থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিত্বের কোনও অর্থই থাকে না।

সামাজিকতা—সমাজ-পরিবেশই ব্যক্তিত্বের পরিচয়। সমাজের বিভিন্ন মানুষের সহিত মেলামেশা করিবার সময় আমরা কি ভাবে আচরণ করিব তাহা দ্বারাই আমার ব্যক্তিত্বের পরিচয় মিলিয়া থাকে।

উপযোজন (Adjustment)—বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে মানাইয়া লওয়া, খাপ খাওয়াইয়া লওয়া বা 'উপযোজন' ব্যক্তিত্বের একটা বড় লক্ষণ। এই উপযোজন গুণটি না থাকিলে মানুষ সামাজিক হইতে পারে না।

লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ—মানুষের সমস্ত আচরণগুলিই উদ্দেশ্যমূলক। তাহার প্রত্যেক কাজের মধ্যেই একটা প্রেরণা আছে, আছে একটা লক্ষ্য। সেই সমস্ত লক্ষ্যবস্তুর মূলে হয়ত আদিম প্রবৃত্তির (অপত্য, যুযুৎসা, কৌতূহল, আত্মবিস্তার প্রভৃতি) তাড়না থাকিতে পারে; তাহা হইলেও সেগুলি নিছক অন্ধ প্রবৃত্তি নহে। পুরাপুরি আত্মসচেতন না হইলেও ইহা উদ্দেশ্যমূলক।

সংহত একত্ব—ব্যক্তিত্বের সর্বাপেক্ষা বড় লক্ষণ হইতেছে তাহার 'একত্ব'। মানুষ জন্মগ্রহণ করে কতকগুলি প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তি জাতীয় জিনিস ও গোষ্ঠীগত সম্ভাবনা লইয়া। তাহার পর জীবনের চলতি পথে অর্জিত অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্ব দানা বাঁধিতে থাকে, বিচিত্র সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আসে রসবোধ, নিয়ন্ত্রিত হয় আচরণ ; সমাজের সঙ্গে ও সাহচর্যের আদর্শে এবং গণমনের প্রভাবে সহানুভূতি, অভিভাবন, অনুকরণ প্রভৃতির দ্বারা গড়িয়া উঠিতে থাকে 'আত্মবোধ', তৈয়ারি হয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সহিত অর্জিত জ্ঞান, আয়ান, শিল্পসাহিত্য, কলা প্রভৃতিতে দক্ষতার সমবায়ে গড়িয়া উঠে "ব্যক্তিত্ব"। এই ব্যক্তিত্ব প্রত্যেক মানুষেরই সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং ইহাই তাহার স্থায়ী পরিচয়।

'টাইপ' হিসাবে মানুষের শ্রেণীবিভাগ

ইংরাজী সাহিত্যে Type বা Typical কথাটি খুবই প্রচলিত। মানুষের টাইপ হইতেছে এক একটা আদর্শ প্রতিরূপ যাহা দ্বারা এক জাতীয় মানুষকে অন্যান্য মানুষ হইতে পৃথক ভাবা যায়, অথবা যাহার আদর্শ কেন্দ্র করিয়া অনুরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষকে তাহার দলে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। সাহিত্যের, বিশেষভাবে উপন্যাস ও নাটকের বিচারে Typical চরিত্রের কথা প্রায়ই শুনা যায়। সেক্ষপিয়রের 'Hamlet', 'King Lear', ডিকেন্সের 'Oliver', 'Uriah Heep', শরৎচন্দ্রের 'ইন্দ্রনাথ', 'অন্নদাদিদি', রবীন্দ্রনাথের নাটকের 'ঠাকুর্দা', আর উপন্যাসের 'আনন্দময়ী', 'অমিট্ রায়' প্রভৃতি অংসখ্য চরিত্রকে এক একটি টাইপ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। এখানে টাইপ হিসাবে মানুষের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য দেওয়া হইল :

(১) সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়ক-নায়িকাদের এই টাইপগত বিচারেই ধীরোদাত্ত, ধীর-ললিত, ধীর-প্রশান্ত, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে।

(২) আয়ুর্বেদশাস্ত্রে মানুষকে যে বায়ু, পিত্ত ও কফের ধাতুর লোক বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহার ব্যঞ্জনাটি নিছক দেহতাত্ত্বিক নহে, ইহার মধ্যেও একটা ব্যক্তিত্বের "টাইপ"গত ব্যঞ্জনা আছে।

(৩) মধ্যযুগে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও মানুষের দেহের মধ্যে রসের (Humour) প্রাচুর্য ও অপ্রাচুর্যের লীলার জন্য মানুষকে ক্রোধশীল (Choleric), জড় প্রকৃতির (Phlegmatic), বিষাদশীল (Melancholic) এবং আশাবাদী (Sanguine) এইভাবে ভাগ করা হইত।

(৪) সাধারণ লোক যে মানুষকে Practical ও Theoretical অথবা Subjective ও Objective প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করে, তাহাও এক হিসাবে মানুষকে টাইপ হিসাবে বিভাগ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

(৫) মিঃ সেলডন্ মানুষের দৈহিক ও স্নায়ু সম্বন্ধীয় গঠনের বিচার করিয়া 'ভিসেরোটোনিক' (Visurotonic), সোমাটোটোনিক (Somatotonic) ও সেরিব্রোটোনিক (Cerebrotonic) এইভাবে ভাগ করিয়াছেন।

(৬) রাণী এলিজাবেথের শিক্ষাগুরু Roger Ascham বহু পূর্বেই দুই জাতীয় টাইপের ছাত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, যথা, "Quick witte"-র দল (যাহারা তাড়াতাড়ি শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বেশীদিন স্মরণ রাখিতে পারে না) আর "Hard witte"-র দল (যাহারা সহজে গ্রহণ করে না, তবে যাহা গ্রহণ করে, তাহা সহজে ভুলিয়া যায় না)।

(৭) মনোযোগ দিবার ক্ষমতার দিক দিয়াও মানুষের শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে ; যথা—Fixating type, Fluctuating type, Static ও Dyanamic type. Fixating টাইপের লোকেরা নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করে এবং নিখুঁত বর্ণনা করে ; Fluctuating টাইপের লোকেরা ঐ সমস্ত বর্ণনার সহিত নিজের কল্পনা ও মন্তব্য মিশাইয়া দেয় ; Static টাইপের লোকেরা একটা বিষয়ে মনোযোগ দিয়া সেই মনোযোগকে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিয়া যাইতে পারে, আর (Dynamic) টাইপের ব্যক্তিদের প্রতিনিয়তই স্মরণ করাইয়া দিতে হয়।

(৮) স্মৃতিশক্তির দিক দিয়াও মানুষের শ্রেণীবিভাগ হয় ; যথা—Perseverator ও Non-preseverator। যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশেষ কোনও চেষ্টা না করিয়াই অতীত ঘটনাকে স্মরণ করিতে পারে অর্থাৎ যাহাদের "তাৎক্ষণিক স্মৃতি" প্রবল তাহাদিগকে Perseverator type বলা

হয়। Non-perseverator type ঠিক ইহার বিপরীত শ্রেণীর লোক।

(৯) স্টার্ণ (Stern) মানুষকে Objective ও Subjective এই দুই টাইপে বিভক্ত করিয়াছেন। অতীত ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম শ্রেণী বাস্তব ঘটনাটিকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বর্ণনা করিয়া যায়, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা তাহাতে নিজের অনুভূতির রং লাগাইয়া ঘটনাটিকে রঞ্জিত করিয়া তুলেন।

(১০) Meumann এবং Stern সাহেব Analytic এবং Synthetic নামক দুইটি টাইপের কথাও বলিয়াছেন। প্রথম টাইপের ব্যক্তিরা ঘটনার খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিয়া বৃহত্তর বিভাগের মধ্য হইতে উপ-বিভাগের সন্ধান করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা খুঁটিনাটি ঘটনার দিকে ততটা লক্ষ্য না রাখিয়া বিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে সাম্যের ইঙ্গিত পান অর্থাৎ সমগ্রভাবে দেখেন। Stern 'Sponteneous' এবং 'Merely receptive' এই ভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা বাহিরের চাপে বা প্রেরণায় কাজে প্রবৃত্ত হন।

(১১) Memory image-এর বিচারেও মানুষের শ্রেণীবিভাগ হয়, যথা 'Eidetic' ও 'Verbal' type. Eidetic টাইপ লোকেরা প্রত্যক্ষীভূত জিনিসগুলিকে একেবারে বাস্তব ও জীবন্তভাবে অনুভব করিতে পারে। ইহাদের কল্পনা ও বাস্তবের বিভেদটা অত্যন্ত ক্ষীণ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায়ই এই বিভাগে পড়ে। Verbal টাইপের ব্যক্তিরা Verbal imagery-তে দক্ষ। ইহারা ভাষার সাহায্যে চিন্তা করে। এই বিভাগটির মধ্যে আবার Visual, Auditory এবং Motor এই কয়েকটি উপ-বিভাগ আছে।

(১২) William James মানুষকে ভাগ করিয়াছেন "নরম মনের মানুষ" (tender-minded) ও "কঠিন মনের মানুষ" (tough-minded) হিসাবে। প্রথম দলের লোকেরা হয় চিন্তাপ্রবণ, আদর্শবাদী ও খানিকটা ধর্মভীরু; আর দ্বিতীয় দলের লোকেরা হয় ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত। ইহারা খানিকটা অবিশ্বাসী ও নাস্তিক প্রকৃতির এবং লাভক্ষতির দিকে সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন।

(১৩) ক্রেটস্‌মার (Kretschmer) মানুষকে ভাগ করিয়াছেন, Pyknic, Leptosome, Athletic এবং Dysplastic টাইপে। Pyknic

টাইপ-এর লোকেরা মোটাসোটা, আমুদে, সামাজিক প্রকৃতির। ইহারা খানিকটা বহির্বৃত্ত দিল-খোলা মানুষ। শরীরের দিক দিয়া সুস্থ এবং আচরণের দিক দিয়া বন্ধুভাবাপন্ন। Leptosome টাইপের মানুষ হইতেছে রোগা, অসামাজিক, লাজুক ও অভিমানী প্রকৃতির লোক। Athletic টাইপের মানুষেরা সবল, স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী। ইহারা বিপদে নির্ভীক, দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রগামী, বেপরোয়া প্রকৃতির। Dysplastic টাইপ হইতেছে এইসব বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মিশ্রণ।

(১৪) Spranger আদর্শের মূল্যবোধের দিক দিয়া মানুষের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন; যথা—Cognitive, Aesthetic, Economic, Political, Religious এবং Social. Cognitive টাইপের ব্যক্তিরা জ্ঞানের ও সত্যের পথের পথিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, অবিষ্কারক প্রভৃতি। Aesthetic টাইপ হইতেছে চারুকলা, শিল্প, নৃত্যগীত প্রভৃতিতে আগ্রহশীল। Economic টাইপের লোকেরা আয় বুঝিয়া ব্যয় করেন, টাকা পয়সার হিসাব বুঝিতে পারেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, কারবার প্রভৃতিতে উন্নতি করিতে পারেন। Political টাইপের লোকেরা নেতৃত্বকামী ও আস্ফালনপ্রিয় মানুষ, ছলে-বলে-কৌশলে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও শক্তি অধিকারে ইহারা দক্ষ। Religious টাইপের লোকেরা ঐহিক সুখ-সুবিধার চেয়ে পারলৌকিক সুখ-সুবিধার দিকে বেশী আগ্রহশীল; আর Social টাইপের লোকেরা সমাজ-সেবা, সমাজ-সংস্কার, জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বেশী আগ্রহশীল।

(১৫) Kracpelin অ-স্বভাবী মানুষদের ভাগ করিয়াছেন Mannic depressive (খেদোন্মত্ত বাতুল), Dementia præcox (চিত্তভ্রংশী বাতুল) প্রভৃতি ভাগে। ইহা "অ-স্বভাবী মনোবিদ্যার" আলোচ্য বিষয়।

(১৬) Rosanof নামক আর একজন পণ্ডিত মানুষের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন Normal, Hysteroid, Cycloid, Schizoid এবং Epileptoid শ্রেণীতে। ইহাদের বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে।

(১৭) জার্মাণ পণ্ডিত নীট্সে মানুষের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন 'প্রভূজাতীয়' ও 'দাসজাতীয়' মানুষ হিসাবে।

মানুষের যতপ্রকার শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে তার মধ্যে সব চেয়ে প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ হইতেছে Morgan ও Gilliland প্রদর্শিত পথে মানুষের প্রক্ষোভ বা আবেগগত প্রতিক্রিয়ার বিচারে। উল্লাসপ্রবণ (Elated type), বিষাদপ্রবণ (Depressive type), উত্তেজনাপ্রবণ (Irritable) ও অপ্রতিষ্ঠ (Unstable type)—এই কয়েকটি "টাইপে" Morgan ও Gilliland মানুষের শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। য়্যুঙ্-এর অন্তর্বৃত্ত (Introvert) ও বহির্বৃত্ত (Extrovert) এবং তাহাদের উপ-বিভাগগুলিও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই টাইপগুলি সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

উল্লাসপ্রবণ (Elated type)—এই জাতীয় ব্যক্তিরা সব সময়েই কারণে-অকারণে সুখী ও আশাবাদী হইয়া থাকে। ইহারা যেন হাওয়ায় উড়িয়া চলে। ইহারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান নয়, সঞ্চয়ীও নহে, সাধারণতঃ স্ফূর্তিবাজ হয়।

উত্তেজনাপ্রবণ (Irritable type)—ইহাদের কথায় কথায় মাথা গরম হইয়া উঠে এবং একটা কিছু ঘটিলেই ইহারা উত্তেজিত হইয়া নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। ইহারা রস-রসিকতার ধার ধারে না এবং সব সময়েই যেন ঘুসি পাকাইয়াই থাকে।

অপ্রতিষ্ঠ (Unstable type)—ইহাদের কোনও সময়েই মন-মেজাজের ঠিক থাকে না। ইহাদের খামখেয়ালি আচরণ কখন যে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহার কিছু ঠিক নাই। ফলে, সামাজিক ব্যাপারে ইহাদের সহিত মানাইয়া চলা খুবই কঠিন ব্যাপার।

আবেগজনিত বৈশিষ্ট্যগুলির বাড়াবাড়ি হইলে মানুষের চরিত্র অ-স্বভাবী (Abnormal) হইয়া পড়ে এবং তাহারা সমাজের সহিত সুস্থভাবে কাজ-কারবার চালাইতে পারে না। কাজেই সুস্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য আবেগের সংযম-শিক্ষাটাও লেখাপড়া শিক্ষার মতই প্রয়োজনীয়।

বহির্বৃত্ত (Extrovert type)—বহির্বৃত্ত লোকেরা আত্মপ্রচারশীল ও আস্ফালনপ্রিয়। ইহারা সভাসমিতিতে বক্তৃতা, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি করিয়া নিজেকে জাহির করিতে চেষ্টা করে। ভীড়ের মধ্যে ইহাদের উৎসাহ

উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। বাড়ীতে বা ক্লাবের চেয়ে বিপুল দর্শকের মধ্যে ইহারা বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারে। সাধারণতঃ একলা থাকিতে পারে না, এমন কি পড়াশুনার ব্যাপারেও দুই-চারিজন সঙ্গী জোগাড় করিয়া লয়। আত্ম-বিশ্লেষণ প্রভৃতির চেয়ে পরের সমালোচনায় ইহারা পঞ্চমুখ।

অন্তর্বৃত্ত (Introvert type)—ইহারা কুনো প্রকৃতির। জনতা সহ্য করিতে পারে না, একলা থাকিতে ভালবাসে। বড় রকমের জনতার মধ্যে ইহারা ভড়কাইয়া যায়। ইহারা সব সময়েই আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্লেষণ-পরায়ণ। ইহাদের প্রতিভা জনতার মধ্যে যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বহির্বৃত্ত লোকদের মত ইহারা আত্মপ্রত্যয়শীল নয়, তাই ইহারা কোনও কিছু করিবার সময় এক পা অগ্রসর হইবার পূর্বে সাত পা পিছাইয়া যায়।

এই অন্তর্বৃত্ত ও বহির্বৃত্ত ছাড়াও য়্যুঙ্ মানুষের চিন্তা, সংবেদন, অনুভূতি ও সংজ্ঞার সহিত অন্তর্বৃত্ততা ও বহির্বৃত্ততার সংমিশ্রণজনিত আট প্রকার ব্যক্তি-বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্যক্তিত্ব জিনিসটা নিছক ব্যক্তিগত (Subjective) ব্যাপার নহে—অনেকখানি সমাজগত ব্যাপার। আমার পরিচয় নিছক আমিটুকু দিয়াই নহে, আমি পাঁচজনের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করি, পাঁচজনের ব্যবহারে আমার মধ্যে কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়, এইটাই আমার বড় পরিচয়। বস্তুতঃ সাধুতা অসাধুতা, ভদ্রতা, অভদ্রতা প্রীতি, বিরক্তি, সরলতা, কুটিলতা, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজ-পরিবেশ ছাড়া নিরর্থক। সেইজন্য যে লোকটা সমাজের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে সেই হইতেছে আদর্শ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। মানাইয়া চলার চেয়ে ধর্ম নাই। অথচ অধিকাংশ লোকই মানাইয়া চলিতে জানে না অথবা পারে না। এই মানাইয়া চলার অভাবে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দোষগুলি প্রকট হইয়া উঠে।

ঘৃণা ও অবিশ্বাস (Hate & Suspicion)—ইহার ফলে মানুষ ভাবে দুনিয়ার মধ্যে শুধু সে নিজেই ভাল লোক, আর বাকী সকলে শয়তান, জুয়াচোর, দুষ্ট। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত বলিয়াছিলেন যাহারা চাঁদে

কলঙ্ক ভিন্ন, কুসুমে কীট ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পায় না, তাহাদের চক্ষে সারা জগৎটাই আবর্জনার আঁস্তাকুড় হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সুখ কোথায়? জগতে দুঃখ, ক্লেদ, মলিনতাও আছে, আবার "আলো হাসি, গান"ও আছে, আনন্দও আছে। কিন্তু যাহারা এই আনন্দটাকে দেখিতে পায় না, মানুষের সাধুতা, সদ্‌গুণ প্রভৃতি বুঝিতে পারে না, তাহাদের জীবনটাই হইয়া উঠে নরক-যন্ত্রণা। কাজেই সুখী ও সুস্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য বাল্যকাল হইতেই ঘৃণা ও অবিশ্বাসের বদলে প্রেম ও বিশ্বাসের অনুশীলন দরকার। প্রেম ও বিশ্বাস মনের রসায়নস্বরূপ।

অসামাজিকতা (Seclusiveness)—যে সমস্ত লোকেরা মানুষকে ঘৃণা করে ও মানুষের সঙ্গে ভালভাবে মানাইয়া চলিতে পারে না, তাহাদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত কুনো প্রকৃতির হইয়া জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহারা জগতের স্তুতিনিন্দাকে গ্রাহ্য করে না এবং জগতের ঘটনা-রটনা লইয়া মাথা ঘামাইতেও চাহে না। ইহাদের মনোভাবটি হইতেছে চরম উদাসীনতার মনোভাব। ফলে, ইহারা জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই বড় হইতে পারে না। চরম অবস্থায় এই সব লোকের মধ্যে **"চিত্তভ্রংশী বাতুলতার"** (Dementia Præcox) লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভুলপথে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা—সামাজিক উপাযোজন (Adjustment)-টা ভুল হইলে এক দিকে আসে চরম উদাসীনতা ও অস্বীকৃতি, অন্য দিকে প্রবল হইয়া উঠে 'যেন তেন প্রকারেণ' সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সমাজ-স্বীকৃতি পাইবার চেষ্টা। সর্বজন-সেবিত পথ ত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কেহ বা রাখে বাবরী-কাটা চুল, আবার প্রাণপণে চেষ্টা করে চালচলনের ভিতর দিয়া অর্থ বা রুচির বাহাদুরি দেখাইবার। বলা বাহুল্য, ইহাতে সমাজের চোখে তাহারা ছোটই হইয়া যায়। তবুও চমক লাগাইবার বা চাল দেখাইবার নেশাটা কাটে না। খবরের কাগজে নামটা প্রকাশিত করিবার বাতিকও এই জন্য। জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে যাহারা পরাজিত হয় বা কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না, সাধারণতঃ এই ধরনের লোকই এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে।

"**টাইপ হিসাবে মানুষের শ্রেণীবিভাগটা** খুব বৈজ্ঞানিক নহে। বস্তুতঃ মানুষ বিভিন্ন টাইপে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া নাই। ক্রিম্যান বলিয়াছেন, পৃথিবীতে মানুষ আছে একটিমাত্র শ্রেণীর যাহাকে বলা যায় "সাধারণ শ্রেণী"র এবং এই সাধারণ শ্রেণীর দুই প্রান্তে আছে দু'চার জন লোক, যাহারা সাধারণ হইতে খানিকটা পৃথক: "There is a single type, the average, around which and from which individuals may deviate as variants." থর্ণডাইকও ঠিক অনুরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। অধ্যাপক Gates দেখাইয়াছেন, দুইটি লোকের বৈশিষ্ট্য যদি একই প্রকারের হয় এবং তাহারই মধ্যে যদি একজনের জেদ, যুযুৎসা বা স্বাস্থ্য বেশী হয়, তাহা হইলেই তাহাদের দুইজনের মধ্যে কৃতিত্বের দিক দিয়া আকাশ-পাতাল পার্থক্য হইবে। টাইপ হিসাবে ঠিক সমজাতীয় লোক বোধহয় পৃথিবীতে এক জোড়াও পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র একই বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই মতটি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, ইহার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। ব্যক্তিত্ব হইতেছে একটি বৃহত্তর একক (Unit) যাহার মধ্যে চরিত্র হইতেছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই জন্যই ব্যক্তিত্বের বিচারের সময় প্রায়ই চরিত্রের বিচারটাই বড় হইয়া উঠে। মানুষের দৈহিক উচ্চতা বা ওজন, গায়ের রং বা গলার স্বর প্রভৃতি বিশেষত্বগুলি ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক বটে, কিন্তু কাহারও সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে ঐ সব দৈহিক বিশেষত্বগুলির উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় না, যতটা করা হয় তাহার সাধুতা, অসাধুতা, সামাজিকতা, অসামাজিকতা, কৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণের উপর। এইজন্যই 'ব্যক্তিত্ব' ও 'চরিত্র' সাধারণতঃ একার্থবোধক হিসাবে প্রতীয়মান হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে চরিত্র হইতেছে ব্যক্তিত্বের সেই সমস্ত উপাদান যাহা দ্বারা মানুষের সামাজিক ব্যবহারগুলির ন্যায়-অন্যায় নির্ণীত হয় (Woodworth and Marquis : 'Psychology')। ব্যক্তিত্বের নৈতিক অভিব্যক্তিটিই হইতেছে "চরিত্র" (Gilliland A. R. : 'Genetic Psychology')।

সহজাত প্রবৃত্তি ও বংশগত বা গোষ্ঠীগত প্রবণতা প্রভৃতির সহিত প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলি সব সময়েই সুখকর বা বরণীয় হয় না। অবাধও হয় না। ফ্রয়েড বলেন, আমাদের সমস্ত কাজকর্মের মূল প্রেরণা হইতেছে কামপ্রবৃত্তি এবং কামপ্রবৃত্তির তৃপ্তি ও ব্যর্থতার উপরই গড়িয়া উঠে চরিত্রের ইমারত।

এ্যাড্‌লার বলেন, আমাদের সমস্ত কাজের মূলেই আছে একটা বাহাদুরি ও বাহবা পাইবার ইচ্ছা (Will to power) আর সেই বাহাদুরি দেখাইবার সফলতা ও ব্যর্থতার উপর গড়িয়া উঠে আমাদের চরিত্র। যে-শিশু জন্মগত বা পরিবারগত কারণে জীবনের গোড়ার দিকে পাইল লাঞ্ছনা বা অবহেলা, যে প্রতিকূল পরিবেশের জন্য নিজের বাহাদুরি ফুটাইতে পারিল না, সে তাহার হীনমন্যতাকে (Inferiority feelling) জয় করিবার জন্য অন্যভাবে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে। ফলে, তোতলা 'ডেমস্থিনিস' হইয়া উঠে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বক্তা; রুগ্ন 'সিজার' হইয়া উঠে দিগ্বিজয়ী বীর। আবার এই ক্ষতিপূরণের চেষ্টা অসামাজিক পথে হইলে মানুষ হইয়া উঠে পাপাচারী, অনীতিপরায়ণ বা ব্যভিচারী। সে তখন শয়তানির পথ দিয়া পরের অনিষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয় সে একটা বাহাদুর লোক।

ম্যাগ্‌ডুগাল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ফ্রয়েড বা এ্যাড্‌লারের মতো বিশেষ একটা প্রবৃত্তির উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁহারা বলেন, মানুষ বহু প্রবৃত্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। পরে জগতের সহিত কারবার করিবার সময়ে নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রবৃত্তিগুলি সংহত হইয়া এক একটা রসানুভূতির (Sentiment) সৃষ্টি করে। এই রসানুভূতির ফলেই মানুষের আচরণগুলি একটা স্থায়ী রূপ লইতে আরম্ভ করে এবং তাহার "আমিত্ব" সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈয়ারী হইতে থাকে। এই সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দানা বাঁধিতে থাকে চরিত্র, নীতিবোধ প্রভৃতি।

মোট কথা যতগুলি বৈশিষ্ট্য লইয়াই ব্যক্তিত্ব গঠিত হউক না কেন, সেই বৈশিষ্ট্যগুলি যতক্ষণ সংহত হইয়া আচরণকে একটা স্থায়ী রূপ দিতে না পারে, ততক্ষণ ব্যক্তিত্বের কোনও পরিচয়ই মিলে না। এই সংহতিটুকু

ভাঙ্গিয়া যাইলেই চরিত্রের (বা ব্যক্তিত্বের) ভাঙ্গন ধরে। ফলে, 'দ্বৈত ব্যক্তিত্ব' 'বহু ব্যক্তিত্ব', 'বিষঙ্গ' (Dissociation) প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, এই সম্বন্ধে (বিস্তৃত আলোচনার জন্য "চরিত্রের পথে" পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ব্যক্তি-বৈচিত্র্য

প্রকৃতির সমতা ও মানুষের 'জাতি-রূপ' ঃ বিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্বের মূলেই একটা মৌলিক প্রকল্প আছে। সেটা হইতেছে "প্রকৃতির সমতা" (Uniformity of nature)। এই সমতার জন্যই আমরা প্রকৃতির ঘটনার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। যদি দেখি জল জিনিসটা উত্তাপে গরম হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়, অথবা শৈত্যে জমিয়া বরফে পরিণত হয়, তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে, পৃথিবীর সব দেশেই যত রকমের জল আছে, সব জলই উত্তাপে বাষ্প হয়, আর শৈত্যে জমিয়া বরফ হইয়া যায়। মনোবিদ্যাতেও এই তত্ত্বটি কাজ করে। ফলে বলা যায়, একজন মানুষের ক্ষেত্রে যে নিয়মটি খাটে অন্য মানুষের ক্ষেত্রেও সেই নিয়মটি খাটিবে। অবশ্য ইঁদুর, গিনিপিগ্, গরু বা ঘোড়ার ক্ষেত্রে সে নিয়মটি কাজ নাও করিতে পারে।

এই তত্ত্বটিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, জাতি হিসাবে মানুষ একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রাণী, অর্থাৎ মানুষের একটা জাতিরূপ (Type) আছে এবং জাতি হিসাবে সব মানুষই এক শ্রেণীর। জাতি হিসাবে সব মানুষই এক শ্রেণীর বলিয়াই একটা বিশেষ ঘটনা বা পরিবেশে একজন মানুষ যেভাবে প্রতিক্রিয়া করিবে, অন্য মানুষও সেইভাবেই প্রতিক্রিয়া করিবে। এই প্রকল্পটুকু মানিয়া না লইলে মনোবিদ্যার কোনও তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হইতে বা সর্বজনস্বীকৃত হইতে পারে না।

মানুষের রূপবৈচিত্র্য ঃ মানুষের "জাতিরূপের" মতই তাহার একটা "ব্যক্তিগত রূপ" (Individual man) আছে। সেইজন্য মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষটিই অপর মানুষ হইতে পৃথক। সে একটা অদ্বিতীয় একক,

যাহার তুলনা সে নিজেই। তাই দেখিতে পাওয়া যায় রং-এর দিক দিয়া, উচ্চতার দিক দিয়া, স্থূলতার দিক দিয়া, ওজনের দিক দিয়া, গঠনের দিক দিয়া, মুখশ্রীর দিক দিয়া, কণ্ঠস্বরের দিক দিয়া প্রত্যেক মানুষটাই আলাদা।

এই স্বাভাবিক জন্মগত বৈচিত্র্য ছাড়াও আবার কর্মগত বা অর্জিত বৈচিত্র্যও প্রত্যেকটি মানুষকে অন্য মানুষ হইতে পৃথক করিয়া তুলিয়াছে। পোশাক-পরিচ্ছদ, কায়দা-কানুন, চাল-চলন-বলন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতিভা, শারীরিক শক্তি ও কর্মপটুতা, মতবাদের পার্থক্য, অনুরাগ-বিরাগের বিশেষত্ব, ক্রীড়া-কৌশলের দক্ষতা—সবদিক দিয়াই প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে।

জাতিগত মানুষের সাম্য ও বৈষম্য—মানুষে মানুষে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি লইয়া কাব্যে, সাহিত্যে ও ধর্মে বহু উচ্ছ্বাসের কথা আছে। সেই সাম্যের অর্থ হওয়া উচিত রাজনৈতিক অধিকারের সাম্য, সুযোগ সুবিধার সাম্য। নতুবা ব্যক্তিত্বের সাম্য, নেতৃত্ব-শক্তির সাম্য, বুদ্ধিমত্তার সাম্য প্রভৃতি একান্তই দুর্লভ। প্রত্যেক মানুষটিই ব্যক্তিগত কর্মসাধনা, পরিবেশ ও বংশগতির ফলে নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য তৈয়ারী করিয়াছে। ফলে, প্রত্যেক মানুষটিই অন্য মানুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া উঠিয়াছে। তাই জাতি হিসাবে মানুষে মানুষে সাম্য থাকিলেও, ব্যক্তি হিসাবে আছে অন্তহীন বৈষম্য।

মানুষের ব্যক্তি-বৈষম্য ও শিক্ষাব্যবস্থা : এই বৈষম্যের ফলে মানুষের জীবন কীট-পতঙ্গের জীবনের মতো এক ছাঁচে গড়িয়া উঠে নাই এবং এই বৈষম্যের ফলেই তাহার জীবনে আসিয়াছে বৈচিত্র্য, তাহার আনন্দ ও কৃতিত্বের সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে বহুমুখী। তাই তাহার শিক্ষাব্যবস্থাটাও কঠিন ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক মানুষটিই এক একটা একক বলিয়া প্রত্যেক মানুষের জন্যই পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে বলিয়াই ব্যক্তি-বৈচিত্র্যের গহনতার মধ্যেই সমজাতীয় লোকেদের বাছাই করিয়া এক একটি শ্রেণী (Type)-ভুক্ত করিতে হয়, বিভাগ ও উপবিভাগের করিতে হয় এবং বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

ব্যক্তি-বৈষম্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ: ব্যক্তি-বৈষম্যহেতু 'টাইপ' হিসাবে মানুষের শ্রেণীবিভাগের কোনও সার্বজনীন আদর্শ নাই। তবে বর্তমান অধিকাংশ মনোবিদ্‌দের মতানুসারে ব্যক্তি-বৈচিত্র্যের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যায়: (১) শারীরিক বৈশিষ্ট্য, (২) মানসিক বৈশিষ্ট্য, (৩) প্রবণতা, (৪) অর্জিত জ্ঞান, (৫) আয়ান (Temperament), ইচ্ছাশক্তি (Volition) এবং (৬) চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

দেহের উচ্চতা, স্থূলতা, গায়ের রং, মুখের গঠন, গলার স্বর প্রভৃতির জন্য মানুষে-মানুষের যে পার্থক্য তাহার জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জন্ম হইতেই কেহ হয়ত চোখে কম দেখে, কেহবা অন্ধ, কেহবা কানে কম শোনে, কেহবা মোটেই শুনিতে পায় না, কেহ হয়ত অপটু, দুর্বল—ইহাদের সকলের জন্য এক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা করা যায় না। ইহাদের জন্য পেশা নির্বাচনের সমস্যাও অন্য প্রকারের। এই সমস্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হইয়া যায়। অসামাজিকতা, অন্তর্বৃত্তিতা, বহির্বৃত্তিতা প্রভৃতির পিছনে থাকে শারীরিক ত্রুটি। এই শারীরিক ত্রুটির জন্য অনেকে লোকদৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে চাহে ও পরে 'কুনো প্রকৃতির' হইয়া পড়ে, 'হীনমন্যতা' ও 'অন্তর্বৃত্তিতা' ফুটিয়া উঠে। মানুষের দেহাভ্যন্তরের নিচ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলির জন্যও ব্যক্তিবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। চঞ্চলতা, ক্রোধন স্বভাব, অকালপক্কতা অপোগণ্ডতার হেতুও ইহাই। শুধু শাসন আর তাড়নে এই সব ত্রুটির প্রতিকার হয় না, উপযুক্ত ঔষধ সেবন বা ব্যায়াম ব্যবস্থা প্রভৃতির মধ্য দিয়া ইহার অনেকখানি প্রতিকার হইতে পারে।

অনুভূতির ক্ষমতারও তারতম্য আছে। জগতের দৃশ্য-গন্ধ গানে ইন্দ্রিয়ের আবেদন সবারই একই রকম নহে। কেহবা চক্ষু দিয়া দেখিয়া, কেহবা কানে শুনিয়া, আবার কেহবা হাতে-কলমে কাজ করিয়া ভালভাবে শিখিতে পারে। তাই বিভিন্ন জাতীয় বালকদের পড়াশুনার জন্যও বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার দরকার। এই হেতুই ম্যাপ, চার্ট প্রভৃতি চক্ষুগ্রাহ্য ব্যবস্থার, গ্রামোফোন, Tape recorder প্রভৃতি কর্ণগ্রাহ্য ব্যবস্থার, Clay model প্রভৃতি স্পর্শগ্রাহ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

নারী ও পুরুষভেদে পার্থক্য : নারী ও পুরুষভেদে পার্থক্যটি শারীরিক পার্থক্যের মধ্যেই পড়ে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নরনারীর মধ্যে বুদ্ধিগত পার্থক্যটা শরীরগত পার্থক্যের চেয়ে অনেক কম। ৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী "মনোবয়সের" পরিচয় দেয় বটে, তবে পূর্ণ বয়সে এ পার্থক্যটা থাকে না। ইহা ছাড়া স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, দক্ষতা প্রভৃতিতে নারীপুরুষের মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। বার্ট সাহেব ১৯টি স্কুলের ৫০০০ ছাত্রছাত্রী লইয়া কয়েকটি Standardised পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা দিয়াছিল, পড়াশুনা, বানান ও রচনার দিক দিয়া মেয়েরা একটু ভাল, আবার গণিত, হাতের কাজ প্রভৃতিতে ছেলেরা ভাল, ড্রইংএ দুই দলই সমান। যোগে বালিকারা ভাল, বিয়োগে বালকেরা ভাল, আবার ভাগে দুই দলই সমান ; এইভাবেই তাহারা যেন একে অপরকে ডিঙ্গাইয়া 'Leap frog' খেলিয়া চলে। নীতি, ধর্ম, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতিতে নারীপুরুষের পার্থক্য নাই বলিলেই চলে।

মানসিক বৈশিষ্ট্য-গত পার্থক্য—মানুষ-মানুষে শারীরিক পার্থক্য ততটা ব্যাপক নহে, যতটা হইতেছে মানসিক ভেদজনিত পার্থক্য। একজন জড়ধীর সঙ্গে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির পার্থক্যের তুলনাই হয় না। ক্লাসের একজন প্রতিভাশালী বালক যে অঙ্কটি কষিয়া দিতে পারে, ক্লাসের ৪০টি ছেলে তাহাদের সম্মিলিত বুদ্ধি দিয়া তাহা করিতে পারে না। কিন্তু ঐ ক্লাসেরই যে কোনও ৪।৫ জন ছাত্রের সম্মিলিত দৈহিক শক্তি দিয়া ক্লাসের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান বালককে সহজেই পরাজিত করিতে পারে। শারীরিক শক্তির সঙ্গে বুদ্ধির এইখানেই প্রভেদ। তিনজন জড়বুদ্ধি বালকের বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) যদি ৫০ করিয়া হয়, তাহা হইলে তিনজন জড়বুদ্ধি বালক শত চেষ্টা করিয়াও ১৫০ বুদ্ধ্যঙ্ক-যুক্ত একটি প্রতিভাশালী বালকের বুদ্ধির কাজগুলি করিতে পারিবে না। তাই একজন মহামনীষীর একক সাধনার সহিত লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের সম্মিলিত সাধনার তুলনাই হয় না। এইজন্যই ব্যক্তি-বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে মানসিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় বুদ্ধি বা বুদ্ধ্যঙ্কগত পার্থক্যটা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পঠন-পাঠনের ব্যাপারে এই পার্থক্যটা নানা রকমের সমস্যার সৃষ্টি করে। স্টার্চ দেখাইয়াছেন একটি ৩০।৩৫ জন ছাত্রযুক্ত সাধারণ ক্লাসে নির্বোধতম ছাত্রের চেয়ে সেরা বুদ্ধিমান ছাত্রের শিখিবার ক্ষমতা ২ গুণ হইতে ২৫ গুণ পর্যন্ত বেশী হইতে পারে। অর্থাৎ পাঠটি তৈয়ারী করিতে নির্বোধ ছাত্রদের যদি আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে, সেরা ছেলেটির তাহা করিতে লাগিবে ১২ মিনিট। এতটা পার্থক্য হয়ত খুব সাধারণ নয়। তথাপি বলা যায়, একটা সাধারণ ক্লাসে নির্বোধতম ছাত্রের চেয়ে বুদ্ধিমত্তম ছাত্রটি ৬ গুণ তাড়াতাড়ি পাঠ তৈয়ারী করিতে পারে।

শিক্ষার সমস্যা ও জটিলতা এখানেই বাড়িয়া গিয়াছে। ভাল ছেলেটির দিকে বেশী নজর দিলে সাধারণ ছাত্রদের ক্ষেত্রে অপচয় হয়। আবার সাধারণ ছাত্রদের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিলে, বুদ্ধিমান ছাত্রটির যথাযথ বিকাশ হয় না। এই হেতুই বুদ্ধির মাপ অনুসারে ছাত্রদের নানা শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ক্লাস গঠন করিলে তাহাদের আত্মবিকাশের সুবিধা হয়।

ব্যক্তি-বৈচিত্র্যের জন্য যেমন শিক্ষাব্যবস্থায় কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, ব্যক্তিত্বের ত্রুটী বা অস্বাভাবিকতার জন্যও কম সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই। কয়েকটি ত্রুটির কথা এখানে আলোচিত হইল।

একগুঁয়েমি (Obstinacy)—সব সমাজেই একগুঁয়ে মানুষ আছে। নানা কারণেই একগুঁয়েমি হইতে পারে। ইহার মূলে থাকিতে পারে আত্ম-প্রচার বা আস্ফালন-প্রবৃত্তি, আইন-শৃঙ্খলার অবমাননা করিয়া নিজের শক্তিমত্তার বাহাদুরী, অথবা পারিবারিক জীবনের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ। অপুষ্টি, অস্বাস্থ্য, অবসাদ প্রভৃতি শারীরিক কারণও একগুঁয়েমির হেতু হইতে পারে। খানিকটা একগুঁয়েমি অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নহে। শৈশবের আত্মকেন্দ্রিক অভিমান, স্বার্থপরতা প্রভৃতির ইহা অভিব্যক্তি। তবে সামাজিক অনুভূতি, শৃঙ্খলাবোধ, সহযোগিতা প্রভৃতির দ্বারা ইহা ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। শিক্ষকের ধৈর্য, সহানুভূতি ও স্নেহের দ্বারা একগুঁয়েমির জটিল কারণগুলির নিদান পাওয়া যায় এবং তাহার প্রতিকারও সম্ভবপর হয়।

স্কুলপলায়ন (Truancy)—অনেক কারণেই এইরূপ প্রবৃত্তি জন্ম লয়।

হয়ত ছাত্রটির কোনও ত্রুটীর জন্য তাহার সহপাঠিরা তাহাকে ক্ষেপাইয়া তোলে, হয়ত শিক্ষকের তাড়ণ ও ভৎর্সনার ভয়ে সে আত্মরক্ষা করিতে চায়, হয়ত সে পড়াশুনায় ঠিক আকর্ষণ বোধ করে না, হয়ত পাঁচীল-ঘেরা স্কুলগৃহ তাহার বহির্মুখী মনকে পীড়া দেয়। হয়ত তাহার মনের মধ্যেই বাস করে একটা যাযাবর প্রকৃতি। এই সব কারণগুলির মধ্যে অনেকগুলি কারণই দুরপনেয় নহে।

অমনোযোগ (Inattention)—ইহারও অনেক কারণ হইতে পারে। হয়তো 'দিবাস্বপ্ন' জাতীয় ব্যাপারে ছাত্রটি মশ্‌গুল থাকিতে ভালবাসে। তাই শিক্ষক যখন পড়াইয়া যান, ছাত্রটি তখন স্বপ্নের জাল বুনিয়া যাইতে থাকে। দিবাস্বপ্ন দেখে কেন? হয়তো বাস্তব জীবনের কোনও সমস্যায় সে পরাজিত বা লাঞ্ছিত, তাই অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে সেই ক্ষতিপূরণ করিতে চেষ্টা করে।

মিথ্যাবাদিতা—অভিভাবক বা শিক্ষকের অতিশাসন বা প্রহারের ভয় অনেক সময় শিশুকে মিথ্যাভাষণে বাধ্য করে। শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বালক মিথ্যা বলে। কাজেই ইহার মূলে শিশুর ব্যক্তিগত অপরাধ যতটা আছে, হয়ত সমাজের অপরাধ আছে তাহার চেয়ে বেশী। কখন কখন শিশুটি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যটুকু ঠিক বুঝিতে পারে না। কখন হয়ত সংঘ-চেতনার বশবর্তী হইয়া বন্ধুবান্ধবকে শিক্ষকের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় লয়। যে কারণেই হউক, এ অভ্যাসকে দূর করিতে হইলে আগে ধীরভাবে মূল কারণটির সন্ধান করিতে হইবে, তাহার পর ব্যক্তিগতভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিক্ষক যদি ধৈর্য, সহৃদয়তা ও অকপটতার সহিত অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অধিকাংশ ত্রুটিরই কারণ নির্ণয় ও প্রতিকার সম্ভবপর হইতে পারে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যাপক পার্থক্য আছে বলিয়াই তাহার শিক্ষা ও পেশা নির্বাচনের পথনির্দেশটা একটা জটিল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

●

শিক্ষা ও পেশা ঃ পথনির্দেশ

মানুষের জীবনের পথটা বড়ই অদ্ভুত। প্রথমতঃ ইহা হইতেছে 'একমুখী পথ' (one way)। তাই বহুবার যাতায়াতেও এ পথটা চেনা যায় না। আমরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনে চলার পথ পাই বটে, কিন্তু চলার ধারাটা তখনও শিখি না। আবার যে-পথটা একবার অতিক্রম করি ও তাহার অভিজ্ঞতা অর্জন করি, দ্বিতীয় বার সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়া সে পথে আর চলিতে পারি না। লক্ষ্যটাও আমাদের দুর্নিরীক্ষ। তাই অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই পথে যাত্রাটা হইতেছে নিরুদ্দেশ যাত্রা। এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় যাহারা সহগামী পথিক, তাহাদের অনুগমন করিলেও, লক্ষ্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকে না। কারণ, এই পথের পথিকদের প্রত্যেকের পথই আলাদা, সামর্থ্য আলাদা, লক্ষ্য আলাদা। তাই জীবনের পথে পথনির্দেশটা একটা বড় সমস্যার ব্যাপার।

অতীত যুগেও এই সমস্যা ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহার গুরুত্ব অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজিকার দিনে আমাদের জীবন হইয়া উঠিয়াছে জটিল, শিক্ষা হইয়াছে বহুমুখী, 'জীবন-সংগ্রাম' হইয়া উঠিয়াছে প্রতিযোগিতা-কঠোর, পেশা হইয়া উঠিয়াছে ট্রেনিং-সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে কর্ম-ব্যবস্থার সম্পর্ক নাই বলিয়া কোন-কোনও ক্ষেত্রে চাকুরীর তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা হইয়া উঠিয়াছে বহুগুণ বেশী, আবার কোন-কোনও ক্ষেত্রে কর্মখালি আছে যথেষ্ট, কিন্তু তাহার জন্য দক্ষ প্রার্থী পাওয়া যায় না।

জাতীয় জীবনে ইহা নিশ্চয়ই বিপুল অপচয়। কাজেই জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে এই অপচয় নিবারণের একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রত্যেক মানুষটি যাহাতে তাহার সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে এবং একটা দরকারী কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সেইভাবে ঢালিয়া সাজা কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমাদের যে শক্তি আছে, তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি, তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল।" আজ এই নীতিটি বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিবার দিন আসিয়াছে। এই নীতি যদি ঠিক ভাবে অনুসৃত হয়, তাহা হইলে দেশের যুবশক্তির একটা

বিরাট অংশ বেকার আর অবজ্ঞাত হইয়া অপচিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বস্তুতঃ একেবারে অকেজো মানুষ পৃথিবীতে নাই বলিলেই চলে। সন্ধান করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক মানুষই কোন না কোনও বিষয়ে দক্ষতা দেখাইতে পারে। সেই বিষয়টির সন্ধান করিয়া তাহাকে ঠিক ভাবে পথ-নির্দেশ করিতে পারিলে জাতীয় শিক্ষা সার্থক হয়। কাজেই "শিক্ষায় পথ নির্দেশ" (Guidance in Education) বর্তমান যুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় নিবারণের জন্য এবং প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ দিবার জন্য সুব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছে।)

শিক্ষায় ও পেশায় পথ-নির্দেশের গুরুত্ব

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে-পথের পরিচয়টা জানা থাকিলেই পথ-নির্দেশ করা যায়, কিন্তু শিক্ষা বা পেশার ব্যাপারে শুধু পথ ও লক্ষ্য-বস্তুটা জানিলেই চলিবে না, যাহাকে পথটা জানানো হইতেছে, সেই পথিককে জানিতে হইবে, তাহার পাথেয় জানিতে হইবে, তাহার শক্তি, সুযোগ ও সম্ভাবনাকেও জানিতে হইবে। এখানে 'গাইড' বা পথনির্দেশক হওয়া সহজ কাজ নহে।)

'গাইড' সম্বন্ধে স্কিনার (Skinner) একটি উদাহরণ দিয়াছেন : একজন আফ্রিকার জঙ্গলে শিকার করিতে যাইতে চাহে। তাহার একজন "গাইড" দরকার। এখন এই গাইডের কাজ হইতেছে ঐ শিকারীটির সঙ্গে যাওয়া ও তাহাকে জঙ্গলের মধ্যে পথের পরিচয় দেওয়া। ঐ শিকারীটির শিকার করার ব্যাপারে সামর্থ্য আছে কিনা, সাজসরঞ্জাম ঠিক আছে কিনা, মনের আয়ানের (temperament) দিক হইতে শিকারের নির্মমতা, কঠোরতা সহ্য করিবার শক্তি আছে কিনা, এত খবর জানিবার প্রয়োজন হয়।

কিন্তু একজন শিক্ষক যখন তাঁহার ছাত্রকে শিক্ষা বা পেশার ব্যাপারে পথ-নির্দেশ করেন, তখন তাঁহাকে ছাত্রের পারিবারিক ইতিহাস, আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদি অনেক কিছুই জানিতে হয়। তা ছাড়াও জানিতে হয় পেশার বৈশিষ্ট্য, নিয়োগের বিধি-বিধান, বাজারের চাহিদা প্রভৃতি।

শিকারের পার্টির 'গাইড্' তার পার্টির সঙ্গে সঙ্গে যায়, পথ ভুল হইলে নূতন পথের সন্ধান দেয়। কিন্তু শিক্ষক যখন তাঁহার ছাত্রকে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পথ-নির্দেশ দেন, তখন তিনি তাহাদের জীবনের পথে সহগামী হন না। কাজেই তাঁহার নির্দেশটি আরও নিখুঁত ও অভ্রান্ত হওয়া দরকার। এই নির্দেশ তখনই সফল হইবে, যখন দেখা যাইবে পথিক নিজেই তাহার জীবনের পথে সার্থক অভিযান করিতে পারিতেছে।

পথ-নির্দেশের পাত্র ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার ব্যাপারে পথ-নির্দেশের প্রয়োজন সকল ছাত্রেরই আছে, তবে বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে সেই সব ছাত্রদের জন্য যাহারা একটু খাপছাড়া বা দলছাড়া,—যাহাদের আচরণ সমস্যামূলক, যাহারা অ-স্বভাবী (abnormal), যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে কিংবা অপরাধপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে।

যাহারা সাধারণ ছাত্র, তাহাদের জন্যও পথ-নির্দেশের প্রয়োজন আছে। তাহাদের বুঝাইয়া বলিতে হইবে, কোন্ ছাত্রের কতদূর পর্যন্ত পড়া উচিত, কোন্ সময় হইতে তাহাদের সাধারণ শিক্ষার পথ ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান, কারিগরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি বা শিল্প প্রভৃতি পেশাগত বিষয়ে শিক্ষা আরম্ভ করিবে, কোন্ পেশার জন্য বিশেষভাবে ট্রেনিং গ্রহণ করিবে, এ সমস্ত বিষয়েও তাহাদের নির্দেশ দিতে হইবে।

পরিকল্পনার প্রয়োজন

যত সহজে এই কথাগুলি বলা হইতেছে, কাজটি কিন্তু তত সহজ নহে। তাহা হইলেও, ইহার প্রয়োজন আছে। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে, রাষ্ট্রের প্রত্যেক লোককে তাহার চরম বিকাশে সাহায্য করা এবং তাহার সম্ভাবনার অপচয় নিবারণ করা। কিন্তু এই অপচয় প্রতিদিনই হইতেছে। পাঠ্যসূচীর এবং পেশার ভ্রান্ত নির্বাচনের ফলে বহু জীবনের অপচয় হইতেছে। একটা লোক হয়ত শিল্পী হিসাবে খুবই কৃতী হইতে পারিত, কিন্তু তাহাকে হয়ত ঠেলিয়া দেওয়া হইল ডাক্তারীর পথে। ফলে

সে হয়ত একজন ভাল ডাক্তার হইতে পারিল না, অথচ শিল্পীর গৌরব ও প্রতিষ্ঠা হইতেও সে বঞ্চিত হইল। ইহাতে শুধু তাহারই যে ক্ষতি হইল তাহা নহে, দেশেরও ক্ষতি হইল। দেশ পাইতে পারিত একজন বিখ্যাত শিল্পী, কিন্তু পাইল একজন তৃতীয় শ্রেণীর চিকিৎসক। জাতির পক্ষে এই অপচয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা বর্তুল কীলককে (round peg) চৌকো গর্তের মধ্যে পুরিতে হইলে সেটা যেমন ঠিক খাপ খায় না, এক্ষেত্রেও তেমনি অবস্থাই হয়। অথচ উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে আমরা প্রতিদিনই এই "ট্রাজিডি"কেই বাড়াইয়া তুলিতেছি।

Spearman বলিয়াছেন, "Everyone could be a genius at something"। প্রত্যেক ছাত্রেরই এই 'genius'-এর সন্ধান করিতে হইবে এবং তাহাকে যোগ্য পথে ভিড়াইয়া দিতে হইবে। যে সব ছাত্রদের বুদ্ধিমত্তা কম তাহাদের বিশিষ্ট প্রতিভার ক্ষেত্রটির সন্ধান করা আরও বেশী দরকার। বুদ্ধির মধ্যে যাদের "G' factor"টি বেশী আছে, তাহারা প্রায় সব বিষয়েই ভাল হইতে পারে। কাজেই তাহাদের লইয়া খুব বেশী সমস্যা নাই। কিন্তু 'G' factor-টি যাহাদের কম, তাহারা হয়ত একটা বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাইতে পারে। যে ক্ষেত্রে তাহারা দক্ষতা দেখাইতে পারে, সেই ক্ষেত্রের সন্ধান করিয়া তাহাদের যদি ঠিক পথে পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে তাহারা কৃতী হইবেই।

এই যে দক্ষতার সন্ধান এবং যোগ্য লোককে যোগ্য পেশায় ভিড়াইয়া দেওয়া, ইহা কোনও লোকের একক চেষ্টায় সম্ভবপর নয়। ইহার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনার ব্যবস্থা দরকার। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মদাতা এবং রাষ্ট্রের নিবিড় সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পাঠ্য ও বৃত্তি-নির্দেশের জন্য বিশেষ রকম ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে এখনও তেমন কিছু ব্যবস্থা হয় নাই। তবে আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্ততঃ একজন করিয়া বৃত্তি-শিক্ষক বা "উপদেষ্টা"র ('Career-master' or 'Teacher-counsellor') প্রয়োজন আছে। তাঁহার কার্জের জন্য বিশেষ রকম 'ট্রেনিং'-এর প্রয়োজন,

সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং কর্মসূচীর প্রয়োজন। রাষ্ট্রগতভাবে পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার প্রয়োগ-ব্যবস্থা ভিন্ন ইহা হইবার নহে।

বৃত্তি-শিক্ষকের (Career master) কর্তব্য

বৃত্তি-শিক্ষকের কাজটা আদৌ সহজ নহে। বাজারে আলু, পটল প্রভৃতি বিক্রীর উদ্দেশ্যে যেমনভাবে বড়-মাঝারি-ছোট জিনিসগুলিকে হাত-বাছাই করিয়া লওয়া হয়, সেভাবে ছাত্রদের বাছাই করা চলে না। এমন কি স্কুলের বাহিরে কোনও মনস্তাত্ত্বিক 'ল্যাবোরেটারিতে'ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা দ্বারা ছাত্রদের বাছাই করা সম্ভব নয়। ছাত্রদের প্রাত্যহিক জীবনে যিনি তাহাদের ত্রুটী-বিচ্যুতির, সিদ্ধি-সাধনার পরিচয় জানিতে পারেন, বহু বছর ধরিয়া তাহাদের আচরণের ইতিহাস লক্ষ্য করিতে পারেন, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গতি-অসঙ্গতির পরিচয় পাইতে পারেন, সেই শিক্ষকেরাই অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় ছাত্রদের চিনিতে পারেন এবং তাহাদের সুষ্ঠু পথ-নির্দেশ দিতে পারেন। বৃত্তি-বিশেষজ্ঞ কোনও বাহিরের লোকের পক্ষেও এ কাজ সম্ভবপর নয়। স্কুলের পাঠনরত শিক্ষকই এ কাজের উপযুক্ত। তবে এ জন্য নিছক শিক্ষা-বিজ্ঞান ছাড়াও, তাঁহাকে আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক বাস্তব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, সাধারণ "গাইডের" সঙ্গে শিক্ষা ও বৃত্তি-বিষয়ক "গাইডের" একটা পার্থক্য আছে। সাধারণ "গাইড"-এর প্রয়োজন হয় শুধু পথটাকে চেনার, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে "গাইডের" প্রয়োজন হয় অনেক বেশী কিছু জানিবার। (পথকে জানিতেই হয়, তাহার উপর তাঁহাকে জানিতে হয় পথিককে এবং তাহার পাথেয়কে।) শিক্ষার পথের পথিক ছাত্রদের জানা যায় যে-ভাবে তার মোটামুটি একটা নিরিখ এইরূপ :

(১) Cumulative Record Card : প্রতিদিনের ইতিহাস অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার দক্ষতা, পরীক্ষার কৃতিত্ব প্রভৃতির যদি বছরের পর বছর ধরিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে রেকর্ড রাখা যায়, তাহা হইলে সেই রেকর্ড কার্ডটি দেখিলেই ছাত্র সম্বন্ধে প্রায় নিখুঁত একটা ধারণা পাওয়া যায়।

সাধারণ স্কুলে বছরে বছরে ছাত্রদের পরীক্ষার সাফল্যের বর্ণনা দিয়া যে "পরিচয় পত্র" (Progress-Report) দেওয়া হয়, তাহাতে এই ইতিহাসটি জানিতে পারা যায় না। কিন্তু একটা ফাইলে যদি ছাত্রের কয়েক বছরের পরিচয় একত্রে রেকর্ড থাকে, তাহা হইলে ছাত্রটির বিশেষ বিশেষ বিষয়ে উন্নতি-অবনতিটা আরও ভালভাবে বুঝিতে পারা যায়। Carrer master-এর তাই প্রথম প্রয়োজন "Cumulative Record Card" প্রস্তুত-করা।

(২) **পরীক্ষার নব রূপায়ণ :** এই রেকর্ড কার্ডে সমস্ত পরীক্ষার সফলাঙ্কগুলি (score) লেখা থাকিবে। কিন্তু বর্তমানে যে-ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তাহাতে পরীক্ষকের রুচি-বিরাগ, খুশী-খেয়ালে পরীক্ষার নম্বর প্রায় প্রভাবিত হয়। এই হেতু Record Card-এর সফলাঙ্কগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরীক্ষা প্রণালীর নবরূপায়ণের প্রয়োজন।

(৩) **পরিসংখ্যান তত্ত্বের সার্থকতা :** বিভিন্ন বিষয়ে সফলাঙ্কের অনুবন্ধ (correlation) প্রভৃতি নির্ণয় করিবার জন্য পরিসংখ্যানতত্ত্ব (statistics) সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সফলাঙ্কের ব্যাখ্যারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। একটি ছাত্র যদি বাংলা পরীক্ষায় ৭০ আর একজন যদি ৬০ নম্বর পায়, তাহা হইলে সাধারণ ভাবে মনে হইবে বুঝি প্রথম ছাত্রটিই বেশী ভাল। কিন্তু যত সহজেই ইহা ঠিক বুঝা যাইল, সব ক্ষেত্রে তত সহজে বুঝা যায় না। ধরা যাইতে পারে, একটি ছাত্র গণিতে ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় ৫৭ আর বাৎসরিক পরীক্ষায় ৬৫ নম্বর পাইল। এখন এই সফলাঙ্কের হিসাব হইতেই কি অভ্রান্ত ভাবে বুঝিতে পারা যাবেই যে, ঐ ছাত্রটি গণিতে উন্নতি করিয়াছে? না, সেটা যাইবে না। কারণ ব্যক্তিগত ছাত্রের ব্যক্তিগত সফলাঙ্কের কোনও মূল্যমান নাই। এই তত্ত্বটি প্রমাণ করা কঠিন নহে। ছেলেটি যখন ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় ৫৭ পাইয়াছিল তখন হয়ত শ্রেণীর সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ৭৫ এবং অধিকাংশ ছাত্র পাইয়াছিল ৫০-এর কাছাকাছি। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষার সময় ছেলেটি যখন ৬৫ পাইল, তখন শ্রেণীর সর্বোচ্চ সংখ্যা হইয়াছে ৯৮ এবং শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্রই পাইয়াছে ৬৬ হইতে ৬৮র মধ্যে। তাহা হইলে দেখা

যাইতেছে, বাৎসরিক পরীক্ষায় ৮ নম্বর বেশী পাওয়া সত্ত্বেও, ছেলেটির অবনতিই হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, "বৃত্তি-শিক্ষকের" পক্ষে পরিসংখ্যান-তত্ত্বের জ্ঞানটা অপরিহার্য। এই তত্ত্বের দ্বারা সফলাঙ্কের ব্যাখ্যা এবং ছাত্রের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটা নিশ্চিত ভাবেই করা চলে।

(৪) **মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা:** ছাত্রকে জানিবার জন্য পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার মতোই তাহার প্রবণতা, সামর্থ্য, রুচি বিরাগ প্রভৃতি নির্ণয় করিবার জন্য নানা জাতীয় মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে বুদ্ধি পরীক্ষাটার গুরুত্ব খুবই বেশী। স্টার্চ (Strach) দেখাইয়াছেন—৩০।৪০ জন ছাত্রযুক্ত একটা ক্লাসে নির্বোধতম ছাত্রের চেয়ে সেরা বুদ্ধিমান ছাত্রটির শিক্ষার ক্ষমতা ২৫ গুণ পর্যন্ত বেশী হইতে পারে। এই পার্থক্যটা হয়ত খুব সাধারণ নয়, তাহা হইলেও ইহা নিশ্চিত যে, একজন নির্বোধতম ছাত্রের চেয়ে বুদ্ধিমত্তম ছাত্রটি অন্ততঃ ৬ গুণ তাড়াতাড়ি পাঠ তৈয়ারী করিতে পারে।

ইহাতে শিক্ষার সমস্যাটা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে যে, ভাল ছাত্রদের দিকে বেশী নজর দিলে সাধারণ ছাত্রদের ক্ষেত্রে অপচয় হয়। আবার নির্বোধ ছাত্রদের বেশী লক্ষ্য রাখিলে বুদ্ধিমান ছাত্রদের যথাযথ বিকাশ হয় না। শিক্ষা-ব্যবস্থায় এদিকে দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ, একটা দেশের ইতিহাসে একজন সেক্ষপীয়র, রবীন্দ্রনাথ বা আইনষ্টাইন্ জাতীয় মহাপুরুষের গুরুত্বটা শত শত সাধারণ লোকের চেয়ে খুব কম নয়। দেশের কলা, কৃষ্টির মান উন্নত হয় দেশের দু'চার জন প্রতিভাশালী মানুষের দ্বারাই। ইতিহাসের ভাঙ্গাগড়া তাঁহাদের দিয়াই হয়। একটা জাতির ইতিহাস হইতেছে সেই জাতির মহাপুরুষদেরই ইতিহাস। শিক্ষায় পথনির্দেশ ঠিকমত হইলে সর্বাত্মক বিকাশের পথ উন্মুক্ত থাকে।

মানুষে মানুষে শারীরিক পার্থক্যটার প্রতিও নজর রাখিতে হইবে। ধরা যাইতে পারে, একজন সাধারণ পাঞ্জাবীর গায়ে তিনজন বাঙ্গালীর সমান জোর আছে। এ ক্ষেত্রে একদিকে যদি ৪ জন বাঙ্গালী ও আর একদিকে ঐ পাঞ্জাবী একটা দড়ি ধরিয়া টানাটানি করে, তাহা হইলে

৪ জন বাঙ্গালীর সম্মিলিত শক্তির কাছে পাঞ্জাবীটি হারিয়া যাইবে। কিন্তু বুদ্ধির ব্যাপারে ৪ জন কেন, ৪ লক্ষ জন জড়ধী তাহাদের সম্মিলিত বুদ্ধি দিয়া একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক বা কবির কাজ কিছুতেই করিতে পারিবে না। সেইজন্যই পড়াশুনার ব্যাপারে পথ-নির্দেশের জন্য বুদ্ধি পরীক্ষার প্রয়োজন খুবই বেশী। এই বুদ্ধি পরীক্ষার যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার দ্বারা ছাত্রদের পথনির্দেশটা ভালভাবে করা যাইতে পারে।

হয়ত দেখা গেল, 'Mechanical Test'-এ একটি ছাত্র ৫০-এর মধ্যে ৪৮ এবং আর একটি ছাত্র ৪০ নম্বর পাইল। কিন্তু দেখা যাইল ১ম ছাত্রটি বুদ্ধি পরীক্ষায় পাইয়াছে ১০০-র মধ্যে ৬০, আর দ্বিতীয় ছাত্রটি ৯০ নম্বর। এখন দু'জন ছাত্রই বিজ্ঞান বাএঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে চাহে। বৃত্তি-শিক্ষক এখন কি করিবেন? তিনি দেখিলেন ২য় ছাত্রটির বুদ্ধ্যঙ্ক বেশী, সুতরাং তাহার সম্ভাবনাও বেশী। তখন তিনি দু'টি ছাত্রের 'Cumulative Record Card' দেখিলেন। তাহাতে দেখা যাইল, ২য় ছাত্রটি গত কয়েক বছর ধরিয়া অঙ্কে খুব ভাল ফল দেখাইয়াছে, কিন্তু ১ম ছাত্রটি মোটেই ভাল ফল করিতে পারে নাই। এখন তাঁহার কাজ সহজ হইয়া যাইল। তিনি বুঝিলেন, ১ম ছাত্রটির এঞ্জিনিয়ারিং-এ ফল ভাল হইবে না, তবে সাধারণ কারীগরীর কাজে সে ভাল হইবে। কিন্তু ২য় ছাত্রটি বিজ্ঞান বা এঞ্জিনিয়ারিং উভয় বিষয়েই ভাল হইতে পারে। তখন শিক্ষকটি ২য় ছাত্রটির অভিভাবকের কাছে তাহার পারিবারিক ইতিহাস, আর্থিক সঙ্গতি প্রভৃতি বুঝিয়া তাহাকে এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে নির্দেশ দিবেন।

আজকাল এক একটা পেশাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয় না। প্রত্যেক পেশাকেই এক একটা গোষ্ঠীর (job family) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভাবা হয়। এই পেশা-গোষ্ঠী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে বৃত্তি-শিক্ষকের কাজের সুবিধা হয়। একটি ছাত্রের প্রবণতা, দক্ষতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি হয়ত তাহার জন্য একটি পেশা স্থির করিলেন। কিন্তু ছাত্রটির অভিভাবকের হয়তো ঐ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি নাই। তখন বৃত্তি-শিক্ষক তাহার জন্য ঐ পেশা-গোষ্ঠীর অন্য আর একটি বা দুটি পেশার নির্দেশ করিলেন। ফলে ছেলেটি তাহার কৃতিত্বের পথ খুঁজিয়া পাইল।

(৫) **অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরীক্ষা :** যন্ত্রাদিতে দক্ষতার পরীক্ষা (mechanical attitude test), জ্যামিতিক-সামর্থ্য-নির্ণয় পরীক্ষা, অঙ্কন শক্তির পরীক্ষা, হস্তসম্পাদ্য কাজের পরীক্ষা প্রভৃতি নানা জাতীয় পরীক্ষা আছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন পেশার জন্য বিভিন্ন রকমের "Occupational profiles"-এরও সৃষ্টি হইয়াছে। কোনও profiles-এ হয়ত গণিতের দক্ষতা ও ছাত্রদের ধৈর্যের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, কোনওটাতে হয়ত সিদ্ধান্তের ক্ষিপ্রকারিতা ও আবেগের সমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, ইত্যাদি।

এ সমস্ত পরীক্ষা ছাড়া, ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা প্রভৃতি নির্ণয় করিবার জন্যও নানা জাতীয় পরীক্ষা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ সব পরীক্ষার দ্বারা একেবারে নিখুঁত ভাবে না হইলেও, প্রায় নির্ভুল ভাবে ছাত্রদের চিনিয়া লওয়া যায়। ছাত্রদের যদি এই সমস্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার জন্য পূর্ব হইতে ট্রেনিং দেওয়া না থাকে, তাহা হইলে সমীক্ষণটি আরও ভাল হয়।

(৬) **বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা :** (Interest Inventory) : ১৩।১৪ বছরের ছাত্রদের অধিকাংশের মধ্যেই রসানুভূতি (sentiment) দানা বাঁধে না। তাই তাহাদের বিশেষ একটা বৃত্তি বা পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে পছন্দ অপছন্দ ঠিকভাবে গড়িয়া উঠে না। তাহা হইলেও, কোন কোনও ছাত্রের ক্ষেত্রে ঐ বয়সেই একটা প্রবণতা আসিয়া যায়। নিউটন যে উত্তর-জীবনে একজন বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার খানিকটা পরিচয় তাঁহার বাল্য জীবনেই পাওয়া গিয়াছিল। এই হিসাবে এই বিষয়ানুরাগ পরীক্ষারও একটা মূল্য আছে। এই পরীক্ষায় কতকগুলি উপজীবিকার নাম বামদিকে লেখা থাকে, আর সেই উপজীবিকাগুলির ডানদিকে "প" (পছন্দ) "অ" (অপছন্দ) এবং প্রশ্নসূচক "?" চিহ্ন থাকে। এবং প্রত্যেক পেশা বা কাজটির সম্বন্ধে ছাত্রদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কথা লিখিয়া দিবার নির্দেশ থাকে।

(৭) **Co-curricular activities, hobbies etc :** আমাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, খেলাধূলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। ক্লাসের আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে সেই চরিত্রগত পরিচয়টা ঠিক ধরা পড়ে না। তাই খেলাধূলা, 'হবি', ছবি আঁকা, গান,

বাজনা, আবৃত্তি, অভিনয়, উৎসব-অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব প্রভৃতির মধ্য দিয়া ছাত্রদের ভালভাবে চিনিতে পারা যায়।

(৮) **ছাত্রদের আত্ম-পরিচয়ের ব্যবস্থা** (Pupil information) : ছাত্রেরা তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে নিজেরা কিভাবে পরিচয় দেয়, সেটাও প্রয়োজনীয় তথ্য। তাহাদের আত্ম-পরিচয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত অতিরঞ্জন হয়ত থাকিতে পারে, তাহা হইলেও, সে পরিচয়টুকু একেবারে নিরর্থক বা মিথ্যা নয়। এই পরিচয় হইতে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কৃতিত্ব বা সম্ভাবনার পূর্ণ পরিচয় না পাওয়া গেলেও, তাহাদের অস্ফুট আদর্শ বা লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

(৯) **অভিভাবকগণ কর্তৃক ছাত্র-পরিচয় :** ছাত্রদের সবটুকু পরিচয় ছাত্রদের কাছ থেকেই পাওয়া যায় না। তাই তাহাদের জীবনের ইতিহাসের অনেক তথ্যই অভিভাবকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে যদি কিছু সমস্যামূলক আচরণ থাকে, তাহা হইলে অভিভাবকদের সহযোগিতা ভিন্ন কিছুতেই তাহার নিদান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ছেলেটি বাড়ীতে অত্যধিক আদর বা পীড়ন পায় কিনা, বাড়ীতে বিমাতার পীড়ন আছে কি না,—সে মাতাপিতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান অথবা একমাত্র সন্তান কিনা, তাহার বাড়ীতে শান্তির পরিবেশ আছে কিনা, বাড়ীতে কোনও লোকের পান-দোষ বা অন্য কোনও চরিত্রগত দোষ আছে কিনা, খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা আছে কি না, কোন্ বয়সে তাহার দাঁত উঠিয়াছিল, কোন্ বয়সী সঙ্গীর সঙ্গে সে দিন কাটায়, এই জাতীয় শত শত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পাইলে ছাত্রটির অ-স্বভাবী বা সমস্যামূলক আচরণের কারণ নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ অভিভাবকই এই সমস্ত উত্তর দিতে রাজী হন না।

শুধু যাহারা "অপরাধপ্রবণ" অথবা যাহাদের আচরণ "সমস্যামূলক" তাহাদের জন্যই নয়, সাধারণ ছাত্রদের জন্যও বহু খবরই অভিভাবকদের নিকট হইতে জানিবার প্রয়োজন হয়। একজন ছাত্র হয়ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। এখন ডাক্তারি পড়াইবার মত তাহার অভিভাবকের আর্থিক সঙ্গতি আছে কিনা, এটা না জানিলে বৃত্তি-শিক্ষক

তাহাকে পথনির্দেশ দিতে পারেন না। অথচ এরূপ সঙ্গতি বা মাহিনা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে অনেক অভিভাবকই হয়ত সেটাকে অপমানজনক বলিয়া মনে করিতে পারেন। এই হেতুই অভিভাবকদেরও এদিকে সচেতন করিয়া তুলিবার প্রয়োজন আছে।

এইখানেই হইতেছে বৃত্তি-শিক্ষকদের সমস্যা। অভিভাবকেরা যদি তাঁহাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তাহা হইলে সাধারণ ছাত্রদের যথাযথ ভাবে বৃত্তি বা পাঠ্যনির্দেশ করা সম্ভবপর নহে, অনগ্রসর ছাত্রদেরও সমস্যার সমাধান হওয়ার নয়। ফলে দেশের অপচয় নিবারিত হইবে না। যাহাদের 'occupational misfit' (অর্থাৎ স্ব-পেশায় অনুপযুক্ত) বলা হয়, তাহাদের সংখ্যা এবং বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে। এই জাতীয় অপচয় নিবারণ করিতে হইলে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা আবশ্যক এবং এই পরিকল্পনায় সরকার, শিক্ষায়তন এবং শিল্পপতিদের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

বৃত্তি-নির্বাচন বিষয়ে করণীয়

বিভিন্ন শিল্প ও বিভিন্ন বৃত্তির সুযোগ সুবিধা, ট্রেনিং-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ক ছায়াছবির ফিল্ম সিনেমার 'News reel'-এর সঙ্গে দেখানো যাইতে পারে। ছেলেদের পাঠ্য ও বৃত্তি-নির্বাচনের ব্যাপারে বৃত্তি-শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকের সহযোগিতার প্রয়োজন বুঝাইয়া ফিল্ম তৈয়ারী করার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহার ফলে অভিভাবকগণ বুঝিতে পারিবেন, চিকিৎসকের কাছে রোগীর রোগের ইতিহাস গোপন রাখিলে যেমন চিকিৎসার অসুবিধা হয়, ছাত্রের পূর্ণ জীবনেতিহাস না জানিলে তেমনই বৃত্তি-নির্বাচন করা অথবা সমস্যামূলক আচরণের প্রতিকার করা সম্ভব হয় না।

রেডিও টক্ (Radio talk) বা রেডিও নাটকের দ্বারা অভিভাবকদের এই সম্বন্ধে আগ্রহশীল করিয়া তুলিতে পারা যায়। সংবাদপত্রের মাধ্যমেও এই কাজ অনেকখানি করা যাইতে পারে।

'Ministry of labour' হইতে বৃত্তি-নির্বাচনের পথ-প্রদর্শন (Guide to Careers) জাতীয় পুস্তিকা প্রণয়ন এবং সেইগুলির ব্যাপক প্রচার

হওয়া বাঞ্ছনীয়। সরকার হইতে এই জাতীয় পুস্তিকার কিছু কপি প্রত্যেক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে বিনামূল্যে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে প্রধান শিক্ষকের মারফৎ ছাত্র এবং অভিভাবকগণ সেই তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় মাঝে মাঝে "Career-Conference" করাও বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে অভিভাবকগণের সঙ্গে শিক্ষকদের যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে। ছাত্রদের প্রতি শাস্তির ব্যবস্থা করিলে অথবা তাহারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে, অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন। তখন তাঁহাদের আচরণটা বন্ধু বা সহযোগীর মত হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ছাত্রদের সমস্যাও আলোচিত হয় না। বিদ্যালয়ে যদি "অভিভাবক-শিক্ষক সংস্থার" (Parent-teacher Association) ব্যবস্থা করা হয়, এবং তাহার বিভিন্ন অধিবেশনে যদি ছাত্রদের বৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে ফল ভাল হইবে।

বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ-উৎসব, স্বরস্বতী পূজা, প্রতিষ্ঠা দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যদি "Career-exhibition"-এর ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে সেখান হইতে বহু অভিভাবকই বহু তথ্যের সন্ধান পাইতে পারেন।

ছাত্রদের বৃত্তি-নির্বাচন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য মাঝে মাঝে বক্তৃতার (Career talks) ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। প্রাচীর-পত্র ও পত্রিকা দ্বারা তথ্যাদির পরিবেষণ করা, Projector প্রভৃতির সাহায্যে ছায়াছবি প্রভৃতি দেখানো, বৃত্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপন করা ইত্যাদির মধ্য দিয়া ছাত্রদের বৃত্তি-নির্বাচন প্রভৃতির জ্ঞান সঞ্চারিত হইতে পারে।

বৃত্তি-শিক্ষকদের কাজগুলির সৌকর্যের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেক কিছু করণীয় আছে; যথা—উপযুক্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতি তৈয়ারী ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা, পরীক্ষা-পরিচালনের জন্য 'Standardised Test' প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, Employ-

ment Exchange প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রদের বৃত্তি-নির্বাচন ব্যাপারে বৃত্তি-শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা, সমস্যামূলক আচরণের বা পেছিয়ে-পড়া (retarded) ছাত্রদের জন্য চিকিৎসা-কেন্দ্রের স্থাপনা করা, পুস্তিকা প্রভৃতির প্রচারের দ্বারা বৃত্তি-নির্বাচনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা, বৃত্তি-শিক্ষকদের কাজের জন্য উপযুক্ত অবসর ও পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

শিক্ষায় পথনির্দেশের বিপক্ষে যুক্তি

বৃত্তি-শিক্ষকদের পরিচালিত মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা (Psychological tests) ও ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (Personality test) প্রভৃতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সমস্ত মনোবিদ্‌রা এখনও একমত নহেন। অনেকেরই সন্দেহ আছে, এই পথনির্দেশের মধ্যেও হিসাবের ভুল আছে। ফলে পথনির্দেশের অভাবে যেমন ক্ষতি হইয়াছে, পথের ভ্রান্ত নির্দেশের জন্যও তেমনি ক্ষতি হইতে পারে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা নৈরাশ্যবাদী ধারণা আছে যে, ওষুধ না খাইয়া যত লোক মরে, ওষুধ খাইয়া মরে তাহার চেয়েও বেশী। কিছুদিন পরে 'guidance' সম্বন্ধেও এই জাতীয় একটা ধারণা হয়তো সৃষ্টি হইতে পারে।

পথনির্দেশের জন্য ছাত্রদের যে বুদ্ধ্যঙ্কের (Intelligence quotient) মাপ হয়, সেই বুদ্ধ্যঙ্কের মাত্রাটাই যে অপরিবর্তনশীল ভাবে কাজ করে, অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধির যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, এ ধারণাটা আজকাল আর নাই। এই শতকের ২০।২৫ বছর আগে যাঁহারা মানুষের বুদ্ধির নিরিখ লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন, যেমন Pearson, Burt, Terman প্রভৃতি, তাঁহারা সকলেই মনে করিতেন বুদ্ধির মাত্রাটা মানুষের মধ্যে অপরিবর্তনীয় ভাবেই থাকিয়া যায়, বিধাতৃ-নির্দিষ্ট অলঙ্ঘনীয় ভাগ্যের মতই সেটা যেন জাতকের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধির মাপ লইয়া বর্তমানে যাঁহারা গবেষণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে বুদ্ধির মাপটা অপরিবর্তনশীল নয়, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা পাশের পরই "১৪+" বয়সের একটি ছাত্রকে মনস্তাত্ত্বিক ফলানুযায়ী বিভিন্ন পাঠ্যধারায়

নির্বাচিত করা এবং জনকতককে বিজ্ঞান বা কারিগরী প্রভৃতি বিভাগে ভিড়াইয়া দিয়া, বাকী ছেলেদের নির্বোধ এই কলঙ্ক দিয়া বিজ্ঞান প্রভৃতি লোভনীয় পাঠ্যধারার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা উচিত হইবে না। কোনও একটা পাঠ্যধারার 'প্রবেশ-পরীক্ষা' (admission test) এবং পরবর্তী যুগের সফলতার অনুবন্ধের (correlation) হার দেখা গিয়াছে অতি কম। Dr. C. F. Fling বলেন, এই 'correlation'-এর অল্পতার কারণ এই নয় যে, "মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার" মধ্যে কোনও ত্রুটী ছিল ; ইহার সত্যিকারের কারণ হইতেছে, পরবর্তী জীবনে "ব্যক্তিত্ব বিকাশে" তারতম্য।

কাজেই 'guidance service'-এ ছাত্রদের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, সেটা কোনও নিশ্চয়তার ইঙ্গিত করে না, ইঙ্গিত করে শুধু সম্ভাবনার। এই সম্ভাবনার অনিশ্চিত আলোকে ছাত্রদের 'পথ-নির্দেশটা' একটা দুঃসাহসের কাজ। তাহাতে অপচয়ের ভয়টা কম নয়। এই প্রসঙ্গে Mc. Clelland-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—

"The number of misfits in Secondary Education are found to be increased by the use of the teacher's forecasts and by giving allowance for personal questions."—(Selection for Secondary Education)।

শিক্ষায় পথনির্দেশটাকে পেশার পথনির্দেশের ভূমিকা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং প্রথমটা হইলে দ্বিতীয়টা খানিকটা সহজসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারেও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমরা জানি, বর্তমানে বিভিন্ন পেশার প্রকৃতি অনুসারে পেশাগুলিকে এক একটি গোষ্ঠীর (job family) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভাবা হয়। বিশেষ বিশেষ "বৃত্তিগোষ্ঠীর" জন্য বিশেষ ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন। বর্তমানের শত শত প্রকার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করিয়া তাহার জন্য বিশেষ ধরনের কর্মীর যোগাযোগ করাও সহজ কাজ নয়। 'Career Master'কে সেই কাজটিও করিতে হইবে। তাঁহার কাজ হইতেছে—"to match job analysis to personal analysis in

such a way that through the fullest possible functioning, each individual may contribute most fully to the welfare of the Group."—C. M. Fleming.

কিন্তু এ কাজটিও আদৌ সহজ নয়। H. H. Eyserck তাঁহার "Use and abuses of Psychology" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, যত সম্ভাব্য বৃত্তি আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ারী করিয়া প্রত্যেক বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর হিসাব করিলেও দেখা যাইবে, ঐ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান এত অল্প যে, পথনির্দেশটা প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হইবে। তাঁহার কথাতেই বলা যায়—

"Even if all available job could be nearly catalogued with specific requirements, nevertheless our knowledge of the abilities and temperamental traits relevent to success in any of the occupations is still so much lacking that without very large scale research, prediction would mostly be impossible."

উপসংহার

এই জাতীয় আলোচনা হইতে মনে হয়, 'কাজ কি এই পথনির্দেশের? তাহার চেয়ে ছাত্ররাই বাছিয়া লউক নিজ নিজ সার্থকতার পথ; তাহারা ভুল নির্বাচন করে করুক, তার পরেই তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া পথ বদলাইবে এবং শীঘ্রই ঠিক পথ বাছিয়া লইবে। আমরা যতই কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের ইপ্সিত পথের অধিকার বন্ধ করিব, তাহারা ততই লুব্ধ এবং যুযুৎসু হইয়া উঠিবে সেই অপ্রাপ্ত পথের জন্য। ইহার চেয়ে সব পথই যদি তাহাদের জন্য উন্মুক্ত থাকে, তাহা হইলে অহেতুক ঝামেলা হইবে কম এবং হয়ত পথ নির্বাচনটাও হইবে সার্থকতর।'

ইহাই যদি হয় তাহা হইলে মনে হইবে এই অবৈজ্ঞানিক সহজ ব্যবস্থাটাই পথনির্দেশের শ্রেষ্ঠ প্রণালী। কিন্তু শিক্ষায় পথনির্দেশের ভার লইয়া আছেন যে-সব বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা (Counsellor) বা

'Career master'-এর দল, তাঁহারা পথনির্দেশের এই সহজ ও খোলা পথটা স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা হয়ত বলিবেন, 'চেষ্টা ও ভ্রান্তির' সহজ পথটাই যদি ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে আমাদের এই 'Psychological test', 'personality test', 'ability test', 'hobby class', 'cumulative record card' প্রভৃতির প্রয়োজন কি ?

এ যুক্তি ছাড়াও, 'guidance'-এর প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক যুক্তি আছে। আমরা জানি, চিকিৎসকেরা সব রোগ সারাতে পারেন না, তাহা হইলেও চিকিৎসা-বিজ্ঞান অচল নয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীও সব ক্ষেত্রে অভ্রান্ত হয় না, তাহা হইলেও, তাহার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হয় না। এই হিসাবে 'guide'-এর প্রয়োজনটাও অস্বীকার করা যায় না। হয়ত এমন দিন আসিবে যখন 'guidance' হইবে অভ্রান্ত। সেদিন যতদিন না আসিতেছে ততদিন 'guide' তাহার সাধ্যমত কর্তব্য করিয়া যাইবে। আগেই বলিয়াছি, অনেক ছাত্রই ঠিক বুঝিতে পারে না কোন্ শিক্ষাধারার (course) কি বৈশিষ্ট্য, কোন্ ধারার জন্য কোন্ জাতীয় বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় ; অনেক ছাত্রই তাহাদের নিজেদের গুণাবলী বা সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন নয়। আবার অনেক অভিভাবকই নিজেদের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে পক্ষপাতমূলক উচ্চাশা পোষণ করেন, অনেক অভিভাবকেরই পাঠধারা বা পেশার (vocation) বা পেশাগত কৌলীন্য (job prestige) সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকে। রাষ্ট্রের মধ্যে কি কি পেশায় এখনও কর্মখালি আছে, কোন্ কোন্ পেশাতেই বা সেটা নাই, এত খবরও সব অভিভাবকের পক্ষে রাখা সম্ভবপর নহে। এই ব্যাপারে ছাত্র ও অভিভাবকদের সাহায্য করা 'Career master'দের (বৃত্তি-শিক্ষক) কর্তব্য। এই কর্তব্য যদি তাঁহারা সুষ্ঠুভাবে করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে অনেক অপচয় নিবারিত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

●

নিজ্জ´ান মানস ও শিক্ষাতত্ত্ব

[ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ]

(মনোবিস্থার রাজ্যে ফ্রয়েডের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত চেতন-মানসটাকেই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বলিয়া মনে করা হইত।) এমন কি আচরণবাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়, যাঁহারা মনের অস্তিত্বকেই স্বীকার করিতেন না তাঁহারাও মানুষের সংজ্ঞান (বা চেতন) আচরণ লইয়াই তাঁহাদের গবেষণার অভিযান চালাইয়াছিলেন। নিজ্জ´ান মানসের অস্তিত্ব, তাহার ক্রিয়া-কলাপ, সংজ্ঞান মনের উপর তাহার সম্ভাব্য প্রভাব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি লইয়া কেহই তেমন ভাবে কিছু আলোচনা করেন নাই।

(নিজ্জ´ানমন সম্বন্ধে প্রথম বিশদ ও সার্থকভাবে আলোচনা করিলেন ফ্রয়েড। নির্ভীক কণ্ঠে তিনিই প্রথম বলেন যে, আমাদের আচরণের উপর নিজ্জ´ানের প্রভাব সংজ্ঞানের চেয়েও বেশী।) এই সিদ্ধান্ত করিয়া হয়ত ফ্রয়েডও খানিকটা একদেশদর্শিতাজনিত ভুল করিয়াছেন। তবে তাঁহার ভুলটিই তাঁহার পূর্বসূরীদের ভুলকে আঘাত করিয়া আমাদিগকে সত্যানুসন্ধানে পথ ও প্রেরণা দিয়াছে। (তাই আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি যে, ছাত্রদের ঠিকমত চিনিতে ও বুঝিতে হইলে তাহাদের নিজ্জ´ানের রহস্য বুঝিতে হইবে। সেইজন্যই বর্তমানে 'Educational psychology'-তেও ফ্রয়েড-প্রবর্তিত নিজ্জ´ান তত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণ অবশ্যই আলোচ্য।)

মনঃসমীক্ষণের ইতিহাস ও বিবর্ত´ন

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ম্যাকডুগাল মন্তব্য করিয়াছেন, মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ফ্রয়েড যাহা করিয়াছেন আরিষ্টটলএর পর হইতে আজ পর্যন্ত কেহই ততটা করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক ফ্রয়েডের পূর্ববর্তী সময়ের মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রটি ছিল স্নায়ুতত্ত্ব ও অধিবিদ্যার (metaphysics) মধ্যবর্তী একটা উষর প্রান্তর মাত্র। এই শুষ্ক উষর পতিত জমির উপরই ফ্রয়েড যে সোনার ফসল ফলাইয়াছেন তাহা যেমনই নূতন তেমনই বৈচিত্র্যময়! তাঁহার চিন্তাধারার নূতনত্ব

আমাদের এমনই আঘাত করিয়াছে যে, আমরা চমকিত হইয়া উঠিয়াছি। ফলে কেহবা ফ্রয়েডকে লইয়া মাথায় করিয়া নাচিয়াছে, কেহবা তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়া অপাঙ্‌ক্তেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বস্তুতঃ ফ্রয়েডকে লইয়া যত বাক্যের ঝড় ও তর্কের ধূলি উঠিয়াছে,—আজ পর্যন্ত কোনও মনস্তাত্ত্বিককে লইয়া ততটা হয় নাই। অথচ ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে নূতন অভিযানের ফলে আবিষ্কৃত হয় নাই। উদ্বায়ু (neurosis) রোগের চিকিৎসার ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়াই ইহার প্রথম উৎপত্তি। ডাঃ ব্রিল-এর (Dr. Brill) মতে, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা বড় আবিষ্কার। ডারউইন্, নিউটন্, স্পিনোজা, আইনষ্টাইন্ প্রভৃতি মনীষীদের মতো ফ্রয়েডেয় মতবাদও প্রথমে পাইয়াছে বিদ্রূপ ও প্রত্যাখ্যান, পরে অপ্রতিবিধেয় ভাবে অধিকার করিয়াছে সমর্থন। ইহার মধ্যে অবশ্য বিস্ময়ের কিছুই নাই। কারণ সাধারণ মানুষ হইতেছে শ্বেত-শ্মশ্রু প্রাচীনপন্থী সন্ন্যাসীর মত; সে অশাস্ত্রীয় নূতন জিনিসকে সহজে আমল দিতে চাহে না—ফ্রয়েডকেও দেয় নাই।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার (বর্তমানে জেকোশ্লাভিয়া) এক ইহুদী বংশে তাঁহার জন্ম হয়। এই পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। তবে এইজন্য ফ্রয়েডের পড়াশুনার ক্ষতি হয় নাই, তিনি ক্লাসে ভাল ছাত্রই ছিলেন।

ফ্রয়েডের প্রতিভা কোন্ ক্ষেত্র লইয়া যে কাজ আরম্ভ করিবে, তাহার যেন কোনও নির্দিষ্ট পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই সময়ে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তাঁহাকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করিল এবং তিনি খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া চিকিৎসা বিদ্যাকেই গ্রহণ করিলেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি ছাত্র হিসাবে ভর্তি হইলেন।

ডাক্তারি পেশাটির প্রতি তাঁহার খুব আকর্ষণ ছিল না, তবে স্নায়ুতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্বটি তাঁহার ভালই লাগিত। ইহুদী বলিয়া তাঁহার সামাজিক লাঞ্ছনা কম ছিল না। এই লাঞ্ছনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইল বিদ্রোহ। সমাজের ধিক্কারে অভ্যস্ত বলিয়াই তাঁহার রক্তের মধ্যে ছিল বেপরোয়া বামপন্থী মনোভাব ও সংস্কারমুক্ত নির্ভীক যুক্তিবাদ। পরবর্তী জীবনে তিনি যে

নির্লজ্জ যৌনবাদ প্রচার করিয়া গোঁড়া সমাজকে আঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার ইহুদী রক্তের মধ্যেই তাহার সম্ভাবনা সঞ্চিত ছিল।

ইউনিভারসিটির ছাত্র অবস্থাতেই তিনি Dr. Brucke-এর গবেষণাগারে সহকারী হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। এখানে স্নায়ুতন্ত্রে তিনি বিশেষভাবে গবেষণা করেন এবং ক্রমশঃ মনোরোগ চিকিৎসার ব্যাপারে আকৃষ্ট হন। অতঃপর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারি পাশ করিয়া ভিয়েনার হাসপাতালে কাজ আরম্ভ করেন। এখানে বাক্‌রোধ (aphasia), বিকলাঙ্গতা, মস্তিষ্কে আঘাতাদি-জনিত বিকৃতি প্রভৃতি ব্যাপারে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

এই সময়ে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শারকো (Charcot)-এর নাম শুনিয়া তিনি প্যারিস যাত্রা করেন। শারকো রোগীদিগকে সম্মোহিত করিয়া তাহাদের হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করিতেন। শারকো-এর ছাত্র এবং অনুবাদক হিসাবে তিনি এক বৎসর প্যারিসে অবস্থান করেন। শারকো-এর কাছে তিনি নির্জ্জান মন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নূতন তত্ত্বের সন্ধান পান নাই, তবে অধিকাংশ হিষ্টিরিয়ার মূলে যে একটা অতৃপ্ত যৌন-আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস আছে, সেই সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন।

শারকো-এর অনেক শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে Boston-এর মর্টন প্রিন্স (Morton Prince : ১৮৫৪-১৯২৯) ও প্যারিসের পিয়্যার জ্যানএ (Pierre Janet) প্রসিদ্ধ। মর্টন প্রিন্স সম্মোহনের দ্বারা দ্বৈত ব্যক্তিত্বের চিকিৎসা করিতেন এবং Janet বিষঙ্গ (dissociation) সম্বন্ধে খানিকটা রহস্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। Janet বলিতেন, মানুষের neurosisএর মূল কারণ হইতেছে একজাতীয় মানসিক দুর্বলতা "Low mental tension", যাহার ফলে তাহার গোপন মনের ইচ্ছার সহিত চেতন মানসের ক্রিয়া-কলাপের সামঞ্জস্য বজায় থাকে না। এইরূপ ক্ষেত্রে তাহার চেতন মানসের চিন্তাস্রোত একভাবে চলে এবং তাহারই অজ্ঞাতে তাহার গোপন মানসে আর একটি চিন্তাস্রোত অন্য ভাবে চলিতে থাকে। ইহাই হইতেছে বিষঙ্গের অবস্থা। এই বিষঙ্গের সৃষ্টি কেন হয়, অর্থাৎ সংজ্ঞান মনের অজ্ঞাতে একটা অবচেতন মন কেন যে তলে-তলে কাজ করিয়া যায়, ইহার রহস্য নির্ণয়

করিতে যাইয়াই ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের অনেক কিছু আবিষ্কার করেন।)

প্যারিস হইতে ভিয়েনায় ফিরিয়া আসিয়া ফ্রয়েড শার্কো-প্রদর্শিত প্রণালীতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। বহু ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সফলতা দেখা যাইল। তবে এই প্রণালীর ত্রুটি-বিচ্যুতিও কিছু কিছু দৃষ্ট হইল। দেখা যাইল যে, সব রোগীকে ঠিক সম্মোহিত করা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসার ফলটিও খুব স্থায়ী হয় না। তখন তিনি আর একবার ফ্রান্সে যাত্রা করিলেন। এইবার তিনি Nancy school-এর ডাক্তারদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা সম্মোহিত রোগীদের প্রতি অভিভাবন (suggestion) প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতেন। ইঁহাদের নিকট হইতে অভিভাবন প্রয়োগের কৌশল কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া ইনি আবার ভিয়েনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং সম্মোহনপ্রণালী দ্বারাই চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।)

(ফ্রয়েড যে প্রণালীতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন তাহাকে তখনও ঠিক মনঃসমীক্ষণ বলা যায় না, কারণ তখনও তাহা খানিকটা "ঝাড়ফুক্" জাতীয় ব্যাপার ছিল।মনঃসমীক্ষণের কাজে জ্যান্এ (Janet) প্রথম সম্মোহন ক্রিয়াকে ব্যবহার করিয়াছিলেন।) তবে সেজন্য ফ্রয়েড জ্যান্এ-এর কাছে মোটেই ঋণী ছিলেন না,—জ্যান্এ-এর প্রণালীর সহিত তিনি অনেক পরে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার প্রকৃত ঋণ ছিল ভিয়েনার ডাঃ ব্রুয়ারের (Breuer : ১৮৪২-১৯২৫) কাছে। ডাঃ ব্রুয়ার ফ্রয়েডএর চেয়ে ১৪ বৎসরের বড় ছিলেন; তাহা হইলেও দুই ডাক্তারের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় ডাঃ ব্রুয়ারের পরীক্ষাগারে কাজ করিবার সময়েই এই বন্ধুত্ব ঘটে। ইনি একজন বড় ডাক্তার ছিলেন এবং সাধারণ রোগের চিকিৎসাই তাঁহার কাজ ছিল। (একবার তাঁহার হাতে একটি হিষ্টিরিয়া রোগিণী আসে। এই নারীটি পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় অসাধারণ ছিল। কিন্তু পক্ষাঘাত, স্মৃতিভ্রংশ এবং মস্তিষ্কের গোলমাল—কোনটিরই তাহার অভাব ছিল না। ব্রুয়ার তাহাকে সম্মোহিত করিয়া দেখিলেন, সম্মোহিত অবস্থায় সেই মহিলাটি অনেক পুরানো ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেছে। যে সমস্ত

ঘটনার আঘাত পাইয়া তাহার এই অসুখের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সমস্ত প্রক্ষোভমূলক (emotional) ঘটনাগুলি সে বেশ স্মরণ করিতে পারিতেছে।) এই জাতীয় অভিজ্ঞতা অবশ্য জ্যান্এ-এরও হইয়াছিল। তবে ডাঃ ব্রুয়ারের অভিজ্ঞতা আর একটু চমকপ্রদ হইল। তিনি রোগিণীকে প্রাণ খুলিয়া অতীত ইতিহাস বর্ণনা করিতে বলিলেন। রোগিণী তাহাই করিল। দেখা গেল, প্রাণ খুলিয়া এই সমস্ত দুঃখের কথা বলিতে-বলিতে রোগিণীর মনটি হাল্কা হইয়া সে সুস্থ হইয়া উঠিল। ডাঃ ব্রুয়ারও মনোরোগ চিকিৎসার একটা তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। বুঝিলেন সম্মোহিত অবস্থায় রোগী যদি প্রাণ খুলিয়া তাহার দুঃখের কথা বলিবার সুযোগ পায়, অতীতের নিরুদ্ধ আবেগের দ্বার খুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার রোগ কাটিয়া যায়। এই তথ্যটির আলোকে ফ্রয়েড এবং ব্রুয়ার আরও কতকগুলি পরীক্ষা চালাইলেন এবং তাঁহাদের পরীক্ষার ফলগুলি ১৮৯৩ ও ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত করিলেন। এই পদ্ধতিটিকে তাঁহারা **মানসিক বিরোচন** (mental cathersis) বা **অভিস্ফোট** (abreaction) প্রণালী আখ্যা দিলেন।

যাহা হউক, ডাঃ ব্রুয়ার কিন্তু এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালাইলেন না। তাহার একটি কারণ ছিল এই যে, তিনি সাধারণ রোগের চিকিৎসাতেই ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। আর একটি বড় কারণ ছিল এই যে, তিনি দেখিলেন—এই অভিস্ফোট প্রণালীর চিকিৎসার সময় রোগিণীরা তাঁহার সহিত নাছোড়বান্দা-প্রেমে পড়িয়া যাইত। কাজেই এই নূতন হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য তাঁহাকে এই চিকিৎসা-পদ্ধতি ছাড়িয়া দিতে হইল।)

এই জাতীয় বিপদ ফ্রয়েডেরও হইয়াছিল। তবে তিনি ইহাতে ভীত হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, এই ব্যাপারটি **সংক্রমণ** বা পাত্রান্তর (transference) ছাড়া আর কিছুই নহে। চিকিৎসককে একজন বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল পাত্র মনে করিয়া রোগীরা স্বতঃই তাঁহাতে আসক্ত হইয়া পড়িত এবং তাঁহাকে বিকল্প প্রেম পাত্র মনে করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। ফ্রয়েড বুঝিলেন, এই সংক্রমণই রোগীর রোগমুক্তির প্রথম পর্যায়। কারণ, অতৃপ্ত প্রেম কামনার মধ্যেই যদি রোগের আদি কারণ নিহিত থাকে, তাহা হইলে একটা বিকল্প

প্রেম পাত্রের সন্ধান পাইয়া সে যদি তাহার নিরুদ্ধ প্রেম-নির্ঝরের দ্বার খুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মনের ভার হাল্কা করিয়া সে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিবে। তবে এজন্য চিকিৎসকের পক্ষ হইতে একটা অনাসক্ত, নির্লিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব বজায় রাখিতে হইবে।

ফ্রয়েডের মতে রোগমুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে transference neurosis ;—এই অবস্থায় রোগী চিকিৎসকের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করে এবং তাহার হৃদয়ের সমস্ত নিরুদ্ধ কামনা উজাড় করিয়া দেয়।

রোগমুক্তির তৃতীয় পর্য্যায়ে আছে সংক্রমণের মোহভঙ্গ ; অতীতের অতৃপ্ত কামনার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান ও মোহমুক্তিজনিত রোগমুক্তি।

ক্রমশঃ ফ্রয়েড দেখিলেন যে, এই সংক্রমণ জিনিসটা সম্মোহিত অবস্থায় ভাল হয় না ; তাহা ছাড়া উদ্বায়ু রোগীদিগকে গভীরভাবে সম্মোহিত করাও যায় না। কাজেই তাঁহার চিকিৎসা-পদ্ধতির কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হইল। তিনি দেখিয়াছিলেন—লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধারের ব্যাপারে সম্মোহন জিনিসটা খুবই কার্যকরী ছিল। তিনি বুঝিলেন, জাগ্রত অবস্থাতেও রোগীকে শরীর মন শিথিল করিবার নির্দেশ দিয়া যদি তাহাকে অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিতে বলা হয়, তাহা হইলেও সে অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারে। তবে এ পদ্ধতিও খুব কার্যকরী ছিল না। তিনি তখন অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। রোগীকে একটি প্রায়ান্ধকার গৃহের মধ্যে একটি ইজি-চেয়ার বা কোচের উপর বসাইয়া তাহাকে বলা হইত "তুমি দেহ-মনকে সম্পূর্ণভাবে শিথিল করিয়া দাও, চোখ দুইটি বুঁজিয়া থাক, এইবার তোমার মনে যা কিছু কথা আসে তাহা বলিয়া যাও, যত তুচ্ছ, যত অর্থহীন হউক না কেন, সব কথাগুলিই বলিয়া যাও"। ডাক্তার অধিকাংশ সময়েই চুপ করিয়া থাকিবেন এবং নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এই সমস্ত কথাগুলির উপর টীকা-টিপ্পনী বা ব্যাখ্যা করিবেন না। ফ্রয়েড এই প্রণালীর নাম দিলেন **মুক্ত অনুষঙ্গ** (Free Association) প্রণালী। এই মুক্ত অনুষঙ্গের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে রোগীর মনের নিরুদ্ধ গোপন কথাগুলি বাহির হইয়া আসিত। ফলে রোগী সুস্থ হইয়া উঠিত।

এই মুক্ত অনুষঙ্গের প্রণালীতে কথা বলিতে বলিতে রোগীরা কখন কখন তাহাদের দেখা স্বপ্নের কথাও বলিত। ফ্রয়েডের ধারণা ছিল, এই স্বপ্নগুলি হইতেছে মনের অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ করিবার একটা উপায় মাত্র। তবে স্বপ্নে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা আসল স্বপ্ন-লক্ষিত বস্তু নহে; একটা রূপক প্রতীকের মধ্য দিয়া স্বপ্নে-দেখা জিনিসগুলি আমাদের অতৃপ্ত কামনা পূরণ করে। তখন তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত "স্বপ্নের ব্যাখ্যা" (Interpretation of dreams) নামক নিবন্ধ প্রকাশিত করেন।) ফ্রয়েডের মতে ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। উড্ওয়ার্থ মনে করেন, ফ্রয়েডের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতেছে "দৈনন্দিন জীবনের মনোরোগ বিদ্যা" (Psychopathology of everyday life : 1901); ইহাতে দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তিগুলি মুক্ত অনুষঙ্গের প্রণালীতে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এইবার এই স্বপ্ন-বিকলন ও মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে তিনি চিকিৎসা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। আবার নূতন করিয়া একটি সমস্যার উদয় হইল। (তিনি দেখিলেন, তাঁহার চিকিৎসিত রোগীরা অন্য কোনও একটা লক্ষণের রোগ লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। ফ্রয়েড দমিবার পাত্র নহেন। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার মনোবিকলন রোগীর জীবনের খুব গভীর তলদেশ পর্যন্ত হয় নাই, খানিকটা ভাসা-ভাসা হইয়াছে, তাই অসুখের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। কাজেই রোগীকে পূর্ণভাবে নিরাময় করিতে হইলে তাহার সুদূর অতীতের মধ্যে যে চাপা আবেগের ইতিহাস আছে, যে কামনা-বেদনার জট পাকাইয়া আছে, তাহারও সন্ধান করিতে হইবে।

কাজেই মুক্ত অনুষঙ্গের পদ্ধতিকে আরও দীর্ঘায়িত করিয়া তিনি অনুসন্ধান চালাইতে লাগিলেন। পথ চলিতে-চলিতে পথের সন্ধানও মিলিল। তিনি দেখিলেন, দূর বাল্য এমনকি সুদূর শৈশবের যৌন-কামনা ও যৌন-অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত আছে এই সমস্ত মনোবৈকল্যের মূল কারণ।)

শৈশবের যৌন-কামনা!—ফ্রয়েড কিন্তু এই নূতন তত্ত্বের আকস্মিকতায় বিচলিত হইলেন না। সত্যকে স্বীকার করিবার মত সাহস ও সংস্কারমুক্ত মন তাঁহার য়িহুদী রক্তের মধ্যেই ছিল।

কিন্তু শৈশবের স্মৃতির উদ্ঘাটনই বা কিরূপে সম্ভব হইবে এবং রোগমুক্তির জন্য যে সংক্রমণের প্রয়োজন তাহাই বা কিভাবে হইবে? শৈশবের অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই অস্পষ্ট, তাহা বাচিকরূপে (Verbal) অভিব্যক্ত নহে। কাজেই তাহাকে পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করা বয়স্ক লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে তাহার প্রয়োজনও নাই। শৈশবের আবেগ অনুভূতিগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই রোগী শৈশবের অতৃপ্ত কামনার অযৌক্তিকতা বুঝিতে পারিয়া রোগ মুক্ত হইয়া উঠিবে।

আর সংক্রমণের (transference) কি হইবে? শিশুর প্রেমের বস্তু হইতেছে তাহার মাতাপিতা, সুতরাং ডাক্তারকে ঐ মাতাপিতার ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহারই উপর রোগী তাহার শৈশবের প্রেম, বিদ্বেষ, তৃপ্তি, বিরক্তি ঢালিয়া দিয়া এই নূতন পিতৃ-প্রতিকল্পের (father substitute) উপর তাহার নিরুদ্ধ আবেগ উজাড় করিয়া দিবে এবং ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিবে। এই প্রক্রিয়ার মূল তত্ত্বটি হইতেছে শৈশবের "ইডিপাস্ অভিজ্ঞতা"র (a complete re-acting of Œdipus experience) পূর্ণ মহড়া দেওয়া এবং তাহার ফলেই বিস্মৃত নিজ্ঞানকে চেতন-মানসে ভাসাইয়া তোলা।

কিন্তু এই ব্যাপারটিকে যত সহজে বলা হইতেছে, আসলে ব্যাপারটা তত সহজ নহে। মুক্ত অনুষঙ্গ বাস্তবিকই মুক্ত নহে, তাহা স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে না। ফ্রয়েড লক্ষ্য করিলেন, কি একটা শক্তি যেন অনুষঙ্গের ক্রিয়াকে বাধা দিতেছে, যাহার ফলে নিরুদ্ধ গোপন কথাগুলি যেন ঠিক বাহির হইয়া আসিতে পারিতেছে না। মনে হইল, রোগী যেন একটা লজ্জাকর অথবা কষ্টকর ঘটনার কথা চাপিয়া যাইতেছে।

এইখানেই ফ্রয়েড তাঁহার মনোবিজ্ঞানের আর একটি তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। ইহা হইল তাঁহার **অবদমন** (repression) তত্ত্ব। তিনি বুঝিলেন, যে সমস্ত অভিজ্ঞতাকে আমরা আমারই বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা পাই, সেই জাতীয় অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে আমরা মনের অবচেতন স্তরে দাবাইয়া নামাইয়া অবদমিত করিয়া রাখি, তাহাকে কিছুতেই চেতন-মানসে

ভাসিয়া উঠিতে দিই না ; ইহাই হইল অবদমনের মূল কথা।) হয়ত আমি আত্মীয়বন্ধুর সহিত চরম অকৃতজ্ঞতার কাজ করিয়াছি, লজ্জাকর পাপ করিয়াছি, সীমাহীন স্বার্থপরতা দেখাইয়াছি, নির্লজ্জ যৌন-কামনা করিয়াছি, আমার নীতিবোধ যাহাতে সায় দেয় না, কাজেই এ সমস্ত গ্লানিকর অভিজ্ঞতা চেতন-মানসে স্থান পায় না। তাহা অবদমিত হইয়া অবচেতন মনে তলাইয়া যায় এবং আমাদের অজ্ঞাতে জট্ পাকাইয়া **গূঢ়ৈষার** (complex) সৃষ্টি করিয়া মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতেই 'দ্বৈত ব্যক্তিত্ব' 'বিষঙ্গ' (dissociation) প্রভৃতির সৃষ্টি হয় ("মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব" নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই অবদমন তত্ত্বের ইঙ্গিত ফ্রয়েড কয়েক বৎসর পূর্বেই পাইয়াছিলেন। যখন তিনি সম্মোহন ও অভিভাবনের দ্বারা চিকিৎসা করিতেন তখনই দেখিয়াছিলেন যে, রোগীকে উৎসাহ দিলেও সে যেন সব কথা খুলিয়া বলে না, কিছু যেন চাপিয়া যায়। কিন্তু তখনও ফ্রয়েডের মনে শৈশবের যৌন-কামনা, নির্জ্ঞান মন, স্বপ্নরূপক, প্রতীক প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। এখন এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার ধারণাগুলি ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল,—একটি তত্ত্ব অন্য একটি তত্ত্বের উপর আলোকপাত করিতে লাগিল এবং পরস্পরের আলোকে প্রত্যেক তত্ত্বটিই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অতৃপ্ত বা অস্বীকৃত কামনা বা শৈশবের আবেগ-প্রতিন্যাসের (emotional attitude) বিস্মৃত স্মৃতিগুলি মুক্ত অনুষঙ্গের প্রভাবে যতই প্রকাশিত হইতে লাগিল, ততই দেখা যাইতে লাগিল প্রায় সমস্ত মনোরোগের মূলে আছে যৌন কামনার ইতিহাস।

কিন্তু এই দীর্ঘ বিস্মৃত লজ্জাকর অভিজ্ঞার কথা যখন চিকিৎসক কর্তৃক প্রকাশিত হয় তখন রোগী কিছুতেই তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। আর চাহিবেই বা কেন ? সে ত বাস্তবিক সে সমস্ত ঘটনাকে চেতন-মানস দিয়া স্মরণ করিতেও পারে না। কাজেই তাহার রোগকে পুরাপুরিভাবে সারাইতে হইলে দীর্ঘদিন ধরিয়া অতীত অভিজ্ঞতার মহড়া দিতে হয়। (প্রতি সপ্তাহে দুই তিনবার করিয়া কয়েক মাস ধরিয়া, হয়ত দুই তিন বছর ধরিয়া, এই কাজ চালাইয়া যাইতে হয়।

ফলে দেখা যাইতেছে, মনোরোগের চিকিৎসার দিক দিয়া মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি বিশেষ ব্যবহারিক বা কার্যকরী নহে। এইরূপ দীর্ঘ দিনব্যাপী চিকিৎসা চালাইবার মত সময় এবং আর্থিক অবস্থা খুব কম লোকেরই আছে।

কাজেই বলা যায়, মনোরোগ চিকিৎসার পদ্ধতির দিক দিয়া ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বটি খুব কার্যকরী পদ্ধতি হয় নাই। কিন্তু এই পদ্ধতির মাধ্যমেই সৃষ্ট হইল ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের অপূর্ব দার্শনিক তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞানের একটা নূতন সম্প্রদায়।

মনঃসমীক্ষণের কয়েকটি তত্ত্ব

মনঃসমীক্ষণ বলিতে দুইটি জিনিস বুঝায়। একটি হইতেছে, মনোরোগ চিকিৎসার পদ্ধতি, আর একটি হইতেছে এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া যে সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে সেইগুলি। চিকিৎসা-পদ্ধতির বিবর্তন ও স্বরূপ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, এইবার ইহার মূল তত্ত্বগুলি লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

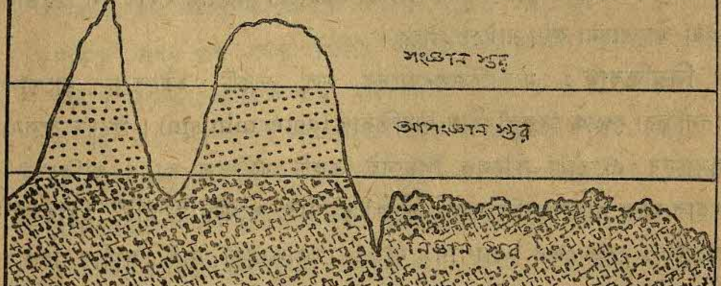
নিয়তিবাদ : মনোবিকলনবাদের মূল তত্ত্বটি হইতেছে প্রত্যেক মানসক্রিয়া সম্বন্ধে বিকল্পবিহীন নিয়তিবাদ (determinism)। ফ্রয়েড বলেন, আমাদের প্রত্যেক কাজের পিছনেই একটি মূলীভূত কারণ থাকিবেই। তাহার মধ্যে খামখেয়ালি নাই, দুর্জ্ঞেয়ত্ব নাই, পাগলামি নাই, হঠাৎ-ঘটা অহৈতুক মেজাজের ব্যাপার নাই, খেয়াল-খুসী নাই, স্বাধীন চিন্তার স্বেচ্ছাচার নাই। এমনকি আপাতঃ দৃষ্টিতে যে সমস্ত কাজগুলিকে পাগলামি বলিয়া মনে হয়, তাহারও মূলে একটি বিধি-নির্দিষ্ট কারণ আছে। তবে সেইটি হয়ত আমাদের সংজ্ঞান মনের গোচরীভূত নহে, এই পর্যন্ত।

সংজ্ঞান মনের গোচরীভূত নহে, এই জাতীয় একটা মনের লীলা যে থাকিতে পারে তাহা পূর্ববর্তী মনোবিদ্‌গণ স্বীকার করিতেন না। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান কিন্তু এই নির্জ্ঞান মনটির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই নির্জ্ঞান মনটি সংজ্ঞান মনের একটা প্রাণহীন খোলস মাত্র নহে, ইহা একটা তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল জীবন্ত জিনিস। ইহা

বর্তিষ্ণু (static) বস্তুপুঞ্জ মাত্র নহে, ইহা একটি চলিষ্ণু (dynamic) শক্তি, ইহা আমাদের জ্ঞানের অগোচরে থাকিয়া মানবজীবনকে পরিচালিত করে। এই নির্জ্ঞান মনের সহিত সংজ্ঞান মনের সম্পর্ক কিরূপ ?

মনের গঠন

ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে মনের গঠনের শ্রেণী বিভাগ এইভাবে করা হয়, যথা: সংজ্ঞান (conscious), আসংজ্ঞান (pre-conscious) এবং নির্জ্ঞান (unconscious)। ইহা ছাড়াও আর এক প্রকার বিভাগ স্বীকৃত হয় যথা—ইদ্ (id), অহম্ (ego) এবং অধিশাস্তা (super ego)। এই দুইটি বিভাগ পরস্পর সম্পর্কশূন্য বা সংযোগশূন্য বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত নহে। প্রথম জাতীয় বিভাগের কিছু কিছু অংশ হয়ত দ্বিতীয় প্রকারের বিভাগের সীমারেখার মধ্যে (নিম্নের চিত্রটি দ্রষ্টব্য) পড়িয়া গিয়াছে।



প্রথমে ইদ্, অহম্, অধিশাস্তার কথাই ধরা যাক। ইহা যেন একটা পর্বতশ্রেণী ও উপত্যকার মত। প্রথম পর্বতশৃঙ্গটি হইতেছে অধিশাস্তা, ইহা সর্বাপেক্ষা উচ্চ, কাজেই সূর্যালোক ইহার উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক পতিত হয়। ইহার পরের শৃঙ্গটি হইতেছে অহম্, ইহাতেও দুপুরের সূর্যালোক কিছু কিছু পড়ে। কিন্তু ইহার পরে যে সুবিস্তৃত উপত্যকার রাজ্য আছে, তাহাতে সূর্যালোক কোনওদিনই পড়িতে পারে না। এই অধিশাস্তা ও অহম্ উভয় শৃঙ্গেরই

উর্ধ্বভাগে আছে আলোকিত সংজ্ঞান স্তর, মধ্যভাগে আছে আলো-আঁধারে আসংজ্ঞান স্তর এবং নিম্নদেশে আছে গভীর নির্জ্ঞান স্তর। ইহার পরে যে ইদ্ নামে উপত্যকাটি আছে, তাহা কোনওদিনই জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয় না। রূপকটির ব্যঞ্জনা এই যে, অধিশাস্তা ও অহং মনের খানিকটা অংশ চৈতন্য রাজ্যের নিম্নস্তরে থাকিলেও, বাকী অংশগুলি চৈতন্যের আলোকে আলোকিত হয়। কিন্তু ইদ-এর অন্ধকার রাজ্যে যাহা ঘটে, তাহার সন্ধান চৈতন্যের আলোকে কোনও দিনই পাওয়া যায় না। অথচ এই ইদ-এর অন্ধকার নির্জ্ঞান রাজ্য হইতেই মনের যত কিছু কার্য প্রভাবিত হয়।

আমরা সংজ্ঞান মন দিয়া যতটুকু মনে রাখি, তাহার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। কত হাসি-হাসি মুখ, কত অতীতের কাহিনী, কত গীতি, কত গাথা, কত কথাই ত আমরা চেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে পারি। এই সমস্ত জিনিসগুলি আমাদের চেতন-মানসের উপরে ঠিক ভাসিয়া থাকে না, একটু নিম্নস্তরে ডুবিয়া থাকে। আমরা একটু চেষ্টা করিয়া সেগুলিকে ভাসাইয়া তুলিতে পারি। এই জাতীয় ব্যাপারকে ফ্রয়েড আসংজ্ঞান স্তরের কার্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ফ্রয়েড বলেন, আসংজ্ঞান স্তরেই যদি এত জিনিস লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে আরও গভীর তলদেশে অর্থাৎ নির্জ্ঞান স্তরে কত বেশী জিনিস যে লুক্কায়িত থাকিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে এই পূর্ণ নির্জ্ঞান স্তরের জিনিস-গুলিকে স্মৃতির সাহায্যে উপরে টানিয়া ভাসাইয়া তোলা যায় না। তাহা হইলেও, নির্জ্ঞান স্তরের বহু অভিজ্ঞতাই যে আমাদের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা নানাভাবে বুঝা যায়, যথা—

(১) আমরা এমন অনেক আচরণ করি যাহার সহিত আমাদের চেতন-মানসের কোনও সম্পর্ক নাই, রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নচারিণী রমণী যখন চীৎকার করিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে, তখন চেতন-মানসের ইতিহাসে হয়ত তাহার কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(২) সম্মোহিত অবস্থায় (hypnotised state) লোকেরা বহু-বিস্মৃত অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতে পারে। আবার সম্মোহনের পরেই

তাহা ভুলিয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায়, মনের গভীর তলদেশের নির্জ্জান রাজ্য হইতে এই জিনিসগুলি সম্মোহিত অবস্থায় ভাসিয়া উঠিয়া থাকে।

(৩) মুক্ত অনুষঙ্গের প্রভাবে হঠাৎ কত কথা মনে পড়িয়া যায়, অথচ চেষ্টা করিয়া স্মৃতির সাহায্যে সেগুলি মনে করা যায় না। সুষুপ্তির অচৈতন্য অবস্থায় আমরা বহু সমস্যার রহস্য খুঁজিয়া পাই, গণিতের সমাধান, কাব্যের বিষয়বস্তু, এমনকি বাণী পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই। সজাগ মন এগুলির সন্ধান দেয় না, ইহা নিশ্চয়ই নির্জ্জানের রাজ্য হইতে ভাসিয়া উঠে।

(৪) স্বপ্নবিকলনের ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, আমাদের বহু অসঙ্গত ও অদ্ভুত স্বপ্নগুলির মধ্যে আমাদের অতীত জীবনের বহু বিস্মৃত ইতিহাস লুকাইয়া আছে।

(৫) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বহু ভুল-ভ্রান্তির মধ্যেও আমরা এই জাতীয় একটা ইতিহাসের সন্ধান পাই। বিরুদ্ধ ক্রোধ, অতৃপ্ত কামনা, বন্ধ্যা অভিমান, দমিত ঘৃণা, গোপন বিদ্বেষ প্রভৃতি মনের অতল তল হইতে এইগুলিকে সৃষ্টি করে। একটি মহিলা একটি হোটেলে যাইয়া নিজের নাম লিখিতে যাইয়া নিজের বংশগত উপাধির বদলে লিখিয়া বসিল অন্য এমন একজনের উপাধি যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু হয় নাই। মহিলাটির অতৃপ্ত কামনা তাহাকে ঐ ভুল করাইল। একটি ছেলে হাতের লেখা শিখিবার সময় M অক্ষরটিকে সব সময়ে উল্টাইয়া W-র মত করিয়া লিখিত। এই ভুলের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখা গেল নামের আদ্য অক্ষরে M আছে এমন একজন লোক তাহার বিধবা মাতার সহিত প্রায়ই আলাপ করিতে আসিত। বালকটি ইহা পছন্দ করিত না, তাই M অক্ষরটিকে উল্টাইয়া দিয়া এই বিরক্তির প্রকাশ করিত। ইহাতেই বুঝা যায়, নির্জ্জান মন তাহার অজ্ঞাতেও এইভাবে কাজ করিয়া যাইত।

(৬) নির্জ্জান মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর একটি বড় প্রমাণ পাওয়া যায় মনোবিকলন দ্বারা মনোরোগের সাফল্য দেখিয়া। মনোবিকলনের দ্বারা মনের গোপন কথা মনের গভীর তলদেশ হইতে ভাসাইয়া চৈতন্যের আলোকে তুলিয়া ধরার সঙ্গে সঙ্গেই মনোরোগও সরিয়া যায়।

ফ্রয়েড মনে করিতেন, এই নির্জ্ঞান মনটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুদূর অতীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু য়্যুঙ্ বলেন, এই নির্জ্ঞানের রাজ্য আরও সুদূরতর প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, ইহা জাতকের জন্মান্তর-প্রসারী গোষ্ঠীগত নির্জ্ঞানের অভিজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই নির্জ্ঞানের স্তর হইতে সজ্ঞানের স্তরে অতীত ইতিহাসগুলি ভাসিয়া উঠে কি ভাবে? ইহা সহজে ভাসিয়া উঠে না, অবদমনের বাধা সরাইয়া তাহাকে তুলিতে হয়। আসংজ্ঞানের স্তর হইতে অবশ্য লুপ্ত স্মৃতিকে অনুষঙ্গের প্রভাবে সহজেই টানিয়া তুলা যায়, তবে নির্জ্ঞানের স্তর হইতে অতীত স্মৃতিকে টানিয়া আনিবার সময় মনে হয় কে যেন তাহাতে বাধা দিতেছে। (ফ্রয়েড প্রথমতঃ ভাবিতেন, একটা প্রহরী (censor) যেন নির্জ্ঞানের নোংরা চিন্তাগুলিকে জাগ্রত মন মহারাজের খাস কামরায় প্রবেশের অনুমতি দেয় না। তাই এই বাধা। তাই নির্জ্ঞানের স্মৃতি মনে পড়িয়াও মনে পড়ে না। সেইজন্যই সম্মোহিত অবস্থাতেই তাহা আসে, কারণ সম্মোহনের সময় প্রহরী বেচারী ঘুমাইয়া থাকে।)

এইবার আমরা ইদ্, অহম্ ও অধিশাস্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ইদ্ (Id): ইহা হইতেছে মানুষের আদিম প্রাণশক্তি, তাহার সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সক্রিয় উৎস। অনেক সময় ইদ্ ও নির্জ্ঞানকে একই জিনিস বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু ইদ্ ও নির্জ্ঞান ঠিক একই জিনিস নহে; কারণ নির্জ্ঞান স্তরটি অহং এবং অধিশাস্তা মনের মধ্যেও কিছু কিছু আছে, তবে ইদের নির্জ্ঞান বড় ব্যাপকতর। ইদের বৈশিষ্ট্য কি? নির্জ্ঞান মনের মতই ইহা অনীতিমূলক, সুখ-দুঃখ অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অযৌক্তিক। তবে ইহার আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। (ইহাই হইতেছে মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তির (instincts) মূল, আবার ইহাই লিবিডো বা কামশক্তির উৎস, ইহার মধ্যেই সঞ্চিত থাকে সমস্ত অবদমিত চিন্তার বিদ্রোহী শক্তিগুলি, ইহার মধ্যেই নিহিত আছে সমস্ত অভ্যাসাদির প্রেরণা।)

অহম্ (Ego): ইহা এক হিসাবে 'ইদ্-এর বিপরীতধর্মী শক্তি। শিশু বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে যতই সে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হইতে

থাকে, ততই বুঝিতে পারে যে, তাহার সকল দাবী পূর্ণ হইতে পারে না। বাস্তবের সঙ্গে এই পরিচয়ের মাঝেই যেন 'ইদ'-এর খানিকটা অংশ ঠেকিয়া শিখিয়া 'অহম্'-এ পরিণত হয়। অহম্ ইদ-এর অন্যায় ও অসঙ্গত দাবী-গুলিকে প্রশ্রয় দেয় না, সে দুনিয়ার খবর রাখে "কত ধানে কত চাল" হয়, সে জানে অন্যায় লোভ ও অসংযত কামনা পরিণামে সুখের চেয়ে দুঃখই আনে বেশী ; তাই সে ইদের সব আব্দারকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই সে এক হিসাবে 'ইদ'-এর প্রতিস্পর্ধী শক্তি (antithesis)। ইদ-এর সহিত অহম্-এর বিরোধটা তীব্র হইলে দেখা দেয় এক জাতীয় মনোবৈকল্য।

অধিশাস্তা : দুনিয়ার সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ের ফলে ইদ-এর খানিকটা অংশ যেমন অহম্-এ পরিণত হইয়া ইদ-এর দাবীকে খর্ব করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ অহম্-এর খানিকটা অংশ যেন মাতাপিতার (বিশেষভাবে পিতার) অভিজ্ঞতার দ্বারা সংযত হইয়া সামাজিক বিধিনিষেধ, পাপপুণ্যবোধ প্রভৃতিতে পরিণত হয় এবং শিশুর কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে। এই শক্তিটির নাম অধিশাস্তা। ইহাই হইতেছে শিশুর আদিম নীতিবোধ বা বিবেকবোধ। তবে ইহা তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সম্ভাব্য নীতিবোধ হইতে আরও ব্যাপকতর জিনিস, ইহা পিতৃপুরুষাগত নীতিবোধ হইতে সৃষ্ট।

লিবিডো : ফ্রয়েডীয় দর্শনে লিবিডো তত্ত্বটি খুবই প্রয়োজনীয়। লিবিডো কাহাকে বলে ? ইহার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলিয়াছেন, লিবিডো হইতেছে সেই প্রবৃত্তির শক্তি যাহাকে প্রেম (কাম) এই নামের দ্বারা অভিহিত করা যায়। (the energy of those instincts which have to do with all that may be comprised by the word love *)

ফ্রয়েডের মতে এই কামশক্তিই হইতেছে আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূল উৎস। এইজন্যই ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে। বলা হয়, ফ্রয়েডীয় মতবাদ হইতেছে "বিশ্ব যৌনবাদ" (pan

* য়ুঙ্ (Jung)-এর মতে এই লিবিডো হইতেছে আরও ব্যাপকতর জিনিস ; ইহা বার্গস-এর "Elan vital"-এর এবং ম্যাগডুগালের জীবনপ্রয়াস (Horme) জাতীয় জিনিস।

sexualism)-এরই নামান্তর। ফ্রয়েড কিন্তু এই অভিযোগে আদৌ বিচলিত হন নাই। তিনি বলেন, যৌন-বোধ (sex) কথাটির সহিত যে "ছি ছি" জড়াইয়া আছে, তাহার কোনও যুক্তি নাই; ইহার প্রভাব আমাদের জীবনে একটা অনস্বীকার্য সত্য, এবং জীবনের সকল অবস্থাতেই ইহা বিচিত্ররূপে ক্রিয়াশীল। বস্তুতঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যায় শিশুরও একটা যৌন ইতিহাস আছে এবং অতি শৈশব হইতেই তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু পদে পদে সে পায় বাধা। কাজেই তাহার মনে আসে একটা ব্যর্থতা ও অবদমন। এই লিবিডোর অবদমনই হইল যত প্রকার সমস্যার মূল।

জন্মের সময় অতি শৈশবে লিবিডোর পরিতৃপ্তির কোনও নির্দিষ্ট শারীর-কেন্দ্র নাই। সমগ্র শরীরেই তাহা পরিব্যাপ্ত থাকে। পরে ক্রমশঃ এক একটি কেন্দ্রে তাহার পীঠস্থান তৈয়ারী হয়। প্রথম পীঠস্থান হয় ওষ্ঠে। তখন ওষ্ঠ দ্বারা মাতৃস্তন্য চুষিয়া শিশু যে আনন্দ পায়, তাহাই তাহার যৌন আনন্দ। বালকের নখ খুঁটা, আঙ্গুল চোষা প্রভৃতি এই আনন্দেরই ভিন্নরূপ।

ইহার পরে আছে তথকথিত "annal phase'; এই সময় সে মলত্যাগ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা একটা আনন্দ পায়। পাঁচ বৎসর বয়সে আসে 'Phallic primacy'র অবস্থা এবং তাহারও পরে আসে 'latency'র যুগ বা অনুপক্রম কাল। ইহার পর বয়ঃসন্ধির যুগ হইতেই স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া দ্বারা মানুষ তাহার লিবিডোর তৃপ্তিসাধন করিতে চেষ্টা পায়।

এই যৌন জ্ঞানের বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে আছে 'আত্মরতি'। নিজের দেহ, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়াই তখন লিবিডোর কারবার। ইহার পরের অবস্থায় আসে "সমরতি"র (homo sexuality) যুগ; তখন নিজেকে ছাড়িয়া সমজাতীয় যোনির বালকবালিকা লইয়াই মানুষের লিবিডো যেন পরিতৃপ্তি দাবী করে। সর্বশেষে আসে লিবিডোর স্বাভাবিক পরিণতি। তখন নারী পুরুষকে এবং পুরুষ নারীকে লইয়া তৃপ্তি কামনা করে।

লিবিডো স্রোত

লিবিডো স্রোত তাহার গতিপথে নিম্নলিখিত ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে—

১। বাহিরের দিকে স্বাভাবিক ভাবে,

২। ভিতরের দিকে স্বরতি বা নার্সিসিজম্-এর সৃষ্টি করিয়া,

৩। বাধা পাইয়া সংবন্ধন (fixation)-এর সৃষ্টি করিয়া,

৪। পশ্চাৎমুখী হইয়া "প্রত্যাবৃত্তি"র (regression) পথ গ্রহণ করিয়া,

৫। প্রতিহত হইয়া অবদমনের সৃষ্টি করিয়া,

৬। পথ পরিবর্তন করিয়া উদ্‌গতির সৃষ্টি করিয়া।

নার্সিসিজম্ : 'জীবন পরিক্রমা' পরিচ্ছেদে নার্সিসিজম্-এর জটিলতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এই নার্সিসিজম্ শৈশবের একটি স্বাভাবিক অবস্থা। ফুলের কুঁড়ি যেমন নিজের গন্ধ নিজের বুকেই জড়াইয়া মাতোয়ারা থাকে, শিশুও তেমনি নিজের সম্বন্ধে একটা অন্তর্মুখী প্রেম লইয়া মাতোয়ারা থাকে। কৈশোরেও এই জাতীয় একটা অবস্থা আসে। ইহাও অস্বাভাবিক অবস্থা নহে।

নার্সিসিজম্-এর অস্বাভাবিক দিকও আছে, ফ্রয়েড তাহাকে 'Secondary Narcissm বলিয়াছেন। এই অবস্থায় লিবিডো স্রোত বহির্মুখী হইয়া কোনও প্রিয়জনের উপর প্রবাহিত হইতে না পারিয়া অন্তর্মুখী হইয়া একটা অলীক কল্পনার জগতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা একটা অস্বাভাবিক পরিণতি গ্রহণ করিলে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে তাহাকে 'অন্তর্বৃত্ততা' বলে। অবশ্য এই অন্তর্বৃত্ততা আর য়্যুঙ-এর অন্তর্বৃত্ততা এক জিনিস নহে।

(লিবিডোর স্বাভাবিক গতি হইতেছে বিপরীত যোনির স্ত্রীপুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়া সন্তানসন্ততি উৎপাদন। এই গতির ফলে লিবিডো স্রোত যখন নিজেকে ছাড়িয়া বহির্মুখী হইতে আরম্ভ করে, তখন ভালবাসাটা প্রথম নিবদ্ধ হয় মাতা (অথবা পিতার) প্রতি; ইহাকে ইডিপাস্ অথবা ইলেক্‌ট্রা ("জীবন-পরিক্রমা" পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) অবস্থা বলা হয়।)

প্রত্যাবৃত্তি (Regression) **:** লিবিডো স্রোত যখন তাহার পরিক্রমার পথে অগ্রসর না হইয়া অতীত শৈশবের কোনও প্রিয়জনের উপর নিবদ্ধ হইয়া থাকে, তখনকার অবস্থাটিকে প্রত্যাবৃত্তি বলা হয়। একটি যুবক হয়ত একটি নারীর প্রতি আসক্ত হইল, পরে ঐ প্রেম ব্যর্থ হইয়া তাহার প্রেমস্রোত প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় সে হয়ত অতিমাত্রার মাতৃভক্ত ছেলে হইয়া অস্বভাবী মন বিশিষ্ট হইয়া পড়িল।

অবদমন (Repression) : লিবিডো স্রোত যখন কোনও বাহিরের পাত্রকে আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না, অথচ প্রেম-স্রোতকে অন্য খাতেও প্রবাহিত করাইতে পারে না, তখন তাহার বিরুদ্ধ স্রোত মনের গোপন তলে তলাইয়া যায়। এই ব্যাপারটিকে অবদমন বলে। অধিশাস্তার শাসন মানিয়া চলিবার ক্ষমতা নাই, এই অবস্থায় সযত্নপোষিত অতৃপ্ত কামনা মনের নির্জ্জান স্তরে নামিয়া যাইয়া জট্ পাকাইয়া আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। অবদমনের ইহাই হইতেছে সর্বাপেক্ষা বিপদের কথা ("মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব" নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উদ্গতি (Sublimation) : লিবিডো স্রোত যখন ব্যাহত হইয়া সমাজকল্যাণকর বা নীতি-ধর্মমূলক কোনও খাতে প্রবাহিত হয় তখন তাহার উদ্গতি হয়। মানুষের যত কিছু সভ্যতা ও কৃষ্টি, তাহা এই উদ্গতির ফলেই সৃষ্ট হইয়াছে। মানুষ প্রতিনিয়তই সমাজকল্যাণের বেদীমূলে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থপর-কামনাকে বলি দিতেছে। সেই বলির রক্তে রাঙা হইয়াই মানুষের সভ্যতার গোলাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

Life and death instinct : ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে মনের শক্তিগুলির মধ্যে প্রায়ই একটা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব (polarity) দৃষ্ট হয়। লিবিডো চাহে নিরঙ্কুশ আনন্দ, অহম্ (ego) তাহাকে বাধা দিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় বাস্তব পরিবেশের অসুবিধার কথা, লিবিডো চায় বাহিরের ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া কামপ্রবৃত্তির তৃপ্তি, আর 'ইগো' চায় আত্মরক্ষা ও আত্মতুষ্টি। এই লিবিডোর প্রেরণা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মানুষের ক্ষেত্রে 'ইগো'র প্রেরণাও অসত্য নহে। তাই গোড়ার দিকে ফ্রয়েড একমাত্র 'লিবিডো' তত্ত্বের দ্বারা মানুষের সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া 'ego motive' and 'libido motive' এই দুইটি তত্ত্বকেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি যদি 'লিবিডো'কে য়্যঙ্-এর মত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই দুইটি প্রতিস্পর্ধী তত্ত্বকে স্বীকার করিতে হইত না। যাহাই হউক, ফ্রয়েড পরে দেখিলেন যে, জীবনের প্রয়োজনেই যেমন কাম-প্রবৃত্তির একটা দাবী আছে, আত্মরক্ষা, স্বার্থবোধ প্রভৃতিরও তেমনই একটা

দাবী আছে ; কাজেই লিবিডো এবং অহম্-এর আপাতঃ প্রতীয়মান দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও তাহাদিগকে একটা ব্যাপক প্রবৃত্তির অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ফ্রয়েড এই প্রবৃত্তিটির নাম দিলেন জীবন-প্রবৃত্তি (life instinct)।

এই জীবন-প্রবৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবৃত্তি কি হইবে ? ফ্রয়েড তাহার নাম দিলেন মৃত্যু-প্রবৃত্তি (death instinct)। মৃত্যু যখন জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তখন জীবনলীলার মধ্যেই মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন আয়োজন চলিতেছে। এই দুইটি প্রবৃত্তিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জীবন-প্রবৃত্তি (life instinct or eros) জীবন ও বৃদ্ধির মূল কথা, আর মৃত্যুপ্রবৃত্তি (death instinct or Thanatos) ক্ষয় ও ধ্বংসের মূল কথা। Eros প্রেরণা দেয় প্রেম ও সৃজনীশক্তিকে এবং Thanatos প্রেরণা দেয় ঘৃণা ও ধ্বংসকে।

যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাতজনিত মনোবৈকল্য (Traumatic neurosis), হিষ্টিরিয়া, দুঃস্বপ্ন, শিশুদিগের অনুকর্ষী পুনরাবৃত্তিমূলক (repetition compulsion) খেলাধূলার মধ্যে দেখা যায়, আমরা যেন বাধ্য হইয়াই অতীতের দুঃখের অভিজ্ঞতাগুলির পুনরাবৃত্তি করি। এই সমস্ত দেখিয়াই হয়ত ফয়েড একটা ধারণা করিয়াছিলেন যে, দুঃখ-বিলাসও আমাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। এই দুঃখ-বিলাস 'আত্মমর্ষণ' প্রভৃতির (masochism) মধ্যেই ফ্রয়েড মৃত্যু প্রবৃত্তির সন্ধান পান।

প্রশ্ন আসিতে পারে, প্রাণীর জীবনে মৃত্যুর প্রবৃত্তি কি স্বাভাবিক হইতে পারে ? ফ্রয়েড বলেন, হাঁ পারে। ইহার প্রেরণা অন্তর্মুখী হইলে মানুষ প্রায়শ্চিত্ত, আত্মনিগ্রহ, আত্মহত্যা প্রভৃতি করিতে চেষ্টা করে, আর বহির্মুখী হইলেই আঘাত করিতে, ধ্বংস করিতে, জয় করিতে চেষ্টা করে।

Mental mechanism : আমরা দেখিয়াছি, ফ্রয়েডর মতে লিবিডোই হইতেছে মানুষের আদিম প্রেরণা। সে যেন প্রতিনিয়তই বলিতেছে—

"আমি অশান্ত আমি অবাধ্য, যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য,
তাহারে ধরিব সবলে ;
আমি নির্মম আমি নৃশংস সবেতে বসাব নিজের অংশ
পর মুখ হতে করিয়া ভ্রংশ তুলিব আপন কবলে।"

কিন্তু তাহার এই অবাধ লোলুপতা পূর্ণভাবে তৃপ্ত হইতে পারে না। তাই ধাক্কা খাইয়া উদ্গতির প্রভাবে সে সৃষ্টি করে কাব্য-সাহিত্য, শিল্প-কলা প্রভৃতি। কিন্তু সকলের পক্ষে এই উদ্গতি সম্ভব হয় না। কাঠোর বাস্তব যখন বাধার অচলায়তন সৃষ্টি করিয়া আমাদের কামনা-স্রোতকে প্রতিহত করে অথচ উদ্গতির দ্বারা যখন আমরা জীবনে অন্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হই না, তখন অচেতন মন নানা কৌশল সৃষ্টি করিয়া আমাদের ব্যর্থতা ও অসামঞ্জস্যের একটা অপব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। অবচেতন মনের এই কৌশল ও কারসাজিগুলিকে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে "Defence mechanism" বলা হয়। কোন কোনও পণ্ডিত ১৭ প্রকার mechanism স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অবদমন (repression), reaction formation, প্রক্ষেপ (projection), ঐকাত্ম (Indentification), যুক্ত্যাভাস (rationalization), অন্তর্বৃত্ততা (introversion) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বর্তমান মনোবিদ্যা ফয়েডীয় সব তত্ত্বগুলিকে স্বীকার না করিলেও, অন্যভাবে এই সমস্ত 'mechanism'গুলি স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

মনোরোগ বিদ্যা ও অস্বভাবী মনোবিদ্যা

ফ্রয়েডীয় দর্শনের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ হইতেছে এই যে, ইহা অস্বভাবী মনস্তত্ত্বের শাস্ত্র, ইহাতে সাধারণ মনস্তত্ত্বের কোনও স্থান নাই।

কিন্তু এই আপত্তি ন্যায্য নহে। কারণ যে মনোবৈশিষ্ট্যগুলি অস্বভাবী (abnormal) মনের জিনিস বলিয়া মনে হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অল্পতর মাত্রায় দৃষ্ট হয়। আমাদের সমস্ত মনোবৈকল্যের মূল কারণটি আছে পরিবেশের সহিত মানাইয়া চলিবার ব্যর্থতার মধ্যে। কাজেই এই ব্যর্থতা যাহাদের জীবনে ঘটিয়াছে, সেই সমস্ত অভাগা প্রতিবেশীদের দুঃখের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা হয়ত আর সে ভুল করিব না। অস্বভাবী মনোবৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকেই বেশীভাবে ফুটাইয়া তুলে বলিয়া ইহার আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

Rickman মনোবৈকল্যগুলির এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, যথা—

(১) **সংক্রমনজাত মনোবৈকল্য** (Transference neurosis), আবেশিক উদ্বায়ু (obsessional neurosis), বিপরিণামী হিষ্টিরিয়া (conversion hysteria), উৎকণ্ঠা হিষ্টিরিয়া (anxiety neurosis) প্রভৃতি। অহং আর ইদ্‌এর দ্বন্দ্বে এইগুলি সৃষ্ট হয়।

(২) **নার্শিজিমজাত বৈকল্য:** খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic depressive), patho neurosis প্রভৃতি—এই ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বটি হয় অহং এবং অধিশাস্তার মধ্যে।

(৩) **বাতুলতা:** ভ্রম বাতুলতা (paronla), চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (Demantia praecox) প্রভৃতি; অহং এবং বাস্তব পরিবেশের সহিত সংঘর্ষ হইতে এইসব বৈকল্যের সৃষ্টি হয়।

(৪) **উদ্বায়ু:** উৎকণ্ঠা উদ্বায়ু (anxiety neurosis), স্নায়বিক অবসাদ (neurasthenia), hypochondria, প্রভৃতি।

(৫) **আঘাত বৈকল্য** (Traumatic neurosis)।

তবে Rickman-এর এই শ্রেণীবিভাগটি সর্বজনস্বীকৃত নহে। Kracpelin প্রভৃতি মনোরোগের শ্রেণী বিভাগ অন্যভাবে করিয়াছেন। শ্রেণীবিভাগ যাহাই হউক, মনোবৈকল্য সম্বন্ধে মোটামুটি এই তত্ত্বগুলি সর্বজনস্বীকৃত: (১) প্রত্যেক বৈকল্যের একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ ও ইতিহাস আছে; (২) মানসিক রোগগুলি হইতেছে বিরুদ্ধ শক্তির সহিত একটা বিদ্রোহ ও সন্ধির চেষ্টা হইতে প্রসৃত; (৩) এই রোগগুলির মধ্যে দুইটি প্রতিক্রিয়া আছে, একটি হইতেছে বিকল্প পরিতৃপ্তির চেষ্টা এবং আর একটি হইতেছে কষ্টভোগ।

স্বপ্নতত্ত্ব

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন হইতেছে, নিদ্রিত অবস্থায় উদ্দীপকের বিরুদ্ধে এক প্রকার মানস প্রতিক্রিয়া (Mode of re-action of the mind to stimulate activity during sleep)। প্রত্যেক সুস্থ লোকের পক্ষেই স্বপ্ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী। ইহার তিনটি মূলতত্ত্ব আছে: (১) ইহা নিদ্রার

সহায়ক, (২) স্বপ্নের প্রত্যক্ষীভূত জিনিসগুলির (manifest content) পিছনে সব সময়েই একটা গোপন উদ্দেশ্য (latent content) থাকে এবং (৩) ইহা সব সময়েই একটা অতৃপ্ত কামনার পূরণ করে।

সুতরাং স্বপ্ন 'শুধু স্বপ্নমাত্র—মস্তিষ্ক-বিকার' নহে। ইহার পশ্চাতে অবদমিত অতৃপ্ত কামনার একটা ইতিহাস আছে, একটা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বও আছে। ইহা নিদ্রাকে রক্ষা করে কিভাবে? ইহা অতৃপ্ত কামনার দুঃখকর বা লজ্জাকর অনুভূতিকে একটা নির্দোষ ছদ্মরূপ দিয়া দুঃখ হইতে আমাদের বাঁচায়। যখন এই নির্দোষ রূপটি দিতে পারে না, তখনই স্বপ্নটা দুঃস্বপ্ন হইয়া আমাদের অতীত অনুভূতির পুনরাবৃত্তি করে।

মনের গোপন কামনাকে সে ছদ্মবেশে ঢাকিয়া প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া নির্জ্ঞান স্তর হইতে সংজ্ঞান স্তরে পৌঁছাইয়া দেয় এবং অতৃপ্ত অবদমিত কামনাকে পরিতৃপ্ত করিয়া অবদমনের গুঢ়ৈষা হইতে মনকে মুক্ত করে। এই ছদ্মবেশটি ঠিকমত না হইলে, হয় প্রহরীর শাসনে অবদমিত কামনা উপরে আসিতেই পারে না, অথবা স্বপ্নটি দুঃস্বপ্ন হইয়া আমাদের পীড়া দেয়। সুতরাং সার্থক বা সফল স্বপ্নগুলি সব সময়েই মনের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। দরিদ্র বালক দুগ্ধ মনে করিয়া চালগুড়া মিশ্রিত জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করে ও তাহার কান্না থামায়; আমরা সেইরূপ স্বপ্নের প্রতীক-পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়া অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তি করি ও মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ('মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব' নামক পরিচ্ছেদে অজিতকুমার ও অনীতার স্বপ্ন-বৃত্তান্তটি দ্রষ্টব্য) হইতে মুক্ত হই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া গোপন কামনাকে স্বপ্নের চেতন মানসের স্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এইজন্য স্বপ্নের নানা জাতীয় কৌশল আছে। যথা—

(১) **নাটকীকরণ** (dramatization): ইহার দ্বারা মনের বিমূর্ত চিন্তাগুলি মূর্ত হইয়া যেন নাটকীয় কুশীলবের ভূমিকায় স্বপ্নের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করে। ইহার ফলেই স্বপ্নের গোপন কথাটি ছদ্ম মূর্তিতে আবির্ভূত হয়।

(২) **সংক্ষেপন** (condensation): সংক্ষেপনের প্রসঙ্গে ইহাই বুঝিতে

হইবে যে, স্বপ্নের প্রত্যক্ষ জিনিসের (manifest content) চেয়ে গোপন কথা (latent content) অনেক বেশী আছে। স্বপ্নের সময় ইহার কিছু রাখিয়া উহার কিছু ছাড়িয়া, এমন একটা অখণ্ড ছবি তৈয়ারী করা হয়, যাহা পূর্ণভাবে কাহারও মধ্যেই নাই। হয়ত রামের পোশাক আর শ্যামের চোখমুখবিশিষ্ট একটি মূর্তি দেখা যাইল, ইহাতে দুইজনেরই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপিত হইয়া ঐ স্বপ্নে দেখা মূর্তিটি সৃষ্ট হইল।

(৩) **অতিক্রান্তি (displacement) বা স্থানান্তরীকরণ**: ইহা দ্বারা মনের গোপন ভাবগুলি অন্য এমন একটি ভাবের দ্বারা স্থানান্তরিত হয় যাহা নীতির দিক দিয়া খানিকটা সমর্থনযোগ্য। ইহা দ্বারা একটি অংশ দ্বারা সমগ্রের সঙ্কেত দেওয়া হয় না, খানিকটা দূরের জিনিস দিয়া তাহার ইঙ্গিত করা হয় এবং স্বপ্নটির ব্যঞ্জনার ভারকেন্দ্র সরিয়া যায়। ফলে পরিচিত ঘটনাটিও অনেকটা অপরিচিত বলিয়া মনে হয়।

(৪) **অনুযোজন** (Secondary elaboration): অহম্-এর যুক্তি-প্রবণতার ফলে অনুযোজন প্রতিক্রিয়া দ্বারা স্বপ্নের অবিশ্বাস্য জিনিসগুলি বিশ্বাস্য করিয়া তোলা হয়। স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য মুক্ত অনুষঙ্গপ্রণালী ব্যবহার করা হয় এবং অবদমিত কামনাগুলির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। ফলে অতৃপ্ত গোপন কামনাগুলি খানিকটা পরিতৃপ্তি লাভ করে।

অনেক সময় অবশ্য কাছাকাছি অতীতের ঘটনা বা কামনা হইতেই স্বপ্নের মালমশলাগুলি আহৃত হয়। কিন্তু ফ্রয়েড বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা আহৃত হয় শৈশবের যৌনকামনা হইতে। তবে স্বপ্নের সময় যৌন ব্যাপারগুলি বিচিত্র প্রতীক চিহ্নের মধ্য দিয়া আমাদের মনে আবির্ভূত হয়। এই প্রতীকগুলির মধ্যে মনুষ্যদেহ, গৃহ বা প্রাসাদরূপে এবং পিতা ও মাতা রাজা ও রাণী (বা বড় বড় লোক) রূপে আবির্ভূত হয়। জন্মের সহিত সব সময়েই জলের সম্পর্ক এবং মৃত্যুর সহিত কোনও প্রকার যাত্রার প্রসঙ্গ থাকে। স্বপ্নে দেখা ছাতা, ছড়ি, ছুরি, বন্দুক, মাছ, সাপ প্রভৃতি পুং জননেন্দ্রিয়ের এবং দোয়াত, বোতল, বাক্স পকেট প্রভৃতি স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত প্রতীক এবং নাটকীকরণ, সংক্ষেপণ,

অভিক্রান্তি প্রভৃতির সাহায্যে স্বপ্ন আমাদের অতৃপ্ত কামনার পূরণ করে।

তবে এই তত্ত্বটিরও যে ব্যতিক্রম আছে ইহা পরবর্তী যুগের লেখায় ফ্রয়েড (Beyond pleasure principle নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য) স্বীকার করিয়াছিলেন। মৃত্যুপ্রবৃত্তি, অনুকর্ষী পুনরাবৃত্তিবাদ (repetition compulsion), যুদ্ধজনিত আঘাত, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা স্বপ্নের মধ্যে অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করি, অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তি করি না।

এইবার অধ্যাপক Flugel-এর 'Introduction of Psycho Analysis' গ্রন্থ হইতে একটি স্বপ্নের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া স্বপ্ন-প্রসঙ্গের শেষ করিব।

একটি নারী স্বপ্ন-বিকলনকারীর নিকট চিকিৎসাধীন ছিল। সে স্বপ্ন দেখিল, একজন মিস্ত্রী পিয়ানো সারাইতে আসিয়াছে, সে পিয়ানোর ভিতর হইতে কতকগুলি বীজ বাহির করিয়া লইতেছে। স্বপ্নটি ছোট, কিন্তু ইহার মধ্যে স্বপ্নের অনেক তথ্যই নিহিত ছিল।

স্বপ্নদর্শিনী নিজেই পিয়ানো। এই রূপকের প্রয়োজন কি? তিনি গান বাজনা ভালবাসিতেন, একটু আধটু বেহালাও বাজাইতেন। জীবনের কঠোরতা যথেষ্ট ছিল, তাই তাঁহার ইচ্ছা হইল একটু পিয়ানোর কাছে যাই। যথা ইচ্ছা তথা স্বপ্ন। তিনি নিজেই স্বপ্নে পিয়ানো হইয়া যাইলেন। ইহা হইল এক নম্বরের ইচ্ছাপূরণ। পিয়ানোর মিস্ত্রী হইল মনোবিকলনকারী ডাক্তার। দুইজনেরই কাজ হইতেছে রোগের চিকিৎসা; একজন বাদ্যযন্ত্রের, আর একজন মনোযন্ত্রের চিকিৎসা করেন। তিনি বীজগুলি তুলিতেছিলেন কেন? বীজ হইতেছে যৌন কামনার প্রতীক। ডাক্তার রোগিণীর অন্যায় যৌনকামনাগুলি তুলিয়া লইয়া তাহাকে সুস্থ করিতেছেন। ইহাই হইল স্বপ্নটির মাধ্যমে আর একটি কামনার পূরণ।

স্বপ্নটির অন্য অর্থও হইতে পারে। বীজগুলির অর্থ লিবিডোর সঙ্গে সম্পর্কিত একটা কিছু—যেমন সন্তানাদি। মনোবিকলনকারী (অর্থাৎ মিস্ত্রীটি) হইতেছে ধাত্রীবিদ্যায় দক্ষ চিকিৎসক। নারীটি তাহার সাহায্যে সন্তান প্রসব করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে।

অপর অর্থও হইতে পারে। মনোবিকলনকারী ডাক্তারের সহিত নারীটি transfrence-এর প্রভাবে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার সহিত সঙ্গম প্রার্থনা করিতেছে। তাহা হইলে বীজগুলি তুলিয়া লইবার অর্থ কি? ইহা একটা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কামনার ছদ্মরূপ। নারীটির ঐ ডাক্তারের সহিত যে সঙ্গমপ্রার্থনা তাহার মধ্যে নৈতিক সমর্থন নাই বলিয়াই বীজের প্রবেশ-প্রার্থনাটিকে নির্গমনের রূপ দিয়া স্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইতেছে।

ফ্রয়েডের অনুবর্তীগণ

ফ্রয়েডীয় দর্শনে মনোবৈকল্যের প্রধান কারণ হইতেছে অবদমিত যৌন-কামনা। ফ্রয়েডের শিষ্যবর্গ বিশেষভাবে এ্যাড্‌লার (Adler) ও য়্যুঙ্ (Jung) এই ব্যাপারে খানিকটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। নির্জ্ঞান মন, অবদমন প্রভৃতিকে ইঁহারাও স্বীকার করেন, তবে ফ্রয়েডের একতর্‌ফা যৌনবাদ ইঁহারা ঠিক স্বীকার করেন না। এ্যাড্‌লার বলেন, আমাদের সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা হইতেছে শক্তির আকাঙ্ক্ষা (will to power), যৌনকামনা নহে। এই শক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইলেই যে হীনমন্যতার (inferiority complex) সৃষ্টি হয় তাহাই হইতেছে আমাদের মনোবৈকল্যের মূল কারণ। তিনি বলেন, জীবনের পথে চলিতে হইলে জীবনের তিনটি জিনিসের সঙ্গে আমাদের থাপ খাওয়াইয়া চলিতে হয়—একটি হইতেছে পরিবেশ, একটি কর্মজীবন এবং আর একটি হইতেছে প্রেম ও প্রেমাস্পদ। এই তিনটি ব্যাপারে শিশু তাহার শৈশবে যেভাবে বাধা বা সাহায্য পাইবে, সেইভাবেই তাহার ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিবে।

আমরা অসহায় হইয়া জন্মগ্রহণ করি, তাই শক্তির কামনা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শক্তি কামনার অন্তরায় হয় বিরুদ্ধ জীবন-পরিবেশ (যেমন দারিদ্র্য) এবং অনুপযুক্ত দেহযন্ত্র (যেমন কানা, খোঁড়া বা কালা হইয়া জন্মান)। তিন প্রকারে ইহার সমাধান হইতে পারে, যথা—(১) উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ (Successful compensatiou), (২) পরাজয় ও পলায়ন (defeat and retreat) এবং (৩) মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিপূরণজনিত অস্বভাবী আচরণ।

উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ফলে বধির বিঠোভেন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক এবং তোত্‌লা

ডিমস্থেনিস্ বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণও বিরল নহে। প্রাংশুলভ্য দ্রাক্ষাফলে বঞ্চিত হইয়া যে শৃগাল দ্রাক্ষাফল টক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল অথবা জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া যে ব্যক্তি কুনো প্রকৃতির হইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে ইহার উদাহরণ মিলিবে। তৃতীয় শ্রেণীর উদাহরণ মিলে বহু কুচক্রী শয়তানের মধ্যে। "হাবা, কালা, কানা খোঁড়ার এক কাঠি বাড়া" প্রবাদটি ইহাদের প্রতিই প্রযোজ্য। একদিক দিয়া ইহারা ছোট ও দুর্বল বলিয়াই শয়তানির মধ্য দিয়া শক্তির পরিচয় দেয়।

এ্যাড্‌লারের মতে, আমাদের জন্মগত ও পরিবেশগত ক্রটীর মধ্যে একটা সার্থক সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যেই আছে সুস্থ মনুষ্যত্ব এবং শিক্ষার মূল কথা হইতেছে বিভিন্ন দিকের সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দিয়া হীনমন্যতার অনুভূতি হইতে আমাদের রক্ষা করা। যে বালক অঙ্ক বা ইংরাজী ভাল পারে না তাহাকে যদি গায়ক বা শিল্পী হইবার সুযোগ দেওয়া হয়, অথবা নানা জাতীয় ঐচ্ছিক বিষয় লইবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে একটা সার্থকতার পথ পায়।

ফ্রয়েডের সহিত য়্যুঙ্-এর কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ মতানৈক্য আছে। য়্যুঙ্ বলেন, মানুষের মধ্যে দুইটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ আছে। একদল মানুষ হইতেছে অন্তর্বৃত্ত এবং আর একদল বহির্বৃত্ত। অন্তর্বৃত্ত লোকেরা চিন্তা-প্রবণ ও আত্মবিশ্লেষণপরায়ণ হয়, তাহারা বহির্বিশ্বের কোলাহল হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসে এবং বাহিরের দর্শক ও শ্রোতার সম্মুখে যেন খানিকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বহির্বৃত্ত লোকেরা ইহার ঠিক বিপরীতধর্মী। লোকের উপস্থিতিতে ইহাদের উৎসাহ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ইহারা আত্ম-প্রচার ও কর্তৃত্ব ভালবাসে।

য়্যুঙ্ বলেন, জগতের যে বিভিন্ন প্রকার অবস্থার সহিত মানুষকে কারবার করিতে হয়, তাহার মধ্যে কোনও ক্ষেত্রে হয়ত চিন্তার কাজ বেশী করিতে হয়, আবার কোনও ক্ষেত্রে হয়ত চিন্তার চেয়ে চলাফেরা, লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা প্রভৃতির কাজ বেশী করিতে হয়। কিন্তু সকলেই সব রকমের কাজের জন্য উপযুক্ত নহে। একজন বহির্বৃত্ত লোককে যদি তাহার বর্তমান জীবন সংস্থানের ফলে চিন্তা ও আত্ম-বিশ্লেষণের কাজ বেশী করিতে হয়, অথবা

একজন অন্তর্বৃত্ত লোককে যদি বহির্মুখী কর্তব্যের কাজ করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনে আসে ব্যর্থতা ও কর্তব্যদ্বন্দ্ব, ফলে সৃষ্ট হয় মনোবৈকল্য। সুতরাং আমাদের মনোবৈকল্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে য়্যুঙের মতে বর্তমানের জীবন-সংস্থানটির উপরেই জোর দিতে হইবে —সুদূর অতীতের শৈশবের অবদমনের উপর নহে।

এইখানেই হইতেছে য়্যুঙের মতবাদের সহিত ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরাট্ পার্থক্য। য়ুাঙ্ বলেন, শৈশবের অবদমন আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে। কিন্তু তাহা হইতে অনেকের মধ্যেই মনোবৈকল্যের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু বর্তমান জীবন-সংস্থানের সহিত যদি আমরা খাপ খাওয়াইয়া চলিতে না পারি তাহা হইলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোবৈকল্যের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ

এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের অবদান কি তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। সাধারণ class-teaching-এর দিক দিয়া ইহার প্রয়োজন যে খুব বেশী আছে, তাহা মনে হয় না; কারণ ক্লাসের রুটিনবাঁধা শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে মনঃসমীক্ষণের জটিল ও দীর্ঘায়িত চিকিৎসা পদ্ধতির কোনও অবকাশ নাই বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষকের পক্ষে বিশেষজ্ঞ মনঃ-সমীক্ষক হওয়াও সম্ভবপর নহে। তাহা হইলেও, প্রত্যেক শিক্ষক এবং অভি-ভাবকের মনোবিদ্ হওয়ার প্রয়োজন আছে। শিক্ষক মনোবিদ্ হইলে ছাত্রগণের স্খলন পতন ত্রুটিগুলিকে তিনি সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারেন। শিক্ষক মনোবিদ্ হইলে অপরাধী ছাত্রদিগকে একটা ঘৃণ্য অপাঙ্‌ক্তেয় পশুশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিবেন না এবং শাস্তি ও তিরস্কার দিয়া অপরাধী ছাত্রকে নূতন নূতন পাপের পথে ঠেলিয়া দিয়া পরিপক্ক অপরাধী করিয়া তুলিবেন না।

কিছু কিছু সংশোধনী ব্যবস্থাও যে তিনি করিতে পারেন না তাহা নহে। একটু চেষ্টা করিলেই তিনি ছেলেদের দৈনন্দিন ভুলভ্রান্তি ও খেলাধূলার বিশেষত্বগুলির মধ্য দিয়া তাহাদের মনের খবর লইতে পারেন এবং প্রয়োজন

বোধে অভিভাবকদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষজ্ঞদিগের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বস্তুতঃ শিশুদিগের প্রতিদিবসের আচরণ ও ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়া ছাত্রদের মনের গোপন ইতিহাসের ("মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব" নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) অনেকখানি সন্ধান পাওয়া যায়। মনঃসমীক্ষণ বিদ্যায় অভিজ্ঞ শিক্ষক একটা সজাগ এবং অভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়া তাঁহার ছাত্রদের আচরণগুলি লক্ষ্য রাখিতে পারেন। মনঃসমীক্ষণ আমাদের আর কিছু দিক আর নাই দিক, অন্ততঃ এইটুকু শিক্ষা নিশ্চয়ই দিয়াছে যে, ছাত্রদের সহিত শিক্ষককে বন্ধুভাবে মিশিতে হইবে এবং তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত একাত্মতা স্থাপন করিতে হইবে।

কবি বলিয়াছেন, "প্রক্ষালনাৎ হি পঙ্কস্য দূরাৎ স্পর্শনং বরম্"—কাদা ধুইয়া ফেলার চেয়ে কাদা যাহাতে না লাগে সেই ব্যবস্থাটাই ভাল। চিকিৎসাতত্ত্বেও এই সত্যটি প্রয়োজনীয়। ঔষধ সেবনান্তে রোগমুক্তির চেয়ে নীরোগ স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল দেহটিই বেশী কাম্য। শরীরের স্বাস্থ্যের মত মনের স্বাস্থ্যের দিক দিয়াও ইহা প্রযুজ্য। মনঃসমীক্ষকগণ এই মানসিক স্বাস্থ্যের সন্ধান দিয়াছেন।

মনোরোগ চিকিৎসার দিক দিয়া এ্যাড্‌লারীয় মনোবিদ্যা স্কুল-পাঠশালাতেই বেশ খানিকটা কাজ করিতে পারে। ছাত্রদের হীনমন্যতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে নানা জাতীয় সার্থকতার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। শারীরিক ত্রুটীজনিত হীনমন্যতায় উপযুক্ত ডাক্তারি চিকিৎসার দ্বারা অসুখকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে পারেন এবং নানাভাবে Successful compensation-এর দ্বারা তোত্‌লা বালক হইতে নূতন ডিমস্থিনিস্‌ এবং বধিরপ্রায় শিশু হইতে নূতন নূতন বিঠোভেন তৈয়ারী করিতে পারেন।

য়ুঙের মনোবিজ্ঞানও ব্যবহারিক দিক দিয়া অনেকখানি কাজ করিতে পারে। এই মনোবিজ্ঞান অন্তর্বৃত্ত-বহির্বৃত্ত বালকদিগের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত ভাবে নিয়োজিত করিতে নির্দেশ দিবে। ফলে সমাজের বহু ক্ষেত্রেই যে সোজা খাপে বাঁকা তরোয়াল পুরিবার ব্যর্থ পরিশ্রম করা হয়, তাহা আর হইবে না; যার সেখানে যোগ্য স্থান সেই স্থানে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া বহু অকল্যাণের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে।

বাল্য-কৈশোরের দুষ্ক্রিয়তা

কৈশোরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জাতকের দেহ-মনে নূতন নূতন পরিবর্তন আসিতে থাকে। এই পরিবর্তনটি লক্ষ্য করিয়াই সংস্কৃত-কবি বলিয়াছেন, মানুষের শৈশব ও যৌবনের আকৃতি গঠন করিবার জন্য দুইজন পৃথক শিল্পী-দেবতা আছেন। এই সময়েই যৌনচেতনা নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে ও সংবেদনপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, নূতন নূতন বিষয়ে কৌতূহল জাগ্রত হইতে থাকে, কাব্য-কাহিনীর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এই সময়েই বালক ও বালিকারা পুরুষ ও নারীর বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরস্পর পৃথক হইয়া যাইতে থাকে। ফলে, মনের গহনের পরিবর্তনগুলি গোপন রাখা সম্ভব হইলেও আকৃতিগত পরিবর্তনকে প্রতিরোধ বা গোপন করা যায় না।—কবি যাহাকে বলিয়াছেন "বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন।" বালিকারা এই সময়েই সেই নারীসুলভ আকৃতি লাভ করিতে থাকে এবং বালকদের মুখেও গুম্ফের রেখা ফুটিয়া উঠে এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত ও ভগ্ন হইয়া যায়। ফলে, একটা লজ্জার অনুভূতিতে কেহ কেহ জড়সড় হইয়া সঙ্কোচের সহিত একপাশে সরিয়া যায় এবং খানিকটা অন্তর্বৃত্ত (introvert) হইয়া পড়ে। এই অন্তর্বৃত্ত ভাবটি অস্বাভাবিক হইয়া অনেকে বাস্তব জীবন হইতে সরিয়া কল্পনার জগতে আশ্রয় লয় এবং শেষ পর্যন্ত অস্বভাবী মনোবিশিষ্ট হইয়া উঠে এবং কাহারও কাহারও মধ্যে চিত্তভ্রংশী বাতুলতার (Demantia praecox) লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই লক্ষণ যাহাদের মধ্যে প্রকাশ পায় না, তাহাদের মধ্যেও অনেক বালকই কৈশোরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠে। কেন এমন হয়? ইহার কারণ কি?

(১) দেহবাদী পণ্ডিতেরা বলেন, দুষ্ক্রিয়তা হইতেছে জন্মগত ব্যাপার, ইহা বংশগতির একটা অনিবার্য পরিণতি। গ্যাল্টন, গাডার্ড প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভাল ও মন্দ লোকের বংশধারার ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, সাধু ও অসাধু হওয়ার উপর বংশগতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধ

মতবাদও আছে। A De Condolle প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন—বংশগতির চেয়ে পরিবেশের প্রভাব বলবত্তর। পাপী হইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে না, পাপ জিনিসটা জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের ঘটনা।

(২) ক্যানন লিওপোল্ড, লেভি প্রভৃতি গ্রন্থিতত্ত্ববিদ্ এবং অনেক সন্ন্যাসী ও ব্যায়ামবিদ্‌গণের ধারণা, মানুষেব বহু আচরণের মূলেই আছে তাহার শরীরস্থ নিশ্ছিদ্র গ্রন্থিসমূহের রস-ক্ষরণের ক্রিয়া। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি বেশী ক্রিয়াশীল হইলে জাতক হয়ত অত্যন্ত চঞ্চল, ক্রোধপরায়ণ ও দুঃসাহসী হইয়া উঠে। সুতরাং এই গ্রন্থির অস্বাভাবিক রসক্ষরণে তাহার আচরণ অসামাজিক হওয়াও বিচিত্র নহে। আবার থাইরয়েড, থাইমাস প্রভৃতি গ্রন্থির রসক্ষরণের স্বল্পতা হইলে যৌন-চেতনা বিলম্বিত হইয়া অথবা প্রাচুর্য হইলে যৌন-চেতনা অকালে প্রবুদ্ধ হইয়া মানুষকে দুষ্ক্রিয়াসক্ত করিয়া তুলিতে পারে।

(৩) অনেকের বিশ্বাস, নির্বুদ্ধিতা বা উনমানসতার সহিত দুষ্ক্রিয়াসক্তির একটা সম্পর্ক আছে। এ সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, অধিকাংশ দুষ্ক্রিয়াসক্ত বালক-বালিকার বুদ্ধির মাপ বা মনস্বিতাংশ হইতেছে ৭০ হইতে ৮০-র মধ্যে। কিন্তু এই তথ্যটি হইতে জোর করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, নির্বুদ্ধিতার সহিত অপরাধপ্রবণতার একট কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। বুদ্ধির দৈন্য অন্যায়ের পথে প্রযুক্ত করে, ইহা ততটা সত্য নহে, যতটা সত্য হইতেছে যে, বুদ্ধির দৈন্য কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে ঠিক পথনির্দেশ করিতে পারে না। নির্বোধকে বুদ্ধিমান দুষ্ট বালকেরা যতটা খেলাইতে পারে, বুদ্ধিমান বালককে ততটা পারে না।

(৪) ফ্রয়েড বলেন, মানুষের আদিম কামপ্রেরণাই মিমিত্তভেদে বিভিন্ন বিবর্তনে মূর্ত হইয়া আমাদের অপরাধপ্রবণতাকে উৎসাহিত করে। তাঁহার মতে, যে আদিম 'ইদ্' (Id) লইয়া জাতক তাহার জীবন-পরিক্রমা আরম্ভ করে, তাহার দাবী সব সময়েই 'অধিশাস্তা মন' (Super-Ego) দ্বারা স্বীকৃত হয় না। ফলে তাহার 'অহমটি' (Ego) যখন 'ইদ্'-এর অসংযত দাবী ও অধিশাস্তার অসম্ভব নৈতিক শাসনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, তখন অনেক দাবীই অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞানের রাজ্যে গূঢ়ৈষা সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাহার পরই জাতকের এই সমস্ত নিরুদ্ধ কামনাগুলি নীতি ও সামজিকতার নৈমিক্ষিপ্ন পথ পরিত্যাগ করিয়া অসামাজিক খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। ফলে সে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, সমাজ যাহাকে ভাল বলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শুচিতা নীতি প্রভৃতিকে অবহেলা করিয়া একটা ছদ্ম আস্ফালনে নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার নির্জ্জান মনের বিদ্রোহকে ব্যক্ত করিতে চাহে।

এই অপরাধপ্রবণতার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান মানুষের জীবন-স্রোতের গোমুখীর দিকে উজান বহিয়া দেখিয়াছে, অতি শৈশবেই জাতকের 'মুখকাম', 'পায়ুঃকাম' প্রভৃতি যুগেই মাতাপিতার পালনের দোষে হয়তো জাতকের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার বীজ উপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে খবরটি হয়ত জাতক নিজেও জানে না, আর মাতাপিতাও জানে না। যে শিশু শৈশবে অবাধে মাতৃস্তন্য পান করিবার সুযোগ পায় নাই, সে হয়ত পরিণত বয়সে অসহিষ্ণু ও অসন্তোষপরায়ণ হইয়া উঠে, যে শিশু মলত্যাগ করার ব্যাপারে অত্যধিক শাসন-তাড়ন পাইয়াছে সে হয়ত পরিণামে জেদী, দুঃখবাদী বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে, ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা কৈশোরের অপরাধপ্রবণতার নানা জাতীয়-শ্রেণী বিভাগ করিয়াছে।

বাল্য-কৈশোরে আইন-শৃঙ্খলার প্রতি একটা উদ্ধত অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়। ইহা নাকি অধিশাস্তা তথা পিতার অভিবাবকত্বের প্রতি ছদ্ম বিদ্রোহের প্রতীক। যে পিতা শিশুকে পদে-পদে বিধি-নিষেধের শাসনে সংযত করিয়াছে এবং তাহার স্বাধীন ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, উত্তরকালে জাতক সমাজকে সেই পিতার ভূমিকায় দেখিতে পায় এবং সেইজন্যই পিতার প্রতি তাহার নির্জ্জান মনের বিদ্রোহকে সমাজের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া পরিতৃপ্ত করে। এই বয়সে স্কুল পালানোর মধ্যেও ঐ জাতীয় বিদ্রোহের ইঙ্গিত আছে।

মিথ্যা-ভাষণ আর একটি অপরাধ। কিন্তু এই অপরাধটির মধ্যেও আছে নির্জ্জান মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রেরণা। ইহার মধ্যে পাপ ততটা নাই, যতটা আছে মনের ব্যাধির লক্ষণ, একটা অবদমিত কামনার ইতিহাস। এই মিথ্যা-ভাষণগুলিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে মনের গূঢ়েষারই পরিচয় মিলে।

চৌর্য আর একটি অপরাধ। ইহার মধ্যেও নির্জ্জান মনের ক্রিয়া আছে।

যে সমস্ত জিনিস জাতক চুরি করে, অনেক সময়েই তাহা হইতেছে ইপ্সিত যৌন পদার্থের প্রতীক। কাজেই এই জাতীয় চুরিগুলিকে অবদমিত যৌন-লিপ্সা এবং যৌন প্রতীক সংগ্রহের মধ্য দিয়া অতৃপ্ত যৌন-কামনার পরিতৃপ্তির চেষ্টা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

দল বাঁধিয়া গুণ্ডামী করাও শৈশবের আর একটি অপরাধ। ইহার মূলেও আছে অধিশাস্তা মনের বিরুদ্ধে 'ইদ্'-এর বিদ্রোহ। বাল্য কৈশোরের অনেক অবাঞ্ছনীয় বিশেষত্বের মধ্যেই বিদ্রোহটির পরিচয় পাওয়া যায়; ছাত্রদের বইপত্র নোংরা করা, খাতা নষ্ট করা, কালি ছিটাইয়া দেওয়াল অপরিচ্ছন্ন করা—এই সমস্তের মধ্যেও আছে এই বিদ্রোহের প্রেরণা এবং এই সমস্ত বিদ্রোহের অধিকাংশের মধ্যেই আছে আদিম যৌন কামনার বিকল্পবিহীন দাবী।

(৫) এ্যাড্‌লার কিন্তু ফ্রয়েডের মতো এই নিরুদ্ধ যৌন-কামনাকেই অপরাধ-প্রবণতার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে যে শক্তির আকাঙ্ক্ষা (will to power) আছে, সেইটির উপযুক্ত খোরাক না পাওয়া, অথবা ব্যহত হওয়ার জন্য হীনমন্যতাবোধ এবং অসামাজিক উপায়ের এই হীনমন্যতাকে জয় করিবার চেষ্টার মধ্যেই আছে অপরাধপ্রবণতার কারণ।

মিথ্যাভাষণ, চৌর্য প্রভৃতি অপরাধকেও এই এ্যাড্‌লারীর সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। অবশ্য অনেক মিথ্যা-ভাষণের মধ্যেই যে নির্জ্ঞান মনের গূঢ়েষার প্রেরণা আছে, তাহাও স্বীকার করা যায় না; সব মিথ্যাই এই গূঢ়েষার ফল নহে। লোককে তাক্ লাগাইয়া দিবার জন্য যেসব চমক্‌দার নাটকীয় মিথ্যা কথা বলা হয়, নিজের শক্তি-সামর্থ্য-সাহস সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলিয়া চাল দিয়া যে মিথ্যা কথা বলা হয় তাহার মূলে আছে হীনমন্যতার প্রতিবাদ।

আমাদের জীবনের পাপতাপ অনেকখানি কমিয়া যাইত, যদি আমরা নিজের বাহাদুরী প্রচার করিবার জন্য অপরের আত্মসম্মানবোধে আঘাত না করিতাম। অত্যন্ত শিশু বয়সেও আমাদের আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত তীব্র থাকে এবং সেই আত্মসম্মানবোধে আঘাত পাইলে শিশু পরিণামে বেপরোয়া ও অসামাজিক হইয়া উঠে। এই তত্ত্বের উদাহরণ হিসাবে এ্যাডলার বর্ণিত একটি গল্প আছে: একটি বালক দেখিত যে, তাহার মাতাপিতা বাহিরে যাইবার

সময় বাক্স-তোরঙ্গে চাবি দিয়া যাইতেন। সে ভাবিল, মাতাপিতা তাহার সাধুতায় সন্দেহ করিতেছেন। ইহাতে তাহার অপমান বোধ হইল এবং মাতা পিতার আচরণের প্রতিবাদ হিসাবে সে চুরি আরম্ভ করিল। ছয় বৎসর বয়সের চুরির অভ্যাস তাহার কুড়ি বৎসর বয়সেও কাটিল না।

ইতোপূর্বে চুরি সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার কথা বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ্যাডলার বর্ণিত এই চুরিটি সে জাতীয় নহে। ইহার মধ্যে নিরুদ্ধ যৌন-কামনার ইতিহাসও নাই, আর অপহৃত পদার্থগুলিও যৌন-পদার্থের প্রতীক নহে। এ্যাড্‌লার বলেন, আমাদের সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার মূলেই আছে হীনমন্যতার প্রতিবাদ। শৈশবে অপমান বোধ, বাহাদুরী প্রকাশে বাধা পাওয়া, দেহগত তুচ্ছতা বা রিক্ততার অনুভূতি, স্নেহ ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়া—এই সমস্তই শিশুকে পরিণামে সমাজদ্রোহী ও অপরাধপ্রবণ করিয়া তুলে। বাল্য কৈশোরের দুষ্ক্রিয়তার ব্যাপারে জাতকের গৃহ, সঙ্গী-সহচর, সমাজ-পরিবেশ, তাহার দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধি—এই সমস্তের প্রভাবও কম নহে।

(৬) Clifford Shaw দুষ্ক্রিয়তার সহিত সমাজ-পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন, দুষ্ক্রিয়তার মাত্রার সহিত সমাজ-পরিবেশের একটা অনুবন্ধ (correlation) আছে। চিকাগো শহরে রেলপথের ধারে বস্তি কলকারখানা প্রভৃতি অঞ্চলে অপরাধপ্রবণতার আধিক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ বস্তি হইতে স্থায়ী বসতবাটীযুক্ত লোকালয়ের দিকে যতই যাওয়া যায় অপরাধ-প্রবণ বালক-বালিকার সংখ্যা ততই হ্রাস পাইয়া থাকে। সিরিল বার্টও লণ্ডনে অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পরে ফিলাডেল্‌ফিয়া, বোষ্টন, ক্লিভল্যাণ্ড প্রভৃতি শহরেও একই প্রকার তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। William Healey দেখাইয়াছেন, চিকাগো এবং বোষ্টন্ শহরে যত বালক অপরাধের জন্য ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রেই ছিল কুসঙ্গের প্রভাব।

(৭) পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস—দারিদ্র্যও অপরাধ-প্রবণতার একটা কারণ। আমরা কিন্তু দারিদ্র্যকে অপরাধপ্রবণতার প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া মনে করি না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার গুরুদাস, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হইতে এ্যাব্রাহাম্ লিংকন্ পর্যন্ত বহু মহাপুরুষই দরিদ্রের সন্তান ছিলেন।

তবে শহরের যে দারিদ্র্য মানুষকে ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া শিবির জীবন যাপন করিতে বাধ্য করে, যে দারিদ্র্য মানুষের লজ্জা আব্রু কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে খোঁয়াড়ের পশুর জীবনে টানিয়া আনে, যে দারিদ্র্য অভাবের তাড়নায় গৃহকর্তা ও গৃহিণীর মধ্যে কলহ ও অশান্তি লইয়া আসে, সে দারিদ্র্য অনেক সময়েই মানুষের অপরাধপ্রবণতাকেও বাড়াইয়া তুলে।

অপর পক্ষে, দরিদ্রের সংসারে বালক যদি দেখে—মাতাপিতা নীতিধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যাইতেছেন, দুঃখের অন্ন সুখ করিয়া খাইতেছেন, মাতাপিতার মধ্যে মতবিরোধ নাই, ভোগের উদগ্র কামনায় প্রতারণা, চৌর্য প্রভৃতির চেষ্টা নাই, ভাগ্যদেবতা ও ভগবানকে অভিশাপ দেওয়া নাই, বরং পুত্রকন্যার লালনপালনের জন্য দুঃখ বরণ আছে, ত্যাগ আছে, ধৈর্য আছে, আত্মত্যাগ আছে—সেরূপ ক্ষেত্রে দরিদ্রের সংসার বালকদের সচ্চরিত্র গঠনে সহায়কই হইয়া থাকে।

(৮) পারিবারিক শান্তি ও শুচিতা বালকের অপরাধপ্রবণতার একটি বড় প্রতিষেধক এবং ইহার অভাব অপরাধপ্রবণতার একটি বড় কারণ। পারিবারিক অশান্তি বালকের মনোজগতের উপর অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। সমাজতত্ত্ববিদ্ Harnel Hart এবং E. B. Hart দেখাইতেছেন, গৃহের প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গেই বালকবালিকার একটা হৃদয়ের সম্পর্ক আছে, একটা প্রীতির বন্ধন এবং একাত্মতা আছে। কাজেই পারিবারিক অশান্তিতে যে পক্ষই দুঃখ পাক না কেন, সেই দুঃখের অনেকখানি অংশ বালকবালিকার হৃদয়ে আঘাত করে। ফলে আহতের প্রতি একটা অক্ষম সহানুভূতি এবং আঘাতকারীর প্রতি বন্ধ্যা বিবক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বে সে আর্ত হইয়া উঠে। অথচ আঘাতকারীকেও সে আত্মীয় ও প্রীতির কেন্দ্র বলিয়া জানে। এই প্রীতির কেন্দ্রই যদি বিরক্তির কাজ করে, তাহা হইলে মোহভঙ্গের ব্যর্থতা কম পীড়াদায়ক হয় না। এই ব্যর্থতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে কাতর হইয়া বালকের মধ্যে একদিকে যেমন একটা তিক্ততা ও আর্তভাব জাগিয়া উঠে, তেমনই অপর দিকে একটা অক্ষম বিদ্রোহ পুঞ্জিত হইতে থাকে। ফলে, পরিণামে এই বালকেরা বেপরোয়া ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠে।

August Eichhorn নামক একজন ভিয়েনার মনোবিদ্ দেখাইয়াছেন—তাঁহার প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য যতগুলি দুষ্ক্রিয়াসক্ত বালক আসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশের গৃহেই শান্তির আব্‌হাওয়া ছিল না। L. Buta W. Hattwick নামে Winnetka-র আর একজন শিশু-মনোবিদ্ লক্ষ্য করিয়াছেন, যে সকল গৃহে শান্তি ও শৃঙ্খলা আছে, সেই সকল গৃহের বালক-বালিকারা শান্ত, ভদ্র, সহযোগী ও পরমতসহিষ্ণু হয় ; অপর পক্ষে যে সকল গৃহে পারিবারিক শান্তি নাই, সেই সকল গৃহের বালক-বালিকারা হিংসাপ্রবণ, প্রক্রোভী, অসন্তোষপরায়ণ ও পরমত-অসহিষ্ণু হয়। এই বালক-বালিকারা উত্তরকালে দাম্পত্যজীবনে পর্যন্ত নিজেদের মানাইয়া চলিতে পারে না।

সিরিল বার্ট দেখাইয়াছেন, পারিবারিক অশান্তির জন্য যে সমস্ত গৃহে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, অথবা মাতাপিতার মধ্যে একজন পৃথকভাবে বাস করে, তাহাদের পুত্রকন্যারা প্রায়ই দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তাঁহার হিসাবে সমগ্র অপরাধী বালক-বালিকার শতকরা ৫৮ ভাগই আসে সেই সব ক্ষেত্র হইতে যেখানে পারিবারিক অশান্তি সুখের গৃহ-নীড়টি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

(৯) এই গৃহ-শান্তির সহিত প্রয়োজন হইতেছে শৃঙ্খলা এবং পুত্রকন্যার প্রতি মাতাপিতার সহৃদয় মনোযোগ। যে পিতা বাড়ির কোন খবরই রাখিতে চাহেন না, অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া যিনি আনন্দের উদ্দেশ্যে ক্লাব, সভা সমিতি বা সিনেমায় ঘুরিতে থাকেন অথবা আর্থিক স্বাচ্ছল্যের সন্ধানে বাড়ী বাড়ী টিউশানি করিয়া বেড়াইতে থাকেন—পুত্র কন্যার দিকে ফিরিয়া তাকাইবারও সময় পান না অথবা তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও করেন না, তাঁহাদের পুত্রকন্যার ভাল হইবার আশা কম।

(১০) অপর পক্ষে, ভালবাসা ও শৃঙ্খলার আতিশয্যে যাঁহারা প্রতিনিয়তই ছেলের পিছনে পিছনে থাকেন, তাঁহাদের ছেলেমেয়েরাও মানুষ হইবার সুযোগ না পাইয়া প্রায় চিরকালই 'নাবালক' থাকিয়া যায়। এই হিসাবে মাতাপিতার মনোযোগের অভাব পুত্রকন্যার অপরাধপ্রবণতার যত বড় কারণ, মনোযোগের আতিশয্যও তত বড় কারণ। মনোযোগের মত শাসন ব্যবস্থারও একটা মাত্রা থাকা প্রয়োজন। অত্যন্ত কড়া শাসনে বালকবালিকা

দুর্বিনীত ও একগুঁয়ে এবং শিথিল শাসনে অসামাজিক ও অভিমানী হইয়া উঠে।

(১১) স্কুল পাঠশালায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও অপরাধপ্রবণতার মূল অনেকখানি নিহিত আছে। বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্র "সিকুলার" হইয়াছে এবং শিক্ষাব্যবস্থাও "সিকিউলার" ও নৈর্ব্যক্তিক হইয়াছে। শিক্ষকদের রাজনীতি বা ধর্মনীতি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মতামত ছাত্রদের প্রভাবিত না করে, সেইজন্য শিক্ষকদিগকে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পড়াইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার ফলে, শিক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত বা ব্যক্তিগত চরিত্রের স্পর্শ হইতে ছাত্রগণ বঞ্চিত হয়। ক্লাসটি যত বড় হয়, পাঠনব্যবস্থাও ততই ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হইয়া গণকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে, শিক্ষকের আচরণ ততই আনুষ্ঠানিক হইয়া পড়ে। ইহার ফলে পাঁচটি step-যুক্ত 'Herbartian method'-এ অভিজ্ঞ "শিক্ষক-যন্ত্র"টির পরিচয় ছাত্ররা যতটা পায়, "শিক্ষক-মানুষ"টির পরিচয় ততটা পায় না।

ইহা ছাড়া বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে "হাউস্ সিস্টেম্" (house system) পরীক্ষা ব্যবস্থা, আন্তঃক্লাস-খেলাধূলা, স্পোর্টস্ প্রভৃতির মধ্যে প্রতিযোগিতা ব্যাপারে যতটা উৎসাহ দেওয়া হয়, সহযোগিতাকে ততটা উৎসাহ দেওয়া হয় না। অথচ সমাজজীবনে সংঘর্ষ এড়াইয়া বন্ধুভাবে চলিতে হইলে প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতার প্রয়োজন অনেক বেশী। প্রতিযোগিতা রজোগুণাত্মক, ইহা আত্মোন্নতির সহায়ক হইলেও, অনেক সময়েই অসামাজিক ও উত্তেজক কার্যে মানুষকে প্রযুক্ত করে। কিন্তু সহযোগিতা সত্ত্বগুণাত্মক, সমাজের স্থিতি ও শান্তির জন্য ইহার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অথচ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার দিকেই লক্ষ্য করা হয় বেশী। একেই ত বর্তমান শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতাই হইতেছে জীবন-সংগ্রামমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক, তাহাতে প্রত্যেকটি মানুষ অপর মানুষকে প্রতিদ্বন্দী ও সম্ভাব্য শত্রু বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। অপরাধপ্রবণতা বর্তমান সভ্যতার একটা অপ্রতিবিধেয় ভাগ্য-ফল। তাহার উপর শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও সেই প্রতিযোগিতাকে নির্বিচারে উৎসাহিত করিয়া আমরা প্রত্যেক ছাত্রটিকে প্রত্যেকের শত্রু করিয়া অপরাধপ্রবণতাকে বাড়াইয়া তুলিতেছি।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা "সিকুলার" বলিয়া শিক্ষকদের শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ানো এবং তাহার জ্ঞানপরীক্ষা করিবারই অধিকারটুকু দেওয়া হইয়াছে, ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে খবরদারী করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ১০ বৎসর এবং কলেজ শিক্ষায় ৪ বৎসর পাঠাভ্যাসের পর যে ছাত্র স্নাতক হইয়া গৃহে ফিরিল, তাহার চরিত্রের কোনও পরিচয়ই তাহার ডিপ্লোমার মধ্যে পাওয়া গেল না। এই দীর্ঘ ১৪ বৎসরের মধ্যে সেই স্নাতকটি করে কোন্ গরীব দুঃখীকে কতটা দান করিয়াছে, দেশ ও দশের জন্য কতটা আত্মত্যাগ করিয়াছে, সমাজসেবায় কতটা দুঃখ বরণ করিয়াছে, এ ইতিহাস স্নাতকের ডিপ্লোমার মধ্যে পাওয়া যায় না। সে কতবার মিথ্যা কথা বলিয়াছে, অসামাজিক আচরণ করিয়াছে, প্রবঞ্চনা করিয়াছে, মনুষ্যত্বের বিচারে তাহার কতবার "স্খলন-পতন-ত্রুটি" হইয়াছে, এ পরিচয়ও স্নাতকের ডিপ্লোমার মধ্যে লেখা থাকে না। অপর পক্ষে, পড়াশুনায় ভাল হইলেই ভাল চাকরী পাওয়া যায়, মান ও মর্যাদা পাওয়া যায়, সমাজে "ভাল ছেলে" বলিয়া খাতির পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, ছাত্রমহলে "ভাল ছেলে" এই কথাটার অর্থই হইতেছে 'পড়াশুনায় ভাল'; স্বভাব-চরিত্রের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই

এই লাভ-ক্ষতির হিসাব ছাড়াও আর একটি কারণে মানুষ সংযত হয়। ভয়ের জন্য পাপ করিব না, ইহা হইতেছে নিম্নস্তরের কথা। ভাল কাজকে ভালবাসি বলিয়া ভাল কাজ করিব, ইহাই হইতেছে আদর্শের কথা। এই আদর্শের ব্যবস্থা স্কুল কলেজে নাই। বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্গতি ও লাঞ্ছনার মধ্যে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষক ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদের "দিনগত পাপ ক্ষয়ের" অধ্যাপনার মধ্যে আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে আদর্শের অভাবেও ছাত্রদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়া যাইতেছে।

(১২) কৈশোর হইতেছে 'hero worship'-এর যুগ। এই সময়ে তাহারা জীবনের আদর্শ নেতার নির্বাচন করে। কিন্তু আজ সমাজে নৈতিক আদর্শ স্থানচ্যুত হইয়া ভোগ ও প্রতিষ্ঠার আদর্শ বড় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া কিশোর কিশোরীরাও সত্যকারের মহাপুরুষদের পরিত্যাগ করিয়া জনপ্রিয় খেলোয়াড় অথবা নটনটীকেই জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। ইহারা দেখে, এই

নটনটীর দল লক্ষ্মীর অনুগ্রহে সুখে দিন যাপন করে, খবরের কাগজে তাহাদের ছবি প্রকাশিত হয়, লোকের মুখে-মুখে তাহাদের নাম প্রচারিত হয়। আর ইহারই পাশে তাহারা দেখে, একজন দরিদ্র অধ্যাপক হয়ত অন্ন সমস্যার সমাধানে ক্লান্ত হইয়া জীবনে কোনও প্রতিষ্ঠাই অর্জন করিতে পারিল না। কাজেই ঐ অধ্যাপকটির চেয়ে ঐ নটনটীগুলিকেই কিশোর কিশোরীরা 'hero' বলিয়া মনে করে ও তাহাদের জীবনের অনুকরণ করে।

(১৩) Dr. Arnold তাঁহার 'Culture and Anarchy' নামক গ্রন্থে সভ্যতার দুইটি দিক দেখাইয়াছেন—Hellenism বা বুদ্ধি-বিচারের দিক আর Hebraism বা নিষ্ঠার দিক। ইউরোপ এবং এদেশেও মধ্যযুগে মানুষ নিষ্ঠার দিকটিতে বেশী নজর দিয়া "গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের" আবর্তে পড়িয়াছিল এবং বর্তমানে নিষ্ঠার চেয়ে বুদ্ধিকে বড় করিয়া মানুষ "চালাকীসর্বস্ব" হইয়া নিষ্ঠা-আদর্শ প্রভৃতি হৃদয়গত গুণগুলিকে অস্বীকার করিতেছে।

পাশ্চাত্য মনোবিদ্‌গণ এই দিকটিতে তেমন ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন না। তাঁহারা 'I. Q'-এর গৌরবে বিভ্রান্ত হইয়া হৃদয়ের সমৃদ্ধিকে কোনও মূল্যই দিতে চাহিতেছেন না। এই ভ্রান্ত আদর্শের জন্য বর্তমান সভ্যতায় আর এক জাতীয় ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে। আজ আমরা নির্জলা মিথ্যা ভাষণকে বিজ্ঞপ্তির নাম দিয়া 'চল' করিয়া লইয়াছি, অপপ্রচারকে "প্রোপাগাণ্ডা" নাম দিয়া শোধন করিয়া লইয়াছি, অন্যায় যুদ্ধকে 'tactics' নাম দিয়া প্রশস্তি করিতেছি এবং smartness ও প্রগল্‌ভতাকে বুদ্ধি নাম দিয়া সভ্যতার আস্ফালন করিতেছি। কিন্তু যে সভ্যতা মস্তিষ্কের ঐশ্বর্য, হৃদয়ের মাধুর্যকে অস্বীকার করে, অপরাধপ্রবণতা তাহার অনিবার্য ফলমাত্র।

প্রতিকারের উপায়

এই অবস্থার প্রতিকার কি? কি উপায়ই বা অবলম্বনীয়?

অপরাধপ্রবণতার নিদান সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখন এই নিদানসমূহের আলোচনা হইতেই প্রতিকার সম্বন্ধেও কিছু কিছু নির্দেশ পাওয়া যাইতে পারে। তবে এই সম্বন্ধে প্রথম কথা

হইতেছে—"প্রক্ষালনাৎ হি পঙ্কস্য দূরাৎ স্পর্শনং বরম্"। কারণ, দেখা গিয়াছে, দুষ্ক্রিয়তা একবার কাহারও মধ্যে সংক্রামিত হইলে তাহা প্রায় অনারোগ্য ব্যাধির মতই তাহাকে পাইয়া বসে। ফলে সাময়িক ভাবে তাহা সারিয়া যাইলেও, আবার শতকরা ৮৮টি ক্ষেত্রে ইহার পুনরাবৃত্তি হয় এবং ৭০টি ক্ষেত্রে বাল্যের দুষ্ক্রিয়তা পূর্ণ বয়সে নূতন করিয়া দেখা দিয়া থাকে।

(১) দুষ্ক্রিয়াসক্তি জিনিসটা যদি জন্মগত ব্যাপার হয় তাহা হইলে জন্মোত্তর যুগে তাহার আর প্রতিকার নাই।

(২) গ্রন্থির রসক্ষরণের তারতম্যে যদি অপরাধপ্রবণতা আসে, তাহা হইলে তাহারও প্রতিকার আছে। উপযুক্ত চিকিৎসা, এ্যাড্রিনাল্ প্রভৃতি গ্রন্থির রস ইন্‌জেকৃশন প্রভৃতির দ্বারা এবং বিভিন্ন জাতীয় যৌগিক আসন অভ্যাসের দ্বারা এই রসক্ষরণের সমতা বিধান করা যাইতে পারে।

(৩) উনমানসতাজনিত অপরাধপ্রবণতা প্রতিকারের উপায় হইতেছে, এই সমস্ত নির্বোধ বালকদের নজরে রাখা এবং ইহারা যাহাতে বুদ্ধিমান শয়তান জাতীয় বালকদের সংসর্গে মিশিতে না পারে, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

(৪) ফ্রয়েডপন্থীরা এই সমস্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত যুবকদের মনোবিকলন করিয়া তাহাদের নির্জ্ঞান মনের গূঢ়ৈষাকে সজ্ঞান মনের স্তরে ভাসাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। তবে এই ব্যবস্থাটি সকলের অধিগম্য নহে। কারণ, ইহার জন্য যে সময় ও অর্থের প্রয়োজন তাহা সকলের আয়ত্ত নহে।

(৫) এ্যাড্‌লারীয় হীনমন্যতা দুষ্ক্রিয়তার কারণ হইলে তাহার প্রতিকার সহজলভ্য না হইলেও, প্রতিবেধের উপায় খানিকটা আছে। ছাত্রদের পাঠ্য-জীবনে প্রচুর ঐচ্ছিক বিষয়ের সুযোগ দিয়া, 'Extra curricullar activities' প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া, ছাত্রদের বাহাদুরির পথ খুলিয়া দিতে হইবে, তাহাদের আশা-আকাঙ্খাকে সহৃদয়তার সহিত দেখিতে হইবে, তাহাদের আত্ম-সম্মান বোধকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। অবশ্য এ ব্যবস্থা শুধু বিদ্যালয়েরই করিলে চলিবে না!, ছাত্রদের গৃহ-পরিবেশকেও উহার অনুকূল করিয়া তুলিতে হইবে। এই জন্য রাষ্ট্র হইতে প্রত্যেকটি অভিভাবককে সচেতন করিয়া তুলার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসামূলক মনোবিদ্যার

"চেম্বার" সৃষ্টি করিতে হইবে এবং ব্যক্তিগত মনোবিদ্যার ব্যাপক অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার ফলে, আমরা প্রত্যেকটি ছাত্রকে বুঝিতে পারিব, তাহার জীবনের গোপন দ্বন্দ্ব, গোপন ব্যর্থতা, গোপন বিদ্রোহের কারণ জানিতে পারিব। তাহাতে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হইতে পারে।

অপরাধীকে বিশেষ বিশেষ অপরাধী-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেই অবস্থার প্রতিকার সহজে হয় না। আর জেলখানার নির্জন বাস বা নির্যাতনও সহজে অপরাধীকে শান্ত ও ভদ্র করিয়া তুলিতে পারে না। সমাজে বাস করিতে করিতেই যে বালক অসামাজিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন আরও স্নেহপরায়ণ সমাজ-পরিবেশ। বুঝিতে হইবে, স্নেহ ভালবাসার জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াই বালকটি সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সে বিদ্রোহ প্রশমিত করিতে হইলে প্রয়োজন আরও স্নেহ, আরও প্রীতি ও সহানুভূতি এবং মধুরতর সমাজ-পরিবেশ।

(৬) সমাজ-পরিবেশ মন্দ হইলে তাহা হইতে ছেলেদের সাবধানে রাখা সত্যই কষ্টকর এবং আদর্শ সমাজ-পরিবেশের মধ্যে নূতন করিয়া বসতবাটী নির্মাণ করা অথবা পুত্রকন্যাকে আদর্শ পরিবেশে মানুষ করিবার জন্য 'Residential College' প্রভৃতিতে পাঠানও অনেকের পক্ষেই সম্ভব নহে। তবুও বালকবালিকাদের সঙ্গীদের দিকে যদি একটু দৃষ্টি রাখা যায় এবং কুসঙ্গীর প্রভাব হইতে তাহাদের দূরে রাখিলে ভাল ফল হইতে পারে।

(৭-৮) দারিদ্র্য প্রভৃতির প্রতিকার আমাদের অনেকেরই হাতে নাই। তবে গৃহপরিবেশকে খানিকটা শান্তিময় করিয়া তুলিতে আমরা অনেকেই চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। আমাদের দাম্পত্য-জীবন শান্তিময় ও সংঘাত-বিহীন হইলে পুত্রকন্যাদের ভদ্র ও সাধু হইবার সম্ভাবনা অনেকখানি থাকে।

(৯-১০) ইহার পর প্রয়োজন হইতেছে অভিভাবকদের অবহিত হওয়ার। পুত্রকন্যার পালনের দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি তাঁহারা সচেতন ও সুশিক্ষিত হন, অতি শাসন, অতি আদর ও অতি উদাসীনতার আতিশয্যগুলি বর্জন করিয়া তাঁহারা যদি ছেলেমেয়েদের পালন ও শাসনের সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলেও অবস্থার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে।

(১১-১২) বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ছাত্রদের নৈতিক আচরণের রেকর্ড রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের আচরণকে সংযত করা যাইতে পারে এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া সংযত আচরণ করিতে করিতে তাহা ক্রমশঃ চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া যাইতে পারে। তবে পূর্বেই বলা হইয়াছে, শাসনের ভয়ে ছেলেরা অন্যায় কাজ করিবে না, ইহা তেমন বড় আদর্শ নহে। ইহার চেয়ে বড় আদর্শ হইতেছে, ছেলেরা ভাল কাজকে ভালবাসিবে বলিয়াই ভাল কাজ করিবে; এইজন্য প্রয়োজন ভাল কাজ করিবার জন্য প্রবৃত্তি তথা রসবোধ সৃষ্টি করা।

(১৩) বুদ্ধির সঙ্গে নিষ্ঠার ভারসাম্যের অভাবের জন্য যে অপরাধপ্রবণতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন একদল অন্নসমস্যামুক্ত রাষ্ট্র-কর্তৃক দলনিরপেক্ষ ত্যাগী ও আদর্শবাদী সমাজ ব্যবস্থাপকের—যাঁহাদের নিষ্ঠা কোনও প্রলোভনেই বিচলিত হইবে না। যে তপোবন সভ্যতাকে আমরা বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, সেই যুগে সমাজে এইরূপ একদল জ্ঞানতপস্বীর উদ্ভব হইয়াছিল। এই সমস্ত তপোবনচারী অধ্যাপকেরা গৃহী হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগব্রতী ছিলেন। তাঁহারা স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য লইয়া সমাজ হইতে দূরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় দিন যাপন করিতেন। তখনও রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া অনেক হইয়াছে, বণিকের সপ্তডিঙা দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দিয়াছে, নাগরিক সভ্যতা তাহার বিলাস-ব্যসন ও চৌষট্টি কলা লইয়া মাতামাতি করিয়াছে, আর নগর হইতে দূরে থাকিয়া এই সমস্ত সন্ন্যাসী সমস্ত ভোগ, সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত ঐশ্বর্যকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। রাজার জন্য রাজনীতি, যোদ্ধার জন্য ধনুর্বেদ, চিকিৎসকের জন্য আয়ুর্বেদ, ভোগীর কামশাস্ত্র এবং যোগীর জন্য যোগশাস্ত্র ইঁহারাই রচনা করিয়াছেন।

এইরূপ ব্রতধারী-দলকে নূতন করিয়া তৈয়ারী করিতে হইবে। এই জাতীয় ত্যাগী আদর্শবাদী অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় অনুরাগী মহাপুরুষের সংখ্যা অল্প হইলেও, কোন যুগেই ইঁহারা একেবারে বিরল নহেন। সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে এই সমস্ত চিত্তবান লোকদিগকে যদি প্রভূত সম্মান দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের আদর্শকে দেশের কিশোরকিশোরীরা সম্মান করিতে শিখিবে, ইঁহাদের নিকট হইতে পথের নির্দেশ পাইলে, অপরাধপ্রবণতা অনেক কমিয়া যাইবে।

প্রেষণা ও উপযোজন

'নোদনা ও প্রেষণা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি, মনোবিদ্যার ইতিহাসে প্রেষণা (motivation) কথাটির একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে। এই প্রেষণাকে বর্তমান মনোবিদ্‌গণ, বিশেষভাবে আমেরিকার মনোবিদ্‌গণ, মানুষের সমস্ত জটিল কার্যকলাপের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন।

এই প্রেষণার স্বরূপ কি? যে শক্তি প্রাণীদিগকে কর্মে প্রেরণা দেয়, বিশিষ্টভাবে তাহাদিগকে প্ররোচিত করে এবং তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে স্থায়ী (Sustain) করিয়া রাখে, তাহাকেই প্রেষণা বলা হয়।

যাহা আমাদিগকে কর্মে প্রেরণা দেয় তাহাকে অনেক সময় উদ্দীপক (Stimulus) বলা হয়। কিন্তু প্রেষণা ও উদ্দীপক ঠিক এক নহে। কাহাকে হয়ত একটি মশক দংশন করিল। সে তখন তাড়াতাড়ি ঐ দংশনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি চড় মাড়িয়া মশকটিকে হত্যা করিল। এই ক্ষেত্রে এই উদ্দীপকটি ক্ষণিকের মধ্যেই আবির্ভূত হইল এবং ক্ষণিকের মধ্যেই তাহার প্রতিক্রিয়া শেষ হইয়া গেল। এই উদ্দীপককে প্রেষণা বলা যায় না। তাহা হইলে প্রেষণার লক্ষণ কি? যে উদ্দীপককে আমরা প্রেষণা বলিব তাহার লক্ষণ হইতেছে—(১) ইহা খানিকটা স্থায়ী প্রকৃতির হইবে; (২) এই উদ্দীপকটির মধ্যে একটা অস্বস্তিকর কিছু থাকিবে; (৩) এই অস্বস্তির জন্যই এমন একটা কিছু করিতে ইচ্ছা করিবে যাহাতে এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা দূর করা যায়; (৪) এই ইচ্ছার মধ্য দিয়া যে কর্মপ্রচেষ্টার উদ্ভব হইবে তাহা নানাভাবে কার্য করিতে থাকিবে এবং এই কার্যের লীলা যতই বিচিত্র হউক না কেন, তাহা চলিতেই থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই অস্বস্তিকর অবস্থাটি বিদূরিত না হয়।

পরিণত বয়সে মানুষের এই প্রেষণা নানা জাতীয় হইলেও, সেই বিচিত্র প্রেষণার মূল অনুসন্ধান করিলে আমরা কয়েকটি মাত্র শারীরিক কামনার (Craving) সন্ধান পাই। অধ্যাপক Gates এইভাবে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিশ্বাস

গ্রহণের ইচ্ছা, ক্লান্তির সময় বিশ্রামের ইচ্ছা, নিদ্রার ইচ্ছা, শীতের সময় গরম পাইবার ইচ্ছা, অথবা গরমের সময় শীতল হইবার ইচ্ছা, বিশ্রামের পর কার্য করিবার ইচ্ছা, যৌন ইচ্ছা, বিপদের সময় পলায়নের ইচ্ছা, অস্বস্তিকর পরিবেশ হইতে অব্যাহতির ইচ্ছা—এই এগারটি মৌলিক কামনার (cravings) তালিকা দিয়াছেন। এগুলি ছাড়াও, অর্জন করিবার ইচ্ছা, জয়ী হইবার বা প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা, বাধাকে জয় করিবার ইচ্ছা, যুযুৎসা, বশ্যতা, সহানুভূতি পাইবার ইচ্ছা, হত্যা বা ধ্বংস করিবার ইচ্ছা, অপরের দুঃখ প্রশমিত করিবার ইচ্ছা, শিশুদিগকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা, সঙ্গী পাইবার ইচ্ছা ও সামাজিক প্রশস্তি পাইবার ইচ্ছা—এই এগারোটি কামনারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সমস্ত তালিকা দেখিয়া মনে হয়, ম্যাক্‌ডুগালের প্রবৃত্তিবাদকে খণ্ডন করিতে যাইয়া এই সব অধ্যাপকের দল নূতন নামে নূতন করিয়া তাঁহারই মতগুলিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এ যেন মন্দির ধ্বংস করিয়া সেই সমস্ত মালমশলা দিয়াই নূতন মস্‌জিদ্‌ তৈয়ারী করার মত একটা ব্যাপার।

এখানে প্রাচীন ও বর্তমান মনস্তাত্ত্বিকদিগের প্রবৃত্তিবাদ ও বর্তমান মতস্তাত্ত্বিকদিগের প্রেষণাবাদের বিতর্ক আমাদের আলোচ্য নহে। এই প্রেষণা ব্যাহত হইলে মানুষের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়, কিভাবে মানুষ অবস্থার সহিত সন্ধি করিয়া লয়, কিভাবে সে অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সহিত উপযোজন (adjustment) করে, তাহাই বিবেচ্য।

আমরা জানি, আমাদের কামনা বা প্রেষণাগুলি প্রায়ই ব্যাহত বা বিলম্বিত হয়। জীবন ও পরিবেশ যতই জটিল হইবে, সমাজের দাবী যতই বিভিন্নমুখী হইবে, কামনার পরিতৃপ্তি ততই অসুবিধার ব্যাপার হইবে। ছোটখাটো ব্যাপারেও দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের হাল্কা ইয়ার্কির প্রেরণা গুরুজন বা অফিসারকে দেখিলে ব্যাহত হয়, সভাসমিতির গুরুগম্ভীর পরিবেশে হাসি কাশির ইচ্ছা রুদ্ধ হইয়া যায় এবং নিছক ভব্যতার খাতিরেই আমরা "হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি"। এই অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারি না। এই সমস্ত ছোটখাটো ইচ্ছার দীর্ঘস্থায়ী প্রেষণাগুলিও প্রায়ই ব্যাহত হয়। যে সকল কারণে প্রেষণাগুলি ব্যাহত হইতে পারে, মোটামুটি তাহা এই :

(১) বিপরীতধর্মী প্রেষণার সংঘাত, (২) সামাজিক আদর্শ, ধর্মশাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ, (৩) পরিবেশ বা অবস্থাজনিত বাধা।

(১) এক জাতীয় প্রেষণা অন্য আর এক জাতীয় প্রেষণার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। যেমন, বিপদের সময় পলায়নের ইচ্ছা জয়ী হইবার ইচ্ছাকে দমিত করিতে পারে, অর্থোপার্জনের ইচ্ছা আরাম পাইবার ইচ্ছাকে প্রশমিত করে, প্রভুত্বের ইচ্ছা স্নেহ-মমতা প্রভৃতির দ্বারা ব্যাহত হয় ইত্যাদি।

(২) সমাজিক নীতিবোধ বা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধও প্রেষণায় সংঘাত সৃষ্টি করেন যেমন যুযুৎসার সহিত শাস্ত্রীয় অহিংসাবাদ, লোভ বা সংগ্রহ প্রবৃত্তির সহিত সাধুতার দ্বন্দ্ব, প্রেমের সহিত সমাজ ও ধর্মনীতির দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

(৩) দৈহিক, মানসিক, অর্থ নৈতিক বা প্রাকৃতিক অবস্থা বা পরিবেশজনিত বাধা প্রেষণাকে দমন করে ; যেমন—প্লাবন, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির জন্য আমাদের অপত্যবৃত্তির কোমলতা বিনষ্ট হয়, শারীরিক কুশ্রীতার জন্য সামাজিক বাহাদুরী বা আত্মপ্রচারের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ইত্যাদি।

প্রেষণার ব্যাঘাত আমাদের জীবনে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে। বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যাঘাতের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া হয়। প্রেষণা ব্যাহত হওয়ার ফলে যাহারা ক্লান্ত বা বিরক্ত হইয়া পড়ে না, তাহারা ব্যাঘাতকে অগ্রাহ্য করিয়া নূতন উদ্যমে কাজ করিতে আরম্ভ করে এবং বারবার চেষ্টা ও ভ্রান্তির (Trial and error) মধ্য দিয়া হয়ত আকস্মিক-ভাবেই সফলতা লাভ করে। এহ সফলতার আকস্মিক আবিষ্কারটিকে মনোবিদ্যার পরিভাষায় "অভিজ্ঞতা" বা শিক্ষা (learning) বলা হয়।

কিন্তু প্রেষণার বাধাকে জয় করিবার জন্য বারবার চেষ্টা করিবার মত উৎসাহ বা উদ্যম সকলের থাকে না ; অথচ ব্যর্থতার অতৃপ্তিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভোগ করাও সুবিধার ব্যাপার নহে। তখন বাধ্য হইয়াই অনেকে এই ব্যর্থতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া, একটা সন্ধি করিয়া লয়। এই ব্যাপারটিকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় উপযোজন (adjustment) বলা হয়।

প্রেষণার ব্যাঘাতের সহিত এই উপযোজন (Adjustment) মোটামুটি সাতটি উপায়ে হইতে পারে : (১) বাধার নিকট নতি (by Surrender)

স্বীকার দ্বারা, (২) বাধার সহিত সোজাসুজি সংগ্রাম দ্বারা (by direct attack), (৩) বাধা হইতে পলায়ন করিয়া কল্পনার জগতে আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা (by introversion), (৪) যুক্ত্যাভাস দ্বারা (by rationalization), (৫) আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার দ্বারা (by defence or escape mechanism), (৬) প্রতিকল্প প্রয়োগের দ্বারা (by substitute) (৭) অবদমনের দ্বারা (by repression)।

(১) বাধার নিকট নতিস্বীকার করিয়া উপযোজন :

বাধার সহিত যুদ্ধ করাই হইতেছে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া। বাধার নিকট নতিস্বীকার করা শুধু প্রাথমিক দুর্বলতার সূচকমাত্র নহে, ইহা পরিণামে ক্লীবত্বও আনিয়া দেয়। কাজেই বাধাকে নিজের চেয়ে শক্তিমত্তর মনে করিয়া যে ব্যক্তি তাহার নিকট নতিস্বীকার করে, সে অতি দুঃখের মূল্য দিয়াই অতি সামান্য একটা সাময়িক শান্তি ক্রয় করে মাত্র। ইহার ফলে তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠে একটা হীনমন্যতার ভাব। এই হীনমন্যতার ব্যাধি তখন তাহার জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংক্রমিত হয় এবং তাহাকে প্রতিনিয়তই জীবন-সংগ্রামে অক্ষম ও অপটু করিয়া তুলে।

(২) বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া উপযোজন :

বাধার সহিত সোজাসুজি সংগ্রাম করা খুবই ভাল। তবে এই সংগ্রামটি চালাইবার সময় যদি আবেগের মাত্রা বেশী হইয়া যায় তাহা হইলে আমরা "বলীয়সী স্পর্ধা"জনিত দুঃখেরই সৃষ্টি করিয়া বসি। ফলে, যে দুঃখকে জয় করিবার জন্য যুদ্ধের অবতারণা, যুদ্ধের আস্ফালনে সেই দুঃখ আরও চাপিয়া বসে। এই জন্য যুদ্ধের মধ্যে উত্তেজনার উত্তাপের চেয়ে হিসাবীর স্থৈর্য বেশী কার্যকরী হয়। জীবনের কুরুক্ষেত্রে দুঃশাসন বা দুর্যোধনগণের চেয়ে যুধিষ্ঠির-দিগেরই জয়ী হইবার সম্ভাবনা অধিক। শান্ত, সংযত, স্থিতধী যুধিষ্ঠির-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই জীবন-সমস্যার উপযুক্ত সমাধান করিতে পারেন। সতর্ক পরিণামদর্শিতাই শৌর্যের কার্যকরী দিক। ইংরাজীতে "Discretion is the better part of valour." "It is cold steel that cuts"প্রভৃতি প্রবচনগুলি এই জাতীয় তত্ত্বই প্রকাশ করে।

(৩) বাধা হইতে পলায়ন বা অন্তর্বৃত্ততার মধ্য দিয়া উপযোজন :

মানসিক স্থৈর্য না হারাইয়া সংযত ও স্থিরভাবে বাধার সহিত যুদ্ধ করিয়া যাহারা বাধাকে জয় করিতে পারে না, অথচ সহজেই বাধার নিকট নতিস্বীকার করিতেও চাহে না, তাহারা অনেক সময়েই বাস্তব জগৎ হইতে পলায়ন করিয়া কল্পনার জগতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ক্রমশঃই অন্তর্বৃত্ত (introvert) হইয়া পড়ে। এই অন্তর্বৃত্ততার চরম অবস্থায় বাস্তবের কাঠকুড়ানি হয়ত নিজেকে 'রাজার মা' মনে করিয়া বাস্তবের দৈন্যকে কল্পনার প্রাচুর্য দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করে এবং কথাবর্তায় 'রাজার মা'-এর মতই আচরণ করে। এই মেজাজী কাঠ-কুড়ানিকেই সাধারণ লোক পাগল বলিয়া অভিহিত করে। এই পাগল হওয়াটা অবশ্য অন্তর্বৃত্ততার একটা চরম অবস্থা। স্বাভাবিক অবস্থা ও চরম অবস্থার মধ্যে বহু অন্তর্বৃত্ত লোক আছে, যাহারা অস্বভাবী (abnormal) ; ইহারা সকলেই কল্পনা-বিলাসের মধ্য দিয়া জীবনের ব্যর্থতা ও দীনতার মধ্যে একজাতীয় সান্ত্বনা লাভ করে। অন্তর্বৃত্তদের মধ্যে যাহারা একেবারে উন্মাদ বা অস্বভাবী হইয়া পড়ে না, অথচ ঠিক স্বাভাবিক ভাবেও জীবনের বাধা-বিপত্তির সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে না, তাহাদের মধ্যে নানা প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়, যথা—

(ক) **অলীক বাহাদুরের দল**—(Conquering hero type) : যে সমস্ত ব্যক্তি জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া অন্তর্বৃত্ত হইয়া পড়ে তাহাদের মধ্যে অনেকেই কল্পনার সাহায্যে নিজেকে একটা মহাবীর বাহাদুর বলিয়া মনে করে এবং কথাবার্তায় সেই জাতীয় আচরণ করে। এইজন্যই জীবন-সংগ্রামে পরাজিত যুবক তাহার বন্ধুবান্ধবের নিকট গল্প ফাঁদিয়া বসে,তাহার পুরুষত্বের লোভে কত উর্বশী তিলোত্তমার দল পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। এইজন্যই অফিসের ধিক্কৃত কেরানী তাহার সঙ্গীদের নিকট গল্প করে,—কিভাবে সে বড় সাহেবের মুখের উপর কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছে; অকিঞ্চন ভিক্ষুক গল্প করে তাহার অতীত সমৃদ্ধির কথা। "স্ত্রীর কাছে পেগের বড়াই" বলিয়া যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই জাতীয় মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। এই মনোবৃত্তির জন্যই আমরা অনেক সময় ভাবি, মূর্খ জগৎ আমার মূল্য বুঝিতে পারিতেছে না, একদিন হয়ত সে আমার যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিবে। এই

জাতীয় মনোবৃত্তির জন্যই কেহ হয়ত বড়লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব, অভিজাতদের সহিত আত্মীয়তা ও আইনষ্টাইন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত মতানৈক্য প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তৃপ্তিলাভ করে ও আত্মপ্রচার করে।

(খ) **দুঃখবিলাসীর দল** (Suffering hero-type): অন্তর্বৃত্ততার আর একটি দিক আছে। যাহার ফলে মানুষ অকারণে আত্মনিগ্রহ ও দুঃখ-বরণ করে ও শহীদ হইবার চেষ্টা করিয়া এক জাতীয় দুঃখ-বিলাসের দ্বারা সাধারণের সহানুভূতি পাইবার চেষ্টা করে। অসুখের ভাণ করিয়া ভাত খাইতে অস্বীকার করা, সিনেমা থিয়েটার দেখিতে যাইতে রাজী না হওয়া, মেলাতলায় খেলনা বা পুতুল কিনিতে না-চাওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়া ছোট ছোট বালকবালিকারা এই জাতীয় মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। বড় বয়সে শহীদ হইবার জন্য প্রায় অকারণেই বড় বড় দুঃখ বরণ প্রভৃতির মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যটির পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্রা বেশী হইলে এই ভাবটি অস্বভাবী মানসতা বা উন্মত্ততার সৃষ্টি করে। তখন ইচ্ছা করিয়া অসুখের ভাণ করা, আত্মহত্যা করা প্রভৃতিও অসম্ভব হয় না। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের Masochism বা মর্ষকাম অনেকটা এই জাতীয় জিনিস।

(গ) **একাত্মতা** (Identification): অন্তর্বৃত্ততার আর এক জাতীয় বিশেষত্ব হইতেছে প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া বড় বড় লোকের সহিত একাত্মতা অনুভব করা। ইহার ফলে ছোট রোগা রিকেটি ছেলেটি হয়ত টারজনের গল্প শুনিয়া নিজেকে মহাবীর টারজন ভাবিয়া বিছানার বালিশটিকেই একটা দুর্দান্ত সিংহ মনে করিয়া তাহার সহিত কুস্তী আরম্ভ করিয়া দেয় এবং বালিশ ফাঁসাইয়া কাল্পনিক সিংহটিকে হত্যা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে থাকে, এমন সময়ে হয়ত মায়ের তিরস্কার-বাণী শুনিয়া তাহার কল্পনা ভাঙ্গিয়া যায়। এই একাত্মতার ফলেই ছোট ছেলেটি তাহার দাদুর চশমাটি নাকে লাগাইয়া গড়গড়াটি মুখে দিয়া 'পাঁচ মিনিটের কর্তা' হয়, অথবা শনের গোঁফ-দাড়ি বানাইয়া "যখন হবো বাবার মত বড়" যুগের মহড়া দেয়।

(৪) **যুক্ত্যাভাস দ্বারা উপযোজন**:

মানসিক উপযোজন যুক্ত্যাভাসের দ্বারাও হইতে পারে। আমরা আমাদের

স্খলন-পতন-ত্রুটির মধ্যে নিজের অপরাধগুলিকে খানিকটা ক্ষমার চক্ষে দেখিবার জন্য আমাদের বিপক্ষের যুক্তিগুলির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমাদের স্বপক্ষে যাহা কিছু বলা সম্ভব, সেইগুলি বলিয়া নিজেদের হইয়া ওকালতি করি। এই জাতীয় ওকালতির মধ্যে আমরা অনেক সময়েই আমাদের নীচতা বা ক্ষুদ্রতাকে "ক্যামোফ্লেজ" (Camouflage) করিয়া তাহার উপর একটা সম্রান্ত ব্যাখা দিয়া থাকি। পড়াশুনায় অনিচ্ছুক ছাত্র তাহার পাঠে অনিচ্ছার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার জন্য মনে মনে ভাবে "আজ আমি ক্লান্ত, এখন পড়াশুনা করিলে ভাল মনে থাকিবে না, সুতরাং এখন শুইয়া পড়ি, কাল সকালে নব উদ্যমে দ্বিগুণ শক্তিতে কাজ করিব।" আবার পরের দিন সকালেও নূতন নূতন যুক্তি ও অজুহাতের অভাব হয় না। এইভাবেই দিন গড়াইয়া চলে। এই যুক্ত্যাভাসের দ্বারা আমরা নিজের মনকে আঁখি ঠারিয়া ভাবের ঘরে চুরি করিয়া নিজের চক্ষে তথা পরের চক্ষে ধূলা দিয়া নিজেদের অন্যায় কাজের স্বপক্ষে ওকালতি করি। এই যুক্ত্যাভাসের প্রকারভেদ আছে, যেমন—

(ক) **প্রক্ষেপ** (Projection): প্রায়ই আমরা আমাদের পরাজয় ও ব্যর্থতার দোষগুলি অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া একজাতীয় তৃপ্তি লাভ করি। ইহারই প্রভাবে আমরা নাচিতে না জানিলে উঠানের দোষ দিই, ব্যাডমিণ্টন খেলায় shuttle cock 'মিস' করিলে র‍্যাকেটের দিকে অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহার মধ্যে আমাদের ব্যর্থতার কারণের ইঙ্গিত করি, পরীক্ষায় ফেল করিয়া প্রশ্নকর্তা বা পরীক্ষকের উপর দোষ চাপাই, ফুটবল খেলায় রেফারির নিন্দা করি, আফিং মদ প্রভৃতি নেশার দোষের জন্য আত্মীয়বন্ধুকে দোষ দিই।

(খ) **আঙ্গুর টক অজুহাত** (Sour grape mechanism): গল্পে আছে, একটি শৃগাল প্রাংশুলভ্য দ্রাক্ষা ফল লাভ করিতে না পরিয়া 'আঙ্গুরগুলি টক', সুতরাং গ্রহণীয় নয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। এই শৃগালের মত আমরাও অনেক সময়েই আমাদের দুর্লভ সার্থকতাকে তুচ্ছ বা পরিত্যজ্য বলিয়া প্রচার করি। এই জন্যই আমরা দরিদ্র হইয়া বলি, অর্থই অনর্থের মূল; interview-এ অকৃতকার্য হইয়া বলি, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই; প্রেমে ব্যর্থ হইয়া বলি, দাম্পত্য জীবনের চেয়ে আর অভিশাপ নাই।

(গ) **মিঠে লেবু অজুহাত** (Sweet lemon mechanism) : লেবু জিনিসটা খাইতে টক। কিন্তু আমি টক জিনিস খাইতেছি মনে করিয়া পাছে কেহ আমাকে হেয় ভাবে অথবা আমাকে করুণা করে, তাই হয়ত আমি বলিলাম "এই লেবুটি অত্যন্ত মিষ্ট, সুতরাং ইহা খাইয়া আমি ভুলও করি নাই, ঠকিয়াও যাই নাই, আমার বেশ আরামই হইতেছে।" এইভাবেই আমরা অনেক সময় আমাদের পরাজয় বা অগৌরবকে ঢাকিয়া আমাদের বাহাদুরিকে বজায় রাখি। বলা বাহুল্য, এই 'আঙ্গুর টক্', 'লেবু মিষ্ট'—অজুহাতের মধ্যেই একটা পরাজয়ের দিক্ আছে। এই পরাজয়টি তখনই প্রকট হইয়া উঠে, যখন অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ তথাকথিত টক্ আঙ্গুরই মিষ্ট হইয়া উঠে এবং মিষ্ট লেবুর আস্বাদ গ্রহণে আমরা আর আগ্রহ দেখাই না।

(ঘ) **গোঁড়ামি ও বিচার-জড়তা :** এই যুক্ত্যাভাস আমাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারা বা কুসংস্কার ও বিচার-জড়তা আনিয়া দেয়। ইহার ফলে আমরা আমাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলিকেই সযত্নে লালন করি এবং নিরপেক্ষ যুক্তির সমালোচনা হইতে পক্ষপাতিত্বের পক্ষপুটে সেই দুর্বল বিশ্বাস ও ভ্রান্ত-সিদ্ধান্তগুলিকে প্রাণপণে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি। ইহাকেই বেকন (Bacon) সাহেব মিথ্যা-দেবতা (idols) বলিয়াছেন। এই মিথ্যা-দেবতার পূজার গোঁড়ামিতে আমরা সত্য জিনিসটিকে দেখিয়াও দেখিতে পাই না, অন্যের মতবাদ সহ্য করিতে পারি না এবং গুটিপোকা যেমন নিজের তন্তু দিয়া নিজের চারিদিকে বন্ধনের সৃষ্টি করে, সেইভাবে চারিদিকে মিথ্যা অভিমানের প্রাচীর তুলিয়া চোখ বুজিয়া ও কানে আঙ্গুল দিয়া গোঁড়ামির মন্ত্রই জপ করিতে থাকি। আমরা ভাবি, আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান লোক নাই, আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান জাতি নাই, আমরা ঈশ্বরের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ জীবগোষ্ঠী, সুতরাং বাহিরের দুনিয়ার নিকট হইতে আমাদের শিখিবার কিছুই নাই, পাইবার কিছুই নাই। ব্যক্তিগত জীবনে ইহা খুব তীব্র মাত্রায় হইলে এক জাতীয় উন্মত্ততা বা অস্বাভাবিক মানসতার সৃষ্টি হয়, যাহাকে 'dissociation' বা "বিষঙ্গ" বলা হয়।

(৫) আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার দ্বারা উপযোজন ঃ

অনেক সময় অতৃপ্তিকর ঘটনা বা অবস্থা হইতে পলায়ন বা আত্মরক্ষা করিবার জন্য মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই হিষ্টিরিয়া, পক্ষাঘাত, বমন, অন্ধত্ব, বধিরতা, শারীরিক যন্ত্রণা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সমস্ত অসুখগুলি এক দিক দিয়া যেমন তাহাদিগকে কঠোর কর্তব্য হইতে অথবা অবাঞ্ছনীয় অবস্থা হইতে অব্যাহতি দেয়, অপর দিক দিয়া তেমনই কর্তব্য হইতে পলায়নজনিত অনুতাপ বা আত্মগ্লানি হইতেও রক্ষা করে। শুধু তাই নয়, এই অসুখগুলির জন্য জনসাধারণও তাহাদিগকে নিন্দা না করিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ করে।

বিগত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে, বহু লোকেরই পক্ষাঘাত, হিষ্টিরিয়া, অন্ধত্ব প্রভৃতি অসুখ হইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত অসুখের কারণ রোগী বা চিকিৎসকের নিকট অজ্ঞাত ছিল এবং ঔষধ পত্রের দ্বারা তাহা দুশ্চিকিৎস্য ছিল। অনেক সময় হয়ত চিকিৎসার দ্বারা সাময়িক ভাবে এই সমস্ত অসুখগুলি সারিয়া গেলেও, যখনই তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা হইত, সঙ্গে সঙ্গেই আবার অসুখের লক্ষণগুলি এমন ভাবে প্রকাশ পাইত যে, যুদ্ধের কাজ তাহাদের দ্বারা অসম্ভব হইয়া উঠিত। ফলে তাহাদিগকে আবার হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইত। ইহার পর যখন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের ঐ সমস্ত অসুখ সারিয়া গেল। অথচ মজার কথা, ঐ সমস্ত রোগীরা ন্যাকামি করিয়া ঐ সমস্ত অসুখ সৃষ্টি করে নাই।

শুধু সামরিক জীবনেই নয়, বাস্তবের প্রাত্যহিক জীবনেও এই জাতীয় অসুখ বহু ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক Gates এই জাতীয় একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একটি অব্যবস্থিত চরিত্রের আদুরে-গোপাল যুবক একটি অফিসে হিসাব-নবিসী কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই চোখের ভীষণ যন্ত্রণার জন্য তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিতে হইল, তাহার ডান হাতটিও যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িল। কয়েক সপ্তাহ বিশ্রামের পর সে আবার অফিসে যোগদান করিল। আবার ঐ অসুখ তাহাকে নূতন করিয়া আক্রমণ করিয়া তাহাকে কাজের অনুপযুক্ত করিয়া তুলিল। এই

ভাবেই ঐ অসুখের কল্যাণে সে তাহার বিরক্তিকর কাজ হইতে রক্ষা পাইল।

এই অসুখের ইতিহাস কি ? হয়ত কোনওদিন অফিসের কাজ করিতে করিতে সত্য সত্যই তাহার চোখে যন্ত্রণা হইয়াছিল, হয়ত হাতে 'খিল ধরা' জাতীয় একটা কিছু হইয়াছিল। সেদিন হয়ত তাহার সহকর্মী বন্ধুরা তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাকে কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছিল এবং তাহাকে শুষ্ক ও কঠোর কর্তব্য হইতে অব্যাহতি দিয়াছিল। সে হয়ত তখন রোগ যন্ত্রণার দুঃখের মধ্যেও শুষ্ক কর্তব্য হইতে অব্যাহতির জন্য একটা গোপন আনন্দ লইয়াই গৃহে ফিরিয়াছিল। ইহার পর আরম্ভ হইল নির্জ্জান মনের প্রেরণায় সত্যিকারের অসুখ। এই অসুখ তাহাকে কর্তব্য পালনের আত্মগ্লানি হইতে বাঁচাইল, বন্ধুবান্ধবের সমালোচনা হইতে রক্ষা করিল এবং কর্তব্য হইতে অব্যাহতি দান করিল। এক ঢিলে দুইটি নয়, তিন তিনটি পাখী মরিল।

(৬) প্রতিকল্প প্রচেষ্টার দ্বারা উপযোজন ঃ

প্রেষণা ব্যাহত হইলে অনেক সময় আমরা প্রতিকল্প প্রচেষ্টার দ্বারাও তৃপ্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি। অফিসে হয়ত বড়বাবুর উপর ভীষণ রাগ হইল, ইচ্ছা হইল তাহার গালের উপর ঠাস করিয়া একটা চড় কষাইয়া দিই। কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না, ব্যর্থ "বন্ধ্যা" ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ীতে আসিয়াই পানটি হইতে চুনটি খসিতে দেখিয়াই কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিলাম। ছেলেমেয়েকে নির্দয় ভাবে প্রহার করিলাম, স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করিলাম। এই প্রতিকল্প প্রচেষ্টা নানাভাবে নানারূপে ঘটিয়া থাকে। ইহারই প্রভাবে ছোট্ট রোগা যুবকটি নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত একটা পাঠান-সেনাপতির গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর তৈয়ারী করিয়া বসে, "রিকেটি" বালকটি "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" হইবার চেষ্টা করে, পড়াশুনায় অকৃতী বালক ছাত্রনেতা হইয়া হরতাল পরিচালনা করে, এবং হাবা-কালা-কানা-খোঁড়ার দল সোজা পথে ব্যর্থ হইয়া শয়তানির চোরা পথ দিয়া লোকের অনিষ্ট করিয়া সকলকে নিজের বাহাদুরি জানাইয়া দেয়।

এই প্রতিকল্প প্রচেষ্টা যে সব সময়েই খারাপ, এমন নয়। শোকের

প্রতিকল্প হিসাবে আমরা প্রায়ই নেশার আশ্রয় গ্রহণ করি বটে, অথবা জীবনে পরাজয়ের প্রতিকল্প হিসাবে বেপরোয়া চরিত্রহীনতায় গা-ভাসান দিই বটে, আবার অনেক সময় এই প্রতিকল্প হিসাবে ভাল কাজও করি। বিপত্নীক হইয়া অনেকে মদের নেশা না ধরিয়া অসাধারণ কর্মবীর হইয়া উঠে. ব্যর্থ প্রেমিক হইয়া অনেকে লোকোত্তর পণ্ডিত বা অসাধারণ কবি হইয়া উঠে, পারিবারিক অশান্তির ফলে কেহ বা গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া "জগদ্ধিতায়" জীবন উৎসর্গ করিয়া মহাপুরুষ সন্ন্যাসী হইয়া উঠে।

(৭) অবদমনের দ্বারা উপযোজন ঃ

ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্‌গণ বলেন, আমাদের সমস্ত কর্মপ্রেরণার মূলে আছে একটা আদিম জৈবশক্তি, যাহার নাম হইতেছে "লিবিডো" (libido)। লিবিডো হইতেছে আমাদের আদিম জৈব-প্রেরণা, আদিম ভোগের ইচ্ছা, যাহার সমাজনীতি নাই, যুক্তি নাই, সংযম নাই, বন্ধন নাই, ধর্মবোধ নাই, দাবীরও অন্ত নাই। কিন্তু আমাদের অধিশাস্তা (Super-ego) মন বা নীতি-বোধ অনেক সময়েই আমাদের কামনার নিরঙ্কুশ দাবীকে অস্বীকার করে। ফলে আমাদের অনীতিমূলক অনেক কামনাই নীতির শাসনে ধাক্কা খাইয়া মনের সংজ্ঞান স্তর হইতে নামিয়া মনের গভীরে নির্জ্ঞান স্তরে তলাইয়া যায়। এই ব্যাপারটিকে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে অবদমন (Repression) বলে।

মনের সযত্ন-লালিত গোপন অতৃপ্ত কামনাগুলি নীতির শাসনে অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞানের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং স্বপ্নের মধ্য দিয়া, বিচিত্র প্রতীক কল্পনার মধ্য দিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে। জাগ্রত অবস্থাতেও নির্জ্ঞান মনের এই অবদমিত কামনাগুলি বিস্মৃতি, ভয়, মাথাধরা, অবসাদ, স্নায়বিক দৌর্বল্য, পক্ষাঘাত, তোত্‌লামি, কাজে ও পড়ায় ভুল ত্রুটি প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাহাদের গোপন বিদ্রোহের পরিচয় প্রদান করে।

প্রেষণাবাদী আধুনিক মনস্তাত্ত্বিগণ (বিশেষভাবে আমেরিকার মনস্তাত্ত্বিক-গণ) ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান মন, অবদমন প্রভৃতি স্বীকার করেন না। অথচ ফ্রয়েড ও তাঁহার শিষ্যবর্গের বহু পরিভাষা ও বহু তত্ত্বই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যুক্ত্যাভাস, প্রতীক, প্রক্ষেপ, একাত্মতা প্রভৃতি একান্তভাবে ফ্রয়েডীয়

মনোবিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া হীনমন্যতা, প্রতিকল্প প্রচেষ্টা (Defence or Escape mechanism) প্রভৃতি এ্যাড্লারীয় মনোবিজ্ঞান এবং অন্তর্বৃত্ত প্রভৃতি বিষয়গুলি য়্যুঙের মনোবিজ্ঞান হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

মানসিক রোগের চিকিৎসাতত্ত্ব

পূর্বেই দেখান হইয়াছে, আমরা যেভাবে উপযোজন করি, তাহা শুভকরও হইতে পারে, অশুভকরও হইতে পারে। অন্তর্বৃত্ততা, অবদমন প্রভৃতি ছাড়া আমরা যে ভাবে জীবনের বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সন্ধি করিয়া লই, তাহার ফলে অনেক সময়েই আমাদের কার্যকলাপ অস্বভাবী হইয়া পড়ে। এই অস্বভাবী মানসিকতাকে ঠিক অসুখের পর্যায়ে ফেলা না হইলেও, শারীরিক অসুখের মতই এগুলি আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামে অক্ষম ও অপটু করিয়া তুলে। ইহার সত্যিকারের প্রতিকারের জন্য অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই বিষয়ে ফ্রয়েড, এ্যাডলার, য়্যুঙ প্রভৃতির অবদান সামান্য নহে। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে অবশ্য প্রণালীতগত মতভেদ ("ফ্রয়েড্ ও মনঃসমীক্ষণ" নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) কিছু কিছু আছে।

বর্তমান প্রেষণাবাদী মনস্তাত্ত্বিকগণের মতে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাতত্ত্বের মূল কথাটি হইতেছে, রোগীকে re-motivate করা, তাহার প্রেষণাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করানো। তাঁহারা এই re-motivation-এর জন্য যে সমস্ত উপায় নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাকে ফ্রয়েড, য়্যুঙ্, এ্যাড্লার প্রভৃতির মতের সমন্বয় বলা যাইতে পারে। উপায়গুলি মোটামুটি এই : (১) রোগীর অস্বভাবী মানসতার জন্য তাহার জীবনেতিহাসের সন্ধান লইতে হইবে। (২) রোগীকে তাহার রোগের কারণগুলি সহানুভূতির সহিত বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং দেখাইয়া দিতে হইবে, জীবনের বাধাবিঘ্নের সহিত লড়াই করিবার প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও স্থানে একটা কিছু ভুল হইয়াছিল, সুতরাং এই ভুলটি পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে নূতনভাবে কাজ করিতে হইবে এবং (৩) উহার পথ নির্দেশ করিতে হইবে। (৪) রোগীকে এমন একটা কর্মসূচী দিতে হইবে যাহাতে গোড়া হইতেই তাহাকে ব্যর্থ হইতে না হয়। হাল্কা সহজ কাজে বহুবার কৃতকার্য হইয়া আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হইলে ক্রমকঠিন কর্মসূচীতে ধীরে

ধীরে অভ্যস্ত করাইতে হইবে। (৫) রোগীর ব্যক্তিগত জীবন-পরিবেশের আলোচনা করিয়া তাহার জন্য নূতন কর্ম-প্রেরণা দিতে হইবে অর্থাৎ তাহাকে "re-motivate" করিতে হইবে। এই সম্পর্কে নিম্নের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

একটি বালক কিছুতেই লেখাপড়া শিখিতে পারে না। তাহাকে লইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চোখের দোষে তাহার পড়াশুনার অসুবিধা হইতেছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য তাহাকে চোখের ডাক্তারের নিকট লইয়া লইয়া যাওয়া হইল। শারীরিক সাধারণ অসুস্থতার জন্য কিনা, জানিবার জন্য চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করা হইল। বড় বড় শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। কিছুতেই কোনও ফল হইল না। শেষ পর্যন্ত ঘরবাড়ী হইতে বহু দূরে আত্মীয়বান্ধবহীন একটা জায়গায় তাহাকে থাকিতে হইল। এখানে এই নির্বান্ধব প্রদেশে থাকিয়া আত্মীয় বন্ধুদের সহিত যোগাযোগের জন্য চিঠিপত্র লিখিবার প্রয়োজন বালকটি প্রতিনিয়তই অনুভব করিতে লাগিল। এই প্রয়োজনবোধই হইল তাহার লেখাপড়া শিখিবার নূতন প্রেষণা। এই নব প্রেরণায় প্রেষিত হইয়া (re-motivate) শীঘ্রই সে লোখাপড়া শিখিতে পারিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়া রাখা উচিত, যে অবস্থায় আসিলে আমাদের চেতনা অস্বাভাবী মানসতার বা মানসিক ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে, তাহা একদিনে হঠাৎ ঘটে না। অতি শৈশব কাল হইতেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ঠিক ভাবে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া ধীরে ধীরে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বৃদ্ধিলাভ করিয়া শেষে মানসিক ব্যাধিরূপে প্রকট হইয়া উঠে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাধির মূলেই আছে বাল্য বা শৈশবের পালনের দোষ। জীবন-পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্য আমাদের জন্মগত প্রেষনার ব্যাঘাত বা বাধার সন্ধান করিয়া আমরা যদি প্রেষণাকে নূতন পথ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই ঐ ব্যাধি কাটিয়া যাইয়া আমাদের জীবন স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। এইভাবেই বহু দুশ্চিকিৎস্য মানসিক ব্যাধির প্রতিকার হইতে পারে। উহার জন্য প্রয়োজন হইতেছে প্রেষণার রুদ্ধ নির্ঝরিণীর পাষাণ- প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া। বাকী কাজটুকু আপনিই হইয়া যাইবে।

শিক্ষায় পরিসংখ্যান

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিমূলক তত্ত্ব আলোচনাই শুধু হয় না, পরন্তু বুদ্ধি, প্রবণতা দক্ষতা প্রভৃতি নানা ধরনের পরীক্ষা করিয়া উহার সফলাঙ্ক অনুসারে ছাত্রদের সম্ভাবনার হিসাব করিয়া ভবিষৎ জীবনের পথ-নির্দেশও করা হইয়া থাকে। কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রেই নহে, জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এইহেতু বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পরীক্ষার সফলাঙ্কগুলির ব্যাখ্যা করিয়া ("শিক্ষা ও পেশা : পথনির্দেশ" পরিচ্ছেদ, ৪৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মূল্য নিরূপণ করিতে হয়। ইহারই জন্য পরিসংখ্যান তত্ত্বের ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কারণ, রাশিগত তথ্যের মধ্যেও বহু হিসাবের ফাঁকি ও ভুল থাকিতে পারে। সেইজন্য রাশিগত তথ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জন্য পরিসংখ্যান তত্ত্বের প্রয়োজন।

ছোট বড়, কম বেশী, লঘু-গুরু, ভাল মন্দ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা সাধারণতঃ জিনিসের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা পরিচয় হইয়া থাকে। কিন্তু পরিচয়টিকে তুলনামূলকভাবে, অথবা, আরও সূক্ষ্মভাবে দিতে হইলে, জিনিসগুলির পরিমাণ, সংখ্যা, ওজন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে একটা ধারণা লইয়া তাহাদের মান নির্ণয় করা কর্তব্য। কোনও জিনিসের মূল্যমান নির্ণয় করিবার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে, জিনিসটিকে অন্য জাতীয় জিনিস হইতে বাছাই করিয়া লইয়া একটা বিশেষ গুণ অনুসারে একটা শ্রেণী বা দলে সাজাইয়া লওয়া। এইভাবে একদল বালককে উচ্চতা অনুসারে, ওজন অনুসারে, গায়ের রং অনুসারে, পড়াশুনার কৃতিত্ব অনুসারে, নানাভাবেই বাছাই করিয়া মানের ক্রম অনুসারে (Rank order) সাজাইতে পারি এবং প্রত্যেক বালকটি সম্বন্ধে একটা ধারণা ঠিক করিতে পারি। এই 'Rank order' দিয়া একদল মানুষ বা জিনিসের মধ্যে বিশেষ একটি মানুষ বা জিনিসের **ক্রমিক অবস্থান** (Position in the group) বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার গুণ বা কৃতিত্বের সঠিক মাপটি বুঝিতে পারা যায় না। এই "ক্রমিক অবস্থান"-এর

মধ্যে কোনও অনন্যনিরপেক্ষ সার্বজনীন (Absolute) মূল্যমান বা, সর্বজনপরিচিত একক (Unit) নাই। ইহা শ্রেণীগত অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তুলনাসাপেক্ষ।

পরীক্ষা, কৃতিত্ব প্রভৃতি ব্যাপারে "সফলাঙ্ক" (Score) দিয়া পরিমাপের ফলে বড় জোর বলা যায়, রাম অঙ্কে ৯০, শ্যাম ৮৫, যদু ৬২ নম্বর পাইয়াছে। এই সফলাঙ্কের বিচার দু'ভাবে হইতে পারে: (১) একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতটা সফল কাজ হইয়াছে তাহা দেখিয়া। এ ক্ষেত্রে যতটা বেশী নির্ভুল কাজ হইয়াছে, তাহাই হইতেছে কৃতিত্বের মূল্য। (২) একটি নির্দিষ্ট কাজ করিতে মোট কতটা সময় লাগিয়াছে তাহা দেখিয়া। এ ক্ষেত্রে যতটা কম সময়ে কাজটি হইয়াছে, তাহাই হইতেছে কৃতিত্বের মূল্য।

সফলাঙ্কের রাশিগুলিকে যখন একটা নির্দিষ্ট এককে ভাগ করা হয়, তখন তৈয়ারী হয় একটা **স্কেল** (Scale)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শূন্যমান (Zero point) হইতে এই স্কেলের আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ সমান সমাম ছেদ বা পর্ব বহিয়া তাহা উঠিতে থাকে। শীতাতপের বিচারে তাপমান যন্ত্রে 0 সেন্টিগ্রেডে জলের দ্রবণাঙ্ক এবং ১০০ সেন্টিগ্রেডে স্ফুটনাঙ্ক সূচিত হয়। কিন্তু শিক্ষা ও মনোবিদ্যার পরীক্ষাতে স্কেলের এই শূন্যমানটি পাওয়া যায় না।

Physical scale-এর Score-গুলিকে 'Measure' বলে। ইহার বিভিন্ন Score-এর মধ্যে যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি চলে। ফলে, সহজেই বলা যায়, এই Scale-এর ৩০ হইতেছে ১৫-র দ্বিগুণ। কিন্তু মনস্বিতাঙ্ক ও অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক পরিমাপে সহজে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। কারণ, ৬০ মনস্বিতাঙ্ককে ১২০ মনস্বিতাঙ্কের অর্ধেক বলা যায় না। মনস্বিতাঙ্কের ব্যাপারে স্কেলের প্রথম পর্বের মূল্যমান শূন্য নহে। পৃথিবীর নির্বোধতম ব্যক্তির মনস্বিতাঙ্কও হয়ত ২০-এর কম নহে। তাহাও আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় বিভিন্ন প্রকার হইবে। কাজেই এইরূপ ক্ষেত্রে স্কেলের নিম্নতম অঙ্কটি পাওয়া যায় না। অন্যান্য পরিমাপেও এই ব্যাপারটি হয়। স্কুলের বাৎসরিক স্পোর্টস্-এ হয়ত ৩০০টি ছাত্রের উচ্চতা মাপিয়া দেখা গেল, সর্বাপেক্ষা খর্বাকৃতি ছাত্রটি হইল ৪´ ফুট ২"ইঞ্চি আর সকলের চেয়ে লম্বা

ছেলেটি হইল ৬′ ফুট ২″ ইঞ্চি। এক্ষেত্রে ৬′-২″—৪′-২″=২′ ফুট—এই স্কেলের মধ্যবর্তী পর্বগুলির অনুপাত বাহির করা সম্ভব নহে।

চলক (Variable)

একদল বালকের সফলাঙ্কগুলি ঠিক পর-পর বাড়িয়া চলে না। এমন হইতে পারে, একটি ক্লাসের ৫০-টি ছাত্রের মধ্যে গণিতের পরীক্ষায় নিম্নতম সংখ্যা হইল ২০ এবং উচ্চতম সংখ্যা হইল ৭০। এই ২০ হইতে ৭০-এর মধ্যেই সকলের অবস্থান। কিন্তু এমন হইতে পারে না, ঐ ক্লাসে প্রত্যেক ছাত্রটি ২০ হইতে ক্রমশঃ সমানুপাতে বেশী নম্বর পাইবেই। বরং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক যে, দুইটি ছাত্র হয়ত ২০ পাইল, একটি পাইল ২১, তাহার পর খানিকটা ফাঁক থাকিয়া গেল, তাহার পর আর একটি ছাত্র হয়ত পাইল ২৯, পরে পাঁচটি ছাত্র পাইল ৪২, দুইটি ছাত্র পাইল ৫০, তিনটি পাইল ৫৪, এইভাবে লাফাইয়া, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বার বার পুনরাবৃত্ত হইয়া নম্বরগুলি চলিতে থাকে। যে Series-এ নম্বরগুলি লাফাইয়া ডিঙ্গাইয়া চলিতে থাকে, তাহাকে বলা হয় বিচ্ছিন্ন চলক (Discrete series), আর যেখানে ঠিক পর-পর সমান পর্ব বহিয়া নম্বরগুলি চলিতে থাকে, তাহাকে বলা হয় অবিচ্ছিন্ন চলক (Continuous series)।

এই পরীক্ষায় যে পাঁচটি ছাত্র ৪২, দুইটি ছাত্র ৫০, তিনটি ছাত্র ৫৪ পাইল, এইগুলিকে বলা হয় আবৃত্তি বা পরিসংখ্যা (Frequency)। পরিসংখ্যান তত্ত্বে প্রত্যেক সংখ্যাটিকে একটি রাশিশ্রেণীর (Series) অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। একটি পরিসরের (Range) মধ্যে উহার অবস্থান। উল্লিখিত গণিত পরীক্ষায় পরিসর ছিল ২০ হইতে ৭০ অর্থাৎ ৫০। এই পরিসরের এক একটি ধাপ হিসাবে এক একটি নম্বর হইতেছে দূরত্বের একক (Unit distance)। সুতরাং প্রত্যেক সংখ্যাটির একটি উচ্চতর সীমা (Upper limit) এবং নিম্নতর সীমা (Lower limit) থাকে। ঐ সীমার মধ্যস্থলে থাকে মধ্যবিন্দু (Midpoint)।

ধরা যাইতে পারে ৫৪ হইতেছে একটি সংখ্যা। পরিসংখ্যান তত্ত্বের ব্যাপারে ৫৪ সংখ্যাটির অর্থ হইতেছে বিন্দুবাচক (Point of distance) নহে, তাহা

দূরত্ববাচক (Space of distance) অর্থাৎ ৫৪ সংখ্যাটি হইতেছে ৫৩·৫ হইতে ৫৪·৫ এই দূরত্বের একক মাত্র। ইঞ্চির পর্বে গাঁথা একটি স্কুটরুলে এক ইঞ্চি কথাটির অর্থ হইতেছে দুইটী পর্বের দূরত্বের মধ্যবর্তী দূরত্বের মাপটুকু, তাহা বিন্দুতে সীমায়িত নহে, দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত। পরিসংখ্যান তত্ত্বে সমস্ত সংখ্যাকেই ঐরূপ দূরত্বের একক ধরা হয়। লৈখিক চিত্রে এইভাবে দেখানো যাইতে পারে :

ক ———— —৫৪ ———— —খ

৫৩·৫ ←৫৪→ ৫৪·৫

এখানে ক হইতে খ পর্যন্ত দূরত্বের অংশ হইতেছে ৫৪ সংখ্যাটীর দ্যোতক।

অন্যভাবেও সফলাঙ্কের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। Garrett দেখাইয়াছেন, কোনও পরীক্ষায় একটি বালক হয়ত ১৫০ নম্বর পাইয়াছে। এখন ১৫০ এই সফলাঙ্কের অর্থ হইতে পারে, বালকটি ১৫০টি বিষয়ে নির্ভুল উত্তর দিয়াছে। অতএব তাহার কৃতিত্বের মাপ হইতেছে ১৫০ হইতে ১৫১-এর মধ্যবর্তী। এ ক্ষেত্রে ঐ সফলাঙ্কের লৈখিক চিত্র (নিম্নে দ্রষ্টব্য) হইবে ১৫০ এবং ১৫১ এই দুইটি সীমার মধ্যবর্তী ক হইতে খ পর্যন্ত স্থানটুকু।

ক ———— ————|———— ————খ

১৫০ ←১৫০·৫→ ১৫১

পরিসংখ্যা-বিভাজন আবৃত্তির হার (Frequency Distribution) :

পরীক্ষার সফলাঙ্কের ব্যাপারেই হউক, অথবা অন্য কোনও ব্যাপারেই হউক, তথ্যাদির (Data) কোনও মূল্যই থাকে না, যতক্ষণ না ঐ তথ্যগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সজাইয়া গুছাইয়া উপস্থাপিত করা হয়।

সংগৃহীত তথ্য হইতে পরিসংখ্যানগত অর্থ বাহির করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন, সংখ্যাগুলির পরিসর (Range) অর্থাৎ সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ সংখ্যার দূরত্ব নির্ণয় করা। কিভাবে তাহা করিতে হইবে? সর্বোচ্চ সংখ্যা হইতে সর্বনিম্ন সংখ্যাটি বিয়োগ করিলেই এই পরিসংখ্যাটি

পাওয়া যাইবে। ধরা যাইতে পারে, একটি পরীক্ষায় ৫০ জন ছাত্রের সর্বনিম্ন সফলাঙ্ক ১২ এবং সর্বোচ্চ সফলাঙ্ক হইতেছে ৬৩। এই প্রাপ্ত সংখ্যার Range হইতেছে ৬৩—১২ = ৫১।

পর্ব বিভাগ বা উপবিভাগ (Class Interval): এখন দেখিতে হইবে এই ৫১ সংখ্যার Range-টিকে কিভাবে ভাঙ্গিয়া লইলে হিসাবের সুবিধা হয়। ধরা যাইতে পারে, ক্লাসের ৫০টি ছাত্র নিম্নলিখিত নম্বরগুলি পাইয়াছে; যথা—১৯, ১০, ৬৪, ১৭, ১৬, ৩০, ৩৩, ৩১, ৩১, ৩১, ৩০, ৩০, ৩৪ ৫৪, ৫০, ৫১, ৫৭, ৫৭, ৪১, ৪৪, ৫২. ৪৫, ৫৯, ৫৮, ৪০, ৪০, ৪১, ৪২, ২০, ৪৩ ৩৯, ২০, ২২, ২২, ২৪, ৩৫, ৩৬, ৩৬, ৩৬, ৩৬, ৩৮, ৩৬, ৩৮, ৩৮, ২৯, ২৭, ২৭, ২৬, ২৫, ২৫ ; এই সংখ্যাগুলির মধ্যে কোন্ সংখ্যাটি কতজন পাইয়াছে তাহার হিসাব রাখাটা একটা কঠিন ব্যাপার। সুতরাং কাজের সুবিধার জন্য পরিসর-(Range)-টিকে ৮।১০টি ছোট-ছোট পর্বে বা উপবিভাগে ভাঙ্গিয়া লওয়া যায়। এখানে শ্রেণীর সর্বনিম্ন সংখ্যা হইতেছে ১২ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ৬৩; হিসাবের সুবিধার জন্য দেখিতে হইবে ১০ হইতে ১৪ নম্বর কত জন পাইয়াছে, ১৫ হইতে ১৯ কত জন, ২০ হইতে ২৪ কত জন, ইত্যাদি। সংখ্যা বা সফলাঙ্কের এই জাতীয় উপবিভাগগুলির নাম "Class interval" বা "Step interval."

আবৃত্তি (Frequency): এই উপভিাগগুলির সঙ্গে সঙ্গেই আবৃত্তি বা Frequency-র প্রসঙ্গ আসে। ছাত্রদের প্রাপ্ত সংখ্যাগুলির অর্থবোধ করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে কোন্ উপবিভাগে (Class interval) কতজন ছাত্র আছে তাহা নির্ণয় করা। ১২ হইতে ৬৩ এই সফলাঙ্ক হইতে সমগ্র ছাত্রদের খুব বড় একটা নিশানা পাওয়া যায় না। এমন হইতে পারে, ক্লাসের মধ্যে হয়ত ৪০টি ছাত্রই ৩০ এর কম নম্বর পাইয়াছে এবং একটিমাত্র ভাল ছেলে ৬৩ পাইয়াছে। কাজেই ক্লাসের ছাত্রদের কৃতিত্বের পরিমাপ করিবার জন্য দেখিতে হইবে, প্রত্যেক উপবিভাগে কতকগুলি ছাত্র আছে। তখন সফলাঙ্কগত তথ্যগুলিকে এইভাবে সাজান যাইতে পারে—

সফলাঙ্কের উপবিভাগ (Class interval)			আবৃত্তি (Frepuency)
১০—১৪	...	...	১
১৫—১৯	...	...	৩
২০—২৪	...	...	৫
২৫—২৯	...	...	৬
৩০—৩৪	...	...	৮
৩৫—৩৯	...	...	১০
৪০—৪৪	...	..	৭
৪৫—৪৯	...	...	৫
৫০—৫৪	...	...	৪
৫৫—৫৯	...	...	০
৬০—৬৪	...	...	১
		মোট—	৫০

ইহাতে ছাত্রদের সফলাঙ্ক সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার সুবিধা হইবে।

টিক্ দেওয়া (Tally) : ছোটখাট ব্যাপারে আবৃত্তি (Freqency) ঠিক করা কঠিন কাজ নহে। তবে বহু সংখ্যা লইয়া কারবার করিতে হইলে কোন্ উপরিভাগে (Class interval) কত জন আছে, তাহার হিসাবটা গোলমাল হইয়া পাইতে পারে। এই গোলমালটি যাহাতে না হয়, সেইজন্য হিসাবটিকে অভ্রান্ত করিবার জন্য টিক্ দেওয়া (Tally) প্রণালীর আশ্রয় লওয়া হয়। ইহা আর কিছুই নহে, এক একটি রাশি যতবার পুনরাবৃত্ত হইবে, ততবারই তাহার পাশে একটি করিয়া 'টিক' '।' দেওয়া। ইহাতে ।, ॥, ।।।, ।।।। এইভাবে টিক দিয়া পঞ্চম বারে টিক্গুলিকে আড়াআড়িভাবে কাটিয়া দিয়া আবার টিক দিয়া যাইতে হয়। আবার দশম বারে দ্বিতীয় টিকগুচ্ছকেও আড়াআড়ি কাটিয়া দিতে হয়; Class interval-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে কাজ করিতে হইবে। ধরা যাইতে পারে, ১০ হইতে ১৪, ১৫ হইতে ১৯, ২০ হইতে ২৪ প্রভৃতি পূর্বোক্ত রাশিগুলি প্রথমে বামদিকে লিখিত হইল। এইবার আলোচ্য রাশিগুলিকে একে একে পড়িয়া যাইতে হইবে এবং যে রাশিটি

যে বিভাগে যতবার আছে, ততবার টিক্ দিতে হইবে এবং প্রত্যেক পঞ্চম বারে আড়াআড়ি করিয়া কাটিয়া যাইতে হইবে।

মধ্যবিন্দু (Mid point)

পূর্বেই বলা হইয়াছে, পরিসংখ্যানতত্ত্বের রাশিগুলি বিন্দুবাচক নহে, বিস্তৃতিবাচক। কাজেই তাহাদের প্রত্যেকেরই উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা আছে। Class interval-এর ক্ষেত্রে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়ঃ ১০—১৪, ১৫—১৯, ২০—২৪, ২৫—২৯, এই ক্ষেত্রে বুঝা যাইতেছে Class interval-এর বিস্তার হইতেছে ৫; স্থতরাং ইহার মধ্যবিন্দুর দুই দিকে দুইটি করিয়া রাশি আছে, যেমন ১০ হইতে ১৪-র মধ্যবিন্দু হইতেছে ১২; ১৫ হইতে ১৯-এর মধ্যবিন্দু হইতেছে ১৭ ইত্যাদি। এই মধ্যবিন্দু বাহির করিবার সূত্র এইরূপ ঃ

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \text{নিম্নসীমার সংখ্যা} + \frac{\text{উচ্চসীমার সংখ্যা} - \text{নিম্নসীমার সংখ্যা}}{২}$$

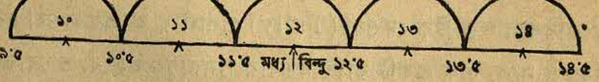
যেমন ১০ হইতে ১৪-র ক্ষেত্রে—

$$১০ + \frac{১৪ - ১০}{২} = ১০ + \frac{৪}{২} = ১০ + ২ = ১২$$

১৫ হইতে ১৯ এর ক্ষেত্রে—

$$১৫ + \frac{১৯ - ১৫}{২} = ১৫ + \frac{৪}{২} = ১৫ + ২ = ১৭ \text{ ইত্যাদি।}$$

১০ হইতে ১৪-র মধ্যবিন্দুর লৈখিক চিত্র নিম্নে দেওয়া হইল ঃ



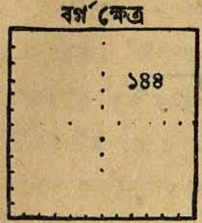
চিত্র নং ১

আবৃত্তি বিভাজনের লেখচিত্র

(Graphic Representation of Frequency Distribution)

রাশিগত তথ্যগুলিকে অনেক সময় ছবি বা লেখচিত্রের সাহায্যেও প্রকাশ করা হয়। ছবির সাহায্যে রাশিগত তথ্যগুলি মূর্তভাবে (Concrete) উপস্থাপিত করা হয় বলিয়া সেগুলি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। "একটি ছবি সহস্র শব্দের সমান" এই কথাটি বাস্তবিক সত্য।

বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র, বহুভূজ, বৃত্ত, পাইচিত্র (Pie chart), লৈখিক চিত্র, ইত্যাদি দ্বারা রাশিগত তথ্যকে নানাভাবে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক, গণিতের পরীক্ষায় রাম এবং শ্যাম ২০০-র মধ্যে যথাক্রমে ১৪৪ এবং ৩৬ পাইল। উহাদের প্রাপ্ত সফলাঙ্কের অনুপাতটি বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র বা পাইচিত্র দ্বারা এইভাবে দেখান যাইতে পারে।



চিত্র নং ২ (রাম)

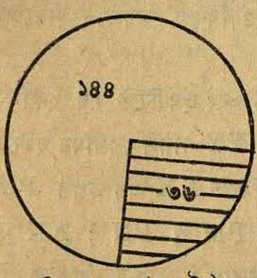


চিত্র নং ৩ (শ্যাম)



চিত্র নং ৪ (শ্যাম)

পরিসংখ্যানতত্ত্বে আবৃত্তি বিভাজনকে (Frquency distribution) চার প্রকার চিত্র দ্বারা বুঝান যায় ; যথা (১) পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon), (২) আয়ত লেখ বা স্তম্ভ (Histogram or Column Diagram), (৩) ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা লেখ (Cumulative Freqnency Graph), (৪) ক্রমযৌগিক শতকরা নির্দেশক রেখা (Cumulative Percentage Graph or Ogive)। উপস্থিত প্রথম দুইটি এক্ষেত্রে আলোচ্য।

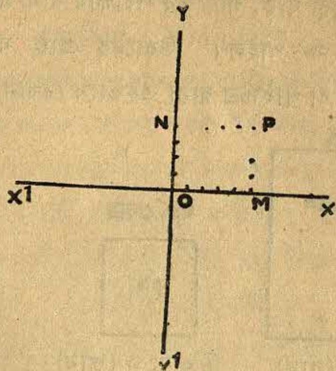


চিত্র নং ৫ (পাই)
রাম = সমগ্র বৃত্ত ; শ্যাম = ডোরা-কাটা বৃত্তাংশ

লেখচিত্র অঙ্কন করিবার সাধারণ নিয়ম (General Principles of Graphic Representation) :

লেখচিত্র (Graph) আঁকিবার জন্য আনুভৌমিক বা আড়াআড়ি (Horizontal) এবং উল্লম্ব বা উপর-নীচের দিকে (Vertical) দুইটি সরলরেখাকে ধরিয়া লইতে হয়। এই রেখা দুইটিকে XX' অক্ষ এবং YY

অক্ষ (Co-ordinate axis) বলা হয়। এই রেখা দুইটি পরস্পরের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। ইহাদের ছেদবিন্দুকে O বা মূলবিন্দু (Origin) বলা



চিত্র নং ৬

হয়। যে কোনও সমতলে আনুভৌমিক ও উল্লম্বরেখা এবং তাহাদের ছেদবিন্দুর সাহায্যে ঐ সমতলে অবস্থিত যে কোনও বিন্দুর অবস্থান সহজেই নির্ণয় করা যায়।

ভুজকোটি ও স্থানাঙ্ক ঃ পূর্ব পৃষ্ঠায় অঙ্কিত ৬নং ছকটিতে যে কোনও একটি বিন্দু P লওয়া হইল। এখন XX´ ও YY´ সরল রেখাদ্বয় হইতে ঐ বিন্দুটির দূরত্ব বাহির করিতে হইবে। P হইতে XX-এর উপর PM এবং YY′-এর উপর PN লম্ব টানা হইল। ইহা PM ও PN´; XX´ ও YY´ অক্ষদ্বয় হইতে P বিন্দুর দূরত্ব প্রকাশ করিতেছে। এই দূরত্বকে P বিন্দুর স্থানাঙ্ক (Co-ordinates) বলা হয়। OM P বিন্দুর X স্থানাঙ্ক বা ভুজ (X Co-ordinate বা Abscissa) এবং PM (বা ON) হইল P বিন্দুর Y স্থানাঙ্ক বা কোটি (Y Co-ordinate বা ordinate)। এ ক্ষেত্রে P বিন্দুর ভুজ = 5 এবং কোটি = 4 একক।

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ভুজ-কোটি ঃ OX ও OY-কে X ও Y অক্ষের ধনাত্মক (Positive) দিক এবং OX′ ও OY′-কে X ও OY অক্ষের ঋণাত্মক (Negative) দিক বলা হয়। O বিন্দু হইতে ডানদিকে যে কোনও

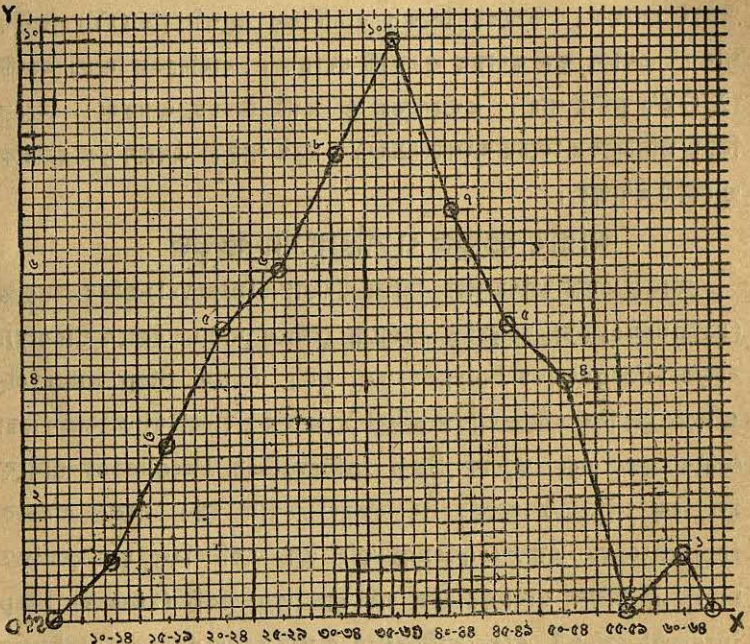
বিন্দুর ভুজ ধনাত্মক এবং বামদিকের যে কোনও বিন্দু ঋণাত্মক। আবার O বিন্দু হইতে উপরের দিকে যে কোনও বিন্দুর কোটি ধনাত্মক এবং নিচের দিকে যে কোনও বিন্দুর কোটি ঋণাত্মক।

পাদ (Quadrant): দুইটি অক্ষ কাগজের সমতলকে চারভাগে বিভক্ত করে। প্রত্যেক অংশটিকে বলে পাদ (Quadrant)। উপরের দিকের ডানদিকের অংশটি (XOY) প্রথম পাদ। এখানে ভুজ ও কোটি উভয়ই ধনাত্মক। উপরের দিকের বামদিকের অংশটি (X'OY) দ্বিতীয় পাদ। এখানে ভুজ ঋণাত্মক ও কোটি ধনাত্মক। বামদিকের নিচের অংশটি (X'OY') তৃতীয় পাদ। এখানে ভুজ ও কোটি উভয়ই ঋণাত্মক। নিচের দিকে ডানদিকের নিচের অংশটি (XOY') চতুর্থ পাদ। এখানে ভুজ ধনাত্মক ও কোটি ঋণাত্মক।

আবৃত্তি-বহুভুজ বা পরিসংখ্যা-বহুভুজ

কোনও একটি রাশিমালার বিভিন্ন বিভাগ-(Interval)-গুলির আবৃত্তি (Frequency)-টা বহুভুজের সাহায্যে দেখানো যায়। ইহাকে পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon) বলা হয়। ইহাতে Step intervel-গুলিকে মূল বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া X অক্ষের পর্ব বহিয়া গণনা করিয়া দেখান হয় এবং প্রত্যেক Step interval-এর Frequency-গুলিকে মূল বিন্দু হইতে Y অক্ষের পর্ব বহিয়া দেখান হয়। ফলে, প্রত্যেক Step interval-এর Frequency-গুলি এক একটি বিন্দু দ্বারা দ্যোতিত হয়। ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্কের ভুজ হইতেছে এক একটি Class বা Step interval-এর পর্ব এবং কোটি হইবে ঐ পর্বের Frequency। এইভাবে প্রত্যেক Step interval-এর Frequency-গুলির দ্যোতক-বিন্দুগুলি স্থাপিত হইবার পর সেই বিন্দুগুলি সরলরেখার দ্বারা যোগ করিলেই একটি বহুভুজ (Polygon) পাওয়া যাইবে। ইহাই হইতেছে পরিসংখ্যা বহুভুজ। ইহাতে সাধারণতঃ মাঝ-বরাবর একটি শৃঙ্গ (Peak বা Mode) থাকে। এইখানেই সর্বাধিক Frequency-গুলি কেন্দ্রীভূত হয়। এই শৃঙ্গের বাম ও ডান দিকে অল্পতর Frequency-গুলি ছড়াইয়া থাকে।

Frequency-গুলি দুই বা তিনটি স্থানে ভিড় করিয়া থাকিলে বহুভুজটিতে দুইটি বা তিনটি শৃঙ্গ থাকিবে। রাশিমালার মধ্যে ভাল, মন্দ, মাঝারির বিপুল মিশ্রণ না থাকিলে অর্থাৎ দলটি বাছাই-করা কৃত্রিম দল হইলে তাহার Frequency polygon-টি দক্ষিণ অথবা বামদিকে হেলিয়া (Skewd) পড়িবে। রাশিমালার Frequency polygon-টি নিম্নে ৭ নং চিত্রে দেখানো হইল :



চিত্র নং ৭

পরিসংখ্যা-বহুভুজ আঁকিবার ব্যবহারিক নির্দেশ এইরূপ :

(১) দুইটি রেখা পরস্পরের সহিত লম্বভাবে অঙ্কন করিতে হইবে উল্লম্ব রেখাটি বামে প্রান্তসীমার দিকে এবং আনুভৌমিক রেখাটি নীচের প্রান্তসীমার কাছাকাছি থাকিবে। O বিন্দুতে ঐ রেখা দুইটি পরস্পর লম্বভাবে মিলিত হইবে। এখন OX হইবে X অক্ষ এবং OY হইবে Y অক্ষ।

(২) X অক্ষ দিয়া Step interval-গুলি সমান সমান পর্বে গুণিয়া যাইতে হইবে। নিম্নতম রাশিযুক্ত Step interval-এর নিম্নসীমা হইতে অর্থাৎ পূর্বতর পর্বের মধ্যবিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর রাশিগুলি পর্বে-পর্বে ডানদিকে দেখাইয়া যাইতে হইবে। উচ্চতম রাশিযুক্ত Interval-এর উচ্চ সীমা পর্যন্ত (অর্থাৎ উচ্চতর পর্বের মধ্যবিন্দু) দেখাইতে হইবে।

(৩) Y অক্ষ বহিয়া প্রত্যেক Interval-এর Frequency-গুলি গুণিয়া যাইতে হইবে। Y স্কেলের একক (Unit) এমনভাবে ঠিক করিতে হইবে যাহাতে উচ্চতম Frequency-র শৃঙ্গটি সমগ্র Figure-এর আড়াআড়ি রেখাটির ৭৫% ভাগ হয়।

(৪) X অক্ষ বহিয়া প্রত্যেক Interval-এর মধ্যবিন্দু হইতে* (কোনও প্রান্তসীমা নহে) ঠিক লম্বভাবে Y-এর দূরত্ব অনুসারে বিন্দু স্থাপন (Plot) করিতে হইবে।

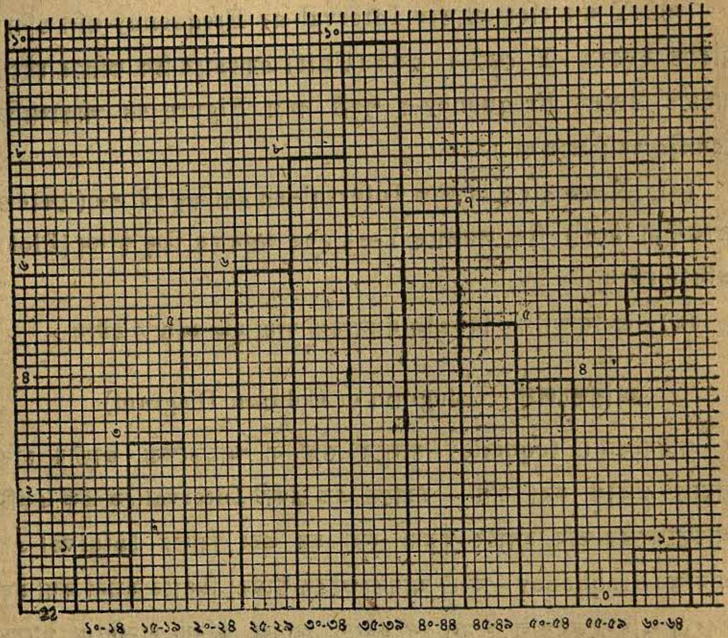
(৫) এবার স্থাপিত বিন্দুগুলি সরলরেখা দ্বারা যুক্ত করিতে হইবে।

আয়তলেখ (Histogram or Column Diagram)

পরিসংখ্যা (Frequency)-গুলিকে স্তম্ভ বা আয়তক্ষেত্র জাতীয় ছবি দ্বারাও প্রকাশ করা যায়। ইহাতে এক একটি Interval-কে এক একটি আয়তক্ষেত্রের ভূমি হিসাবে কল্পনা করা হয় এবং বিভিন্ন Interval-এর আবৃত্তি (Frequency)-কে ঐ আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা হিসাবে কল্পনা করা হয় এবং ঐ আয়তক্ষেত্রগুলিকে মূলবিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া ডানদিকে গায়ে-গায়ে সাজান হয়। Frequency Polygon-এ এক একটি Step interval-এর অন্তর্গত সমস্ত রাশিগুলিকেই সেই Step interval-এর মধ্যবিন্দু দিয়া প্রকাশ করা হয়। কিন্তু Histogram-এর বেলায় ধরিয়া লওয়া হয় যে, ঐ Step interval-এর অন্তর্গত সমস্ত রাশিগুলি ঐ পর্বটুকুর মধ্যে সমানভাবে ছড়াইয়া আছে।

* Frequency Polygon-এর প্রত্যেক Class interval-এর সংখ্যাগুলি দ্যোতিত হয় তাহার মধ্যবিন্দু (Mid-point) দ্বারা।

Histogram-এ এক একটি Interval-এর অন্তর্গত রাশিগুলি এক একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের (Area) সহিত সমানুপাতযুক্ত (Proportional)। এই হিসাবে এক একটি Interval-এর Frequency নির্ধারণের দিক দিয়া Histogram হইতেছে Frequency polygon-এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রণালী। Histogram-এ প্রত্যেক Interval-টি যদিও এক

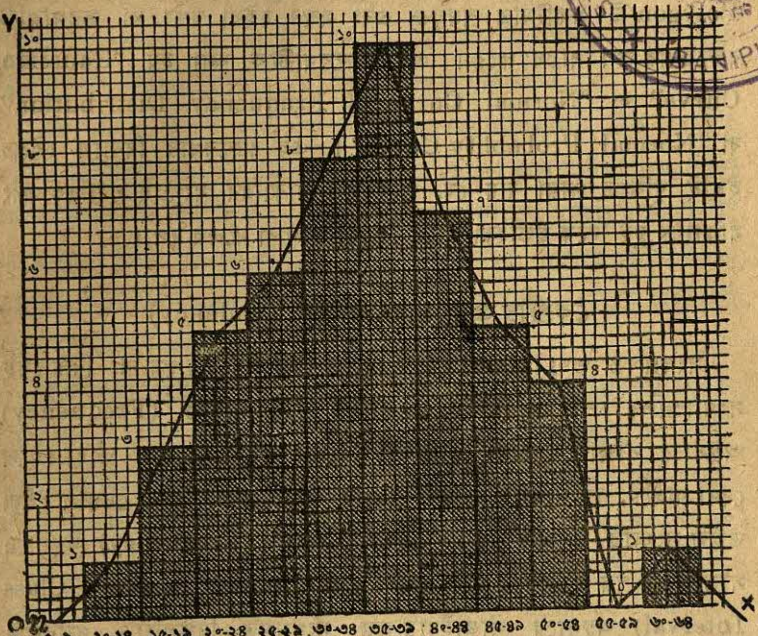


চিত্র নং ৮

একটি আয়তক্ষেত্র দিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেও, সব সময়ে ঐ আয়তক্ষেত্রগুলি পুরাপুরিভাবে আঁকিয়া দেখান হয় না। অনেক সময় শুধু উপরের দিকের স্তম্ভগুলির মাথাগুলিই আঁকিয়া দেখান হয়। উপরের ৮নং চিত্রে প্রদত্ত রাশিমালাকে আয়তলেখ (Histogram) দ্বারা দেখান হইয়াছে।

Step interval-এর Frequency বুঝিবার জন্য 'আয়তলেখ' শ্রেষ্ঠতর প্রণালী হইলেও, Frequency-র সামগ্রিক বিচারে উভয়ই অবশ্য তুল্যমূল্য।

কারণ, 'আয়তলেখ' এবং 'পরিসংখ্যা বহুভুজ' উভয়েরই ক্ষেত্রফল সমানই হয়। একটি প্রদত্ত রাশিমালার পরিসংখ্যা-বিভাজনকে একই চিত্রে আয়তলেখ এবং পরিসংখ্যা বহুভুজ দ্বারাও দ্যোতিত (৯নং চিত্র দ্রষ্টব্য) করা যাইতে পারে।



চিত্র নং ৯

প্রথমে পরিসংখ্যা বিভাজনের আয়তলেখ (Histogram) অঙ্কিত করিয়া তাহার পর ঐ আয়তলেখের আনুভৌমিক (Horizontal) বাহুগুলির মধ্য বিন্দুগুলি বিভিন্ন সরলরেখা দ্বারা সংযুক্ত করিলেই "পরিসংখ্যা বহুভুজ"টি পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, উভয় ক্ষেত্রের কালি (area) সমান। ৯নং চিত্রটি একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, Frequency Polygon-এর রেখাগুলি দ্বারা Histogram হইতে যে ত্রিভুজগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, অনুরূপ ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ততগুলি সর্বসম ত্রিভুজই Frequency Polygon-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

Gaussian Curve: ইতিপূর্বে আলোচিত যে-রাশিমালা Erequency Polygon দ্বারা দ্যোতিত হইয়াছে, তাহা দ্বি-শৃঙ্গযুক্ত-(Bi-modal) এবং খানিকটা অমসৃণ। কিন্তু রাশিমালায় বহুসংখ্যক রাশি থাকিলে এই Polygon-টি একটিমাত্র শৃঙ্গযুক্ত এবং মসৃণ হইয়া ঘণ্টা বা তরঙ্গাকৃতি বক্ররেখার রূপ ধারণ করে। এই বক্ররেখাটিকে বলা হয় "Gaussian Curve" বা "Normal Curve of Fruquency Distribution" বা "Normal Probablity Curve"। এই বক্ররেখার বিন্যাস হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীতে মাঝারির সংখ্যাই সর্বাধিক এবং মাঝারির দুই দিকে ছড়াইয়া আছে কিছুটা ভাল বা মন্দের দল।

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency)

সংখ্যাগত তথ্য (Data) হইতে বিশেষ কিছু অর্থবোধ হয় না, কিন্তু সেই সংখ্যাগুলির পরিসর (Range) বাহির করিয়া আবৃত্তি (Frequency) অনুসারে সাজাইলে তবেই খানিকটা অর্থবোধ হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে সংখ্যাগুলি ছিল সংখ্যার জনতা মাত্র, এখন সেগুলি হইয়া উঠিল সংখ্যার সুশৃঙ্খল ব্যূহ। এইভাবে আবৃত্তি (Frequency) অনুসারে সাজাইবার পর জটিলতার স্থলে শৃঙ্খলা আসিল বটে এবং পর্ব বিভাগ (Class Interval) অনুসারে সাজাইবার জন্য সংখ্যাগত বিপুলতাও খানিকটা সংক্ষেপিত হইল বটে, তাহা হইলেও সংখ্যাগুলিকে ঠিক এক কথায় বুঝিতে পারা যায়, এমন কিছু ব্যবস্থা হইল না। সংখ্যাগুলিকে এক কথায় বুঝাইতে হইলে, সাধারণতঃ আমরা গড় নির্ণয় করিয়া তাহাদের পরিচয় দিয়া থাকি। একটি ক্লাসের বাংলা পরীক্ষায় ৫০টি ছাত্রের মধ্যে বিভিন্ন ছাত্র বিভিন্ন নম্বর পাইল—কেহ ২১, কেহ ৩৭, কেহবা ৮২ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নিম্নতম ২১ অথবা ৮২ উচ্চতম নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রের দ্বারা ক্লাসের ঠিক পরিচয় মিলে না। ক্লাসের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় ছাত্রদের গড় সফলাঙ্কের দ্বারা। ক্লাসের উচ্চতম বা নিম্নতম প্রান্তস্থ ছাত্রদের কৃতিত্ব সাধারণ ছাত্রদের পরিচয় বহন করে না। সে পরিচয়টা পাওয়া যায়, এই উভয় প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রগত

ছাত্রদের কৃতিত্বের মাপে। ইহার মধ্যেই ক্লাসের বিভিন্ন সফলাঙ্কের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বুঝিতে পারা যায়। এই কেন্দ্রীয় প্রবণতা বুঝিবার জন্য পরিসংখ্যান-তত্ত্বের সাহায্য লওয়া হয়ঃ (১) গড় (Average বা mean), (২) মধ্যমান (Median) এবং (৩) সংখ্যাগুরুমান (Mode)।

মধ্যমানঃ ক্রমিক মান-অনুসারে সাজানো রাশিমালার ঠিক কেন্দ্রস্থ মানটি হইতেছে মধ্যমান। একটি ক্লাসে যদি ১১ জন ছাত্র পরীক্ষা দেয়, তাহা হইলে সফলাঙ্কের দিক দিয়া যে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, তাহার সফলাঙ্কটিই মধ্যমান। ইহার উপরে বা নীচের দিকে ঠিক সমান সংখ্যক ছাত্রের (এ ক্ষেত্রে ৫টি করিয়া) সফলাঙ্ক ছাড়াইয়া আছে। সুতরাং মধ্যমান হইতেছে একটা প্রদত্ত রাশিমালার (Series) ঠিক মধ্যবিন্দু।

সংখ্যাগুরুমানঃ ইহা হইতেছে আর একজাতীয় কেন্দ্রীয় প্রবণতার নির্দেশক। একটি রাশিমালার (Series) মধ্যে যে সংখ্যাটি সর্বাপেক্ষা বেশী-বার পুনরাবৃত্ত হয়, তাহাই সংখ্যাগুরুমান। ধরা যাইতে পারে, দশজন ছাত্রযুক্ত একটি ক্লাসে ছাত্রগণের সফলাঙ্ক হইতেছে ৫০ ৫১ ৪২ ৩৭ ৫১ ৪২ ৫৭ ৪২ ২৯ ৩৮। এখানে ৪২ এই সংখ্যাটি সর্বাপেক্ষা বেশীবার আবৃত্ত হইয়াছে। কাজেই ৪২ সংখ্যাটিই হইবে Crude mode বা empirical mode। Frequency polygon বা Histogram-এ এই Mode জিনিসটিই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দ্বারা দ্যোতিত হয়।

গড় (Avevage or Mean)ঃ প্রদত্ত রাশিমালার কেন্দ্রীয় প্রবণতা বুঝিবার সর্বাপেক্ষা সাধারণ উপায় হইতেছে গড় নির্ণয় করা। শুধু যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বুঝিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন, তাহা নহে, কোন একটা বিশেষ সংখ্যার মূল্যমান বুঝিবার জন্যও গড়ের প্রসঙ্গ আসে। নতুবা অন্য-সম্পর্ক-নিরপেক্ষ একটা বিচ্ছিন্ন সংখ্যার বিশেষ কিছু অর্থ হয় না। ধরা যাইতে পারে, নবম শ্রেণীর একটি ছাত্র ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় ইতিহাসে ৪৩ এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় ৪৮ পাইয়াছে। সাধারণ বিচারে স্পষ্ট মনে হইবে, ছাত্রটি উন্নতি করিয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ বলিয়া মনে হয়, ততটা নহে। কারণ, একটু ধীরভাবে ঐ শ্রেণীর সফলাঙ্কগুলি আলোচনা করিলে হয়ত দেখা

যাইবে যাণ্মাসিক পরীক্ষায় ঐ শ্রেণীতে ইতিহাসে উচ্চতম সফলাঙ্ক ছিল ৫৮ এবং গড় সফলাঙ্ক ছিল ৪১ ; কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় ঐ শ্রেণীর উচ্চতম সফলাঙ্ক হইয়াছিল ৮৫ এবং গড় ছিল ৫০। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ ছাত্রটি বাৎসরিক পরীক্ষায় যাণ্মাসিক পরীক্ষার চেয়ে ৫ নম্বর বেশী পাইলেও, সাধারণ ছাত্রের তুলনায় প্রকৃতপক্ষে তাহার অবনতিই হইয়াছে, উন্নতি হয় নাই। এইরূপ ব্যাপার হইতে প্রমাণিত হয় যে, কোনও একটা বিশেষ সংখ্যার কোনও মূল্যমান নাই। একটি বিশেষ সংখ্যাকে বুঝিতে হইলে শ্রেণীর গড়-সংখ্যার সহিত তাহার তুলনা করিতে হইবে। এই গড় নির্ণয় করিবার প্রণালী এইরূপ :

(১) গড় বাহির করিবার সাধারণ নিয়ম হইতেছে একজাতীয় রাশিগুলির সমষ্টিকে তাহাদের সংখ্যা (যত দফা রাশি আছে) দ্বারা ভাগ করা। ধরা যাইতে পারে, একটি ক্লাসের দশটি বালকের ভূগোলের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সফলাঙ্ক হইতেছে ২০, ১৬, ১৭, ১৫, ২৮, ২৪, ২৫, ২৭, ২২ ও ২৬ ; তাহা হইলে ইহাদের গড় হইবে—(২০+১৬+১৭+১৫+২৮+২৪+২৫+২৭+২২+২৬)÷১০=২২০÷১০=২২। সুতরাং এক্ষেত্রে গড় নির্ণয়ের সূত্র হইতেছে—

$$M = \frac{EX}{N}$$

এখানে M = গড়, EX = রাশিগুলির যোগফল, এবং N = ছাত্রসংখ্যা।

(২) গড় নির্ণয়ের দ্বিতীয় প্রণালীটি এইরূপ : প্রথমতঃ রাশিগুলির একটা "আন্দাজী গড়" (Guessed mean) স্থির করা। দ্বিতীয়তঃ এই আন্দাজী গড়ের সহিত প্রত্যেক রাশিটির পার্থক্যটি + অথবা − চিহ্ন দ্বারা দেখানো। তৃতীয়তঃ এই পার্থক্যগুলির যোগফল স্থির করা। চতুর্থতঃ এই যোগফলকে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা।

এই প্রণালীতে পূর্বোক্ত রাশিগুলির গড় এইভাবে সহজেই করা যায় :

ছাত্র (Pupils)	সফলাঙ্ক (Score)	আন্দাজী গড় (Guessed mean)	পার্থক্য (Deviations)
ক	২০	২৪	− ৪
খ	১৬	২৪	− ৮
গ	১৭	২৪	− ৭
ঘ	১৫	২৪	− ৯
ঙ	২৮	২৪	+ ৪
চ	২৪	২৪	+ ০
ছ	২৫	২৪	+ ১
জ	২৭	২৪	+ ৩
ঝ	২২	২৪	− ২
ঞ	২৬	২৪	+ ২
			− ৩০ + ১০ = − ২০

মোট ছাত্রসংখ্যা = ১০

$$\text{সুতরাং}\quad \text{গড়} = ২৪ - \frac{২০}{১০} = ২৪ - ২ = ২২$$

$$\text{এক্ষেত্রে গড় নির্ণয়ের সূত্রটি হইতেছে : } M = A \pm \frac{ED}{N}$$

A = Assumed mean বা আন্দাজী গড়। ED = আন্দাজী গড়ের সহিত প্রত্যেক রাশির পার্থক্যের যোগফল। N = মোট ছাত্রসংখ্যা। M = Mean.

যে-সব ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক রাশি লইয়া কাজ করিতে হয়, সে-সব ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দুই প্রকার প্রণালীতে গড় নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়। একটি নগরীর লোকসংখ্যা হয়ত দুই লক্ষ। এই নগরের লোকের গড়পড়তা আয় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথম প্রণালীটি অর্থাৎ দুই লক্ষ লোকের আয়ের সমষ্টি নির্ণয় করিয়া তাহাকে দুই লক্ষ সংখ্যা দিয়া ভাগ করা প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয় প্রণালীও প্রায় অনুরূপই অসম্ভব। এইজন্য পরিসংখ্যান-তত্ত্বে এই জাতীয় সমস্যার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রণালীতে গড় নির্ণয় করা হয়। সেই প্রণালীটি খানিকটা দ্বিতীয় প্রণালীরই অনুরূপ। ইহার বিভিন্ন পর্বগুলি এইরূপ :

(১) রাশিগুলিকে পর্ববিভাগ (Class interval)-এ ভাগ করিয়া আবৃত্তি (Frequency) অনুসারে সাজাইতে হইবে।

(২) মাঝামাঝি অবস্থিত পর্ববিভাগ-(Class interval)-এর (অর্থাৎ যে Class interval-এ সর্বাপেক্ষা বেশী আবৃত্তি আছে) মধ্যবিন্দুকে "আন্দাজী গড়" (Assumed mean) ধরিয়া লইতে হইবে।

(৩) অতঃপর প্রত্যেক পর্ববিভাগের (Class interval-এর) মধ্যবিন্দু-গুলির পার্থক্য (Deviation) স্থির করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক পার্থক্য-(Deviation in interval unit)-টিকে তাহার সংশ্লিষ্ট আবৃত্তির (Frequency-র) সহিত গুণ করিতে হইবে।

(৫) এই গুণফলের সমষ্টিকে (Algebraic sum) মোট সংখ্যা (ছাত্র-সংখ্যা, অধিবাসী-সংখ্যা, দফা প্রভৃতি) দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। ইহা দ্বারা "c" (Correlation in units class interval) পাওয়া যাইবে।

(৬) এই "c"-কে "i" দ্বারা অর্থাৎ Class interval-এর দৈর্ঘ দ্বারা গুণ করিতে হইবে।

(৭) এইবার আন্দাজী গড়ের সহিত "ci"-কে যোগ (অথবা বিয়োগ) করিলেই প্রকৃত গড়টি বাহির হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে: একটি শ্রেণীতে ২৯টি ছাত্রের ভূগোল পরীক্ষায় সফলাঙ্ক-(Score) হইল ১৬ ২২ ২৪ ১০ ২০ ১৪ ১৪ ১৪ ১৫ ১৮ ১৫ ১২ ২২ ১৮ ১৬ ১৬ ১৩ ৭ ২০ ২১ ৯ ১০ ১৮ ১০ ১৪ ১৬ ২। দেখা যাইতেছে, প্রদত্ত রাশিগুলির মধ্যে নিম্নতম রাশি হইতেছে ২ এবং উচ্চতম রাশি হইতেছে ২৪; সুতরাং ইহাদের পরিসর (Range) হইতেছে ২৪—২ = ২২; এখন এই পরিসর (Range)-টিকে আমরা সুবিধামত ১১টি পর্বে (Class interval-এ) ভাগ করিয়া তাহাদের আবৃত্তি (Frequeucy) অনুসারে সাজাইতে পারি। আলোচ্য ক্ষেত্রে Class interval-এর দৈর্ঘ্য হইতেছে ২; সুতরাং আলোচ্য রাশিগুলির গড় এইরূপ হইবে:

পুনর্বিন্যস্ত রাশিগুলি	আবৃত্তি f	মধ্যবিন্দু	পার্থক্য x	পার্থক্য ও আবৃত্তির গুণলফ fx	
২৩—২৪	১	২৩·৫	+৫	+ ৫	
২১—২২	৩	২১·৫	+৪	+ ১	= +৩৭
১৯—২০	২	১৯·৫	+৩	+ ৬	
১৭—১৮	৪	১৭·৫	+২	+ ৮	
১৫—১৬	৬	১৫·৫	+১	+ ৬	
১৩—১৪	৫	১৩·৫	০	০	
১১—১২	১	১১·৫	—১	— ১	= —২০
৯—১০	৫	৯·৫	—২	—১০	
৭—৮	১	৭·৫	—৩	— ৩	
৫—৬	০	৫·৫	—৪	০	
৩—৪	০	৩·৫	—৫	০	
১—২	১	১·৫	—৬	—৬	
	২৯			fx = ১৭	

এক্ষেত্রে c = ১৭/২৯ = ·৫৮ ; i = ২ সুতরাং ci = ·৫৮ × ২ = ১·১৬

A.M. (বা আন্দাজী গড়) = ১৩·৫

সুতরাং T.M. (বা প্রকৃত গড়) = ১৩·৫ + ১·১৬ = ১৪·৬৬

মধ্যমান (Median) : কতকগুলি রাশিকে ক্রমিক মান অনুসারে সাজাইলে ঠিক কেন্দ্রস্থ রাশিটি হইবে মধ্যমান। ধরা যাইতে পারে, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সাতটি বালক যথাক্রমে ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ৯, ১০ পাইয়াছে। এখানে মধ্যমান হইতেছে ৪র্থ বালকটি অর্থাৎ যে ছেলেটি ৮ পাইয়াছে। প্রতিযোগীর সংখ্যা সাত না হইয়া যদি ছয় হইত, অর্থাৎ বেজোড় না হইয়া জোড় সংখ্যা হইত, তাহা হইলে এই জোড় সংখ্যক রাশিমালার ঠিক কেন্দ্রগত রাশি দুইটির গড় হইবে মধ্যমান ; যেমন ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ৯ ; এখানে মধ্যমান হইবে কেন্দ্রস্থ রাশি দুইটির অর্থাৎ ৭ ও ৮-এর গড় (৭ + ৮) ÷ ২ = ৭·৫।

মধ্যমান বাহির করিবার জন্য কয়েকটি রাশিমালা লক্ষ্য করা হইতেছে :

৭টি সংখ্যার : ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ৯, ১০ = চতুর্থটি অর্থাৎ (৭ + ১)/২ = ৪র্থ রাশিটি মধ্যমান।

৯টি সংখ্যার : ৫, ৬, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ = অর্থাৎ $\frac{৯+১}{২}$ = ৫মটি মধ্যমান।

সুতরাং মধ্যমান বাহির করিবার সূত্র $d = M \frac{N+1}{2}$ তম রাশি।

এখানে Md = median, N = রাশিমালার মোট সংখ্যা।

Continuous series-এ Median এবং Mean-এর মধ্যে মানগত কোনও পার্থক্য থাকে না, অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে যে মানটি Median হইবে, তাহাই ঐ রাশিমালার গড় (Mean) হইবে। কিন্তু Series-টির মধ্যে ফাঁক থাকিলে অথবা Frequency-র পার্থক্য থাকিলে, Mean ও Median এক হয় না। দুই একটি Series লক্ষ্য করিলেই ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যাইবে।

সাতটি রাশির Series :

Continuous series—যেমন ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮
এখানে মধ্যমান ৫, আর গড় (২+৩+৪+৫+৬+৭+৮) ÷ $\frac{৩৫}{৭}$ = ৫
Discrete series—যেমন ২, ৪, ৪, ৫, ৮, ৯, ১০,
এখানে মধ্যমান ৫, আর গড় (২+৪+৪+৫+৮+৯+১০) ÷ ৭ = ৬

নয়টি রাশির Series :

Continuous Series—যেমন ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০
এখানে মধ্যমান ৬ এবং Mean-ও = $\frac{৫৪}{৯}$ = ৬
Discrete series—যেমন ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১২, ১৩,
এখানে Median ৬, কিন্তু mean হইবে $\frac{৬৩}{৯}$ = ৭ ইত্যাদি।

সংখ্যাগুরু মান (Mode) : একটি রাশিমালার মধ্যে যে রাশিটি সর্বাপেক্ষা বেশী বার আবৃত্ত হয়, তাহাকে Crude Mode or Empirical Mode বলা হয়। যেমন ৯, ১০, ১১, ১২, ১২, ১৩, ১৩, ১৩, ১৪, ১৪। এই রাশিমালার ১৩ হইতেছে Crude mode। Continuous Series-এ Frequency-যুক্ত রাশিমালার Mode-এর কোনও প্রসঙ্গই আসে না।

যখন এই রাশিগুলি Class interval অনুসারে সাজান হয়, তখন Crude mode-টি হয় সেই উপবিভাগটির মধ্যবিন্দু যে-উপবিভাগটির Frequency সর্বাধিক। আর True mode একটি Series-এর এমন একটা বিন্দু বা শৃঙ্গ যেখানে রাশিগুলি সব চেয়ে বেশীবার আবৃত্ত।

Crude mode-এর সহিত True mode-এর পার্থক্য আছে কি? আছে। তবে যে-ক্ষেত্রে Scale-টি সুসঙ্গতভাবে সাজান থাকে এবং যেখানে N খুব বেশী হয় সেখানে True এবং Crude mode প্রায়ই এক হইয়া যায়।

Mode বাহির করিবার সূত্রটি এইরূপ: Mode = 3 mdn − 2 mean.

গড়, মধ্যমান, সংখ্যাগুরুমান প্রভৃতির ব্যবহারবিধি সংক্ষেপে এইরূপ:

গড় (mean): (১) কেন্দ্রীয় প্রবণতার সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মান হইতেছে গড়। (২) রাশিমালার অন্তর্গত প্রত্যেক রাশিটির সমান গুরুত্ব দিতে হইলেও গড়-এর প্রয়োজন। তাহা ছাড়া (৩) পরিসংখ্যান তত্ত্বগত অন্যান্য হিসাবের জন্যও অর্থাৎ Standard deviation, Product, moment, Co-efficients of correlation প্রভৃতি বাহির করিবার জন্যও গড় নির্ণয়ের প্রয়োজন।

মধ্যমান (median): (১) তাড়াতাড়ি একটা কেন্দ্রীয় প্রবণতা জানিতে হইলে median ব্যবহার করা বিধেয়। (২) রাশিমালার প্রান্তের দিকে ভারী বা হাল্কা রাশি থাকিলে 'গড়'-এর মানটি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় এবং কেন্দ্র হইতে ভারী সংখ্যার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। সে ক্ষেত্রে medianটি কেন্দ্রীয় অবস্থানটিকে খানিকটা নিভুর্লভাবে বুঝাইয়া দেয়।

সংখ্যাগুরুমান (mode): রাশিমালার মধ্যে যে রাশিটি সর্বাপেক্ষা বেশীবার আবৃত্ত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য mode-এর প্রয়োজন।

পার্থক্য বা ব্যত্যয় (Variablity)

কতকগুলি রাশির কেন্দ্রীয় প্রবণতা দেখিবার জন্য গড় (mean), মধ্যমান (median) বা 'সংখ্যাগুরুমান (mode) এর প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় প্রবণতা হইতেই রাশিগুলির সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা করা যায় না। রাশিগুলি আশেপাশে কিভাবে ছড়াইয়া আছে, তাহা জানিলে রাশিগুলি সম্বন্ধে ধারণাটি আরও সুস্পষ্ট হইবে।

শুধু গড় বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রবণতা দেখিয়া যে কতকগুলি রাশি সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা করা যায় না, তাহা একটু হিসাব করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ধরা যাইতে পারে, দুইটি বিদ্যালয়েই নবম শ্রেণীতে ৫০টি করিয়া ছাত্র

আছে এবং দুইটি স্কুলেই ঐ শ্রেণীতে গণিতের পরীক্ষায় সফলাঙ্কের (score) গড় হইতেছে ৩৫। এই গড়ের হিসাব হইতেই এইটুকুই মনে হইতে পারে যে, এই দুইটি স্কুলেই পড়ানোর সমস্যা এক হইবে; কিন্তু তাহা নাও হইতে পারে। এমন হয়ত হইতে পারে যে, প্রথম স্কুলটিতে উচ্চতম সফলাঙ্ক হইতেছে ৬২ এবং নিম্নতম সফলাঙ্ক হইতেছে ১০, আর দ্বিতীয় স্কুলটিতে উচ্চতম সফলাঙ্ক হইতেছে ৪০ নিম্নতম সফলাঙ্ক হইতেছে ২৮। এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় স্কুলে খুব ভাল ছাত্র না থাকিলেও, এ স্কুলটিতে ছাত্রগণ প্রায় সমজাতীয় (homogeneous), অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে খুব ভাল বা খুব খারাপ ছেলে নাই। ফলে দ্বিতীয় স্কুলটিতে পড়ানোর কাজটা সহজতর হইবে। প্রথম স্কুলটিতে ৬২ নম্বর পাওয়া ছেলেটিকে যে-ভাবে পড়াইলে সে উপকৃত হইবে, ১০ নম্বর পাওয়া ছেলেটি তাহাতে আদৌ উপকৃত হইবে না। আবার ১০ নম্বর পাওয়া পেছিয়ে-পড়া (retarded) ছাত্রটির মত সহজভাবে পড়াইলে ভাল ছেলেটি নূতনত্বের খোরাক পাইবে না। ফলে সে ক্লাসে অমনোযোগী হইবে, অথবা গোলমাল করিবে। প্রথম স্কুলটিতে সফলাঙ্কের range-এর পার্থক্য বেশী বলিয়া সেখানকার ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। দ্বিতীয় স্কুলটিতে কিন্তু এতটা পার্থক্য নাই বলিয়াই সেখানে পড়াইবার সমস্যা কম।

ফলে দেখা যাইতেছে, নিছক গড় বা কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিচারে দুইটি স্কুল একজাতীয় মনে হইলেও, দুইটি স্কুল একজাতীয় নহে। কারণ, প্রথম স্কুলটির ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য (Variability) বেশী; সেখানে সফলাঙ্কের range বেশী, অর্থাৎ অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যাবুদ্ধির ছাত্র সেখানে ছড়াইয়া আছে।

এই পার্থক্য মাপিবার জন্য চারটি উপায় আছে, যথা (১) range বা প্রসার; (২) গড় পার্থক্য (mean deviation); (৩) সমক পার্থক্য (standard deviation) এবং (৫) Quartile deviation.

প্রসার (Range): প্রসার হইতেছে নিম্নতম সফলাঙ্ক হইতে উচ্চতম সফলাঙ্ক সীমারেখার মধ্যবর্তী অংশ। আমাদের উদাহৃত প্রথম বিদ্যালয়টির প্রসার ছিল ৬২—১০ = ৫২ এবং দ্বিতীয়টির প্রসার ছিল ৪০ – ২৮ = ২৮।

এই প্রসার হইতেছে পার্থক্য নির্ণয়ের একটা স্থূল উপায় মাত্র। ইহা দ্বারা আমরা দুইটি চরম প্রান্তের হিসাবটুকুই পাইয়া থাকি। এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে রাশিগুলি ঘেঁসাঘেঁসিভাবে অথবা পাতলা ভাবে ছড়াইয়া অছে, তাহার কেনোও হিসাব ইহার মধ্য হইতে পাওয়া যায় না।

গড় পার্থক্য (average বা mean devitation) :

গড় পার্থক্যের অর্থটি বুঝিতে হইলে প্রথমে Deviation কথাটার অর্থ বুঝিতে হয়। Deviation শব্দের অর্থ হইতেছে পার্থক্য। কাহার সহিত পার্থক্য ? কতকগুলি রাশির মধ্যে যে রাশিটি তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় (representative), তাহার সহিত। এক একটি রাশির তুলনা করিলে কম বা বেশী যেটুকু তফাৎ হয়, তাহাই হইতেছে deviation। এখন প্রশ্ন আসিতে পারে, একদল রাশির মধ্যে সেই দলের কোন্ রাশিটি প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে ? সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় রাশিটি বা কেন্দ্রীয় মানবিশিষ্ট রাশিটি প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। Mean বা Median এই কাজটুকু করিতে পারে।

Mean-কে যখন প্রদত্ত রাশিমালার প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করা হয়, তখন mean হইতে ব্যষ্টিগতভাবে প্রত্যেক রাশিটি কিছু কম বা বেশী হইবে। গণিতশাস্ত্রে ঐ কম বা বেশীকে বিয়োগ বা যোগ চিহ্ন দ্বারা দ্যোতিত করা হয় এবং পার্থক্যের ঋনাত্মক ও ধনাত্মক সংখ্যাগুলির সমষ্টি সমান হয় ; অর্থাৎ তাহাদের যোগফল 0 হয়। যেমন 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 এবং 12—এই সংখ্যাগুলি লক্ষনীয়। ইহাদের গড় হইতেছে $(1+2+3+4+6+7+9+10+12)\div 9$ বা $54\div 9=6$। এই গড় হইতে প্রদত্ত রাশিগুলির পার্থক্য দেখান যাইতেছে—

রাশি		গড় হইতে পার্থক্য
1	—	= −5
2	—	= −4
3	—	= −3
4	—	= −2
		−14

প্রতিনিধি স্থানীয় রাশি বা গড়	6	—	=0
	7	—	=+1
	9	—	=+3
	10	—	=+4
	12	—	=+6
			+14

পরিসংখ্যান তত্ত্বে গড়-পার্থক্য নির্ণয় করিবার উপায় হইতেছে, প্রতিনিধি স্থানীয় রাশি হইতে যোগ-বিয়োগ চিহ্ন নির্বিশেষে deviation-গুলি বাহির করিয়া তাহাদের গড় নির্ণয় করা। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ব্যষ্টিগত রাশিগুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য যদি বেশী হয়, তাহা হইলে mean deviationটি বড় হইবে এবং পারস্পরিক পার্থক্য অল্প হইলে mean-deviationটি ছোট হইবে। এই mean deviation-এর দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইবে, সমস্ত রাশিগুলি কি ভাবে ছড়াইয়া আছে অর্থাৎ সেগুলি কাছাকাছি ঘেঁসাঘেসি করিয়া আছে, অথবা ফাঁক ফাঁক ভাবে ছড়াইয়া আছে।

এই mean deviation-এর মাপটি দুইভাবে হইতে পারে। Mean হইতে অথবা median হইতে পার্থক্য ধরা যাইতে পারে। ৯ জন ব্যক্তির মাসিক আয় হইতেছে ৫০, ৬৮, ৬৫, ৬৫, ৭০, ৭৮, ৯৫ ও ১০০ এবং ১১৬। সুতরাং ইহাদের গড় হইতেছে ৮১, এবং মধ্যমান হইতেছে ৭৮। এক্ষেত্রে mean ও median হইতে পার্থক্য (deviation) গুলি নিম্ন প্রকার হইবে –

mean হইতে	median হইতে
—৩১	—২৮
—১৬	—১৩
—১৬	—১৩
—১১	— ৮
— ৩	০
+ ৯	+১২
+১৪	+১৭
+১৯	+২২
+৩৫	+৩৮
যোগ-বিয়োগ নির্বিশেষে সমষ্টি ১৫৪	যোগ-বিয়োগ নির্বিশেষে সমষ্টি ১৫১

দেখা যাইতেছে, এখানে mean হইতে Average deviation = $\frac{১৫৪}{৯}$ = ১৭$\frac{১}{৯}$ এবং median হইতে average deviation = $\frac{১৫১}{৯}$ = ১৬$\frac{৭}{৯}$

এই জাতীয় উদাহরণ হইতে average deviation-এর সূত্রটি পাওয়া যাইল। যথা— $MD = \frac{E\ 1X1}{N}$

ব্যাখ্যা—EX = রাশিগুলির deviation-এর সমষ্টি। x-এর দুই পার্শ্বেই ॥ এইরূপ চিহ্নটির অর্থ হইতেছে রাশিগুলির যোগবিয়োগ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। N = প্রদত্ত রাশিগুলি সংখ্যা বা দফা।

সমক পার্থক্য : (Standard deviation বা SD)

গড় পার্থক্য ছাড়া আর একটি উপায়ে deviation মাপা হয়। তাহা হইতেছে, সমক পার্থক্য বা Standard deviation. ইহাতে mean হইতে পার্থক্যগুলির বর্গফলের গড় বাহির করিয়া তাহার বর্গমূল বাহির করিতে হয় (S D is the square root of the mean of the squared deviations from the mean)। ধরা যাইতে পারে, ৪, ৬, ৬, ৭, ৯, ১১ এবং ১৩ এই সাতটি রাশির S D বাহির করিতে হইবে।

এখন এই রাশিগুলির mean হইতেছে ৮ এবং ইহাদের deviations হইতেছে : –৪, –২, –২, –১, +১, +৩, +৫। ইহাদের বর্গ ফল হইতেছে : ১৬, ৪, ৪, ১, ১, ৯, ২৫। বর্গফলের গড় হইতেছে (১৬ + ৪ + ৪ + ১ + ১ + ৯ + ২৫) ÷ ৭ = ৮·৫৭১৪

সুতরাং S D হইতেছে $\sqrt{৮\ ৫৭১৪}$ = ২·৯৪

এবং S Dর সূত্র হইতেছে $S D = \sqrt{\frac{En^{2}}{N}}$

সমক পার্থক্যের (S D) সহিত গড় পার্থক্যের (M D) তুলনা

M D বাহির করিবার সময় আমরা যোগ বিয়োগের চিহ্নগুলিকে গ্রাহ্য করি না এবং সমস্ত পার্থক্যগুলিকেই positive বলিয়া মনে করি। কিন্তু SD-র ক্ষেত্রে প্রত্যেক পার্থক্যগুলির বর্গ বাহির করা হয় বলিয়া যোগ বিয়োগের গুরুত্বটা থাকে না।

ইহা ছাড়া S D-র ক্ষেত্রে median বা mode হইতে পার্থক্য ধরা হয় না ; সব সময়েই mean হইতেই পার্থক্যটি ধরা হয়।

Quartile Deviation বা Q

কেন্দ্রীয় মান হইতে পার্থক্য (deviation) নির্ণয় করিবার আর একটি উপায় হইতেছে Quartile deviation বাহির করা। ইহা বাহির করিতে হইলে শুধু median-কেই কেন্দ্রীয় মান বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। আমরা জানি, একটি রাশিমালাকে মানের ক্রম-অনুসারে সাজাইলে ঠিক কেন্দ্রগত রাশিটিকে মধ্যমান (median) বলে। Quartile মাপ হইতেছে এই median হইতে নিম্নতম ও উচ্চতম প্রান্তের অর্ধেক। ফলে, median ও quartile-এর দ্বারা সমস্ত রাশিমালাটি চারটি সমভাবে বিভক্ত হয়। মধ্যমানের দুই পাশের Quartiles-গুলিকে নিম্নতর (lower) এবং উচ্চতর (upper) quartiles বলা হয়।

Quartile হইতেছে সমগ্র রাশিমালার ২৫% অংশ। Q_1 Q_2 Q_3 এবং Q_4 দ্বারা বিভিন্ন Quartile-গুলিকে দ্যোতিত করা হয়। Q_1 হইতেছে প্রথম ২৫% অংশের নিম্ন সীমা পর্যন্ত রাশিমালা ; Q_2 হইতেছে ৫০% এর নিম্ন পর্যন্ত রাশিমালা, Q_3 হইতেছে ৭৫% এর নিম্ন পর্যন্ত রাশিমালা এবং Q_4 হইতেছে ৭৬% হইতে ১০০% পর্যন্ত রাশিমালা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১০৩ জন ছাত্রের একটি দলকে উচ্চতা অনুসারে সাজাইলে নিম্নতর Quartile হইবে ২৬ এবং উচ্চতর Quartile হইবে ৭৮ ; যথা—

১ ২৬ ৫২ ৭৮ ১০৩

The Co-efficient of Variation

অনেক সময় একটা group-এর পার্থক্যের (variation) সহিত অন্য একটা group-এর পার্থক্যের তুলনা করিবার প্রয়োজন হয়। ধরা যাইতে পারে, ১০ বৎসরের বয়সের বালকগণ উচ্চতার দিক দিয়া বেশী variable অথবা ওজনের দিক দিয়া বেশী variable—এই তত্ত্বটি নিরূপন করিতে হইবে।

কি ভাবে তাহা সম্ভব হইবে ? MD SD NQ প্রভৃতি দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যাইবে না। কারণ, বিভিন্ন group-এর MD বা SD উহাদের নিজ নিজ mean হইতে আশপাশের বিভিন্ন রাশিগুলি কি ভাবে ছাড়াইয়া আছে তাহারাই ইঙ্গিত করে। কিন্তু group দুইটির mean অথবা তাহাদের তুলনা করিবার মাপকাঠির একক (unit) এক না হইলে MD বা SD দ্বারা তুলনা করা সম্ভব হয় না। ওজনের সঙ্গে ওজনের কিংবা উচ্চতার সঙ্গে উচ্চতার তুলনা চলে। কিন্তু ওজনের সঙ্গে উচ্চতার তুলনাটা সহজ নয়। তবে এ তুলনাও করা চলে দুইটির variation-এর coefficient দ্বারা। ইহার জন্য প্রয়োজন, দুইটি group-এরই কেন্দ্রীয় প্রবণতার সহিত variability-র অনুপাতটির তুলনা করা। যে unit দিয়াই variability মাপা হউক না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। দুইটি group-এর variability-র সহিত কেন্দ্রীয় প্রবণতার অনুপাত দেখিয়াই তাহাদের তুলনা করা সম্ভব হয়। ইহার প্রচলিত সূত্রটি এই : $V = \frac{100 \times \sigma}{M}$.

এখানে V = coefficient of variation ; σ = SD ; M = mean.

M. garnet-এর একটি উদাহরণ হইতে এই ব্যাপারটা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ধরা যাইতে পারে, একদল ৭ বছরের ছেলেদের উচ্চতার mean হইতেছে ৪৫ ইঞ্চি এবং σ ২.৫ ইঞ্চি ; ইহাদের ওজনের mean হইতেছে ৫০ পাউণ্ড এবং Q বা SD ৬.০ পাউণ্ড। এখন প্রশ্ন, এই দলটি উচ্চতার দিক দিয়া বেশী variable না ওজনের দিক দিয়া ? পাউণ্ডের ওজনের সহিত ইঞ্চির দৈর্ঘ্যের তুলনা সোজাসুজি ভাবে SD-র সাহায্যে হয় না ; কিন্তু দুইটির SD-র সহিত mean-এর ভগ্নাংশের দ্বারা তুলনাটা সম্ভবপর হয়। যথা—

উচ্চতার $\text{Variation} = \frac{১০০ \times ২.৫}{৪৫} = ৫.৬$

এবং ওজনের $\text{Variation} = \frac{১০০ \times ৬.০}{৫০} = ১২$

এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে ওজনের variation-টাই বেশী।

অনুবন্ধ (Correlation)

কোনও ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ের যোগ্যতা একই পর্যায়ের নাও হইতে

পারে। এই জাতীয় যোগ্যতার পারস্পরিক সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যকে পারস্পর্য্য বা অনুবন্ধ বলে। এই অনুবন্ধ সাদৃশ্যমূলক অথবা বৈসাদৃশ্যমূলকও হইতে পারে। একটি বৃত্তের পরিধি তাহার ব্যাসের প্রায় ৩.১৪ গুণ। যে কোনও মাপেরই বৃত্ত হউক না কেন, তাহার ব্যাস ও পরিধির দৈর্ঘ্যের অনুপাতটি ঐ একই থাকিবে। এই জাতীয় অনুবন্ধকে 'সম্পূর্ণ সদর্থক অনুবন্ধ' (Perfect positive Correlation) বলে। ইহার চিহ্ন হইল +১। ইহার ঠিক বিপরীত গুণবিশিষ্ট অনুবন্ধকে 'সম্পূর্ণ নঞর্থক অনুবন্ধ' বলে। তাহার চিহ্ন হইতেছে—১। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে খানিকটা ধারণা হইবে। এখানে রাম, শ্যাম ও যদুর ইংরাজী ও ইতিহাস এবং ইংরাজী ও গণিতের সফলাঙ্কের অনুবন্ধটি দেখান হইতেছে।

সম্পূর্ণ সদর্থক অনুবন্ধ			**সম্পূর্ণ নঞর্থক অনুবন্ধ**		
	ইংরাজী	ইতিহাস		ইংরাজী	গণিত
রাম—	৪০	৪০	রাম—	৪০	৮০
শ্যাম—	৫০	৫০	শ্যাম—	৫০	৫০
যদু—	৮০	৮০	যদু—	৮০	৪০

প্রথম ছকটিতে দেখা যাইতেছে, ইংরাজীর সহিত ইতিহাসের এমন একটি সম্পর্ক আছে যে, যে-ছাত্রটি ইংরাজীতে ভাল হইবে সে ইতিহাসেও ভাল হইবে; আর যে ইংরাজীতে মন্দ সে ইতিহাসেও মন্দ। ইহা সদর্থক অনুবন্ধের লক্ষণ। দ্বিতীয় ছকটিতে দেখা যাইতেছে, যে-ছাত্রটি ইংরাজীতে ভাল সে গণিতে মন্দ এবং যে ছাত্রটি ইংরাজীতে মন্দ সে গণিতে ভাল; ইহা নঞর্থক অনুবন্ধের লক্ষণ। শিক্ষাতত্ত্বে অনুবন্ধ নির্ণয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। একটি ছাত্র ইংরাজীতে ভাল হইলে ইতিহাসে ভাল হইবে কিনা, সঙ্গীতের পারদর্শিতার সঙ্গে গণিতের পারদর্শিতার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা ইত্যাদি ব্যাপারে গবেষণা করিতে হইলে অনুবন্ধ নির্ণয়ের প্রয়োজন। অনুবন্ধ নির্ণয়ের সূত্র হইতেছে:

$$\text{অনুবন্ধ} = \frac{৬ E D^2}{N(N^2-1)}$$

এখানে ED^2 = পার্থক্যের বর্গফলের সমষ্টি। N = দফা

"Rank difference method" দ্বারা সাধারণতঃ এই অনুবন্ধটি নির্ণয় করা হয়। ইহাতে তুল্যমান দুইটি বিষয়ের সফলাঙ্কগুলিকে ১ম ও ২য় স্তম্ভে দেখান হয় ; ৩য় ও ৪র্থ স্তম্ভে যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্তম্ভের ক্রমিক মান (order)-গুলি দেখান হয়। ৫ম স্তম্ভে দুইটি মানের পার্থক্যগুলি (deviation) দেখান হয় এবং ৬ষ্ঠ স্তম্ভে ঐ পার্থক্যগুলির বর্গফল দেখান হয়। বাকী প্রক্রিয়াগুলি উল্লিখিত সূত্র হইতেই বুঝা যাইবে।

ধরা যাক্, গণিত ও ইতিহাসের পরীক্ষায় ৮জন ছাত্রের সফলাঙ্ক হইতেছে গণিতে ১৫, ১৮, ২২, ১৭, ১৯, ২০, ১৬, ২১ এবং ইতিহাসে ৪০, ৪২, ৫০, ৪৫, ৪৩, ৪৬, ৪১, ৪১। ইহাদের কৃতিত্বের অনুবন্ধটি হইবে :

বালকগুলির নাম	গণিতের সফলাঙ্ক	ইতিহাসের সফলাঙ্ক	গণিতে ক্রমিক মান	ইতিহাসে ক্রমিক মান	মানদ্বয়ের পার্থক্য	পার্থক্যের বর্গ
ক	১৫	৪০	৮	৮	০	০
খ	১৮	৪২	৫	৫	০	০
গ	২২	৫০	১	১	০	০
ঘ	১৭	৪৫	৬	৩	৩	৯
ঙ	১৯	৪৩	৪	৪	০	০
চ	২০	৪৬	৩	২	১	১
ছ	১৬	৪১	৭	৬'৫	'৫	'২৫
জ	২১	৪১	২	৬'৫	৪'৫	২০'২৫

$ED^2 = ৩০'৫০$

মোট দফা বা N = ৮

অনুবন্ধটি হইবে— $১ - \frac{৬ \times ৩০'৫০}{৮(৬৪ - ১)} = ১ - \frac{৩০'৫}{৮৪} = ১ - '৩৬ = '৬৪$

এইভাবেই ছাত্রদের প্রাপ্ত সংখ্যার জনতার মধ্য হইতেই ফুটিয়া উঠিবে একটা সম্পর্কবোধের ইঙ্গিত, একটা অনুবন্ধ (correlation)। এই অনুবন্ধের দ্বারাই আমরা বিভিন্ন মাপকাঠি দ্বারা মাপা বিভিন্ন বিষয়ের সফলাঙ্কের (score) মধ্যেও একটা পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিব। ফলে দুইটি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রাশিমালা একটি সাধারণ বন্ধনে ঐক্য-বদ্ধ হইবে।

●

পরিভাষা

abnormal—অস্বভাবী
abreaction—অভিস্ফোট
abstract—বিমূর্ত, বস্তুবিচ্ছিন্ন,
afferent nerve—অন্তর্মুখী স্নায়ু,
adjustment—উপযোজন
after-image—অনুবেদন
attention—অভিনিবেশ
affect—সংবেদন
ambivalence—উভয় বলতা
association—অনুষঙ্গ
behaviourism—আচরণবাদ, চেষ্টিতবাদ,
cathersis—বিরেচন, পরীবাহ
cognition জ্ঞান
complex—গূঢ়ৈষা, জট্
compulsion repetition—অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তি
conation—কর্ম-প্রয়াস
concept—ধারণা
condensation—সংক্ষেপণ
conditioned reflex—কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত
consolidation—অন্তঃপূর্তি
correlation—অনুবন্ধ
double personality—দ্বৈত ব্যক্তিত্ব
deliquency—দুষ্ক্রিয়তা, অপরাধপ্রবণতা
delution—ভ্রান্তি
demantia praecox—চিত্তভ্রংশী বাতুলতা
displacement—অভিক্রান্তি
disposition—স্বভাব
dissociation—বিষঙ্গ
drive—নোদনা
duct gland—সচ্ছিদ্র গ্রন্থি
ductless gland—নিশ্ছিদ্র গ্রন্থি
ego—অহম্
efferent nerve—বহির্মুখী স্নায়ু,
effectors—কর্মেন্দ্রিয়
emotion—প্রক্ষোভ, আবেগ
empathy—সমানুভূতি
engram complex—ছাপ জট্
environment—পরিবেশ, পরিগম
espirtde corps—সংঘচেতনা
evolution—অভিব্যক্তি, বিবর্তন
extrovert—বহির্বৃত্ত, বহির্মুখী
feeble-minded—ঊনমানস
fixation—সংবন্ধন
fore-concious or precons-cious—আসংজ্ঞান
functionalism—ক্রিয়াবাদ
germ plasm—বীজপঙ্ক
group test—সংঘাভিক্ষণ, গণমাপক
hallucination—মায়া, অমূল প্রত্যয়
hormy—জীবন-প্রয়াস
heuristic method—আবিষ্কার প্রথা
hypostatization—নিছক কল্পনার বস্তু
hypothesis—প্রকল্প
idea—ভাব
identification—ঐকাত্ম্য
idiot—জড়ধী
illusion—অধ্যাস

immediate memory—তাৎক্ষণিক স্মৃতি
impulse—আক্ষেপ
incentive—প্রয়োজক
inferiority complex—হীনমন্যতা,
insight—অন্তর্দৃষ্টি
instinct—প্রবৃত্তি, বৃত্তি
interest—আগ্রহ
intelligence quotient—মনস্বিতাংশ, বুদ্ধ্যঙ্ক
introvert—অন্তর্বৃত্ত, অন্তর্মুখী
latency period—অনুপক্রমকাল
libido—কাম শক্তি
laboratory—প্রয়োগশালা
make believe—কল্পনা বিলাস,
masochism—মর্ষকাম
master-sentiment—অধিরাজ রস বা অধিরাজ সংস্কার
mimesis—অন্ধ (নির্জ্ঞান) অনুকরণ
mneme—সংরক্ষণ প্রয়াস
motivation—প্রেষণা
motor nerve—কর্মবহা স্নায়ু
narcissism—স্বকাম
neurosis—উদ্বায়ু
neurone—স্নায়ু কোষ
parallelism—সহচারবাদ
play-way—ক্রীড়াচ্ছল
projection—প্রক্ষেপ
rationaliasiion—যুক্ত্যাভাস
receptors—অনুভূতি গ্রহণের যন্ত্র
reflex action—প্রতিবর্তক ক্রিয়া
regression—প্রত্যাবৃত্তি
regressive—পশ্চাম্মুখী
repetition ccmpulsion—অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তি
response—সাড়া, প্রতিক্রিয়া
repression—দমন, রোধন
retention—সংরক্ষণ
sadism—ধর্ষকাম
score—সফলাঙ্ক
secondary elaboration—অনুযোজনা
self-assertion—আত্মবিস্তার
sensori nerve—জ্ঞানবহা স্নায়ু
sensori motor reaction—সংবেদ-চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া
sensation—ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি, সংবেদন
sentiment—রস, রসবোধ, সংস্কার
stimulus—উদ্দীপক
structuralism—অবয়ববাদ
sublimation—উৎকর্ষণ, উদ্গতি
symbolization—প্রতীক পরিণতি
super-ego—অধিশাস্তা
sympathy—সহানুভূতি
synthesis—সংশ্লেষণ
temperament—আয়ান
transference—সংক্রমণ
tropism—আভিমুখ্য
unconscious—নির্জ্ঞান
verbal—বাচিক
volition—ইচ্ছা
will—সংকল্প

গ্রন্থপঞ্জী

শিক্ষা ও মনোবিদ্যা :

Drever—Introduction to the Psychology of Education.
Gates, A. I.—Psychology for Students of Education (1930).
James, W.—Talks to Teachers.
Nunn, T. P.—Education : Its Data and First Principles.
Ross—Groundwork of Educational Psychology.
Sandiford, P.—Educational Psychology.
Thorndike—Educational Psychology.
Skinner, C.—(Editor) Educational Psychology (1936).

বুদ্ধি ও বিদ্যার পরীক্ষা :

Ballard—Mental Tests.
Burt, C.—Mental and Scholastic Tests.
Hartog—An Examination of Examinations.
Freeman, F. S.—Theory and Practice of Psychological Testing (1950).
Terman—Group Tests of Mental Ability.
Schonell—Diagnostic and Attainment Testing.

শিশু ও কিশোর :

Adler—Guiding the Child.
Charmichael, L. (Editor)—Manual of Child Psychology (1946).
Drummond—The Child.
Hutchison, A. M.—The Child and His Problems.
Skinner, C. E. and P. L. Harriman (Editors)—Child Psychology.
Hall, S.—Adolescence.
Jones, H. E.—Development in Adolescence (1943).
Hollingworth, H. L.—Psychology of Adolescence.
Garrison, K. C.—Psychology of Adolescence.
Valentine, C. W.—Adolescence and Some Problems of Youth Training.

ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি বৈচিত্র্য :

Allport, G. W.—Personality (1937).
Cattell, R. B.—Personality (1947).
Murphy, G.—Personality (1947).
Freeman, F. S.—Individual Differences (1934).

প্রতিভা রহস্য ও প্রতিভাশালী বালক :

Hollingworth, L. S.—Gifted Children.
Terman, L. M.—Genetic Studies of Genius.
Cattell—A Statistical Study of Eminent Men.
Bentlay, J. E.—Superior Children.
Spearman—Nature of Intelligence and the Principle of Cognition.

জড়ধী ও অসম্পূর্ণতাযুক্ত বালকবালিকা :

Ingram Chritina—Education of the Slow Hearing Child.
Goddard—Feeblemindedness—Its Causes, etc.
Soden, William H.—Rehabilitation of the Handicapped.
Potter, R. K. G. A.—Visible Speech (1950).
Stern Edith, M.—The Handicapped Child.

অপরাধ প্রবণতা :

Burt, C.—Young Delinquent.
Goldberg Harriet—Child Offenders (1947).
Slawson, J.—The Delinquent Boy.
Thomas, W. I.—The Unadjusted Girl.

অস্বাভাবী মনোবিদ্যা :

Mc.Dougall—Outlines of Abnormal Psychology.
Corney, Landis—Textbook of Abnormal Psychology.
Dorcuss, R. M. and G. W. Shaffer—Textbook of Abnormal Psychology (1945).
Moss Fred., A and Thelma Hunt—Foundations of Abnormal Psychology (1932).

মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন সম্প্রদায় :

Adler—Individual Psychology.
Bentley, M.—The Psychologies Called Structural (1926).
Carr, H.—Functionalism (1930).
Elm Green—Gstalt Psychology (1938).
Freud—Psychopathology of Everyday Life.
The Interpretations of Dreams.
Three Contributions to the Theory of Sex.
Jacobic J.—The Psychology of Jung.
Jung—Collected Papers on Analytical Psychology.
Koffa, A. K.—Principles of Gestalt Psychology.
Kohlar, R.—Mentality of Apes.
Pavlov—Conditional Reflex.
Titchner—Structural and Functional Psychology.
Robinson, E. S.—Association Theory To-day.
Goldstein—Organismic Approach on the Problem of Motivation.
Stern—General Psychology from Personalistic Standpoint.
Watson—Psychology as a Behaviorist Views It.
Mc.Dougall, W.—Outlines of Psychology;
Social Psychology.

বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে সমালোচনা

Hirdbredir, E.—Seven Psychologies (1933).
Morgan, C. L.—An Introduction to Contemporary Psychology.
Murchison, C.—Psychologies of 1930.
Woodworth, R. S.—Contemporary Schools of Psychology.

প্রয়োগিক মনোবিদ্যা :

Crozier, W. I.—The Foundations of Experimental Psychology.
Myers, C. S.—Textbook of Experimental Psychology.
Woodworth, R. S.—Experimental Psychology.
Titchener, E. B.—Experimental Psychology.
Drever, J.—A First Laboratory Guide in Experimental Psychology.

প্রাণি-মনোবিদ্যা :

Thorndike—Animal Intelligence (1898).
Washburn—Animal Mind, 1908.

Wundt, W.—Lectures on Human and Animal Psychology (1891).
Lloyd Morgan—Animal Life and Intelligence.

সাধারণ মনোবিদ্যা :

Bair, A.—The Senses and the Intellect (1855).
Stout—Manual of Psychology.
Sulley, J.—Outlines of Psychology.
Woodworth, R. S. and Marquis, D. G.—Psychology (1947).

পরিসংখ্যান তত্ত্ব :

Sumner, W. L.—Statistics in School.
Thurstone, L. L.—The Fundamentals of Statistics.
Garret, H. E.—Statistics in Psychology and Education.
Guilford, J. P.—Fundamental Statistics in Psychology and Education.
Bowley—Elements of Statistics.
Elderton—Primer of Statistics.
King—The Elements of Statistical Methods.
Chambers—Statistical Correlations for Beginners.

পথনির্দেশ :

James, A. G.—Principles of Guidance.
Mayers, G.—Principles and Techniques of Vocation Guidance.
Willimson, E.—How to Counsel Students.
Ruth Strong—Educational Guidance.
Little and Chabman—Developmental Guidance in Secondary Schools

ব্যবহারিক মনোবিদ্যা :

Gray—Psychology Applied to Human Affairs.
Griffith—An Introductory to Applied Psychology.
Gray—Psychology in Industry.
Chisel and Brown—Personal and Industrial Psychology.
Viteles—Industrial Psychology.
Fryer, D. R. and others—Handbook of Applied Psychology.

পুস্তকখানি সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত :

Hindusthan Standard : The language of the book makes it pleasant reading and takes away much of the burden of the subject.........the book will easily gain popularity among the serious-minded readers.

Calcutta Review (Reviewed by K. K. Mookerjee): The remarkable feature of the book is that it covers a major portion of the Calcutta University B. T. Syllabus on Educational Phychology, and as such it will satisfy the requirements of the B. T Candidates. The Book written in a lucid nontechnical style and hence will have an appeal to students of education and layman alike. It will also be valuable for teachers it kept in school libraries

দেশ : জ্ঞানের এক বিচিত্র এবং জটিল রাজ্য মনস্তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় সেই জটিল রাজ্যে আমাদের আলো দেখাইয়াছেন।

যুগান্তর : বইখানি সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু হইতেছে অনাড়ম্বর অথচ অত্যন্ত সুন্দর ভাষা অতি সহজভাবে বুঝাইয়া দিবার কৌশল। মনস্তত্ত্ব বিষয়ক এমন চমৎকার বই বাংলা ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ।

আনন্দবাজার : প্রকাশভঙ্গী ও ভাষার প্রাঞ্জলতার গুণে মনস্তত্ত্বের জটিল বিষয়গুলিও সহজ হইয়া আসিয়াছে। আলোচনায় আগাগোরা একটা আন্তরিকতার ভাব ও মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।

শনিবারের চিঠি : এই ধরণের বই যে বাংলায় লেখা হইতেছে, ইহা আমাদের সৌভাগ্য। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে রাখা উচিৎ।

শিক্ষক : শিক্ষা বিষয়ক মনস্তত্ত্ব সাধারণ মনস্তত্ত্ব অপেক্ষাও জটিলতর এ বিষম দুরূহ বিষয়কে লেখক যতখানি সহজ, চিত্তগ্রাহী ও বোধগম্য করিয়া তুলিয়াছেন তাহা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।